রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে
পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক সমিতির
সশ্রদ্ধ নিবেদন

রবীন্দ্রনাথ

সম্পাদক
দেবীপদ ভট্টাচার্য

ইস্টলাইট বুক হাউস
২০, স্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা-১

ইষ্টলাইট বুক হাউস, ২০, ষ্ট্রাণ্ড রোড,
কলিকাতা-১ হইতে শ্রীবাসুদেব লাহিড়ী
কর্তৃক প্রকাশিত।

প্রথম প্রকাশঃ বৈশাখ, ১৩৬৮
মে, ১৯৬১

মূল্য ঃ দশ টাকা।

লয়্যাল আর্ট প্রেস প্রাইভেট লিঃ
১৬৪, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩
হইতে শ্রীনারায়ণ লাহিড়ী কর্তৃক মুদ্রিত।

॥ প্রস্তাবনা ॥

রবীন্দ্রনাথের জীবন শুধু একটি ব্যক্তি মানবের আবির্ভাব ও কর্ম-কৃতির ইতিহাস নয়, মানবতার বিবর্তনের একটি বিশেষ স্তরের নিদর্শন। রবীন্দ্র-নাথের নিজের কথায় বলিতে গেলে, ইতিহাসের আদিক্ষণ হইতে নিখিল মানুষ শুধু 'হইয়া উঠিতেছে'। যাঁহাদের দিকে ভালো-ভাবে তাকাইয়া এই নিখিল মানুষ বিশেষ বিশেষ কাল-বিন্দুতে দাঁড়াইয়া বুঝিতে পারে, এইখানে আসিয়া দাঁড়াইলাম, আমার পূর্ণতার আদর্শের মধ্যে যে অনন্ত সম্ভাবনা নিহিত আছে তাহা এই অবধি আসিয়া এতখানি বিষয়ীকৃত হইয়াছে—আরও এত-খানির সে ব্যঞ্জনা বহন করিতেছে—রবীন্দ্রনাথ সর্বজনস্বীকৃতিতেই তাঁহাদের মধ্যে একজন। মানবতার অখণ্ড ইতিহাস-রচনার জন্য এই জীবনলিপি যেন একটি বিশেষ দেশে বিশেষ কালে মহাকাল কর্তৃক প্রোথিত গূঢ়ার্থক শিলালিপি। রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব সম্বন্ধে এই স্বীকৃতিই দেশে দেশে রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী উৎসবকে বিশেষ তাৎপর্য দান করে।

এই উৎসবে পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক সমিতির কিছু কাজ করিবার দায়িত্ব রহিয়াছে; সেই দায়িত্ব স্মরণ করিয়াই এই সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ। এ সংকলন শুধু প্রশস্তি-রচনার জন্য পরিকল্পিত নয়, কোন্ মানবতা আমাদের মধ্য দিয়া দেশে দেশে কালে কালে পরিপূর্ণ প্রকাশ প্রার্থনা করিতেছে, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার দীর্ঘ জীবনে তাহার কি সন্ধান পাইয়াছেন—আগামী কালের মানুষের পথযাত্রার জন্য তিনি কি ইঙ্গিত রাখিয়া গিয়াছেন বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে তাহাকেই ভালো করিয়া দেখিবার ও বুঝিবার চেষ্টা। এই চেষ্টায় এখানে আমরা হাত মিলাইয়াছি বিশ্বভারতী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ। আমাদের অভিপ্রায়ের সততা আমাদিগকে কাজে আগাইয়া দিয়াছে, অধিকারের বিচারের ভার যাঁহাদের সামনে এই সংকলন-গ্রন্থ উপস্থিত করিতেছি, তাঁহাদের হাতে।

সমিতির পক্ষ হইতে এই সংকলন গ্রন্থের সম্পাদনার গুরুভার স্বেচ্ছায় ও সানন্দে গ্রহণ করিয়াছেন অধ্যাপক দেবীপদ ভট্টাচার্য। ইহা তাঁহার ধন্য-বাদাকাঙ্ক্ষা-নিরপেক্ষ কর্তব্যনিষ্ঠার পরিচায়ক। অন্যান্য যাঁহারা অগ্রবর্তী হইয়া তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে অন্যতম অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সাধন কুমার ভট্টাচার্য, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন ঘোষ, শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, শান্তি সিংহ রায়, গৌতম চট্টোপাধ্যায়, মৃণাল ভদ্র, সত্যজিৎ চৌধুরী, চিত্তপ্রিয় ঘোষ, প্রকৃতিরঞ্জন নাথ, সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। এই সংকলন গ্রন্থ প্রকাশের কৃতিত্বে তাঁহারাও শ্রদ্ধেয় অংশীদার। সমিতির সহযোগী হিসাবে ইষ্টলাইট বুক হাউসের শ্রীযুক্ত বাসুদেব লাহিড়ী এই সংকলন প্রকাশের ভার গ্রহণ করিয়া আমাদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। সংকলন গ্রন্থের মুদ্রক নয়্যাল আর্ট প্রেসের কর্মিবৃন্দও আমাদের ধন্যবাদের পাত্র।

—শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত।

পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক সমিতির উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত

রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সমিতি

সভাপতি

শশিভূষণ দাশগুপ্ত

সম্পাদক

দেবীপদ ভট্টাচার্য

কর্মসচিব

সুরেশ মৈত্র

জীবেন্দ্র সিংহ রায়

কোষাধ্যক্ষ

কেশবেশ্বর বসু

সূচী

রবীন্দ্রনাথ

বাক্‌পতি রবীন্দ্রনাথ

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

উত ত্বঃ পশ্যন্ ন দদর্শ বাচম্,
উত ত্বঃ শৃণ্বন্ ন শৃণোতি এনাম্।
উতো ত্বস্মৈ তন্বং বি সস্রে—
জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ ॥

কেহ বাক্‌কে দেখিয়াও দেখে না,
কেহ ইহাকে শুনিয়াও শুনে না।
কিন্তু বাক্ কাহারও-জন্য নিজ তনু আবিষ্কৃত করে
পতির-জন্য প্রেমময়ী সুন্দর-বস্ত্র পরিহিতা জায়া যেমন ॥

প্রায় সত্তর বৎসর হইল রবীন্দ্রনাথ তাঁহার মাতৃভাষা সম্পর্কে প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন—তাঁহার "বাংলা উচ্চারণ" শীর্ষক প্রবন্ধ। এটী তাঁহার "শব্দ-তত্ত্ব"-নামক প্রবন্ধ-সংগ্রহে প্রথম দেওয়া হইয়াছে। ইহার পূর্বে ও পরে তাঁহার সাহিত্য-জীবনে তিনি নানা-ভাবে সাহিত্য-স্বষ্টি এবং সাহিত্য-আলোচনা এই উভয় পথেই অদ্ভুত শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়া বাঙ্গালা ভাষাকে ধন্য এবং জগৎ-সমক্ষে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের লোকোত্তর প্রতিভার মুখ্য প্রকাশ ঘটিয়াছে বাংলা ভাষার মাধ্যমে। একদিকে তিনি যেমন অপার্থিব বিভূতির অধিকারী, যে বিভূতি বা দেবদত্ত শক্তি না থাকিলে শিল্প-রচনা সার্থক এবং শাশ্বত রস-রচনার পর্যায়ে উন্নীত হইতে পারে না, তেমনি অন্যদিকে তিনি সাধক, তিনি প্রয়োগ-বিজ্ঞানে নিপুণ শিল্পী, যে প্রয়োগ-বিজ্ঞান এবং শিল্প-নৈপুণ্য তাঁহার রস-স্বষ্টিকে আদিম বা আদিম-গন্ধী এবং অশিক্ষিত-পটু রচনার ঊর্ধ্বে, প্রৌঢ় এবং শিক্ষিত শিল্পের পদবীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের চিত্তে একাধারে অপার্থিব রসানুভূতি ও বস্তু-তন্ত্র বিজ্ঞানের অপূর্ব সমন্বয় দেখা যায়; সেই জন্যই তাঁহার রচনা ও আলোচনা উভয়ই কল্পনা ও বিজ্ঞানের আলোকে উজ্জ্বল।

প্রয়োগ-নিপুণ শিল্পী বলিয়াই রবীন্দ্রনাথ কেবল অনুভূতি ও আবেগ আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারেন নাই, তাঁহাকে বস্তুর প্রতি দৃষ্টি দিতে হইয়াছে, তাঁহাকে বৈজ্ঞানিক হইতে হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির কাছে কিছুই তুচ্ছ নয়—যাহা-কিছু চর্মচক্ষের সমক্ষে "সৎ" বা বিদ্যমান, তাহার সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক-দৃষ্টি-সম্পন্ন ব্যক্তির কৌতূহল থাকিবেই। রবীন্দ্রনাথের মনও এই বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক মন।

বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণত্ব এবং সঙ্গে সঙ্গে রসানুভূতিজাত কল্পনা ও প্রকাশ শক্তির একত্র সমাবেশ, পৃথিবীতে খুব কমই দেখা গিয়াছে। আধুনিক ইউরোপের সাহিত্য-ক্ষেত্রে এইরূপ মনের প্রকৃষ্ট পরিচয় আমরা পাই জরমান কবি Goethe গ্যোতে-তে; আমাদের দেশে রস-রচয়িতাদের মধ্যে এরূপ সর্বন্ধর বৈজ্ঞানিক মন বোধ হয় এক রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই দেখা দিয়াছে।

বিশ্ব-প্রপঞ্চের ব্যাপার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ঔৎসুক্য এবং অনুধাবনের পরিচয় দিয়াছেন। গণিত, ফলিত বিজ্ঞান—দ্যুলোকতত্ত্ব, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, ভূতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব প্রভৃতি আধুনিক বিজ্ঞান—রীতিমত অনুশীলন না করিলেও, ঐসব বিষয় সম্বন্ধে আধুনিক সভ্য ও সংস্কৃতিপূত চিত্তের উপযোগী কৌতূহল এবং জিজ্ঞাসা তাঁহার আছে। তাঁহার মধ্যে রসসৃষ্টির অপরিহার্যতা বা অবশ্যম্ভাবিতা না থাকিলে, এই মন লইয়া রবীন্দ্রনাথ হয়তো একজন বড় দরের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারক হইতে পারিতেন। তিনি ভাষা-গত বস্তুর আলোচনা অবলম্বন করিয়া যে সহজ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। আধুনিক ভারতে ভাষানুসন্ধিৎসুগণের পক্ষে ইহা একটী মার্জনীয় আত্মপ্রসাদের কথা যে, রবীন্দ্রনাথের মত দিব্যদৃষ্টি-সম্পন্ন কবি, শাব্দিকগণের অগ্রণী হইয়া অবস্থান করিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার প্রকাশ হইতেছে প্রধানতঃ বাঙ্ময় প্রকাশ। সঙ্গীত, অভিনয়, রূপকর্ম—এই তিনেও তাঁহার লক্ষণীয় এবং প্রশংসনীয় কৃতিত্ব থাকিলেও, মুখ্যতঃ তিনি কবি, তিনি শব্দচিত্রকার, তিনি ভাষাশিল্পী। তাঁহার প্রতিভার এই প্রধান অবলম্বন, ভাষা, এবং বিশেষ করিয়া বঙ্গভাষা, তাঁহাকে যে আকৃষ্ট করিবে, তাহা স্বাভাবিক।

মধ্য-যুগের সংস্কৃত বৈয়াকরণ বোপদেব তাঁহার "মুগ্ধবোধ" ব্যাকরণের প্রারম্ভে, ভাষা এবং ভাষাশ্রয়ী চিন্তার উৎস-স্বরূপ শাশ্বত সত্তার প্রণাম করিয়াছেন চিরাচরিত রীতিতে "ওঁ নমঃ শিবায়" মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া; কারণ, উপনিষদের কথায়, "প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ প্রসৃতা পুরাণী"—এই শাশ্বত শিব হইতে পুরাতনী প্রজ্ঞা—বাক্—নিঃসৃত হইয়াছেন। তাহার পরে বৈয়াকরণ সংক্ষিপ্ত কিন্তু গভীর-ভাবের পরিচায়ক দুইটী শব্দে মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন—

॥ শং শব্দৈঃ ॥

অর্থাৎ, শব্দ-সমূহ-দ্বারা শম্ অর্থাৎ মঙ্গল হউক। বৈয়াকরণ এখানে রহস্য-বাদী হইয়াছেন—ক্ষুদ্র দুইটী শব্দের সাহায্যে, মানব-ভাষার অন্তর্নিহিত শক্তি, সৌন্দর্য এবং অবিনশ্বরত্ব সম্বন্ধে তাঁহার চেতনা বা উপলব্ধির আভাস আমাদের তিনি দিয়াছেন; বাঙ্ময়-গত রহস্য বা আনন্দ-বোধের পরিচয় নীরস ব্যাকরণ-

সূত্রে পরে আর কোথাও দিবার সুযোগ তাঁহার হয় নাই। রবীন্দ্রনাথও নিজ সমগ্র জীবনে শব্দ-দ্বারা এই 'শম্' বা 'সত্য-শিব-সুন্দর'-এর প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি যে শব্দের শক্তি, প্রয়োগ ও বিবৃতি—অর্থাৎ 'ব্যাকরণ'—লইয়া বিচার করিবেন, ইহাতে আশ্চর্যান্বিত হইবার কিছুই নাই; বৈজ্ঞানিক-সুলভ কৌতূহল ও জিজ্ঞাসার বশে কবি রবীন্দ্রনাথ, 'ব্যাকরণিয়া' রবীন্দ্রনাথ হইতে দ্বিধাবোধ করেন নাই।

রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতি ও রীতি লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহার "বাংলাভাষা পরিচয়" বইয়ে। ইহাতে বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে নিজ অবলোকন-লব্ধ কতকগুলি মূল্যবান্ তথ্য রবীন্দ্রনাথ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—ভাষার আলোচনা প্রসঙ্গে ইহা রবীন্দ্রনাথের এ-তাবৎ প্রকাশিত শেষ রচনা। রবীন্দ্রনাথ ভাষাবিজ্ঞান-ব্যবসায়ীর মত অনুশীলন-রীতি বা পরি-পাটী অবলম্বন করিয়া ভাষাতত্ত্বের চর্চা করেন নাই, সেইজন্য তিনি নিজেকে "ভাষা-সম্বন্ধে ভূগোল-বিজ্ঞানী" না বলিয়া, নিজের সম্বন্ধে বলিতেছেন—"আমি যেন পায়ে চলা পথের ভ্রমণকারী।......বিজ্ঞানের রাজ্যে স্থায়ী বাসিন্দাদের মতো সঞ্চয় জমা হয় নি ভাণ্ডারে, রাস্তায় বাউলদের মতো খুশি হ'য়ে ফিরেছি, খবরের ঝুলিটাতে দিন-ভিক্ষে যা জুটেছে তার সঙ্গে দিয়েছি আমার খুশির ভাষা মিলিয়ে। ......জ্ঞানের দেশে ভ্রমণের শখ ছিল ব'লেই বেঁচে গেছি, বিশেষ সাধনা না থাকলেও। সেই শখটা তোমাদের মনে যদি জাগাতে পারি, তা হ'লে আমার যতটুকু শক্তি সেই অনুসারে ফল পাওয়া গেল মনে ক'রে আশ্বস্ত হবো।"

রবীন্দ্রনাথ নিজের কৃতিত্ব সম্বন্ধে বিশেষ বিচার-শীল হইয়া কথাগুলি লিখিয়াছেন। তাঁহার ভাষাতত্ত্ব-আলোচনার প্রেরণা নিজের কথাতেই তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন—"মানুষের মনোভাব ভাষাজগতের যে অদ্ভুত রহস্য আমার মনকে বিস্ময়ে অভিভূত করে, তার ব্যাখ্যা ক'রে আমি এই বইটি আরম্ভ করেছি।" আমার মনে হয়, ভাষা সম্বন্ধে এই রহস্য-বোধ, আর ভাষার ব্যাখ্যার চেষ্টা, এই দুইটীর সম্বন্ধে একটা সচেতন ভাব এবং কৌতূহল, তাঁহার রস-রচনা এবং ভাষা-ঘটিত আলোচনা, উভয়ের দ্বারা রবীন্দ্রনাথ আমাদের মনে জাগাইতে সমর্থ হইয়াছেন।

ভাষা-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের "বিশেষ সাধনা" ছিল না, এ কথা তিনি বলিয়াছেন। বিশেষ সাধনা, professional বা পেশাদার ভাষাতাত্ত্বিকের মত ছিল না, হয় তো এ কথা সত্য; কিন্তু এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সাধনা যে অনন্যসাধারণ, তাহার পরিচয় তাঁহার বাঙ্গালা ভাষা এবং বাঙ্গালা ছন্দ বিষয়ে আলোচনায় ভূরি ভূরি আছে। "শব্দ-তত্ত্ব"র প্রবন্ধাবলী হইতে দেখা যায়, পূর্বে বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে যতটুকু অনুশীলন হইয়াছিল,

রবীন্দ্রনাথ তখন সে সমস্তটুকুর সহিত পরিচিত ছিলেন। উপরন্তু তিনি আধুনিক বাঙ্গালার উচ্চারণ সম্বন্ধে, এবং বাঙ্গালার ধ্বন্যাত্মক শব্দ, শব্দ-দ্বৈত প্রভৃতি কতকগুলি বৈশিষ্ট্যে সম্বন্ধে প্রথম অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, প্রথম চিরতরে এই-সব বিষয়ে কতকগুলি সূত্র আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। যেমন বাঙ্গালার স্বর-সঙ্গতির সূত্রগুলি; বাঙ্গালার ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রকৃতি—ইহারই আধারে স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় বাঙ্গালা ভাষার এই শ্রেণীর শব্দগুলির এক অতি চমৎকার আলোচনা করেন ("ধ্বনি-বিচার", সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩১৪ সাল, দ্বিতীয় সংখ্যা; "শব্দ-কথা", ১৩২৪, প্রথম প্রবন্ধ)। বাঙ্গালা নাম ও সর্বনাম শব্দের তির্যক্ রূপ সম্বন্ধে, এবং এই রূপ আরও কতকগুলি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের আলোচনা বাদ দিতে পারা যায় না।

প্রথম প্রথম রবীন্দ্রনাথ ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণায় যে ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, পরবর্তী কালে সে আকর্ষণ তাঁহার মনে হয় তো ছিল না—কারণ পেশাদার ভাষাতাত্ত্বিক না হইলে এই জটিল বিষয়ের সমস্ত সূত্র ধরিয়া অনুসন্ধান করা সাধারণের পক্ষে একটু কষ্ট-সাধ্য ব্যাপার হইয়া পড়ে—ভাষাশিল্পী কবির পক্ষেও বটে। নিছক শাব্দিক অপেক্ষা কবির আসন অনেক উচ্চে,—শাব্দিকের মত আদার ব্যাপারী হইয়া থাকা কবির পক্ষে সম্ভবপর হয় না। সুতরাং পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে কবি যে অনুশীলন আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেই ধারা বহিয়া উত্তর-কালে শব্দশাস্ত্রের কোনও বিরাট্ গবেষণায় তাহার পরিণতি হয় নাই। ইহাতে হয় তো শব্দশাস্ত্রের দিক্ হইতে আমরা একটু আক্ষেপ করিতে পারি; কিন্তু সমস্ত শব্দশাস্ত্র অপেক্ষা যাহা বড়, যাহা ব্যাপক, যাহা মানব জাতির পক্ষে উপযোগী, সেই কাব্য-সাহিত্যকে রবীন্দ্রনাথ সমৃদ্ধ করিয়াছেন, মানব-জাতির শাশ্বত সম্পদ্‌রূপে তাহাকে বাঙ্গালা ভাষায় সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; নিছক বৈজ্ঞানিক হইয়া শব্দের জালে তিনি যে জড়াইয়া পড়েন নাই, শব্দকে পক্ষ করিয়া তিনি অসীমে যে উড্ডীন হইয়াছেন, ইহা মানব-জাতির সৌভাগ্য।

ছন্দের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালা ছন্দের প্রকৃতি লইয়া কতকগুলি বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন ও শ্রীযুক্ত অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় যে ভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বাঙ্গালা ছন্দের আলোচনা করিয়াছেন—বিশেষতঃ অমূল্যবাবু যে ভাবে বাঙ্গালা ছন্দের রীতি ও নিয়মগুলি সূত্র-নিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন—রবীন্দ্রনাথ সে ভাবে ছন্দস্তত্ত্ব লিখেন নাই। এখানে তিনি ছন্দোরাজ্যের বিজ্ঞান-সম্মত ভৌগোলিক নহেন, তিনি ছন্দোরাজ্যের সম্রাট্,—এমন জনপ্রিয় সম্রাট্ যিনি নিজ রাজ্যের সর্বত্র স্বাধীনভাবে অপ্রতিহত-গতিতে বিচরণ করেন, ও সেই দেশের খবর যাহারা চাহে তাহাদেরও এই বিচরণ-লব্ধ জ্ঞান দিতে কার্পণ্য করেন না।

রবীন্দ্রনাথের ভাষার উপর অধিকার এবং ভাষার প্রকৃতি-সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি বিবেচনা করিলে, সত্যই তাঁহাকে "বাক্‌পতি" বলিয়া সংবর্ধনা করিতে হয়। আমাদের বাঙ্গালা ভাষা ধন্য, ইহার কাব্য-সাহিত্য ধন্য, ইহার তথ্যানুশীলন ধন্য, যে এই ভাষায় এত বড় বাক্‌পতি কবি এবং মনীষী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—যিনি সত্যকার বাগ্‌দ্রষ্টা ও বাক্‌শ্রোতা, এবং যাঁহার নিকট বাগ্‌দেবী আপনাকে প্রকট করিয়াছেন।

ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন

যে-সকল ক্ষণজন্মা পুরুষ যুগে যুগে আবির্ভূত হয়ে মানুষকে ইতিহাসের মহাযাত্রাপথে তার শেষ লক্ষ্যের অভিমুখে পরিচালিত করে যান, সেই সমস্ত মানবপ্রেমিকদের জীবনব্রতের চরম মূল্য নির্ণয় করার একমাত্র অধিকারী মহাকাল। সমগ্র মানবের অখণ্ড ইতিহাসের বিশাল পটভূমির উপরে তাঁদের জীবনচিত্র গতিশীল কালের তুলিতেই মোটা রেখায় ও অক্ষয় বর্ণে অঙ্কিত হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর দীর্ঘ-জীবনের মহৎব্রত উদ্‌যাপন করে অনন্ত কালের অদৃশ্য পথে মহাপ্রয়াণ করেছেন। বিশ্বমানবের জন্যে তাঁর জীবন যে বাণী বহন করে এনেছিল, বৃহৎকালের ব্যবধানে তার অর্থ ক্রমশঃ পরিস্ফুট হবে। বর্তমান কালের অনতিব্যবধান থেকে তাঁর সমুন্নত বিরাট্ ব্যক্তিত্বকে সমগ্রভাবে দৃষ্টিগোচর ও উপলব্ধি করা স্বভাবতই অসম্ভব। কিন্তু তাঁর জীবন ও ব্যক্তিত্বকে সর্বকালের বিশাল ভূমিকায় স্থাপন করে পরিমাপ করার অধিকার আধুনিক কালের না থাকলেও বর্তমান যুগের যে বাণী ও ব্রত তাঁর মধ্যে মূর্তিপরিগ্রহ করেছিল তার স্বরূপনির্ণয়ের শুধু অধিকার নয়, দায়িত্বও আধুনিক কালেরই। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা যুগপ্রতিনিধি রবীন্দ্রনাথের জীবন ও বাণীর বৈশিষ্ট্য কোথায়, তা নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করব।

প্রথমেই বলে রাখা প্রয়োজন যে, ইতিহাসের পর্বে পর্বে এক-একটি জাতির মধ্যে যে-সব মহাপুরুষ আবির্ভূত হন, তাঁরা সকলেই একাধারে যুগপ্রতীক ও যুগপ্রবর্তক। রবীন্দ্রনাথের বেলাতেও এই সত্যের ব্যতিক্রম ঘটেনি। যে-কালে তিনি আমাদের মধ্যে এসেছিলেন সে-কালের বিশ্ববাণী তাঁর মধ্যে সংহত হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল। শুধু তাই নয়, সে-কালের অন্তরে নূতন প্রাণ ও শক্তি সঞ্চার করে তাকে নবতর সার্থকতার অভিমুখে প্রেরণা দান করেছিলেন। স্বীয় কালের যে অভিপ্রায় ও সংকল্পকে তিনি আমাদের কাছে বহন করে এনেছিলেন, তাঁর জীবনের ব্রতকে আমাদের মধ্যে পূর্ণতররূপে প্রতিষ্ঠিত করবার উদ্দেশ্যেই তাঁর কণ্ঠনিঃসৃত সেই যুগাভিপ্রায় ও সংকল্পের বাণীকে সমগ্রভাবে উপলব্ধি করা আমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক।

রবীন্দ্রনাথের জীবনকাল বিশ্বের তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি পরম যুগসন্ধিক্ষণ। এই সন্ধিক্ষণে বিচিত্র রকমের দানবীয় ও দৈব শক্তির সংঘাতে কালসমুদ্র যেমন প্রবলভাবে মথিত হয়েছে, পৃথিবীর ইতিহাসে তেমনটি আর

কখনও ঘটেনি। ওই মন্থন আসলে মানুষের চিত্তসমুদ্রেরই মন্থন। সেই উন্মন্থনের ফলে যে অমৃতরাশি উত্থিত হয়েছে, তারই বাহকরূপে তিনি সমগ্র জীবনকাল বিশ্বজগতের কাছে ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। আর, যে আপাত-মনোরম তীব্র হলাহল উদ্‌গত হয়ে জনচিত্তকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছে, তাঁর সদাসতর্ক কণ্ঠ কঠিন ধিক্কারধ্বনিতে ওই হলাহলকে নিন্দিত করে বিশ্ব-জগতের বিশেষতঃ ভারতবর্ষের হৃদয়কে তার প্রতি বিমুখ করে তুলতে চিরপ্রয়াসী ছিল। তাঁর জীবনের শেষ মহাবাণী 'সভ্যতার সংকট'-নামক রচনাটিতেই এ-কথার প্রমাণ জ্বলন্ত অক্ষরে দীপ্যমান হয়ে রয়েছে। যে-অমৃতের পাত্র তিনি বিশ্বের দ্বারে দ্বারে বহন করে নিয়ে গিয়েছেন, সে-অমৃত যে ভারতেরই অমৃত এ-কথাটি বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। কাশীরাম দাসের গ্রন্থের যে বাণীটি আমাদের কানে এবং প্রাণে সব চেয়ে বেশি করে ধ্বনিত হয় সেটি হচ্ছে,—'মহাভারতের কথা অমৃত-সমান'। গভীরভাবে তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে রবীন্দ্রনাথেরও জীবনসাধনার মূলবাণী হচ্ছে—'মহা-ভারতের কথা অমৃত-সমান'। কিন্তু ওই বাণীকে তিনি নূতন অর্থে উদ্দীপ্ত এবং নূতন প্রাণে সঞ্জীবিত করে তুলেছেন। তাঁর সমগ্র জীবনব্যাপী বাণীসাধনার মূল লক্ষ্যই হচ্ছে একটি বিরাট্ অখণ্ড অথচ বিচিত্র মহা-ভারত রচনা। যে মহাভারতের মহৎ সমুজ্জ্বল রূপ তিনি ধ্যাননেত্রে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, সেই রূপটি একই কালে ভৌমণ্ডলিক রূপ এবং মানস রূপ। ভারতবর্ষের মনকেই তিনি দেখেছিলেন তাঁর নিজের মনের মধ্যে। এই দৃষ্টিতে লক্ষ্য করলে তাঁর সমগ্র রচনাবলীকে আধুনিক কালের উপযোগী একখানি বিপুলকায় ও বহুপর্বিক মহাভারত বলেই স্বীকার করতে হবে। আপাতদৃষ্টিতে প্রাচীন মহাভারত ও আধুনিক রবীন্দ্ররচনার মধ্যে শুধু যে অপরিমেয় পার্থক্যই লক্ষিত হবে তা নয়, এই উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্যস্থাপনের প্রয়াসটাই নিরর্থক বলে মনে হবে। কিন্তু গভীরতর দৃষ্টিতে বোঝা যাবে, উভয়েরই মর্মবস্তু এক; উভয়ের হৃৎপিণ্ড একই বিরাট্ ছন্দে স্পন্দিত হচ্ছে এবং সে ছন্দ হচ্ছে মহান্ ভারতবর্ষের মহত্তর আদর্শ ও অভিপ্রায়ের ছন্দ। রবীন্দ্র-নাথেরই ভাষায় বলতে গেলে তখন ভারতবর্ষ 'আপন বিরাট্ চিন্ময়ী প্রকৃতিকে প্রত্যক্ষরূপে সমাজে স্থিরপ্রতিষ্ঠ করতে উৎসুক হয়ে উঠেছিল; দেশের বিদ্যা, মননধারা ও চিৎপ্রকর্ষের যুগব্যাপী ঐশ্বর্যকে একত্র সংহত করে সুস্পষ্টরূপে নিজের গোচর করে তোলার নিরতিশয় আগ্রহ জেগেছিল সমস্ত দেশের মনে। তখনকার কালের ওই অভিপ্রায় এবং সমস্ত দেশের ওই ঔৎসুক্য ও আগ্রহই রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে তৎকালীন ভারতসংহিতার মধ্যে। আধুনিক কালেও সমগ্র দেশব্যাপী অভিপ্রায় এবং আত্মপ্রকাশের আগ্রহ রবীন্দ্রনাথকে আশ্রয় করে তাঁর বিপুল রচনারাশির মধ্যেই মূর্ত ও স্থিরপ্রতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে, এ-কথা বললে

কি অন্যায় হবে? মহাভারতকার কাশীরাম দাসকে লক্ষ্য করে কবি মধুসূদন যে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন, তাকে ঈষৎ রূপান্তরিত ও অর্থান্তরিত করে আমরা রবীন্দ্রনাথকে লক্ষ্য করেও বলতে পারি—

মহা-ভারতের কথা অমৃত-সমান,
হে রবি, কবীশদলে তুমি পুণ্যবান্।

মহা-ভারতের বাণীবাহক রবীন্দ্রনাথের স্বরূপ সম্যক্ উপলব্ধি করা চাই; নতুবা ভারতবর্ষের মর্মনিহিত অভিপ্রায় ও আধুনিক কালের নির্দেশ আমাদের কাছে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি কালিদাস ভৌগোলিক ভারতবর্ষের বিরাট্ পটভূমিরূপ হিমালয় পর্বতের বর্ণনার সূচনাতেই বলেছেন,—

অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা
হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ।

নগাধিরাজ হিমালয়কে 'দেবতাত্মা' না বলে যদি 'ভারতাত্মা' নামে অভিহিত করা হত তা-হলে শুধু যে কাব্যের ছন্দ-সংগতি অব্যাহত থাকত তা নয়, তার ভাবসংগতিও অধিকতর সুরক্ষিত হত বলেই আমার বিশ্বাস। কেননা, ওই মহাগিরির বিরাট্ রূপের মধ্যে ভৌগোলিক ভারতবর্ষের অন্তরাত্মা যে সত্যই অচলপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, এ-কথা বলাই বাহুল্য। আর, ভাবরূপী ভারতবর্ষের আত্মা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে তার মহাকবিদের রচনাবলীতে—ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথের বাণীসংহিতাতে। বস্তুতঃ এই ভারতাত্মা মহাকবিদের কাব্যসমূহের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত না হয়ে ভারতীয় আত্মার প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করা সম্ভব নয়। 'যাহা নাই মহাভারতে তাহা নাই ভারতে', এই জনবাদের সার্থকতা শুধু যে ব্যাসের গ্রন্থ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য তা নয়; অন্য তিনজন মহাকবির রচনাবলী সম্বন্ধেও এ-কথা সমভাবেই সার্থক। ভারতাত্মা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের আধুনিক যুগ যে অপূর্ব রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে, তাকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করতে না পারলে রবীন্দ্রনাথকেও ঠিকমতো জানা যাবে না, আধুনিক যুগও আমাদের কাছে অচেনাই থেকে যাবে।

পূর্বেই বলেছি, যে-সময়ে রবীন্দ্রনাথ এ-দেশের আলোতে প্রথম নয়ন উন্মীলন করলেন সেটি বিশ্বের তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি মহাযুগসন্ধিক্ষণ। ইতিহাসের বহুবিচিত্র শক্তি সেই সন্ধিক্ষণে আমাদের দেশে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল এবং ওই শক্তিসংঘাতের জটিল আবর্তের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের জীবনযাত্রা শুরু হয়েছিল। সিপাহি-যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই তাঁর জন্ম। আর ওই সিপাহি-যুদ্ধের অগ্নিশিখাতেই ভারতের পূর্বতন রাষ্ট্রশক্তিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার সমস্ত আশা নিঃশেষে ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছিল। পাশ্চাত্ত্য

সংঘশক্তি ও অস্ত্রশক্তির নিকট ভারতীয় রাষ্ট্রশক্তি সম্পূর্ণরূপে পরাভব স্বীকার করতে বাধ্য হল। শুধু রাষ্ট্রশক্তি নয়, চিত্তশক্তির ক্ষেত্রেও পাশ্চাত্ত্যের জয়ধ্বজা ভারতভূমিতে সগর্বে প্রোথিত হল। ইউরোপীয় বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রভৃতি তীব্ররশ্মিতে ভারতের চোখকে ধাঁধিয়ে দিয়ে তার চিত্তকে প্রায় সম্পূর্ণরূপেই অভিভূত করে ফেলেছিল। কিন্তু সুখের বিষয় প্রাচ্য আত্মাকে একান্ত পরাভবের গ্লানি থেকে বাঁচাবার রক্ষামন্ত্রটিও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের ওই চিত্তসংঘাতের মধ্যেই নিহিত ছিল। শুধু তাই নয়, দুইটি অরণিকাষ্ঠের সংঘর্ষণে যেমন অগ্নি উৎপন্ন হয়ে যজ্ঞসমিধ্‌কে প্রজ্জ্বলিত করে তোলে, তেমনি পূর্ব ও পশ্চিমের সংঘর্ষজাত অগ্নিশিখা ভারতীয় চিত্তকে যে উদ্দীপনা দান করল তাই তাকে নূতন সার্থকতার পথে প্রেরিত করেছে। ইউরোপীয় চিৎশক্তির বিদ্যুৎ-সংস্পর্শে যেন ভারতবর্ষের মুমূর্ষু দেহে নূতন প্রাণ সঞ্চারিত হল এবং সেই নব-জাগরিত ভারত যেন চারদিকের পরাভবের অন্ধকারের মধ্যেও নূতন আলোতে নূতন পথের সন্ধানে উৎসুক হয়ে উঠল। বাংলাদেশের সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসটাই ওই নব চাঞ্চল্যের স্পন্দনে স্পন্দিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এই দীর্ঘকালের সন্ধানেও ভারতবর্ষের পক্ষে আপন পথ, তার স্বকীয় সার্থকতার পথ আবিষ্কার করা সহজ হয়নি। উনবিংশ শতকের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখি দুই দল লোক ভারতের তরণীকে দুইটি বিভিন্ন স্রোতোমুখে পরিচালিত করতে প্রবল প্রয়াস করছে। একদল চাইছে ভারতবর্ষকে অন্তরে-বাহিরে ভাবে চিন্তায় আদর্শে রাষ্ট্রব্যবস্থায় পাশ্চাত্ত্য ভাবাপন্ন করে তুলতে, আর-এক দলের ইচ্ছা ভারতকে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রেখে তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য অব্যাহত রাখা। অবশ্য এ-কথা বলাই বাহুল্য যে, উভয় দলেই আদর্শ ও অভি-প্রায়ের তারতম্য অনুসারে নিজেদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ ও পার্থক্য ছিল। তা-ছাড়া, আর-এক শ্রেণীর লোক ছিল যাদের বলা যেতে পারে মধ্যপন্থী ; তাদের উদ্দেশ্য প্রাচ্য ও প্রতীচ্য আদর্শের মধ্যে অল্পাধিক সমন্বয় স্থাপন করা। এই দলের অনুবর্তীদের সংখ্যাই ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু মধ্যপথের রেখা কোথায় টানা হবে, সমন্বয়ের সীমা কোথায়, তা নিয়েও মতপার্থক্যের অন্ত ছিল না। এই প্রাচ্য-প্রতীচ্যের দ্বন্দ্ব ছাড়া আরও এক দ্বন্দ্ব তখন দেশে অত্যন্ত উগ্র হয়ে উঠেছিল। সে দ্বন্দ্ব হচ্ছে নূতন-পুরাতনের দ্বন্দ্ব। কারও মতে প্রাচীন ভারতের সমাজ ও ধর্মব্যবস্থাকে পুনরুজ্জীবিত না করলে বর্তমান ভারতের সার্থকতা লাভের আশা নেই। আর-এক দলের মতে ও ব্যবহারে প্রমাণিত হয় যে, তারা বর্তমানের ব্যবস্থাকেই অল্পাধিক অক্ষুণ্ণ রাখতে চায়। অবশ্য এ-ক্ষেত্রেও স্বভাবতই মধ্যপন্থাই অধিকাংশের চিত্তকে বেশি করে আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু মধ্যপথ কোথায়, সে-বিষয়ে মতের একতা দেখা যায়নি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে,

তখনকার দিনে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য এবং প্রাচীন ও আধুনিক, এই চারটি বিরুদ্ধ শক্তির সংঘাতে আমাদের জাতীয় চিত্ত আলোড়িত হচ্ছিল। সূক্ষ্মতর ভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে বিরুদ্ধশক্তি আসলে চারটি নয়, তিনটি। প্রাচ্য-পন্থীরাই প্রাচীন ও আধুনিক এই দুই দলে বিভক্ত ছিল। আধুনিকপন্থীরা মোটা-মুটি রক্ষণশীল, সর্বপ্রকার পরিবর্তনেরই তারা বিরোধী; প্রাচীনপন্থীরা চান ভারতবর্ষের অতীতকেই ভবিষ্যতে প্রতিফলিত করতে, অর্থাৎ অতীতের আদর্শে ভবিষ্যৎকে গড়ে তোলাই তাদের অভিপ্রায়। আর, প্রতীচ্যপন্থীদের মতে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎকে গড়তে হবে ইউরোপের আদর্শে। বলা বাহুল্য, সমস্যা হচ্ছে ভবিষ্যৎকে নিয়ে; ভারতের ভাবী রূপ হবে কেমন সেইটেই হল মূল প্রশ্ন। রক্ষণশীলদের মতে সেটা হবে বর্তমানেরই অনুবৃত্তিমাত্র; প্রাচীনপন্থীদের মতে অতীতেরই প্রতিরূপ এবং প্রতীচ্যবাদীদের মতে ইউরোপীয় আদর্শের অনুকৃতি বা অনুস্মৃতি। বলা বাহুল্য, আদর্শের এই রকম সুস্পষ্ট ও পরিচ্ছিন্ন বিভাগ থাকা কখনও সম্ভব নয়। সকলেই অল্পবিস্তর সমন্বয়ের পক্ষপাতী ছিল। কিন্তু ওই সমন্বয়সাধনের উপলক্ষ্যে সকলেরই উক্ত তিন আদর্শের কোনো না কোনোটার প্রতি অত্যাধিক আকর্ষণ প্রকাশ পেত। কিন্তু দেশ তো তিন পথে অগ্রসর হতে পারে না। তাকে হয় একটি পথ বেছে নিতে হবে, না-হয় একটি নূতন পথ আবিষ্কার করতে হবে। কিন্তু সে কোন্ পথ? এই সমস্যাই তখন জাতীয় চিত্তকে ব্যাকুল করে তুলেছিল। ধর্মে-দর্শনে, সাহিত্যে-শিক্ষায়, সমাজে-রাষ্ট্রে সর্বত্রই এই সমস্যা তখন উদগ্র হয়ে উঠেছিল।

এই সমস্যার দিনেই রবীন্দ্রনাথ আবির্ভূত হলেন আমাদের জাতীয় সাধনার ক্ষেত্রে। স্বভাবতই তাঁকেও ভারতের যাত্রাপথনির্ণয়ের মহাব্রতে ব্রতী হতে হয়েছিল। তাঁকে নানা সময়ে নানা দিকে ঝুঁকতে হয়েছিল, নানা দ্বিধায় আন্দোলিত হতে হয়েছিল। অবশেষে তিনি যে-পথকে ভারতবর্ষের সার্থকতা-লাভের যথার্থ পথ বলে অন্তরে স্থিরভাবে উপলব্ধি করলেন, তাকে তিনি 'ভারত-পথ' নামেই অভিহিত করেছেন। এই পথের সুস্পষ্ট পরিচয় পাই তাঁর গোরা উপন্যাসে (১৩১৪-১৬), 'পূর্ব ও পশ্চিম'-নামক প্রবন্ধটিতে (১৩১৫), 'ভারততীর্থ' নামক বিখ্যাত কবিতাটিতে (১৩১৭) এবং রামমোহন-শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে পঠিত অভিভাষণদ্বয়ে (১৩৪০)। তিনি নিজেও ছিলেন এই ভারতপথেরই পথিক এবং তাঁর স্বজাতিকেও ওই নির্দিষ্ট যাত্রাপথেই আহ্বান করে গিয়েছেন। এই ভারতপথের বৈশিষ্ট্য কি, তা বিচার করে দেখা অবশ্য কর্তব্য।

গোরা যখন নিজের জন্মগত পরিচয় লাভ করল তখনই সে বহু অনু-সন্ধানের পর নিজের সত্যকার আত্মার পরিচয়ও লাভ করল। তখনই বলতে

পারল, আজ আমি 'সম্পূর্ণ অনাবৃত চিত্তখানি নিয়ে একেবারে ভারতবর্ষের কোলের উপরে ভূমিষ্ঠ হয়েছি'। এই আত্মোপলব্ধির ফলেই সে জোরের সঙ্গে ঘোষণা করেছে, "আমি আজ ভারতবর্ষীয়। আমার মধ্যে হিন্দু মুসলমান খ্রীস্টান কোনো সমাজের কোনো বিরোধ নেই। আজ ভারতবর্ষের সকলের জাতই আমার জাত, সকলের অন্নই আমার অন্ন।....আমাকে আজ সেই দেবতারই মন্ত্র দিন যিনি হিন্দু মুসলমান খ্রীস্টান ব্রাহ্ম সকলেরই—যাঁর মন্দিরের দ্বার কোনো জাতির কাছে কোনো ব্যক্তির কাছে কোনোদিন অবরুদ্ধ হয় না—যিনি কেবলই হিন্দুর দেবতা নন, যিনি ভারতবর্ষের দেবতা।"

'পূর্ব ও পশ্চিম' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রথমেই প্রশ্ন তুলেছেন, 'ভারতবর্ষের ইতিহাস কাহাদের ইতিহাস'। এই প্রশ্নের আলোচনার গোড়াতেই তিনি বলেছেন, 'ভারতবর্ষের ইতিহাস আমাদেরই ইতিহাস নহে, আমরা ভারতবর্ষের ইতিহাসের জন্যই সমাহৃত'। তবে সে ইতিহাস কাদের? রবীন্দ্রনাথের মতে সে ইতিহাস সমস্ত মানবের বা মহামানবের এবং সেই মহামানবের ইতিহাস ভারতবর্ষের আধারে একটি বিশেষ রূপ ও বিশেষ কল্যাণসাধনের মধ্যেই সার্থকতা লাভ করবে। তাই তিনি খুব জোরের সঙ্গেই বলেছেন, "ভারতবর্ষে মানবের ইতিহাস একটি বিশেষ সার্থকতার মূর্তি পরিগ্রহ করিবে, পরিপূর্ণতাকে একটি অপূর্ব আকার দান করিয়া তাহাকে সমস্ত মানবের সামগ্রী করিয়া তুলিবে—ইহা অপেক্ষা কোনো ক্ষুদ্র অভিপ্রায় ভারতবর্ষের ইতিহাসে নাই"। তাই যদি হয় তবে মহামানবের ভারতীয় ইতিহাসে আমাদের স্থান কোথায়, আমাদের কর্তব্য কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন, "বৃহৎ ভারতবর্ষকে গড়িয়া তুলিবার জন্যই আমরা আছি, মহা-ভারতবর্ষ গঠনের এই ভার আজ আমাদের উপরে পড়িয়াছে; একদিন যে ভারতবর্ষ অতীতে অঙ্কুরিত হইয়া ভবিষ্যতের অভিমুখে উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিতেছে....সেই ভারতবর্ষ সমস্ত মানুষের ভারতবর্ষ। একদিন যাহারা সম্পূর্ণ সত্যের সহিত বলিতে পারিবে, আমরাই ভারতবর্ষ, আমরাই ভারতবাসী—সেই অখণ্ড প্রকাণ্ড 'আমরা'র মধ্যে যে-কেহই মিলিত হউক, তাহার মধ্যে হিন্দু মুসলমান ইংরেজ আরও যে-কেহ আসিয়া এক হউক না—তাহারাই হুকুম করিবার অধিকার পাইবে এখানে কে থাকিবে আর কে না থাকিবে।" মহাকালের যে অভিপ্রায় ভারতবর্ষের ইতিহাসকে আশ্রয় করে অভিব্যক্তি লাভ করছে, রবীন্দ্রনাথের মতে তার লক্ষ্য হচ্ছে পৃথিবীর সমস্ত মানবকে ভারতবর্ষের মধ্যে মিলিত করা এবং ভারতবর্ষকেও সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে প্রসারিত করা; আমরা সমস্ত পৃথিবীর, সমস্ত পৃথিবীও আমাদের; আমাদের জন্যে বুদ্ধ খ্রীস্ট মহম্মদ জীবন গ্রহণ ও জীবন দান করেছেন। এই ব্যাপক বিশ্ববোধের ভিত্তির উপরেই তিনি পূর্ব ও পশ্চিমকে ভারতবর্ষের ভূমির উপরে

প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। কেননা, 'ভারতবর্ষের সাধনাকে পশ্চিমে ও পশ্চিমের সাধনাকে ভারতবর্ষে দিবার ও লইবার পথ রচনা' করাই ভারতীয় ইতিহাসের বর্তমান যুগের অভিপ্রায়। এই যুগাভিপ্রায়কে সার্থক ও সফল করে তোলারই মহৎ ব্রত ধারণ করেছেন ভারতের নবযুগ-প্রবর্তক মহামনীষীরা —রামমোহন রায়, রাণাডে, বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দ। "যখন ভারতবর্ষে দেশের সঙ্গে দেশের, জাতির সঙ্গে জাতির যোগসাধন হইবে, তখন ভারত-ইতিহাসের যে-পর্বটা চলিতেছে সেটা শেষ হইয়া যাইবে এবং পৃথিবীর মহত্তর ইতিহাসের মধ্যে সে উত্তীর্ণ হইবে।" ভারতবর্ষের ইতিহাসের গতিকে বিশ্বাভি-মুখী করে তোলার দ্বারাই, পূর্ব ও পশ্চিমের যথার্থ মিলনের দ্বারাই আমরা নিজেরা সার্থক হব এবং ভারতবর্ষের ইতিহাসের অভিপ্রায়কেও সফল করতে পারব। ভারতীয় ইতিহাসের এই বিশ্বমিলনাভিমুখী পথকেই রবীন্দ্রনাথ 'ভারতপথ' নামে অভিহিত করেছেন। আর 'ভারততীর্থ'-নামক যে বিখ্যাত রচনাটির মধ্যে তাঁর এই সত্যোপলব্ধি সংহত ও উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পেয়েছে, সে কবিতাটিকেও তিনি 'ভারতপথের গান' নামে অভিহিত করেছেন। 'ভারতবর্ষের মহাক্ষেত্রে যে নানাজাতি ও নানা শক্তির সমাগম' হয়েছে তাদের সকলের সম্মিলিত ঐক্যের মধ্যেই ভারত-ইতিহাসের নবতর ও উজ্জ্বলতর উদ্‌বোধন ঘটবে। সেই প্রদীপ্ত প্রভাতের প্রত্যাশাতেই কবি বিশ্বের সমস্ত জাতিকে ভারতবর্ষের মহামানবের মিলনতীর্থে আহ্বান করেছেন।—

এসো হে আর্য, এসো অনার্য, হিন্দু-মুসলমান,
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খ্রীস্টান।

ভারতের ব্রত হল ঐক্যসাধনা এবং যত বড়ো বিরাট্‌ দেশ এই ভারতবর্ষ তত বড়োই তার এই ঐক্যের সাধনা। প্রাচীনকালের ইতিহাসে দেখা যায়—

কেন নাহি জানে কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা
দুর্বার স্রোতে এলো কোথা হতে সমুদ্রে হলো হারা।

এইটেই হল ভারতীয় সংস্কৃতির অন্তরতম প্রবণতা। তাই কবি নিঃসংশয়-চিত্তেই তার ভাবী পরিণতি সম্বন্ধেও বলতে পেরেছেন—

দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে।

ভারতের সেই চিরন্তন বিরাট্‌ ঐক্যের সাধনা এবং ভবিষ্যতের তদ্রূপ বিরাট্‌ ঐক্যপরিণতির বাণী কবিকণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে—

তপস্যাবলে একের অনলে বহুরে আহুতি দিয়া
বিভেদ ভুলিল, জাগায়ে তুলিল একটি বিরাট্‌ হিয়া।
সেই সাধনার সে আরাধনার
যজ্ঞশালার খোলা আজি দ্বার,

হেথায় সবারে হবে মিলিবারে আনত-শিরে—
এই ভারতের মহামানবের সাগর-তীরে।

এই ভারততীর্থ কবিতার প্রায় সমকালে রচিত 'জনগণ-মন-অধিনায়ক'-ইত্যাদি জাতীয় সংগীতটিতেও অখণ্ড ভারতের মিলনবাণীর মন্ত্র উদ্‌গীত হয়েছে।—

অহরহ তব আহ্বান প্রচারিত, শুনি' তব উদার বাণী
হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারসিক মুসলমান খ্রীস্টানী—
পূরব পশ্চিম আসে তব সিংহাসন-পাশে,
প্রেমহার হয় গাঁথা।
জনগণ-ঐক্য-বিধায়ক জয় হে, ভারত-ভাগ্যবিধাতা।

'পথ ও পাথেয়' (রাজাপ্রজা) নামক প্রবন্ধটিতে (১৩১৫) রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাসকে আরও বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করে তার অন্তরতম প্রবণতা কোন্ দিকে এবং তার সার্থক পরিণতি কোথায় তাই দেখিয়েছেন। "ভারতবর্ষের মতো নানা বৈচিত্র্য ও বিরোধগ্রস্ত দেশে তাহার সমস্যা নিতান্তই দুরূহ। ঈশ্বর আমাদের উপর একটি সুমহৎ কর্মের ভার দিয়াছেন।....আদিকাল হইতে জগতে যতগুলি বড়ো বড়ো শক্তির প্রবাহ জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে তাহাদের সকলগুলিরই কোনো না কোনো বৃহৎ ধারা এই ভারতবর্ষে আসিয়া মিলিত হইয়াছে।" অতঃপর আর্য-অনার্যের মিলন, বৌদ্ধধর্মের মিলনমন্ত্রের প্রভাবে ভারত ও মঙ্গোলীয় জাতিসমূহের মধ্যে একাত্মতা-স্থাপন, শঙ্করাচার্যকর্তৃক খণ্ড ও বিচ্ছিন্ন ভারতীয় সম্প্রদায়সমূহকে অখণ্ড বৃহত্ত্বের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা ও ইসলামধর্মরূপী ঐক্যমন্ত্রবাহী আর-এক মানব-মহাশক্তির আবির্ভাবের কথা উল্লেখ ক'রে তিনি লিখেছেন, "তখন চৈতন্য, নানক, দাদু, কবীর ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে জাতির অনৈক্য—শাস্ত্রের অনৈক্যকে—ভক্তির পরম ঐক্যে এক করিবার অমৃত বর্ষণ করিয়াছিলেন। কেবলমাত্র ভারতবর্ষের প্রাদেশিক ধর্মগুলির বিচ্ছেদক্ষত প্রেমের দ্বারা মিলাইয়া দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহা নহে—তাঁহারাই ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমান প্রকৃতির মাঝখানে ধর্মসেতু নির্মাণ করিতেছিলেন। ভারতবর্ষ এখনই যে নিশ্চেষ্ট হইয়া আছে তাহা নহে—রামমোহন রায়, স্বামী দয়ানন্দ, কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ পরমহংস, বিবেকানন্দ, শিবনারায়ণ স্বামী—ইঁহারাও অনৈক্যের মধ্যে এককে, ক্ষুদ্রতার মধ্যে ভূমাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য জীবনের সাধনাকে ভারতবর্ষের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। অতীতকাল হইতে আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষের এই এক-একটি অধ্যায় ইতিহাসের বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত প্রলাপমাত্র নহে, ইহারা পরস্পর-গ্রথিত ; ....ইহারা .... বিধাতার অভিপ্রায়কে অপূর্ব বিচিত্ররূপে সংরচিত করিয়া তুলিতেছে। পৃথিবীর আর-কোনো দেশেই এত বড়ো বৃহৎ রচনার আয়োজন হয় নাই—এত জাতি এত ধর্ম

এত শক্তি কোনো তীর্থস্থলেই একত্র হয় নাই—একান্ত বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে প্রকাণ্ড সমন্বয়ে বাঁধিয়া তুলিয়া বিরোধের মধ্যেই মিলনের আদর্শকে পৃথিবীর মধ্যে জয়ী করিবার এমন সুস্পষ্ট আদেশ জগতের আর কোথাও ধ্বনিত হয় নাই। ....ভারতবর্ষের মানুষ দুঃসহ তপস্যা দ্বারা এককে ব্রহ্মকে প্রেমে জ্ঞানে ও কর্মে সমস্ত অনৈক্য ও সমস্ত বিরোধের মধ্যে স্বীকার করিয়া মানুষের কর্মশালার কঠোর সংকীর্ণতার মধ্যে মুক্তির উদার নির্মল জ্যোতিকে বিকীর্ণ করিয়া দিক—ভারত-ইতিহাসের আরম্ভ হইতেই আমাদের প্রতি এই অনুশাসন প্রচারিত হইয়াছে। শ্বেত ও কৃষ্ণ, মুসলমান ও খ্রীস্টান, পূর্ব ও পশ্চিম কেহ আমাদের বিরুদ্ধ নহে—ভারতের পুণ্যক্ষেত্রেই সকল বিরোধ এক হইবার জন্য শত শত শতাব্দী ধরিয়া অতি কঠোর সাধনা করিবে বলিয়াই অতি সুদূর কাল হইতে এখানকার তপোবনে একের তত্ত্ব উপনিষদ্ এমন আশ্চর্য সরল জ্ঞানের সহিত প্রচার করিয়াছিলেন। .... তাই আমি অনুরোধ করিতেছিলাম অন্যান্য দেশের মনুষ্যত্বের আংশিক বিকাশের দৃষ্টান্তে ভারতবর্ষের ইতিহাসকে সংকীর্ণ করিয়া দেখিবেন না। .... যে-ভারতবর্ষ মানবের সমস্ত মহৎ শক্তিপুঞ্জ দ্বারা ধীরে ধীরে এইরূপে বিরাট্ মূর্তি ধারণ করিয়া উঠিতেছে, সমস্ত আঘাত-অপমান সমস্ত বেদনা যাহাকে এই পরম-প্রকাশের অভিমুখে অগ্রসর করিতেছে, সেই মহাভারতবর্ষের সেবা আমাদের মধ্যে সজ্ঞানে সচেতনভাবে কে করিবেন, কে একান্ত ভক্তির সহিত ভারত-বিধাতার পদতলে নিজের নির্মল জীবনকে পূজার অর্ঘ্যের ন্যায় নিবেদন করিয়া দিবেন? ভারতের মহাজাতীয় উদ্‌বোধনের সেই আমাদের পুরোহিতবৃন্দ কোথায়?"

অন্যত্র তিনি বলেছেন, "এখানে নানাজাতের লোক একত্র এসে জুটেছে। পৃথিবীতে অন্য কোনো দেশে এমন ঘটেনি। যারা একত্র হয়েছে তাদের এক করতেই হবে, এই হল ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম সমস্যা। এক করতে হবে বাহ্যিক ব্যবস্থায় নয়, আন্তরিক আত্মীয়তায়। ইতিহাসমাত্রেরই সর্বপ্রধান মন্ত্র হচ্ছে সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্—এক হয়ে চলব, এক হয়ে বলব, সকলের মনকে এক বলে জানব। এই মন্ত্রের সাধনা ভারতবর্ষে যেমন অত্যন্ত দুরূহ এমন আর কোনো দেশেই নয়। যতই দুরূহ হোক, এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ ছাড়া রক্ষা পাবার অন্য কোনো পথ নেই।...ভারতবর্ষের এই শাশ্বত বাণীকে জয়যুক্ত করতে কালে কালে যে মহাপুরুষেরা এসেছেন.... সেই মুক্তিদূতের মধ্যে একজন ছিলেন কবীর, তিনি নিজেকে ভারতপথিক বলে জানিয়েছেন। নানা জটিল জঙ্গলের মধ্যে এই ভারতপথকে যাঁরা দেখতে পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে আর-একজন ছিলেন দাদু।......সেই পথের পথিক আধুনিক কালে রামমোহন রায়।......তাঁর মৃত্যুর পর একশত বৎসর অতীত

হল ।....কিন্তু রামমোহন রায় পুরাতত্ত্বের অস্পষ্টতায় আবৃত হয়ে যান নি। তিনি চিরকালের মতোই আধুনিক। কেননা, তিনি যে কালকে অধিকার করে আছেন তার এক সীমা পুরাতন ভারতে।....তার অন্য দিক্ চলে গিয়েছে ভারতের সুদূর ভাবী কালের অভিমুখে।....তিনি বিরাজ করছেন ভারতের সেই আগামী কালে, যে-কালে ভারতের মহাইতিহাস আপন সত্যে সার্থক হয়েছে, হিন্দু মুসলমান খ্রীস্টান মিলিত হয়েছে অখণ্ড মহাজাতীয়তায়।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁর আজীবন সাধনার ফলে আমাদের যে-পথের সন্ধান দিয়েছেন এবং যে-পথে তিনি আমাদের পুনঃপুনঃ আহ্বান করে গিয়েছেন সে হচ্ছে এই মহা-ভারতেরই পথ, এই মহা-জাতীয়তার পথ। ভারতপথিক রামমোহন সম্বন্ধে তাঁর যে উক্তি উপরে উদ্‌ধৃত করা গেল, বলা বাহুল্য সেটি তাঁর নিজের সম্বন্ধেও সর্বতোভাবেই প্রযোজ্য। বস্তুতঃ তিনি নিজেই ছিলেন ওই ভারতপথের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাপথিক।

প্রাচীন ভারতে বৌদ্ধধর্মের যে শাখাটি বিশ্বমৈত্রীর প্রেরণায় উদ্‌বুদ্ধ হয়ে প্রায় সমগ্র এসিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল এবং তুর্কিস্থান থেকে জাপান ও মঙ্গোলিয়া থেকে যবদ্বীপ পর্যন্ত সর্বমানবকে জাতিবর্ণনির্বিশেষে একাত্মতার বন্ধনে আবদ্ধ করতে প্রয়াসী হয়েছিল, তার নাম মহাযান। যে মহাতরণী তখন উদ্ভাবিত হয়েছিল সে তরণী ছোটো ছিল না ; দেশবিদেশের ছোটো-বড়ো উচ্চনীচ সকল নরনারীরই ঠাঁই হয়েছিল সে মহাতরণীতে। গভীরভাবে তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে, সমগ্র ভারতবর্ষই ওই মহাযানধর্মী ; এবং ভারতবর্ষের ইতিহাস বস্তুতঃ ওই ভারত-মহাযানেরই ইতিহাস। প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত আর্য-অনার্য, গ্রীক-পারসিক, শক-হূণ, আরব-তুর্কি, পাঠান-মোগল, পর্তুগীজ-ইংরেজ প্রভৃতি কত জাতি যে এই মহাতরণীতে আরোহণ করে একই সার্থকতা, একই অখণ্ড মহাজাতীয়তার লক্ষ্যাভিমুখে যাত্রা করে কালসমুদ্রে পাড়ি দিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। বস্তুতঃ ভারত-মহাযানের যাত্রাপথই রবীন্দ্র-নাথের দৃষ্টিতে ভারত-মহাপথ রূপে প্রতিভাত হয়েছে। পূর্বোক্ত বৌদ্ধ মহাযান ধর্মের একটি মতবাদ সর্বাস্তিবাদ নামে পরিচিত। সর্বাস্তিবাদীদের দার্শনিক দৃষ্টিতে বিশ্বজগতের ক্ষুদ্র-বৃহৎ সমস্ত কিছুরই সার্থকতা স্বীকৃত হয়ে থাকে, কোনো কিছুরই অস্তিত্ব অস্বীকার্য নয়। ভারত-দার্শনিক রবীন্দ্রনাথকেও সর্বাস্তিবাদী নামে অভিহিত করলে অন্যায় হয় না। কেননা, ভারতবর্ষকে তিনি যে দৃষ্টিতে দেখেছেন তাতে মহাভারতবর্ষ-গঠনের উপাদান হিসাবে দেশী-বিদেশী, প্রাচীন-নবীন সমস্ত জাতি, শক্তি ও ধর্মমতেরই সার্থকতা ও উপযোগিতা স্বীকৃত। ভারতবর্ষে তিনি যে মহাজাতি-সমন্বয়ের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন, সেই সমন্বয়ের সাধনায় প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক সম্প্রদায় ও প্রত্যেক ধর্মমতেরই

সমবেত আত্মোৎসর্গ একান্ত আবশ্যক। 'সবার পরশে পবিত্র-করা তীর্থনীর' ছাড়া যে মার অভিষেক সুসম্পন্ন হতে পারে না, এ-বাণী তো তাঁরই।

যাহক, রবীন্দ্রপ্রদর্শিত এই ভারতমহাপথের সম্যক্ পরিচয় লাভ করা চাই, নতুবা রবীন্দ্রনাথকেই যথার্থভাবে বোঝা যাবে না। তাঁর ধ্যানদৃষ্টিতে ভারতবর্ষের যে উজ্জ্বল ও পরিপূর্ণ রূপ ফুটে উঠেছিল, ধ্যানী রবীন্দ্রনাথকে সত্যভাবে জানতে হলে ভারতবর্ষের সেই রূপটিকেও প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করা চাই। কেননা, সাধনা ও ধ্যানলব্ধ সত্য এবং ধ্যানী সাধকের আত্মস্বরূপ একই প্রতিষ্ঠাভূমিতে অভিন্নরূপে মিলিত হয়ে যায়। মহাযানধর্মী ভারতবর্ষের বিশ্বরূপ দর্শন করতে এবং তার ঐতিহাসিক অভিপ্রায়ের লক্ষ্যাভিমুখী মহাপথের সন্ধান পেতে রবীন্দ্রনাথকে দীর্ঘকালব্যাপী সাধনায় রত হতে হয়েছিল। রবীন্দ্র-নাথকে বুঝতে হলে তাঁর ওই সাধনার ইতিহাসটিও বিশদভাবে জানা চাই। সে ইতিহাসটিকে সংহতরূপে দেখা যায় গোরা উপন্যাসে ও বিশ্বভারতী প্রতি-ষ্ঠানের অভিব্যক্তিতে, আর বিস্তৃতভাবে পাওয়া যায় তাঁর সমগ্র রচনাবলীতে ও তাঁর দীর্ঘকালব্যাপী কর্মসাধনাতে। কিন্তু সে ইতিহাস বর্তমান প্রবন্ধে আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়।

রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের যে বিশ্বতোমুখী রূপ দর্শন করেছিলেন তার তিনটি প্রকাশ। প্রথম প্রকাশ ভূগোলগত, দ্বিতীয় প্রকাশ ইতিহাসগত এবং তৃতীয় প্রকাশ আদর্শ বা ভাব-গত। কিন্তু এই তিনটি প্রকাশ পরস্পরবিচ্ছিন্ন নয়, বরং কার্যকারণসূত্রে অতি ঘনিষ্ঠভাবে গ্রথিত। ভারতবর্ষের ভৌগোলিক রূপের দ্বারাই তার ঐতিহাসিক রূপ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। ভূগোলের রঙ্গমঞ্চেই ইতিহাসের নাট্যলীলা চলে, শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট নয়; কোনো দেশের ঐতিহাসিক নাট্যলীলায় ওই দেশের ভৌগোলিক রূপও অন্যতম শ্রেষ্ঠ অথচ মূক অভিনেতারই কাজ করে, এ-কথা বললেই অধিকতর সত্য বলা হয়। আর, কোনো জাতির ইতিহাসকেও কতকগুলি চঞ্চল ও আকস্মিক ঘটনার সমষ্টিমাত্র রূপে দেখাও সত্য দেখা নয়। আপাতচঞ্চল ঘটনাপ্রবাহের অন্তরে থাকে একটি অচঞ্চল প্রতিষ্ঠাভূমি এবং আকস্মিকতার মায়াযবনিকার অন্তরালে দেখা যায় কোনো একটি বিশেষ পরিণতি ও স্থির লক্ষ্যের অভিমুখে জাতীয় আত্মাভিব্যক্তির অবিচলিত গতি। অপ্রকাশের গুপ্ত গুহা থেকে উৎসারিত হয়ে অনন্ত প্রকাশের অভিমুখে জাতীয় আত্মা ও চিত্তাভিব্যক্তির যে প্রবাহ, তারই নাম জাতীয় ইতিহাস। তাই কোনো জাতির আত্মস্বরূপের যথার্থ পরিচয় পেতে হলে ওই জাতির ইতিহাসকে সত্যরূপে জানা চাই। কেননা, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায়, 'ইতিহাসের প্রত্যেক অধ্যায়ের চরম কথাটি হচ্ছে, আত্মানং বিদ্ধি' (প্রবাসী—১৩৪৯ আশ্বিন, পৃ ৫৩৫)।

"নিজের কাছে নিজের পরিচয়টাকে বড়ো করবার চেষ্টাই সভ্যজাতির ইতিহাসগত চেষ্টা।" অর্থাৎ ইতিহাসের ভিতর দিয়েই প্রত্যেক জাতির আত্মোপলব্ধি ঘটে। যাহক, ইতিহাসের নিত্য চাঞ্চল্যের অন্তরালে জাতীয় চিত্তের অন্তর্নিহিত যে আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ পরিপূর্ণ সার্থকতার অভিমুখে নিরন্তর প্রস্ফুটিত হয়ে উঠছে, সেটিই হচ্ছে জাতির ভাবরূপ।

রবীন্দ্রসাহিত্যে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক রূপ, ঐতিহাসিক রূপ ও ভাবরূপ, এই তিন রূপেরই অপূর্ব পরিচয় পাই। ওই ভাবরূপ আবার সমাজ ও ধর্ম এই দুইটি পৃথক্ অথচ সংশ্লিষ্ট মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করেছে। সমাজের আদর্শ ও ধর্মের আদর্শকে আশ্রয় করেই ভারতবর্ষের ভাবরূপ ব্যক্ত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মতে ভাবরূপী ভারতবর্ষের আত্মা কখনও রাষ্ট্ররূপ বা রাষ্ট্রীয় আদর্শের সাধনায় সিদ্ধিলাভের প্রয়াস করেনি।

রবীন্দ্রনাথ ও অমরতা

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

রবীন্দ্রনাথের কবিমানসে মানুষের মুক্তি ও অমৃতত্ব বা অমরত্বের ধারণা ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ছিল, কারণ উভয় ধারণাই মূলে প্রসৃত তাঁহার অন্তর্নিহিত একটি গভীর অদ্বয়বোধ হইতে। কিন্তু এই মুক্তি এবং অমৃতত্বের ধারণা বিষয়ে উপনিষদের সহিত খানিকটা অংশে রবীন্দ্রনাথের মিল থাকা সত্ত্বেও এ-বিষয়ে উপনিষদের সহিত রবীন্দ্রনাথের অনেকখানি পার্থক্য রহিয়াছে এবং সেই পার্থক্যের ভিতর দিয়াই রবীন্দ্রনাথের স্বাতন্ত্র্য ব্যঞ্জিত।

অমৃতত্ব বা অমরত্ব বিষয়েও রবীন্দ্রনাথের অনুভূতি-প্রবণতা কোনো একটানা পথে অগ্রসর হয় নাই। এ-ক্ষেত্রেও কোনও বিশিষ্ট মতবাদের পথ অনুসৃত হয় নাই বলিয়াই কোনো সোজা পথও দেখা দেয় নাই, অনুভূতি কবিকে বিচিত্র-গামী করিয়া তুলিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের গানের মধ্যে মাঝে মাঝে তাঁহার যে অমরত্বের বিশ্বাস প্রকাশ পাইয়াছে তাহা খানিকটা প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসকে অবলম্বন করিয়া। উপনিষদে বলা হইয়াছে, ' ঐ যাহা কিছু তাহা পূর্ণ, এই যাহা কিছু তাহাও পূর্ণ, পূর্ণ হইতেই পূর্ণ উদিত হয় ; পূর্ণের পূর্ণ গ্রহণ করিলে পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে।' এই পূর্ণ-স্বরূপের অসীমতার মধ্যে কিছুই হারাইয়া যাইবার ভয় নাই ; ব্যক্তিকে নিজের ক্ষুদ্রসীমার মধ্যে খণ্ড করিয়া না দেখিয়া পূর্ণস্বরূপের অসীমতার মধ্যে প্রসারিত দেখিতে পাইলে আর মৃত্যুর প্রশ্ন থাকে না। এই ভাবটি অবলম্বন করিয়া রচিত রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু সম্বন্ধে অতি প্রচলিত জনপ্রিয় গানটি—

> তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে
> যত দূরে আমি ধাই—
> কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু,
> কোথাও বিচ্ছেদ নাই।

পূর্ণস্বরূপের 'চরণের কাছে' 'যাহা কিছু সব' নিত্যকালের জন্যই 'আছে আছে আছে' ; অতএব 'নাই নাই ভয়' শুধু ক্ষুদ্র আমিরই ক্রন্দন ; সেই পূর্ণস্বরূপের মধ্যে সকল 'অন্তর গ্লানি' এবং 'সংসার ভার' পলকের মধ্যে একাকার হইয়া যায় ; সুতরাং জীবনের মধ্যে সেই পূর্ণস্বরূপকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলেই নিত্য অমৃতত্ব লাভ করা যায়।

এই গানে এবং এইজাতীয় অন্য গানে ব্যঞ্জিত যে প্রবণতা তাহা হইল সকল খণ্ডের পশ্চাতে পূর্ণস্বরূপ একের উপলব্ধির চেষ্টা ; বহুত্ব হইতে খণ্ডত্ব হইতে ফিরিয়া পূর্ণস্বরূপ একে সমাহিত হইবার চেষ্টা। এখানে এই 'পূর্ণস্বরূপ এক'ই একমাত্র হইয়া দেখা দিয়াছেন, সেই একের ভিতর দিয়া বহুর ভিতরে যুক্ত হইবার কোনও স্পৃহা প্রবল হইয়া দেখা দেয় নাই। মৃত্যু-সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আর একটি অতিজনপ্রিয় গান হইল,—

কেন রে এই দুয়ারটুকু পার হতে সংশয়
জয় অজানার জয়।

এখানে কবিমন প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের সহিত আরও ঘনিষ্ঠ হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে এখানেও 'অজানার জয়' ঘোষণা করিলেন বটে, কিন্তু এই অজানার মধ্যে যত অস্পষ্টভাবেই হোক, খানিকটা 'জানা' আসিয়া গিয়াছে। এই জীবন যেন 'দুদিন দিয়ে ঘেরা ঘর', মৃত্যুর দুয়ারের ভিতর দিয়া এঘর ছাড়িয়া গেলে যেখানে গিয়া পৌঁছনো যাইবে তাহা হইল 'চিরদিনের আবাস'। এই 'চিরদিনের আবাস'কেও 'একে'র মধ্যে নিহিত বিশ্বজীবনের প্রবাহ বলিয়া যে ব্যাখ্যা না করা যাইতে পারে তাহা নয়, কিন্তু অন্যত্র কবি সত্যের নিখিলসৃষ্টি প্রবাহের ভিতর দিয়া যে নিরন্তর জায়মান রূপ দেখিতে চাহিয়াছেন এক্ষেত্রেও 'অজানা'র জয়ধ্বনির ভিতর দিয়া তাহার আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছে মনে হয় না। পরবর্তী কালের এই জাতীয় গানে রবীন্দ্রনাথ 'অজানা'কে খানিকটা প্রচলিত সুরঘেঁষা করিয়া 'চিরদিনের আবাস' বলিয়া গ্রহণ করেন নাই ; খানিকটা সুরপরিবর্তন লক্ষ্য করিতে পারি—

সমুখে শান্তিপারাবার
ভাসাও তরণী হে কর্ণধার ।।

এই সঙ্গীতটির ভিতরেই। অধ্যাত্ম প্রেরণা এখানেও স্পষ্ট, কিন্তু এখানে যে 'চির সাথী'কে ক্রোড় পাতিয়া কবিকে গ্রহণ করিতে বলা হইয়াছে সেই 'চির-সাথী'র পথ হইল অসীমের পথ, এবং 'ধ্রুবতারকার জ্যোতিঃ' লাভ করিতে হইবে এই অসীমের পথেই। 'মর্ত্যের বন্ধন' যাহাতে ক্ষয় হয় কবি তাহার প্রার্থনা জানাইয়াছেন বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই প্রার্থনা জানাইয়াছেন যেন মর্ত্যের বন্ধন ক্ষয় হইবার পরেই 'বিরাট বিশ্ববাহু মেলি লয়' ; এই বিরাট বিশ্বের সঙ্গে এক হইয়াই অন্তরে 'মহা-অজানা'র 'নির্ভয় পরিচয়' লাভ করিতে হইবে। কিন্তু কবি এখানে 'অসীমের পথ' এবং 'বিরাট বিশ্বে'র কথা বলিলেও বেশ বোঝা যায়, তাঁহার দৃষ্টি পিপাসিত হইয়া উঠিয়াছে একটি 'ধ্রুব তারকা'র জ্যোতির জন্য—বিরাট বিশ্বের মধ্য দিয়া আপন লীলার লুকাচুরি খেলিতেছেন যে মহা-

অজানা কবির অন্তরের সকল রসের ধারা যেন সেই দিকেই বাসনার বাহু বাড়াইয়া দিতেছে।

যে কথাটি এখানে বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিতে পারি তাহা হইল এই, এইজাতীয় গানগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ আমিকে এক অসীম পূর্ণস্বরূপের সঙ্গে যোগ করিয়া অমৃতত্ব বা অমরত্ব লাভের প্রবণতাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। এখানকার 'এক'কে নিরন্তর আত্ম-সর্জনের ভিতর দিয়া প্রকাশমান এক করিয়া তেমনভাবে পাইতেছি না যতখানি পাইতেছি বিশ্বসৃষ্টির চরমবিধারক 'এক'রূপে। 'এক'কে অবলম্বন করিয়া 'সর্বং ইদং'কে জড়াইয়া ধরিবার ব্যাকুলতা এখানে প্রবল হইয়া ওঠে না, আমি এবং 'সর্বং ইদং' এখানে 'এক অসীমে'র মধ্যে পূর্ণস্বরূপের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অমরত্ব লাভ করিতেছে সেইভাবে যেভাবে একটি নদীর ধারা গিয়া অমরত্ব লাভ করে বিরাট সমুদ্রের মধ্যে। এই 'একে'র মধ্যে অমরতা লাভের ধারণা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছেরবীন্দ্রনাথের 'শান্তিনিকেতনে' সঙ্কলিত একটি ভাষণের মধ্যে—

"মৃত্যু এই জগতের সহিত, বিচিত্রের সহিত, অনেকের সহিত, আমাদের সম্বন্ধের পরিবর্তন করিয়া দেয়—কিন্তু সেই একের সহিত আমাদের সম্বন্ধের পরিবর্তন ঘটাইতে পারে না। অতএব যে সাধক সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত সেই এককে আশ্রয় করিয়াছেন, তিনি অমৃতকে বরণ করিয়াছেন ; তাঁহার কোনো ক্ষতির ভয় নাই, বিচ্ছেদের আশঙ্কা নাই। তিনি জানেন, জীবনের সুখদুঃখ নিয়ত চঞ্চল, কিন্তু তাহার মধ্যে সেই কল্যাণরূপী এক স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছেন, লাভ ক্ষতি নিত্য আসিতেছে যাইতেছে, কিন্তু সেই এক পরমলাভ আত্মার মধ্যে স্তব্ধ হইয়া বিরাজ করিতেছেন ; বিপদসম্পদ্ মুহূর্তে মুহূর্তে আবর্তিত হইতেছে, কিন্তু—

এষাস্য পরমা গতিঃ, এষাস্য পরমা সম্পৎ,
এষো ঽস্য পরমো লোকঃ এষো ঽস্য পরম আনন্দঃ।

সেই এক রহিয়াছেন—যিনি জীবের পরমা গতি, যিনি জীবের পরমা সম্পৎ, যিনি জীবের পরম লোক, যিনি জীবের পরম আনন্দ।"

(প্রাচীন ভারতের এক)

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার গানে কবিতায় এবং অনেকগুলি নাটকে আবার অমরতার কথা বলিয়াছেন অদ্বয়ের মধ্যেই একটি দ্বয়বোধকে অবলম্বন করিয়া, যেখানে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস, তাঁহার ব্যক্তিজীবন একটি নিত্যকালের 'আমি'রূপে স্মরণাতীত কাল হইতে—

যুগে যুগে এসেছি চলিয়া
স্খলিয়া স্খলিয়া
চুপে চুপে
রূপ হতে রূপে
প্রাণ হতে প্রাণে।

এই যে ধূলির সহিত আরম্ভ করিয়া চলিতে চলিতে একদিন মানুষের মধ্যে বিবর্তন ইহাত একদিনের কথা এক জীবনের কথা নয়—লক্ষ কোটি বৎসরের এই বিবর্তন মানুষ হইয়া ফুটিয়া উঠিবার ; মানুষ হইয়া একবার ফুটিয়া উঠিয়াই যাত্রার শেষ হয় নাই—জন্মজন্মান্তরের ভিতর দিয়া মানুষ আমিও যে একটি চিরপ্রসার্যমাণ ব্যক্তিপুরুষে বর্ধিত হইতেছি। রবীন্দ্রনাথ এরূপ স্থলে বহুবার জীবন হইতে জীবনে চলিয়া যাইবার কথা বা জন্মজন্মান্তরের কথা বলিয়াছেন, কিন্তু এই জন্মান্তরবাদ ঠিক আমাদের প্রচলিত পুনর্জন্মবাদ বা জন্মান্তরবাদ নয় ; এই জন্মান্তর হইল একটা বিবর্তনধারার ক্রমস্তর মাত্র। রবীন্দ্রনাথের এই যে অন্বয়ের মধ্যে দ্বয়বোধের আদর্শ ইহা একটি স্বতন্ত্র আলোচ্য বিষয়—ইহার বিস্তারিত আলোচনায় এখানে প্রবেশ করিতে চাহি না ; কিন্তু এই অন্বয়ের মধ্যে দ্বয়কে অবলম্বন করিয়া কবির মধ্যে যে অমরতার ধারণা গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহারই উল্লেখ করিতে চাহি। এই অমরতার পশ্চাতে রহিয়াছে ব্যক্তিজীবনে একটা নিরবচ্ছিন্ন বিবর্তন-ধারায় বিশ্বাস, এই বিবর্তন-ধারার মধ্যে ত মৃত্যু বলিয়া কোনও কিছু থাকিতে পারে না ; আমরা যাহাকে মৃত্যু বলি তাহাত কখনও এই বিবর্তন ধারায় কোনও ছেদ আনিতে পারে না, জীবন ও মৃত্যু উভয়ই যে এই 'আমি'র অনন্ত বিবর্তন ধারায় আগাইয়া চলিবার পদক্ষেপ মাত্র। চলিতে গেলে পা ফেলিতেও হয়, পা তুলিতেও হয়, উভয় জুড়িয়া চলার কাজ ; পা-ফেলা হইল জীবন, পা-তোলা হইল মৃত্যু। জীবনের ভিতর দিয়া প্রকাশের যে অধ্যায়টি আরম্ভ হইল মৃত্যুতে তাহার শেষ নয়, মৃত্যু তাহাকে টানিয়া লইয়া নূতন অধ্যায়ে পৌঁছাইয়া দিল। মৃত্যুর ভিতর দিয়া ছাড়া নূতন অধ্যায় আসিবে কি করিয়া ? নূতন নূতন অধ্যায় না আসিলে নিরন্তর হইয়া-ওঠা 'আমি'র সকল হইয়া ওঠাই যে বন্ধ হইয়া যায়।

বিশ্বসৃষ্টির ভিতর দিয়া বিশেষভাবে এই একটি 'আমি'র যে নিত্য বিবর্তন ইহাকে অবলম্বন করিয়া জীবন-মৃত্যুর একটি অচ্ছেদ্য পারস্পরিক সম্পর্কের কথা আমরা রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গানে প্রথমাবধি দেখিতে পাই ; জীবন-মৃত্যুর ভিতরকার অচ্ছেদ্য সম্পর্ককে বহু কবিতায় ও গানে রবীন্দ্রনাথ উমা-মহেশ্বরের নিত্য-প্রেমসম্বন্ধের অনুরূপ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন ; কোথায়ও কবি এই দুইকে নটরাজের নৃত্যের দুই পদক্ষেপ বলিয়াছেন, কোথায়ও তিনি ইহাকে নটরাজের

নৃত্যের লাস্য ও তাণ্ডব এই দুই ভঙ্গি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। জীবনের সকল অতীত বর্তমান অনাগতকে জুড়িয়া একই 'আমি'র বিবর্তন বা প্রকাশ চলিতেছে বলিয়া একজীবনের কোনো অসমাপ্ত পূজাও যেমন কখনও 'হারা' হয় না,—আবার জীবনান্তরের দ্বারাও কোথাও কিছু 'হারা' হইবার সম্ভাবনা নাই; আমার জীবন যাঁহার হাতের বিশ্ববীণাতারের একটি বিশেষ ঝঙ্কারমাত্র সেই ঝঙ্কারের মধ্যেই আমার সমগ্র অর্থ নিহিত আছে—সেই ঝঙ্কারই নিজেকে ব্যাপ্ত করিয়া নিত্য অর্থবান্ হইয়া উঠিতেছে অনবচ্ছিন্ন বিবর্তনধারার ভিতর দিয়া। একজীবনে একরকমভাবে হইয়া উঠিবার পালা—মৃত্যুর মধ্য দিয়া আহ্বান আসিল আবার পুরাতন প্রথাকে ত্যাগ করিয়া নূতন করিয়া হইয়া উঠিবার পালার। 'প্রভাত-সংগীতে'র অস্পষ্ট কবিচেতনার মধ্যেই মরণের মধ্য দিয়া চিরজীবনের কল্পনা জাগিয়া উঠিয়াছিল—

মরণ বাড়িবে যত কোথায়, কোথায় যাব,
বাড়িবে প্রাণের অধিকার,
বিশাল প্রাণের মাঝে কত গ্রহ কত তারা
হেথা হোথা করিবে বিহার।
উঠিবে জীবন মোর কত না আকাশ ছেয়ে
ঢাকিয়া ফেলিবে রবি শশী,
যুগ-যুগান্তর যাবে নব নব রাজ্য পাবে
নব নব তারায় প্রবেশি। (অনন্ত মরণ)

এই যৌবন-অনুভূতিই পরিণতি লাভ করিয়াছিল 'বলাকা'র 'শা-জাহান' কবিতায় প্রকাশিত দৃঢ় প্রত্যয়ে—

প্রিয়া তারে রাখিল না, রাজ্য তারে ছেড়ে দিল পথ,
রুধিল না সমুদ্র পর্বত।
আজি তার রথ
চলিয়াছে রাত্রির আহ্বানে
নক্ষত্রের গানে
প্রভাতের সিংহদ্বারপানে।

কালে কালে স্তরে স্তরে জীবনের এই অবিরাম ধারাকে প্রথম প্রবাহিত করিয়া দিয়াছে ও এক জীবন-দেবতা, এই ধারাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া নিত্য আত্ম-বিকাশের অগ্রগতির পথেও আগাইয়া লইয়া যাইতেছে এক জীবন-দেবতা; জীবনে জীবনে বিচিত্র পরিবেশের ভিতর দিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই একই জীবন-দেবতার সহিত পরিচয়; সকল নূতন পরিবেশের ভিতর দিয়া তাই খেলা করিতেছে একই পুরাতন 'আমি' আর সেই একই পুরাতন জীবন-দেবতা। এই জীবন-

দেবতা ঠিক বিশ্বদেবতা নন; ইনি হইলেন বিশ্বদেবতারই ব্যক্তিজীবন-কেন্দ্রে প্রতিফলিত একটি বিশেষ রূপ, বিশেষ জীবন-ধারার সঙ্গে যুক্ত হইয়া বিশেষ জীবন-ধারা দ্বারা অবচ্ছিন্ন বিশেষ দেবতা। (এই জীবন-দেবতা রবীন্দ্রনাথের কাছে কখনও জীবনের নিরুদ্দেশ যাত্রায় নীরবে অঙ্গুলি তুলিয়া ইঙ্গিত দানকারিণী মধুরহাসিনী বিদেশিনী হইয়া দেখা দিয়াছেন, কখনও কবিজীবনের অনন্তকৌতুকময়ী অন্তর্যামিনীরূপেও দেখা দিয়াছেন, কখনও 'পউষ প্রখর শীতে জর্জর' মৃত্যুরজনীতে কৃষ্ণ অশ্বে আরূঢ়া অবগুণ্ঠনবতী চিররহস্যময়ী নারী হইয়া দেখা দিয়াছেন, কখনও তাঁহার কাব্যজীবনের 'মহারানী' হইয়া দেখা দিয়াছেন, কখনও দেখা দিয়াছেন সমগ্র জীবন যাত্রায় অন্তরতমরূপে, আবার কখনও দেখা দিয়াছেন এক পরম অধ্যাত্ম দয়িত রূপে—যাঁহাকে কবি কোথাও ভগবান্ বা ঈশ্বর নাম দেন নাই, বন্ধু বলিয়াছেন, নাথ বলিয়াছেন, সখা বলিয়াছেন, পিতা বলিয়াছেন, দোসর বলিয়াছেন, সুন্দর বলিয়াছেন, হৃদয়-রাজা বলিয়াছেন—আর বলিয়াছেন সকল আনন্দে সকল বেদনায় এক লীলাময় 'তুমি'। চিরন্তনের প্রবহমাণ এই 'আমি' ধারার উপরে নিত্য 'তুমি'র স্পর্শই জীবনকে অমৃতত্ব দান করিয়াছে।) রবীন্দ্রনাথের গানগুলির ভিতর দিয়া এই অমৃতত্ব বা অমরত্বই রবীন্দ্রনাথের চিত্তকে নির্ভয় দান করিয়াছে—সান্ত্বনা দান করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মবিশ্বাসের অনুসরণ করিলে অমরত্বের এই বিশ্বাসই প্রধান হইয়া দেখা দেয়। কিন্তু পূর্বেই দেখিয়াছি, কবি ব্যক্তি-জীবনের এই ধারাকে সম্পূর্ণ একটি পৃথক্ ধারা না রাখিয়া ক্ষণে ক্ষণে ইহাকে বিশ্বমানবের জীবনধারার সহিত মিলাইয়া লইবার প্রেরণা অনুভব করিয়াছেন। যেখানে তিনি তাঁহার বিশেষ 'আমি'-ধারার সঙ্গে একটি 'তুমি'কে যুক্ত করিয়া বিরলে এই 'আমি-তুমি'র নিত্যবিচিত্র রহস্য-লীলা আস্বাদ করিতে চাহিয়াছেন সেখানেই কবির মধ্যে 'একাকিত্বে'র ঝোঁক প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, সেখানেই কবি বিশ্বজনের আড়ালে একা একা একটি 'তুমি'কে গান শুনাইতে চাহিয়াছেন; যেখানে এই বিশেষ আমিকে আবার সকল আমির সহিত যুক্ত করিবার প্রেরণা লাভ করিয়াছেন সেখানে আবার 'তুমি'কেও সকলের ভিতরকার অন্তর্যামী 'তুমি'কে মিশাইয়া যে এক 'তুমি' তাহার সহিত যুক্ত করিয়া লইয়াছেন। এই এক 'আমি'কে সকল 'আমি'র সহিত যুক্ত করিয়া লইবার প্রেরণাই রবীন্দ্রনাথের ভিতরে নূতন করিয়া এক মানবতাবোধ গড়িয়া তুলিয়াছিল। এই মানবতাবোধকে অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রনাথের মধ্যে অমরতাবোধের একটি নূতন রূপ লক্ষ্য করিতে পারি; সে রূপটি স্পষ্ট হইয়া দেখা দিয়াছে যেখানে তিনি তাঁহার 'The Religion of Man' গ্রন্থে বলিলেন, " his multi-personal

humanity is immortal"—মানুষের মধ্যে বহুব্যক্তিত্বের সমন্বয়ে গঠিত যে মানবতা তাহাতেই হইল মানুষের অমরতা। এই মানবতার মধ্যে যে পূর্ণতার আদর্শ বিদ্যমান সেই মানবীয় পূর্ণতার আদর্শের মধ্যেই নিহিত মানবের অমরতা। এই কথাই কবি বার বার করিয়া বলিয়াছেন তাঁহার 'মানুষের ধর্ম' ভাষণে, "মানুষ যেদিকে সেই ক্ষুদ্র অংশগত আপনার উপস্থিতকে প্রত্যক্ষকে অতিক্রম ক'রে সত্য, সেইদিকে সে মৃত্যুহীন'।

এই মানবতাবোধের জাগরণে রবীন্দ্রনাথের ঔপনিষদিক একের বোধ নূতন বিস্তার এবং নূতন ব্যাখ্যা লাভ করিয়াছে। আমরা কিছু পূর্বেই রবীন্দ্রনাথের প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের পথে যে অমরতাবোধ তাহার আলোচনা প্রসঙ্গে 'শান্তি-নিকেতনে' সঙ্কলিত একটি ভাষণের ('প্রাচীন ভারতের এক') কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াছি; সেখানে রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের 'এষাস্য পরমা গতিঃ এষাস্য পরমা সম্পৎ, এষো হস্য পরমো লোক এষো হস্য পরম আনন্দঃ' বাণীটি উদ্ধৃত করিয়া কি করিয়া সৃষ্টির মধ্যে 'দ্বন্দ্ব' একের মধ্যে অমৃতত্ব বা অমরতার সন্ধান লাভ করিতে হইবে তাহারই কথা বলিয়াছেন। কবি উপনিষদের এই বাণীটি তাঁহার 'মানুষের ধর্ম' ভাষণটির ভিতরেও উদ্ধৃত করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সেখানে তিনি বলিয়াছেন—

"এখানে উনি এবং এ, দুইয়ের কথা। বলছেন, উনি এর পরম গতি, উনি এর পরম সম্পদ, উনি এর পরম আশ্রয়, উনি এর পরম আনন্দ। অর্থাৎ, এর পরিপূর্ণতা তাঁর মধ্যে। উৎকর্ষের পথে এ চলেছে সেই বৃহতের দিকে, এর ঐশ্বর্য সেইখানেই, এর প্রতিষ্ঠা তাঁর মধ্যেই, এর শাশ্বত আনন্দের ধন যা কিছু সে তাঁতেই।"

এখানকার এই 'এ' কে? আর 'উনি'ই বা কে? 'এ' হইল ব্যক্তি-মানব, আর 'উনি' হইলেন মহামানব বা মানবব্রহ্ম—এবং "আমাদের ঋতে সত্যে তপস্যায় ধর্মে কর্মে সেই বৃহৎ মানবকে আমরা বিষয়ীকৃত করি।"

এই মানবতাবোধ যেমন কবির মধ্যে জীবনের কোনও বিশেষ কালে বিশেষ প্রভাবে উদ্ভূত সত্য নয়—ইহা যেমন তাঁহার শৈশবের যুগ হইতেই তাঁহার মধ্যে গড়িয়া উঠিতেছিল এবং অস্পষ্ট চেতনার আবরণ মুক্ত হইয়া কর্মযোগে পরিণত বয়সে বলিষ্ঠরূপ ধারণ করিয়াছিল, মানবতাবোধের সঙ্গে যুক্ত অমরতাবোধের ক্রমবিকাশও ঠিক সেই একই সঙ্গে একইভাবে। 'প্রভাতসংগীতে'র 'অনন্ত জীবন' কবিতাতেই দেখিতে পাই, 'এ আমার গানগুলি দু-দণ্ডের গান, রবে না রবে না চিরদিন' এই বেদনা প্রথম যৌবনেই কবিচিত্তকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল; কিন্তু আপনার মধ্যেই তিনি এ সংশয়ের উত্তর পাইয়াছিলেন—

নাই তোর নাই রে ভাবনা,
এ জগতে কিছুই মরে না।
নদী স্রোতে কোটি কোটি মৃত্তিকার কণা,
ভেসে আসে, সাগরে মিশায়,
জান না কোথায় তারা যায়!
একেকটি কণা লয়ে গোপনে সাগর
রচিছে বিশাল মহাদেশ,
না জানি কবে তা হবে শেষ।

এই রকম প্রতিটি ব্যক্তি-হৃদয়ের গান মিলিয়া মিশিয়া মানুষের মহাসঙ্গীত রচিত হইয়া উঠিতেছে। প্রতিনিয়ত স্নেহ-ভালোবাসা লইয়া মানুষের ঘরে ঘরে আমরা কত ছবি দেখিতেছি; জীবনের দেখা সব ছবিই যে আমরা সব সময় মনে করিয়া রাখিতে পারি তাহা নয়—

কত কী যে দেখেছিনু হয়তো সে-সব ছবি
আজ আমি গিয়েছি পাসরি ।
তা বলে নাহি কি তাহা মনে
ছবিগুলি মেশে নি জীবনে?

জীবনে যখন যেখানে মানুষের যত ছবি দেখিয়াছি, যত গান শুনিয়াছি তাহা সব আমার মনে-প্রাণে মিশিয়া গিয়া আমার জীবনকে মুহূর্তে মুহূর্তে গড়িয়া তুলিয়াছে, এবং এই পদ্ধতিতেই মহামানবের মহাজীবন গড়িয়া ওঠে।

সকলি মিশিছে আসি হেথা,
জীবনে কিছু না যায় ফেলা,
এই যে যা কিছু চেয়ে দেখি
এ নহে কেবলি ছেলে খেলা।

'প্রভাতসংগীতে'র এই 'অনন্ত জীবনে'র আদর্শ অবশ্য রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তি-জীবনের অনন্তপ্রবাহের ভিতর দিয়া যে অখণ্ডতার আদর্শ তাহারই সহিত যুক্ত; কিন্তু এখানেও এই ব্যক্তিজীবনের ধারাগুলি মিলিয়া মিলিয়া যে একটি মহামানবের সত্য গড়িয়া তুলিতেছে এবং মহামানবের সেই গড়িয়া ওঠার মধ্যে ব্যক্তি-মানবের অমরতা লুক্কায়িত রহিয়াছে এ-কথার আভাস রহিয়াছে। 'প্রভাত সংগীতে' যাহা আছে আভাসে 'কড়ি ও কোমলে' তাহা কুঁড়ি হইয়া ফুটিয়া উঠিল।

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
* * *
ধরায় প্রাণের খেলা চির তরঙ্গিত,
বিরহ মিলন কত হাসি অশ্রুময়,
মানবের সুখে দুঃখে গাঁথিয়া সংগীত
যদি গো রচিতে পারি অমর আলয়।

মানবের সুখ-দুঃখের মধ্যেই অমর আলয় রচনা করিবার যে আকাঙ্ক্ষা তাহার প্রথম স্পষ্ট উচ্চারণ দেখিতে পাইলাম এইখানে। যৌবনের এই আকাঙ্ক্ষার চমৎকার পরিণতি লক্ষ্য করিতে পারি 'পরিশেষে'র 'আমি' কবিতাটির ভিতরে। স্মরণ রাখিতে হইবে, 'পরিশেষে'র কবিতা রচনার পূর্বে কবি 'The Religion of Man' এই ভাষণ দিয়া আসিয়াছেন; সুতরাং শাশ্বত মানুষ বা মানব-ব্রহ্মের আদর্শ তখন তাঁহার মনে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে; শুধু মননে নহে কর্মযোগে বিশ্ব-মানবের সহিত মিলনেও এ আদর্শ তাঁহার জীবনে সত্য হইয়া উঠিয়াছে। যে কথা দেখিতে পাই এই যুগের বিভিন্ন ভাষণে সেই কথাই দেখিতে পাই এই যুগের কবিতাতেও।—

জানি তাই, সে-আমি তো বন্দী নহে আমার সীমায়,
পুরাণে বীরের মহিমায়
আপনা হারায়ে
তারে পাই আপনাতে দেশকাল নিমেষে পারায়ে।
যে-আমি ছায়ার আবরণে
লুপ্ত হয়ে থাকে মোর কোণে
সাধকের ইতিহাসে তারি জ্যোতির্ময়
পাই পরিচয়।
যুগে যুগে কবির বাণীতে
সেই আমি আপনারে পেয়েছে জানিতে।
দিগন্তে বাদলবায়ু বেগে
নীল মেঘে
বর্ষা আসে নাবি।
বসে বসে ভাবি
এই আমি যুগে যুগান্তরে
কত মূর্তি ধরে,
কত নামে কত জন্ম কত মৃত্যু করে পারাপার
কত বারম্বার।
ভূত ভবিষ্যৎ লয়ে যে বিরাট অখণ্ড বিরাজে
সে মানব-মাঝে
নিভৃতে দেখিব আজি এ আমিরে,
সর্বত্রগামীরে।

অবশ্য পূর্বেই আমরা লক্ষ্য করিয়াছি, মহামানবের কথা বলিতে গিয়া কবি মহামানবের ধারাকে বিশ্বসৃষ্টির সমগ্রধারা হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলেন নাই; মানবধারাকে বিশ্বধারার সঙ্গেই মিলাইয়া লইয়াছেন, কিন্তু বিশ্বধারার বুকে অমৃতের বাণী যে ফুটিয়া উঠিয়াছে মানবধারার ভিতর দিয়াই—এবং বিশ্ব-

প্রকৃতির আর যাহা কিছু সব যে এই মানবধারার ভিতর দিয়া অমৃতের বাণী জাগাইয়া তুলিবারই সাধনা করিতেছে এ সত্য কবির মনকে পরিপূর্ণভাবে অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। পুনশ্চের 'শিশুতীর্থ' কবিতাটির শেষভাগে দেখিতে পাই—

> প্রভাতের একটি রবিরশ্মি রুদ্ধদ্বারের নিম্নপ্রান্তে তির্যক হয়ে পড়েছে।
> সম্মিলিত জনসংঘ আপন নাড়ীতে নাড়ীতে যেন শুনতে পেলে
> সৃষ্টির সেই প্রথম পরমবাণী, মাতা, দ্বার খোলো।

এই মাতা কে? মাতা বসুন্ধরা। সমস্ত সৃষ্টি আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করিয়া আছে কবে মাতা বসুন্ধরা তাঁহার তৃণশয্যায় মানবশিশু কোলে করিয়া বসিয়া থাকিবেন, সেই মানবশিশুর মধ্যে ঘনীভূত হইয়া রূপ লাভ করিবে সৃষ্টির সকল অর্থ।—

> দ্বার খুলে গেল।
> মা বসে আছেন তৃণশয্যায়, কোলে তার শিশু,
> উষার কোলে যেন শুকতারা।
> দ্বারপ্রান্তে প্রতীক্ষাপরায়ণ সূর্যরশ্মি শিশুর মাথায় এসে পড়ল।
> কবি দিলে আপন বীণার তারে ঝংকার, গান উঠল আকাশে:
> জয় হোক মানুষের, ওই নবজাতকের, ওই চিরজীবিতের।
> সকলে জানু পেতে বসল, রাজা এবং ভিক্ষু, সাধু এবং পাপী, জ্ঞানী এবং মূঢ়;
> উচ্চস্বরে ঘোষণা করলে: জয় হোক মানুষের,
> ওই নবজাতকের, ওই চিরজীবিতের।

এই কথাই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন তাঁহার 'শান্তিনিকেতনে' 'সত্য হওয়া' নামক ভাষণটিতে—

"মানুষের আত্মা মুক্তিলোকে আনন্দলোকে জন্মগ্রহণ করবে বলে বিশ্বের সূতিকা গৃহে অনেক দিন ধরে চন্দ্র সূর্য তারার মঙ্গলপ্রদীপ জ্বালানো রয়েছে। যেমনি নবজাত মুক্ত আত্মার প্রাণচেষ্টার ক্রন্দনধ্বনি সমস্ত ক্রন্দসীকে পরিপূর্ণ করে উচ্ছ্বসিত হবে অমনি লোকে লোকান্তরে আনন্দশঙ্খ বেজে উঠবে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সেই প্রত্যাশাকে পূরণ করবার জন্যই মানুষ।"

'বীথিকা'র 'নব পরিচয়ে'র মধ্যে দেখি, নব নব জন্ম বহিয়া এক খেয়া-তরীতে করিয়া যে একটি 'আমি'র বার বার আনাগোনা এই আমির পরিচয় লইতে গিয়া কবি অনুভব করিতে পারিয়াছেন—

> অনন্তের হোমানলে
> যে-যজ্ঞের শিখা জ্বলে,
> সে-শিখা হতে এনেছে দীপ জ্বালি।

অনন্তের বিশ্বপ্রবাহের মধ্যে আত্মাহুতির হোমানলের শিখা হইতে এই যে একটি জীবনের দীপ জ্বালাইয়া লওয়া গিয়াছে ইহার গতি কোন্ দিকে ?

এ-সংসারে সব সীমা
ছাড়ায়ে গেছে যে-মহিমা
ব্যাপিয়া আছে অতীতে অনাগতে,
মরণ করি অভিভব
আছেন চির যে-মানব
নিজেরে দেখি সে-পথিকের পথে।

এই চিরমানবের পথের পথিক হইয়া চিরমানবের চলার মধ্যেই হইল অমরত্বের আশ্বাস। 'বীথিকা'র মধ্যে এই দৃষ্টিতে কবি মরণকে 'মাতা' বলিয়া দেখিতে পাইয়াছেন—

চলে যে যায় চাহে না আর পিছু,
তোমারি হাতে সঁপিয়া যায় যা ছিল তার কিছু।
তাহাই লয়ে মন্ত্র পড়ি
নূতন যুগ তোল যে গড়ি—
নূতন ভালো মন্দ কত, নূতন উঁচুনিচু।

রোধিয়া পথ আমি না রব থামি ;
প্রাণের স্রোত অবাধে চলে তোমারি অনুগামী।
নিখিল ধারা সে স্রোত বাহি
ভাঙিয়া সীমা চলিতে চাহি
অচলরূপে রব না বাঁধা অবিচলিত আমি।

সহজে আমি মানিব অবসান,
ভাবী শিশুর জনমমাঝে নিজেরে দিব দান।
আজি রাতের যে-ফুলগুলি
জীবনে মম উঠিল দুলি
ঝরুক তারা কালি প্রাতের ফুলেরে দিতে প্রাণ।

নিজের জীবনে ফুল ফুটাইয়া যদি তাহা দ্বারা আগামী দিনের মানবের জীবনের কোনও ফুল ফুটাইতে সাহায্য করিতে পারি তবে তাহাই জীবনকে দিবে অমরত্বের সন্ধান। একদিন কবি নিজের জীবনের যত গান, কবিতা, অন্য যাহা কিছু তাঁহার সৃষ্টি সকলকেই আত্মানন্দের চরমমূল্যেই সার্থক বলিয়া দেখিতে চাহিয়াছিলেন ; কিন্তু শেষের দিকে অন্য বোধটাই যেন কবির আত্ম-পুরুষকে সর্বাবস্থায় ধারণ করিয়া রাখিতেছিল ; যাহা কিছু তাঁহার দান তাহা দ্বারা নিজের ভিতর দিয়া মহামানবকে যতখানি বিকশিত করিয়া যাইতে

পারিয়াছেন এবং তাহা দ্বারা ভাবিকালের মানুষকে তাহাদের নিজেদের মধ্যে মহামানবতাকে বিকশিত করিয়া তুলিতে যতখানি সাহায্য করিতে পারিয়াছেন সেইখানেই তাঁহার জীবনের সকল সার্থকতা, সেইখানেই তিনি মৃত্যুঞ্জয় হইয়া মহামানবের মধ্যে বাঁচিয়া রহিলেন।

মানুষের জীবনের একটা যে প্রাত্যহিক দিক আছে এই দিকটাতেই হইল মানুষের অনিত্য লীলা; এই প্রাত্যহিকতার অনিত্যলীলার ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইতে চাহিতেছে মানুষের নিত্য; যেখানে ফুটিয়া ওঠে সেই নিত্য-লীলার আভাস—সেইখানেই মানুষের মধ্যে আবির্ভাব দেবতার।

দেবতা মানবলোকে ধরা দিতে চায়
মানবের অনিত্য লীলায়। (বীথিকা, দেবতা)

এইরূপেই কোনও কোনও মানুষের মধ্যে আবির্ভূত হন 'দেবসেনাপতি'; তিনি মৃত্যুপণে সর্ব অমঙ্গলের উপরে হানেন আঘাত—বিকীর্ণ করিয়া দেন দিব্যজ্যোতি; তাহারই প্রেরণায়—

ত্যাগের বিপুল বল
কোথা হতে বক্ষে আসে;
অনায়াসে।
দাঁড়াই উপেক্ষা করি প্রচণ্ড অন্যায়ে
অকুণ্ঠিত সর্বস্বের ব্যয়ে।
তখন মৃত্যুর বক্ষ হতে
দেবতা বাহিরি আসে অমৃত-আলোতে;
তখন তাহার পরিচয়
মর্ত্যলোকে অমর্ত্যেরে করি তোলে অক্ষুন্ন অক্ষয়। (বীথিকা, দেবতা)

মানবতার মধ্যে এইভাবে যখন দেবত্বের মহাবতরণ তখনই মর্ত্য অমর্ত্য হইয়া ওঠে; সেই দিকটাই হইল শাশ্বতের দিক। মহামানবতার অবতরণেই মানুষের অমরত্ব। এইবোধে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই কবি 'আকাশ প্রদীপে'র 'ভূমিকা'য় বলিয়াছেন—

আমি বদ্ধ ক্ষণস্থায়ী অস্তিত্বের জালে,
আমার আপন-রচা কল্পরূপ ব্যাপ্ত দেশে কালে,
এ কথা বিলয় দিনে নিজে নাই জানি
আর কেহ যদি জানে তাহারেই বাঁচা ব'লে মানি।

'জন্মদিনে'ও কবির মধ্যে দেখি সেই বিশ্বাস এবং আশ্বাস।—

খেলাঘরে আজ যবে খুলে যাবে দ্বার
ধরণীর দেবালয়ে রেখে যাব আমার প্রণাম,
দিয়ে যাব জীবনের সে নৈবেদ্যগুলি
মূল্য যার মৃত্যুর অতীত। (১৩ সং)

জীবনের অমৃতত্ত্বের সহিত কবির মানবতাবোধ কিভাবে মিশিয়া গিয়াছিল 'আরোগ্যে'র শেষের দুইটি কবিতার মধ্যে তাহার পরিচয় রহিয়াছে। ৩২শ সংখ্যক পদে কবি অনুভব করিতেছেন—

> এক আদি জ্যোতি-উৎস হতে
> চৈতন্যের পুণ্যস্রোতে
> আমার হয়েছে অভিষেক,
> ললাটে দিয়েছে জয়লেখ,
> জানায়েছে অমৃতের আমি অধিকারী ;
> পরম-আমির সাথে যুক্ত হতে পারি
> বিচিত্র জগতে
> প্রবেশ লভিতে পারি আনন্দের পথে।

কিন্তু এই 'পরম আমি'কে ? তাহার উত্তর লাভ করা যায় ঠিক পরের কবিতাটিতেই—

> এ আমির আবরণ সহজে স্খলিত হয়ে যাক ;
> চৈতন্যের শুভ্র জ্যোতি
> ভেদ করি কুহেলিকা
> সত্যের অমৃত রূপ করুক প্রকাশ।
> সর্ব মানুষের মাঝে
> এক চিরমানবের আনন্দ কিরণ
> চিত্তে মোর হোক বিস্তারিত।

অমরতা রবীন্দ্রনাথের কাছে ন্যায়-যুক্তির পথে লব্ধ স্পষ্ট কোনও সিদ্ধান্ত নহে, একটি বিশ্বাসমাত্র, কোনও জাতিগত সংস্কারের দ্বারা লব্ধ বিশ্বাস নহে—নিজের বিচিত্র অনুভূতির ভিতর দিয়া নানাভাবে গড়িয়া ওঠা একটা গভীর বোধ। গভীর বোধ মানুষের চিত্তে যখন একটা স্থিরতা লাভ করে—এবং বোধের সেই স্থিরতা যখন মানবচিত্তের মধ্যে জড়তাদ্রোহী প্রবল একটা প্রেরণা রূপে দেখা দেয় তখনই আমরা বলিয়া থাকি যে বোধ সেখানে বিশ্বাসের রূপ ধারণ করিয়াছে। অমরতা রবীন্দ্রনাথের মনের মধ্যে এই জাতীয়ই একটি বিশ্বাস। এ-বিশ্বাসের মূল্য বাস্তবজীবনে ইহার সক্রিয়তায়। অমরতার কোন্ বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনে ইতিহাসের প্রতিক্রিয়ায় মুহ্যমান চেতনার মধ্যে নূতন তেজ ও তাপের সঞ্চার করিয়াছিল ? নিস্তরঙ্গ নঙর্থক সন্মাত্রে পর্যবসিত কোনও পূর্ণস্বরূপের মধ্যে আত্ম-বিসর্জনের অমরতা নয়—মহামানবের ব্রহ্মকমলে বিকশিত পূর্ণস্বরূপের ভিতরে নিত্য-আত্ম-প্রবহণের অমরতা। এই নিত্যকালের মহামানবতার বোধই রবীন্দ্রনাথের চিত্তে একটি গভীর অধ্যাত্মবোধ রূপেই দেখা

দিয়াছিল, এইজন্য তাঁহার অধ্যাত্মজীবনে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াই তিনি গভীর উল্লাসে এই মহামানবের আগমনী-গান গাহিতে পারিয়াছিলেন—

ঐ মহামানব আসে,
দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে
মর্ত্তধূলির ঘাসে ঘাসে।

* * * *

উদয় শিখরে জাগে মাভৈঃ মাভৈঃ রব
নবজীবনের আশ্বাসে।
'জয় জয় জয় রে মানব অভ্যুদয়'
মন্দ্রি উঠিল মহাকাশে।

এই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হইয়াই রবীন্দ্রনাথ অমর মানুষ সম্বন্ধে এমন করিয়া গাহিতে পারিয়াছিলেন—

মরণ সাগর পারে তোমরা অমর
তোমাদের স্মরি।
নিখিলে রচিয়া গেলে আপনারই ঘর,
তোমাদের স্মরি।
সংসারে জ্বেলে গেলে যে নব আলোক
জয় হোক, জয় হোক, তারি জয় হোক—
তোমাদের স্মরি॥

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাদর্শ

শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়

(এক)

ছিন্নপত্রের একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন,

"নদীর দুইতীরের মাঝখান দিয়ে ভেসে যাবার যে-একটা বিশেষ আনন্দ আছে সে উপভোগ করেছি—কিন্তু দিন দুই ডাঙায় বসে থাকলে সেটা ঠিকটা আর মনে থাকে না।"

ব্যক্তির সত্তার মধ্যে সাধারণভাবে যে দুটি রূপ দেখতে পাই, সে-ও বোধ হয় ঐ রকমই। একটি আছে সম্পূর্ণ নিজের ; সে বিশ্বজগতের সঙ্গে অভেদ হয়ে অবিরাম চলে ; আর-একটি দৈনন্দিন কার্যকলাপের সঙ্গে, কর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়টি যখন ঘাড়ের উপর হুড়মুড় করে পড়ে তখন প্রথমটি অন্তর্হিত না হলেও পশ্চাতে পড়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথের কথায়,

"এখনই সদর নায়েব আমলাবর্গ এবং প্রজারা উপস্থিত হলে এই উলুধ্বনির প্রতিধ্বনিটুকু পাড়া ছেড়ে পালাবে ; অতি ক্ষীণ ভূতভবিষ্যৎকে দুই কনুই দিয়ে ঠেলে ফেলে জোয়ান বর্তমান নিজ মূর্তি ধরে সেলাম ঠুকে এসে দাঁড়াবে।"

'জোয়ান বর্তমান'-টাই' হচ্ছে সমাজ-ব্যক্তি ; যে ব্যক্তি সমাজের মধ্যে আছে, আছে 'কর্মরত অবস্থায় ; মানুষকে নিয়ে কখনও সমাজ নয়, কর্ম-রত মানুষকে নিয়েই। কর্মের মধ্যে এসে মানুষ সমাজব্যক্তির সঙ্গে এক সম্পর্ক গড়ে তোলে, সেই সম্পর্ক-অনুসারেই সেই মানুষটির পরিচয়। ঐটি তার নাম। নাম এক প্রকারের আঁকশী হতে পারে, কিন্তু সেটি ব্যক্তি নয়, সমগ্র মানুষটি সেই আঁকশীতে বেধে আসে না। সমাজের ঐ কর্ম-সম্পর্ক ব্যক্তিকে কেবল কর্মে উৎসাহ দিয়েই শেষ হয়ে যায় না, ওরই মাধ্যমে সে নিজেকে দেখে, সে নিজকে চিনতে পারে, সে নিজকে বাড়িয়ে নেয়। এই দুটি সত্তা যেন দিন আর রাত্তিরের মতো। রাত্তিরের অন্ধকার খুব স্বাভাবিক, তাকে আমরা পরিহার করতে পারি না, উচিতও নয়। কারণ রাত্তিরের পৃষ্ঠপটেই নিজের আনন্দটুকু সঞ্চিত হয়, সেই আনন্দের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ দেখি উষার সমাগমে সমস্ত জীবলোকে।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাতত্ত্বে এবং আদর্শে এইটুকু বুঝে নিতে পারলেই তাঁর সমগ্র শিক্ষাধর্ম আমরা বুজতে পারব। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাতত্ত্ব তাঁর জীবন থেকে একটা বিচ্ছিন্ন কিছু নয়, তাঁর কবিজীবনের সঙ্গে শিক্ষাতত্ত্বও জড়িয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা সম্পর্কেও প্রচুর লিখেছেন, কিন্তু 'ভানুসিংহের'

মতো রবীন্দ্রনাথই সেই শিক্ষাবিদ। তিনি যদি এখানে নতুন রবীন্দ্রনাথ হতেন তবে তাঁর মধ্যে ডিউঈ, ম্যাকডুগাল, নান্, বের্গসঁ প্রভৃতি কতখানি আছেন, শিক্ষণ-শিক্ষাবিদ্যালয়ের শিক্ষাতত্ত্বের নানা পত্র-পত্রিকা ও গবেষণার বিষয় নিয়ে মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করা যেত। অবশ্য এ বিষয়ে তেমন করে যে বিশ্লেষণ না করা হয়েছে তা নয়। আমেরিকায় এক শিক্ষাবিদ স্নাতকোত্তরের থিসিসের জন্য শান্ত মাথায় এ নিয়ে চুলচেরা বিচার করেও দেখিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকতেই আমাদের যুগেও এরকম প্রবন্ধাদি লেখা হয়েছে। অর্থাৎ শারীরিক ক্ষমতা, নন্দনবিদ্যা, হাতের কাজ, কর্মের মাধ্যমে শিক্ষা তাঁর শান্তিনিকেতনে কতখানি আছে, তাঁর ভাষণে কেমন প্রতিফলিত হয়েছে—সেই সব ঘোষণা। এইটি আপত্তিকর না হলেও প্রবন্ধকারের বিদ্যাচর্চা মাত্র, তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ নেই। সাহিত্য আলোচনায় কিন্তু আমরা রবীন্দ্রনাথকে এভাবে বর্গীকৃত করি না। মনে হয় রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাসম্পর্কে বিশেষ ধরণের প্রবন্ধগুলিই এর জন্য দায়ী। তিনি যদি শিক্ষা-সম্পর্কে বিশেষ ক'রে কিছু না-ও লিখতেন তবু তাঁর সাহিত্য-কর্ম থেকেই তাঁর শিক্ষাদর্শ বুঝতে পারা যেত। ছিন্নপত্রের ঐ চিঠিতেই শেষের দিকে আছে,

> ছেলেবেলায় যদি আরব্য উপন্যাস, রবিনসন ক্রুসো না পড়তুম, রূপকথা না শুনতুম, তা হলে নিশ্চয় বলতে পারি, ঐ নদীতীরে এবং মাঠের প্রান্তের দূর দৃশ্য দেখে ঠিক এমন ভাব মনে উদয় হত না; সমস্ত পৃথিবীর চেহারা আমার পক্ষে আর একরকম হয়ে যেত। এইটুকু মানুষের মনের ভিতরে বাস্তবিকে কাল্পনিকে জড়িয়ে-মড়িয়ে কি যে একটা জাল পাকিয়ে আছে।

জালের এই গিঁঠ খোলার কথায়ই তো তিনি তাঁর 'লক্ষ্য ও শিক্ষা' প্রবন্ধে বলেছেন;

> 'আসল কথা, এক দিকে হউক বা আর একদিকে হউক ভূমার আকর্ষণকে স্বীকার করিতেই হইবে, আমাদিগকে বড়ো হইতে আরও বড়ো হইতে হইবে।'
>
> 'তুমি কেরাণির চেয়ে বড়ো, ডেপুটি মুন্সেফের চেয়ে বড়ো, তুমি যাহা শিক্ষা করিতেছ তাহা হাউয়ের মতো কোনোক্রমে ইস্কুল মাস্টারি পর্যন্ত উড়িয়া তাহার পর পেন্সনভোগী জরাজীর্ণতার মধ্যে ছাই হইয়া মাটিতে আসিয়া পড়িবার জন্য নহে—এই মন্ত্রটি জপ করিতে দেওয়ার শিক্ষাই আমাদের দেশে সকলের চেয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষা এই কথাটা আমাদের নিশিদিন মনে রাখিতে হইবে।'

কিন্তু এই ভূমার আকর্ষণের উদ্দীপক কোথায়? উদ্দীপক হচ্ছে রবিনসন ক্রুসো, রূপকথা অর্থাৎ সমাজ-সম্পর্কে যে-নামটি আহরণ করেছি সেই 'আমি'।

এই ভূমার সন্ধানের জন্য উপনিষদ আবৃত্তি করবার প্রয়োজন দেখিনা, রবীন্দ্রনাথের নিজের জীবনের ঘটনা থেকেই তার প্রমাণ মেলে। 'জীবনস্মৃতি' থেকে বা তা থেকে আরও সন্ধানী পুস্তক সেই প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্র

জীবনী' থেকে আমরা একটা কথা বেশ বুঝতে পেরেছি যে, নর্মাল-ইস্কুলই তাঁকে ইস্কুলশিক্ষার বিরোধী করে তুলেছিল। এই নর্মাল-ইস্কুল বিদ্যাসাগরের প্রতিষ্ঠিত হলেও, বা 'আদর্শ ইস্কুল' হলেও এটা একটা শিক্ষা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কেন্দ্র। শিক্ষা নিয়ে অর্থ শিক্ষার্থী বা শিশুদের নিয়ে। এতে শিশু রবীন্দ্রনাথের আপত্তি লাগল কেন? কত শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে গবেষণা, নতুন ধরণের মেধা-চর্চার কত সূত্র—সহমর্মী শিক্ষণ-শিক্ষকদের কত অধ্যবসায়। এতো আর ফাঁকিবাজির ক্ষেত্র নয়। তবু তাঁর খারাপ লাগল। কারণ শিক্ষাবিষয়বস্তু কেমন ক'রে ছেলেদের মাথায় ঢোকাব এই নিয়ে সেখানে কারবার। শিশুকে কেমন ক'রে বড়ো করব সেকথা সেখানে নেই। পরবর্তীকালে তিনি লিখছেন,

"যখন এমনতরো প্রশ্ন শুনি 'আমরা কি শিখিব, কেমন করিয়া শিখিব, শিক্ষার কোন্ প্রণালী কোথায় কিভাবে কাজ করিতেছে' তখন আমার এই কথাই মনে হয়, শিক্ষা জিনিসটা তো জীবনের সঙ্গে সংগতি-হীন একটা কৃত্রিম জিনিস নহে।"

অর্থাৎ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে তিনি বিদ্যাচর্চা পছন্দ করেন নি। শিশু রবীন্দ্রনাথের আত্মা বিদ্রোহ করে বসেছিল। তাই পেনেটির বাগান, বা হিমালয়ের সান্নিধ্য তাঁকে বড়ো করে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। নর্মাল-ইস্কুলের আওতায় এই বড়োত্ব নেই;

'স্কুলের কর্তৃপক্ষেরা তখনকার কোনো একটা থিওরী অবলম্বন করিয়া বেশ নিশ্চিন্ত ছিলেন যে তাঁহারা ছেলেদের আনন্দ-বিধান করিতেছেন......যেন তাঁহাদের থিওরি অনুসারে আনন্দ পাওয়া ছেলেদের একটা কর্তব্য, না-পাওয়া তাহাদের অপরাধ।'

রবীন্দ্রনাথ এখানে 'আনন্দ' কথাটির উপর এত কশাঘাত করেছেন, কারণ শিক্ষণ-শিক্ষাবিদ্যালয় রুশো, পেস্টালৎজী, ফ্রয়েবেল, হার্বার্ট, মন্তেসরী এবং ডিউঈ থেকে ধার করে 'আনন্দ' কথাটা বসাবার জন্য বড় অসম্ভব প্রকারে ব্যস্ত; তারপর থর্নডাইকের পশু-প্রাণীর উপরকার পরীক্ষা-করা শিক্ষাসূত্র নিয়ে নানা আন্দোলনের মধ্যে ঐ 'ইণ্টারেস্ট' কথা কেমন করে যেন একটা ব্যাধির মতো হয়ে বসেছে। কেউ কেউ আবার শোধনমন্ত্র ঝেড়ে বলছেন, না ও-ইণ্টারেস্ট সে-ইণ্টারেস্ট নয়, 'এফোর্টে'র সঙ্গে যুক্ত যে ইণ্টারেস্ট তাইই সত্যকার ইণ্টারেস্ট।

আর-একটু এগিয়ে অনেকে আবার লেউইন সাহেবের অঙ্ক-মনোবিদ্যা সম্মত 'ভেক্টর' বা ঐ ধরণের কথা বলতে চান। রবীন্দ্রনাথ বাক্স বা ধাঁধা নিয়ে কাজ-কারবার করে আনন্দের কথা বলছেন না, তিনি সমগ্র জীবন এবং বৃহৎ জীবনের বোধের আনন্দের কথাই বলছেন। এই বোধ বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে মেলে না, এ বোধ মানুষমাত্রেই থাকে; সুপ্ত অবস্থায় যে থাকে তা-ও নয়। সুপ্ত

থাকলে শিশু রবীন্দ্রনাথ ইস্কুল পালাতেন না। মানুষ যেদিন জন্মগ্রহণ করে সেদিন যেমন চক্ষু নিয়েই জন্মগ্রহণ করে, তারপর বিষয়বস্তুর সাহচর্যে তার অভ্যাস ঘটে তেমনি জন্ম থেকেই ঐ ভূমার আকর্ষণ নিয়ে সে আসে আর তাই অনুশীলনের দ্বারা, বাধার সম্মুখীন হয়ে অভ্যস্ত হয়। এই বোধের একটা ঘটনা জীবনস্মৃতি থেকে বলা যায় ;

অঘোরবাবু মেডিকেল কলেজে পড়তেন, রবীন্দ্রনাথদের বাড়ীতে ইংরেজিও পড়াতেন। নিষ্ঠাবান শিক্ষক। ভুজবলে ছাত্রদের শাসন করতেন না। কিন্তু তিনি যেদিন তাঁদেরকে কণ্ঠনালীর ক্রিয়া বোঝাতে লাগলেন রবীন্দ্রনাথের ভালো লাগে নি ;

"আমি জানিতাম সমস্ত মানুষটাই কথা কয় ; কথা কওয়া ব্যাপারটাকে এমনতরো টুকরা করিয়া দেখা যায় ইহা কখনো মনেও হয় নাই। কলকৌশল যত বড়ো আশ্চর্য হউক না কেন তাহা তো মোট মানুষের চেয়ে বড়ো নহে।"

এই সামগ্রিকবোধের আর একদিনের ঘটনা ;

"টেবিলের উপর একটি বৃদ্ধার মৃতদেহ শয়ান ছিল ; সেটা দেখিয়া আমার মন তেমন চঞ্চল হয় নাই, কিন্তু মেজের উপরে একখণ্ড কাটা পা পড়িয়াছিল সে দৃশ্যে আমার সমস্ত মন একেবারে চমকিয়া উঠিয়াছিল। মানুষকে এইরূপ টুকরা করিয়া দেখা এমন ভয়ংকর এমন অসংগত যে সেই মেজের উপর পড়িয়া-থাকা একটা কৃষ্ণবর্ণ অর্থহীন পায়ের কথা আমি অনেক দিন পর্যন্ত ভুলিতে পারি নাই।"

কেউ যদি বলেন রবীন্দ্রনাথ সুন্দরের সেবক তাই সৌন্দর্যের বিঘ্নকর বলেই তাঁর এত খারাপ লেগেছিল, তাহলে বলতে হয়, যা-কিছু বিচ্ছিন্ন বিযুক্ত তাই-ই অসুন্দর। কাজেই 'ডাইরেক্ট মেথড' বা প্রত্যক্ষ করিয়ে ঘটনার সান্নিধ্যে এনে পড়ানোর প্রক্রিয়া যে নির্বিচারে আনন্দ-দায়ক সেকথা স্বীকার করা যায় না।

অত্যন্ত আধুনিক যুগের ইংরেজি পদ্ধতির বহুঘোষিত 'স্ট্রাকচারাল মেথড' সম্পর্কে সহসা মন্তব্য করতে পারেন, সামগ্রিকতা অক্ষুণ্ণ রাখতে এই মেথড বুঝি বা ভালো। তা কিন্তু নয়। ইংরেজি যাদের মাতৃভাষা নয় তাদের কাছে ঐ 'স্ট্রাক্‌চারাল মেথড'ও নিরানন্দের ; কারণ সমাজে চলতে ফিরতে ঐ ভাষাটিকে তারা কখনও পায় না। উভয়ের (মেথডের) মধ্যে কোন্‌টি ভালো সেটি বিচার করা যেতে পারে ; কিন্তু মাতৃভাষা যেমন ধমনীতে, মানসিকতায়, কালের প্রতি-মুহূর্তে ব্যক্তির কাছে জড়িয়ে থাকে তেমন বিদেশী ভাষা নয় বলেই, শিক্ষায় মাতৃভাষাকেই রবীন্দ্রনাথ সমর্থন করেছেন। রবীন্দ্রনাথ মাতৃভাষাকে রাজনীতির জন্যে সমর্থন করেন নি। করেছেন, সামগ্রিকতার বোধ থেকেই। এই সমগ্র দৃষ্টি ছিল বলেই রবীন্দ্রনাথ বাঙলাভাষার ধ্বনির এমন সন্ধান পেলেন যে অক্ষর মাত্রাবৃত্ত প্রভৃতি এড়িয়ে ছন্দে স্বকীয়তা আনতে পেরেছিলেন ; নতুন

রকমের 'অক্ষর'-চিন্তা এল তাঁর। মধুসূদন বাঙলাভাষার ধ্বনিকে নেতি নেতি ক'রে আবিষ্কার করেছিলেন আর রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালের কাব্যের সম্মুখীন হওয়া মাত্রই বাংলার ধ্বনিকে চিনতে পারলেন।

শিশু মনোবিদেরা হয়ত ধমক দিয়ে বলবেন, 'আনন্দ'-কে অত জটিল করে না ভেবে 'কৌতূহলে'র সঙ্গে মিশিয়ে দেখলে ঠিক ব্যাপারটি বোঝা যাবে ; রবীন্দ্রনাথের ঐ শবব্যবচ্ছেদে কোন কৌতূহল ছিল না তাই অঘোরবাবুর ত্রুটি হয়েছিল। কিন্তু ঐ 'জীবনস্মৃতি'তে তারও বিরুদ্ধ প্রমাণ আছে। কৌতূহল বস্তুটি কি তারই সন্ধান নেওয়া যাক।

ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটি দেখিয়ে নতুন শিক্ষা-পদ্ধতি প্রচলনের জন্য নর্মাল ইস্কুল প্রবর্তিত হল। সেই নর্মাল ইস্কুলে 'অবজেক্ট লেসন' বলে অতি উপাদেয় এবং কার্যকরী পদ্ধতি চালু হল। রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় সেই 'অবজেক্ট লেসন'-কে বাংলায় শিক্ষা দেওয়ার জন্য বই লিখলেন 'বস্তুবিচার'। রবীন্দ্রনাথ এই 'বস্তুবিচার'-এর গোলোক ধাঁধাঁয় পড়লেন। বস্তুবিচারে চা, সাগু, রেশম, এরারুট, কালি, কাগজ, প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে, বাংলাদেশেরই নিত্যকার পরিচিত বিষয়বস্তু সম্পর্কে বেশ ওয়াকিবহাল ক'রে তোলা হয়। রবীন্দ্রনাথ কলকাতার ছেলে, তাঁর কাছে এ সকল কৌতূহলের বস্তু হওয়া উচিত। কিন্তু তা হল না। নিশ্চয়ই বইয়ের লেখাকে সরস করে পড়ানোর পদ্ধতি ছিল। তবু সরস হল না। অথচ বাড়ীতে সীতানাথ ঘোষ (জীবনস্মৃতিতে আছে 'দত্ত' বলে) যে প্রকৃতিবিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন তা তাঁর ভালো লাগত।

'এই শিক্ষাটি আমার কাছে বিশেষ ঔৎসুক্যজনক ছিল। জাল দিবার সময় তাপসংযোগে পাত্রের নীচে জল পাৎলা হইয়া উপরে উঠে, উপরের ভারি জল নিচে নামিতে থাকে এবং এই জন্যই জল টগবগ করে' ইহাই যেদিন তিনি কাচ পাত্রে জলে কাঠের গুঁড়া দিয়া আগুনে চড়াইয়া প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিলেন সেদিন মনের মধ্যে যে কিরূপ বিস্ময় অনুভব করিয়াছিলাম তাহা আজও স্পষ্ট মনে আছে।'

লক্ষ্য করবার মতো যে, এই অংশে 'ঔৎসুক্য' এবং 'প্রত্যক্ষ দেখানো' দুটো কথা আছে। তবু এ ঐ শিক্ষাপদ্ধতির বহুঘোষিত 'কৌতূহল' এবং 'কাজ করতে করতে শেখা' বা অনুরূপ প্রক্রিয়ার সঙ্গে এক নয়। এখানে একটি বস্তুর বিচ্ছিন্ন অবস্থা নয়, তার সমগ্র রূপের অন্য একটি দিক ; রূপান্তর নয়, শক্তি। পূর্বে উদ্ধৃত ছিন্নপত্রের সেই জাল কেটে ওঠার একটা দৃষ্টান্ত ; শক্তির যেন বাস্তবে-কল্পনায় জড়িয়ে এক রূপ। এইজন্য পদ্ধতি এখানে আকর্ষণের বস্তু নয়, 'পুরনো জ্ঞানের সঙ্গে নতুন জ্ঞানের' সংযোগ করাও নয়; এখানে বিস্ময়কর হচ্ছে মানবশিশু যেন ঐটির মধ্যে নিজের শক্তির এক দর্পণ পেয়ে গেল। অনেকে ভাবেন, বিজ্ঞানের প্রতি রবীন্দ্রনাথের অসীম আগ্রহই এর জন্য দায়ী। তাহলে

বস্তুবিচারে তিনি আনন্দ পেতেন, পদার্থবিদ্যায় কিছু হল না বলে আক্ষেপ করতেন না। বিজ্ঞানে তাঁর আগ্রহ ছিল যে-অর্থে সেই অর্থেই তিনি এখানে উৎসুক হয়েছেন, সেই অর্থই রয়েছে তাঁর 'বিশ্বপরিচয়' লেখার মূলে। সবকিছু ছেড়ে তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানে হাত দিয়েছিলেন ; হিমালয়ে গিয়ে দেবেন্দ্রনাথের কাছে জ্যোতিষ পড়ে তিনি এমন প্রভাবিত হয়েছিলেন যে শৈশবে তিনি 'সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়' লিখতে আগ্রহী হলেন। সন্ধ্যা-সঙ্গীতের বিষণ্ণ নিরাসক্ত মন থেকে মুক্ত হয়ে প্রভাত-সঙ্গীতে আসবার একটি কারণ ঐ জ্যোতির্বিজ্ঞানও হতে পারে।

কাজেই 'কৌতূহল এবং প্রত্যক্ষ' পদ্ধতির আবির্ভাব এখানে ভূমার টানেই বলতে হয়। কোন মনোবিজ্ঞানের শাস্ত্র থেকে মনের উপকরণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে তিনি যান নি। মানুষের মন থেকে যা বিকীর্ণ হ'ল মনোবিদ্যা সেইটুকুই হিসাব করতে পারে ; কিন্তু সেই হিসাব অনুযায়ী অপর একটি মনকে—খড়ি পেতে তৈরী করতে যাওয়া প্রশাসকের কাজ হতে পারে, বিজ্ঞানীর নয়। গবেষক সমগ্র মানুষের পরিপ্রেক্ষিতে যে জিনিস পান সেইটি পুনরায় অপর মানুষের মধ্যে ঢুকিয়ে 'বাঁও মেলানো' মনুষ্যত্বের অপমান। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে আমরা এই অবস্থারই সৃষ্টি করি। সেইজন্য যতো ভর্তি পরীক্ষার অনুষ্ঠান, বুদ্ধি-অভীক্ষার অযথা পত্র-জাল। একটু স্পষ্ট করতে হলে বলতে হয়, বুদ্ধি-অভীক্ষা যে বিনে (ট্) সাহেব করেছিলেন তার সূত্রপাত হয় বুদ্ধিহীনদের স্বাভাবিক শিশুর থেকে তফাৎ বের করতে গিয়ে। তফাৎ-টা বিনে (ট্) সাহেবের কতখানি 'আপ্ত' বলা যায় না ; তারপরও অবশ্য পরীক্ষা হয়েছে ; পরীক্ষা হয়েছে রণ-ক্ষেত্রের সৈনিক বাছাই করতে গিয়ে ; পরীক্ষা হয়েছে চিন্তার প্রক্রিয়া নির্ণয় করতে গিয়ে। স্পীয়ারম্যানের নবজ্ঞান আয়ত্তির সূত্র তিনটিতে আর যাইই থাকুক চিন্তাসৃষ্টিতে অনুবন্ধ প্রক্রিয়া যে কখন হয়, কেমন করে হয় সে কথাটি নেই। থাকলে, বুদ্ধিটি অর্জিত না, রক্তে প্রবাহিত তা একান্ত করেই বলা যেত। থাকলে, আমেরিকায় বুদ্ধির ব্যাখ্যায় আর ইংল্যাণ্ডের বুদ্ধির ব্যাখ্যায় অত 'শক্তি' বা ফ্যাক্টর নিয়ে বিতর্ক থাকত না। মনোবিদ্যার সব ব্যাপারেই বোধ হয় তাই। আমরা নাকি অকেজো হয়ে পড়েছি ন্যায়ের তর্ক করতে গিয়ে যে, 'তাল পড়িয়া টিপ করে, কি, টিপ করিয়া তাল পড়ে।' কিন্তু পাশ্চাত্যদেশ যে 'দৌড়িয়ে ভয় পাই, কি ভয় পেয়ে দৌড়ই' সেই তর্ক নিয়ে মানুষকে বৈজ্ঞানিকভাবে বুঝেছে, তা বিনা দ্বিধায় স্বীকার করে বসি।

এই 'বিজ্ঞান-বাদে'র আওতা থেকে যদি আমরা বেরোতে পারি তবেই আমাদের সমগ্র মানুষকে বোঝা সম্ভব হবে। রবীন্দ্রনাথ কবি, কবি আত্মবিশ্লেষণ করে থাকেন, তাই প্রতিপদে তাঁর 'সমগ্র' টুকু ব্যবহার করেছেন অন্যকে বুঝবার

পক্ষে। এই সমগ্র বা ভূমাকে আরও ব্যাখ্যা করতে হ'লে রবীন্দ্রনাথেরই উক্তি তুলতে হয়,

"গেটে মরবার সময় বলেছিলেন—more light! আমার যদি সে সময়ে কোনো ইচ্ছা প্রকাশ করবার থাকে তো আমি বলি, more light and more space!'

আলো এবং আকাশ এইটি বোধ হয় তাঁর শিক্ষাদর্শনের সারমর্ম। আলো নিচ্ছেন তিনি দিনের বেলাতে, আর আকাশ বা শান্তি (একই অর্থে তিনি ব্যবহার করেছেন) নিচ্ছেন সন্ধ্যা থেকে; অথবা বলব, সমগ্র দিনমানেই আলোক, আর শান্তি আছে নীরব মধ্যাহ্নে এবং সন্ধ্যার আলোকে। এই ভাবটি যদি পৃথিবীর কর্ম আর ভাবের দিকের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া যায় (বহুবার তিনি সেই নির্দেশ দিয়েছেন) তবে কর্ম থেকে মানুষের জ্ঞান আসে, আলোক আর ভাব থেকে শান্তি।

মানুষের মনের বৃত্তে এই দিবা-সন্ধ্যার ধর্ম আছে বলেই জীবনস্মৃতিতে তিনি দ্রষ্টার মতো উল্লেখ করে বসেছেন,

'তিনি যতো ভালো মানুষ হউন তাঁহাব পড়াইবার সময় ছিল সন্ধ্যাবেলা এবং পড়াইবার বিষয় ছিল ইংরেজি।'

এর পূর্বেও একবার বলেছেন,

'কাঠ হইতে অগ্নি উদ্ভাবনটাই মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে বড়ো উদ্ভাবন এই কথাটা শাস্ত্রে পড়িতে পাই। আমি তাহার প্রতিবাদ করিতে চাই না। কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় পাখিরা আলো জ্বালিতে পারে না এটা যে পাখির বাচ্ছাদের পরম সৌভাগ্য একথা আমি মনে না করিয়া থাকিতে পারি না।'

এই উক্তিটি যে উদ্ভট চিন্তার পরিহাস নয় তা একটু স্বাভাবিক চিন্তাতেই বোঝা যায়। তাতেও 'চিন্তাশীল নরহরি' যদি বিমর্ষ হন তবে অন্য কথা বলছি।

রবীন্দ্রনাথ সারাজীবনে বহু কবিতা লিখেছেন, সে অনুপাতে ছোটগল্প লেখেন নি। তার একটা বড়ো কারণ, গল্পগুলো সমাজ-কর্ম আর কবিতা তাঁর নিজের জীবন-দর্শন। এইজন্য সহরের অধিবাসী হয়েও তাঁর কালের বর্তমান কলকাতার প্রতীকতা বা চিত্রকল্প অতি অল্পই ব্যবহার করেছেন। সঞ্চয়িতার হিসাব করে দেখলাম (১৩৫৯ এর পৌষ সংস্করণ) পাণ্ডুলিপির কবিতা বাদ দিয়ে কবিতার সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৯৩ (পংক্তি সংখ্যা ১৯০৭৭), এর মধ্যে বর্তমান সহরের চিত্রকল্প আছে ১৪টি কবিতায়, আর সংযোজনে ১১টি কবিতায়।

এর কারণ বোধ হয় এই ছোট গল্পের মানুষ সমাজে-ঘেরা। কবি তির্যক

দৃষ্টিতে তাদের জালের গিঁঠ খুলবার প্রচেষ্টা তুলে ধরেছেন ; কাজেই জালের গিঁঠটুকুর বর্ণনা তাতে থাকবে। কিন্তু কবিতায় 'গিঁঠ কেন কাটব' তার দর্শন আছে, সেখানে মানুষ শুধু সমাজ-মানুষ নয়, পূর্ণ মানুষ। এইজন্য কবিতায় শিক্ষা বা ইস্কুলের ব্যবহার সম্পর্কে উক্তি তেমন পাওয়া যায় না, কিন্তু ছোটগল্পের ছত্রে ছত্রে সে সম্পর্কে নানা উল্লেখ আছে। শেষের দিকের কবিতায় কিছু কিছু শিক্ষার উল্লেখ অবশ্য আছে। কিন্তু প্রথম দিকের একটি কবিতায় তিনি প্রথমে এই শিক্ষার অত্যাচার সম্পর্কে লিখতে বাধ্য হয়েছিলেন। বাধ্য হয়েছিলেন নৈরাশ্যে নয়, সে সময় বৃহৎ-কে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেছেন বলে। এই কবিতা হচ্ছে প্রভাত-সঙ্গীতের নবম কবিতাটি ; 'সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়'। এখানে পাঠশালার উপমাটি উল্লেখ করছি ;

মহাছন্দে বাঁধা হয়ে, যুগ যুগ যুগ যুগান্তর,
পড়িল নিয়ম-পাঠশালে
অসীম জগৎ চরাচর।

আবার,

"জাগো জাগো জাগো মহাদেব,
কবে মোরা পাব অবসর।
অলঙ্ঘ্য নিয়ম-পথে ভ্রমি
হয়েছে হে শ্রান্ত কলেবর ;
নিয়মের পাঠ সমাপিয়া
সাধ গেছে খেলা করিবারে,
একবার ছেড়ে দাও দেব,
অনন্ত এ আকাশ মাঝারে।"

'পাঠশালার উপমা' বলেছি, কিন্তু কাব্য-রসিক মাত্রেই বুঝতে পারবেন এই উপমাটি কতখানি রসোৎসারিত। উপলব্ধির কতখানি গভীরতা থাকলে, অভিজ্ঞতার কতখানি দ্যুতি থাকলে তবে এই ধ্বনি বা রস সৃষ্টি করা যায়। বারবার 'যুগ' এবং 'মহৎ' দ্যোতক শব্দপ্রয়োগে কবির নিজের জীবনদর্শনকে যেমন বোঝাচ্ছে তার সঙ্গে পাঠশালার নিয়মের নিগড়কে তেমনি অতি দুর্বল করে তোলা হচ্ছে। এ নিয়ম গতিহীন নয়, পাঠশালার নিয়ম চলচ্ছক্তি রহিত নয়, অত্যন্ত মাংসল পায়ে তার যাত্রা। তাই তাতে এত ক্লান্তি। সে তো আর সমগ্র সত্তাকে উদ্বুদ্ধ করে নৃত্য করে না। এ নিয়মের ছন্দ যত 'মহা'ই হোক তা অক্ষর-গোণার ছন্দ, স্বাভাবিক ছন্দ নয়। স্বীকার করি, অক্ষরগুণে কবিতা লেখাই লেখকের প্রাথমিক কাজ। কিন্তু সেই প্রাথমিক কাজটি কবির সমগ্র জীবন ব্যেপে থাকলে কবির জন্ম হতে পারে না।

এই আকাশ বা অবকাশ ছিলনা 'মাস্টারমশায়' গল্পের হরলালের। কারণ 'কি করিলে তাহার অবস্থা ভালো হইবে, এই আশায় সে বহু কষ্টে বই জোগাড় করিয়া কেবলমাত্র নিজের চেষ্টায় দিনরাত শুধু পড়া করিয়াছে। তাই 'অভাগা হরলালের এমন করিয়া কোনো মানুষকে ভালোবাসিবার সুযোগ ইতিপূর্বে কখনও ঘটে নাই।'

অবকাশ ছিলনা রাসমণির ছেলে কালীপদ-র। হালদার-গোষ্ঠীর বংশীয় অবস্থা কবি বর্ণনা করছেন,

"দিনরাত জাগিয়া পড়া করিয়া করিয়া তাহার অন্তরের দিকে কিছু জমা হইতেছে কি না অন্তর্যামী জানেন, কিন্তু শরীরের দিকে খরচ ছাড়া আর কিছুই নাই।'

'হৈমন্তীর' অপুর হৈমন্তীকে দেখবারও অবকাশ নাই ;

"পরীক্ষা পাশের উদ্‌যোগে কোমর বাঁধিয়া লাগিলাম। একদিন রবিবার মধ্যাহ্নে বাহিরের ঘরে বসিয়া মার্টিনোর চরিত্রতত্ত্ব বইখানার বিশেষ বিশেষ লাইনের মধ্যপথগুলা ফাড়িয়া ফেলিয়া নীল পেনসিলের লাঙল চালাইতেছিলাম....।'

'তপস্বিনী'র বরদার অবকাশ জোটে নি ;

"মাখন হেড মাস্টারের কাছে সন্ধান লইয়া জানিলেন, ইস্কুল এবং ঘরের শিক্ষক এইরূপ বড়ো বড়ো দুই এঞ্জিন আগে পিছে জুড়িয়া দিলে তবে বরদার সদগতি হইতে পারে।"

'পয়লা নম্বরে'র অদ্বৈতবাবু ইস্কুলের পড়া করতেন না কিন্তু এত অসম্ভব রকমে পড়াশুনা করতেন যে তাঁরও অবকাশ ছিল না। 'চিত্রকরে'র বড়োবাবু চুনিলালকে অবকাশ দিতে চান নি।

আর তালিকা বাড়াতে চাইনে। কিন্তু এই ইস্কুল-কলেজের ছাত্রদের জীবনেও যে অবকাশ না-আসে তা নয়। 'অপরিচিতা'র অনুপমের এইরূপ অবকাশ জুটেছিল :

"কিছুদিন পূর্বেই এম-এ পাশ করিয়াছি। সামনে যতদূর পর্যন্ত দৃষ্টি চলে ছুটি ধূ ধূ করিতেছে ;......এই অবকাশের মরুভূমির মধ্যে আমার হৃদয় যেন বিশ্বব্যাপী নারীরূপের মরীচিকা দেখিতেছিল—।"

এমনই অবস্থায় বহু পুণ্য থাকলে যেমন রাস্তার গ্যাসের আলোয় পড়ে বিদ্যাসাগর হওয়া যায়, তেমনি বহু ভাগ্য থাকলে ইস্কুলে পড়ে-ও রবীন্দ্রনাথ হওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের জীবনে তাই অবকাশ জুটল হিমালয়ে পিতার ইঙ্গিতে, তৎপূর্বে জুটেছিল রেলিঙগুলোকে ছাত্র তৈরী করে, ম্যাজিক দেখানোর ছাত্রবন্ধুর সান্নিধ্যে আর জ্যোতিদাদার স্নেহে। নতুবা, ইস্কুলের নির্মম ঘরের মধ্যে পাহারাওয়ালা দেয়ালে আবদ্ধ হয়ে পদার্থবিদ্যা, জ্যামিতি আর অভিধান নিয়ে 'মেঘনাদ বধ' পড়ে তাঁর মনের বৃদ্ধি হত না।

তবে এই অবসর কথা বলতে গিয়ে শিক্ষাশাস্ত্রের সেই 'শিক্ষা অবসর বিনোদনের জন্য' কথাটা যে বলছিনা, সেকথা সাধারণ পাঠকও বুঝতে পারবেন। 'অবসরের জন্যই শিক্ষা' ওই মতটা এসেছিল গ্রীসের শিক্ষাব্যবস্থা থেকে। গ্রীসের গণতন্ত্রে মেয়েদের এবং সেই দেশের পুরাতন-অধিবাসীদের স্থান ছিল না। শিক্ষাতেও নয়। কাজেই কাজ-কর্ম করতে হয়না অথচ পূর্ণ অবসর আছে এমন 'স্বাধীন নাগরিকদের জন্যই' তখন শিক্ষা ছিল। তারপর যেহেতু শিক্ষাটা সমাজের 'কুলীন'দের জন্যই এক রকমের কলকাঠি, তাই বুদ্ধিমান শিক্ষা-মনোবিদেরা ঐ নিয়ে দার্শনিকতা সুরু করলেন। আর পূর্বেই বলেছি, বিজ্ঞান-বাদের যুগে সেকথাটা সহজেই সকলের সম্মতি আদায় করতে পারে। তাই এখনও ঐ মতবাদীদের ফলাও পসার। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু অবসর বা অবকাশ অর্থে মনের আকাশকেই (Spacc) বুঝিয়েছেন। সেটি শান্তির স্থান, সেটি চিন্তা আর উদ্ভাবনের ক্ষেত্র।

এই ব্যাখ্যাটা করবার দরকার এইজন্য পড়ল যে, গভীর আলোচনামূলক পুস্তকেও দেখা গেছে, রবীন্দ্রনাথ যে শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের একটু সময় দিতেন যখন তারা যা' ইচ্ছে তাই ভাবুক—সেই ব্যাপার নিয়ে গভীর তথ্য মূলক আলোচনা। আলোচনার প্রতিপাদ্য সেখানে এই যে, মন্তেসরীর পদ্ধতি থেকে যে রবীন্দ্রনাথের পদ্ধতি কত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ তাই। 'রূপকথা পড়াতে নেই কারণ মিথ্যাকে শেখানো হয় অথচ এখানে তাই পড়ানো হয়, আর, ধ্যানের সুযোগ দেওয়ার কারণ যে প্রাচ্যের এক বৈশিষ্ট্য' সেই কথা প্রতিপন্ন করাই এইসব পুস্তকের উদ্দেশ্য। কিন্তু তেমন উৎসাহ না দেখালেই রবীন্দ্রনাথের উপর সুবিচার করা হত। রবীন্দ্রনাথ এখানে জীবন-দর্শনেরই কথা বলেছেন। সমগ্র সৃষ্টির নিয়মের কথা বলেছেন। শিক্ষাক্ষেত্রে সৃষ্টির সেই স্বাভাবিকতাকেই ধরতে চেয়েছেন। নিজের জীবনকে ভালো ক'রে বুঝেছিলেন বলেই অন্যের জীবনকে গড়তে এত আগ্রহী হয়ে পড়েন।

আরও একটা প্রশ্ন উঠতে পারে। রবীন্দ্রনাথ কি পুঁথির ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে চান? সেই আদিবাসীদের যাযাবরী শিক্ষা বা ঘটনাক্রমিক শিক্ষাকেই প্রতিষ্ঠা করতে চান? এ রকম কথা রুশো হয়ত বলতে পারেন, কিন্তু উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর রবীন্দ্রনাথ বলতে পারেন না। রবীন্দ্রনাথ নিজে যে পাঠ্যপুস্তক লিখেছিলেন সেটি না উল্লেখ করেও বলা যায়, তিনি ইস্কুল পলাতক হয়েও প্রচুর পড়তেন। অথচ এই পড়ার সঙ্গে আবার তাঁর 'পয়লা নম্বর' গল্পের অদ্বৈত-বাবুরও মিল নেই। ইস্কুলের বই আলোও নয় আকাশও নয়, তার কারণ যে-কারণে বই পাঠ্য করা হয়, পড়ানো হয় সেই কারণেই সেগুলি কানা সঙ্কীর্ণ গলি। বই পাঠ্য করার পিছনে সমাজসেবীর সদুদ্দেশ্য থাকতে পারে; বর্ণ-

পরিচয়, কথামালা, ঋজুপাঠ যাঁরা লিখেছেন তাঁরা যে সমাজের মহান্ উদ্দেশ্যেই লিখেছিলেন সে কথায় বিন্দুমাত্র সন্দেহ কেউ পোষণ করে না। কিন্তু সেগুলি যখন পাঠ্য হয় তখন সবাই চায় তার আদ্যন্ত ছাত্রেরা বুঝুক। যত বুঝবে ততই যেন ব্যবহারে আচরণে প্রয়োগ করবে। এই 'বোঝা' ব্যাপারটা মনুষ্যমাত্রেরই অপমানকর। 'বেশ করে বুঝিয়ে দাও' বলে বাংলায় যে বিশেষ প্রয়োগ দেখা যায় তা বড় অমর্যাদাকর। পড়িয়ে শুনিয়ে তাদের চিত্তের কোথাও যদি ফাঁক থাকে এই ভয়ে বোঝানো সুরু হয়। রবীন্দ্রনাথের এতে বড় আপত্তি :

"শিক্ষার সকলের চেয়ে বড়ো অঙ্গটা—বুঝাইয়া দেওয়া নহে,—মনের মধ্যে ঘা দেওয়া। সেই আঘাতে ভিতরে যে জিনিসটা বাজিয়া উঠে যদি কোনো বালককে তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে বলা হয় তবে সে যাহা বলিবে সেটা নিতান্ত একটা ছেলেমানুষি কিছু। কিন্তু যাহা সে মুখে বলিতে পারে তাহার চেয়ে তাহার মনের মধ্যে বাজে অনেক বেশি ;"

এই জন্যই গায়ত্রী মন্ত্রে তিনি আনন্দ পেতেন, গীতগোবিন্দ পড়ে নিজে রসসৃষ্টি করতেন, জামাইবারিক পড়ার জন্য আঁচল থেকে চাবি চুরি করতেন।

'চাবি চুরি করা'তো আবার মনঃসমীক্ষকদের বিশেষ সমস্যার ব্যাপার। জামাইবারিক বা গীতগোবিন্দ পড়ার উৎসাহকে তাঁরা ভেঙে দুমড়ে এমন এক স্থানে নিয়ে যেতে পারেন যে, শিক্ষায় 'গাইডেন্স' পদ্ধতি যে অবিলম্বে দরকারী তার প্রস্তাব আসতে পারে।

এই প্রস্তাবকারী শিক্ষাবিদেরা ইস্কুলকে মানুষের স্বাস্থ্যনিবাসই ক'রে তুলতে চান। তার কারণ হচ্ছে, ইস্কুল ব্যাপারটাই ব্যক্তিজীবনের চেয়ে সমাজ-জীবনের দিকেই বিশেষ নজর দেয়। তাই ইস্কুলকে বলা হয় সমাজীয় প্রতিষ্ঠান। ব্যক্তিকে সমাজের করে তোলার দিকে ইস্কুলের যত মনোযোগ এমন আর কিছুতে নয়। ধর্মের আওতা থেকে মানুষের সর্বসাধারণের আওতায় ইস্কুলকে আইন ক'রে তুলে আনা হলেও তার সর্বাঙ্গে যে ছিন্ন শিকড় ধর্মের মৃত্তিকা সমেত লেগে রয়েছে তা আর দূরীভূত করা গেল না। মানুষকে তাই এই সমাজের প্রতিষ্ঠান মনে করে একরকমের চিংড়িমাছ। তার দেহ থেকে খোসাটি খুলে না ফেললে আর খাওয়ার সুখ হয় না। তাই তাকে সমাজের করে নিতে তাকে বহুবিধ সাধারণ জ্ঞান দাও। অভিভাবকেরাও মনে করেন; সমাজের না হতে পারলে ক'রে খাবে কি? কিংবা জীবনের পথে adjustment করবে কি করে, তার ব্যক্তিত্ব আসবে কি করে?

ইংরেজি ঐ adjustment এর বাংলা বোধ হয় সমন্বয়ন বা উপযোজন। সমন্বয়ন-এর পিছনে দুটি দিক আছে। পরিবেশের সঙ্গে যেমন নিজেকে অন্বিত করা হয়, তেমনি পরিবেশকেও পরিবর্তন ক'রে নিজের সঙ্গে অন্বিত করা হয়। এই প্রক্রিয়ার পিছনে মনের ভিতর যে কি ব্যাপার সঙ্ঘটিত হয় তা বলা কঠিন।

কিন্তু সাধারণ জ্ঞান থাকলে বা না-থাকলে যে এর খুব একটা বেশি সমাধান হয় তা মনে হয় না। একটা ঘটনার কথা বলা যাক। বাল্মীকির রামায়ণে বর্ণিত আছে যে, রাম লক্ষ্মণ আর সীতা যখন বনে যাবার আগে দশরথ-কৈকেয়ীর সঙ্গে দেখা করতে এলেন তখন তাঁদের চীর পরতে হল। তখনকার মুনি-ঋষিদের সমাজে বাস করতে অভ্যস্ত হয়েও সীতা কিন্তু চীর পরিধান করতে পারলেন না। কেমন ক'রে পরতে হয় তিনি জানতেন না। রামও জানতেন না মেয়েরা কি ভাবে চীর পরে। কৈকেয়ীর মতো পরীক্ষকেরা কিন্তু একে সাধারণ জ্ঞানের অভাব বলতে পারেন। ভেবে স্থির করতে পারেন বনে গিয়ে সীতা adjust করতে পারবেনা। কিন্তু পরে দেখা গেল, সাধারণ জ্ঞান পাওয়া মেয়েরাও বোধ হয় তাঁর মতো ঐ ভয়ঙ্কর এবং দুরন্ত বনে অমন সমন্বয় করতে পারত না। রাম লক্ষ্মণ বা সীতার এই শক্তিটি কি করে এল ?

এ এক রহস্য বটে। রবীন্দ্রনাথ মানুষের জীবনে এই রহস্যকে স্বীকার করতেন। তিনি অভীক্ষা বা টেস্ট তৈরী করতে তো যান নি। মানুষের অক্ষমতাকে অমন ওলকচুর অভ্যন্তরের 'বিষথলি বা Raphides বলে মনে করেন নি। মনস্বিতাংশ যাঁরা মাপেন সেই রাশি মনোবিদেরা মনে করেন তাঁদের ছক কাটা বুদ্ধির উপকরণগুলো যেন টিকটিকির জিভের মতো, অতি দ্রুত চুম্বক-হাতুড়ীর মতো বের করে শিশুর বুদ্ধির পোকাগুলিকে অঙ্কে ফেলে দেওয়া যায় অবশ্য তখনও এসব টেস্ট গবেষণা বিশেষ হয়নি।

ইস্কুলের দোষ দিয়ে লাভ নেই। শিক্ষক, কর্তৃপক্ষ, সমাজ, পাঠ্যপুস্তক সবাই মিলে ইস্কুল হচ্ছে একটা ব্যাপার। এখানে ছেলেদের আকাশ আর আলো থাকতে পারে না। রবীন্দ্রনাথও সেকথা স্বীকার করেছেন,

> 'আমার বলিবার কথা এই, শিক্ষা কোনো দেশেই সম্পূর্ণত ইস্কুল হইতে হয়না এবং আমার দেশেও হইতেছেনা। পরিপাকশক্তি ময়রার দোকানে তৈরি হয় না, খাদ্যই তৈরি হয়। মানুষের শক্তি যেখানে বৃহৎভাবে উদ্যমশীল সেইখানেই তাহার বিদ্যা তাহার প্রকৃতির সঙ্গে মেশে। আমাদের জীবনের চালনা হইতেছে না বলিয়াই আমাদের পুঁথির বিদ্যাকে আমাদের প্রাণের মধ্যে আয়ত্ত করিতে পারিতেছি না।'

মানুষের মন নিয়ে, বুদ্ধি নিয়ে, পড়ানোর পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা করা, আর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা দোষের নয়। বরং পদার্থবিদ্যার সন্ধানী কার্য যখন মানুষের নিজের বেলাতে প্রযুক্ত হল তখন থেকেই মানবসভ্যতার একটি প্রগতির যুগ বলে চিহ্নিত করা চলে। কিন্তু এই সন্ধানীকার্যের অহমিকা তাকে সঙ্কীর্ণ করে তুলেছে, তার মহৎ সম্ভাবনাকে হত্যা করে বসেছে। ভূবিজ্ঞান, ভূগোল, জীববিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ের বহু আলোচনার পর এই সিদ্ধান্তেই আমাদের আসা উচিত ছিল যে, নৃবিজ্ঞান, সমাজ

বিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞান স্বীকার করবে মানুষ এই সবকে জড়িয়ে, সবাইয়ের মধ্যে তার স্থান ; উপরন্তু যে-প্রৈতি নিয়ে তার এই মনুষ্যজীবনের পরিণাম সে-প্রৈতি এখনও থেমে যায় নি। ভাববাদ বা আদর্শবাদকে যত নিন্দাই করা হোক এ কথাও সত্য, তার বিপরীতটা বিজ্ঞানবাদের নিয়ন্ত্রণবাদ বা ভবিষ্যৎ নির্দেশও একটি ভ্রান্ত পথ। সদাশয় বৈজ্ঞানিকেরা বর্তমানে নিউটনের যান্ত্রিক অনিবার্যতা স্বীকার করেন না, তাঁরা কোনো কিছুর গতিপথ আগে থেকে ছকে দেন না, তার পরিক্রমণ পথকে খুঁজে পেতে চান মাত্র।

শিক্ষাশাস্ত্র এই বিভিন্ন সন্ধানী কার্যের প্রচেষ্টাকে সিদ্ধান্ত বলে মনে করে নিয়ে ইস্কুলে কাট-গোঁয়ারের মতো চালনা করেন, সেই কথাটিই রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনে আর তত্ত্বে মেলে নি। একটা উদাহরণ দিয়ে স্পষ্ট করতে পারি।

ইস্কুলে পড়ানোর সময় উপকরণ, দর্শন এবং শ্রবণ, ব্যবহার করার প্রাবল্য আছে। বেতারযন্ত্র, ছবি, চলচ্চিত্র প্রভৃতি সেই উপকরণের মধ্যে আছে। বাস্তবে যখন এই জিনিসগুলো এসে গেছে তখন ব্যবহার করা কেউ অন্যায় মনে করবেনা। কিন্তু ঐগুলিতেই শিক্ষার শেষ এ মনে করা ভুল। এমনও দেখা গেছে, একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিক্ষাবিদ এবং পদ্ধতি প্রণেতা ক্লাসে পড়ানোর সময় তাঁর টেপ-রেকর্ডারে বক্তৃতা ধরে নিয়ে সেই যন্ত্র চালিয়ে ব্ল্যাক-বোর্ডে তাই অনুসরণ ক'রে মূক অভিনয় করে যাচ্ছেন। এই পদ্ধতি অভিনব সন্দেহ নেই, কিন্তু এটি মানুষের শিক্ষার পক্ষে ভ্রান্ত পথ যে তা এই সেদিনও ভাষা-পড়ানোর সন্ধানী-কার্যে ব্যাপৃত রিচার্ডস সাহেব তাঁর 'Speculative Instrument' গ্রন্থে উল্লেখ ক'রে গেছেন। উল্লেখ করছেন বলেই সত্য তা নয়, তিনি মানুষের মনের সত্যটি ধরতে পেরেছেন বলেই সত্য। কারণ এত অভিনব বিষয় সত্ত্বেও বলতে হবে, ঐসব বিজ্ঞান উপকরণ সীমাবদ্ধ ; শিক্ষকের বাচনিক ভঙ্গী, তাঁর উপস্থিতির যে ব্যাপকতা আর উদারতা আছে তা থেকে তাঁর বাচন আর কর্মকে আলাদা ক'রে নিয়ে ছাত্রদের সম্মুখে তুলে ধরা অর্থ,উনবিংশ শতাব্দীর বস্তুবিচার পড়ানো। বস্তুর মধ্যে কর্ম থাকতে পারে, মানুষের মন নেই। মন আর কর্ম একসঙ্গে না জুড়ে গেলে কোনো মানুষেরই স্থষ্টির কিছু ভালো লাগে না।

বোধহয় মন্তেসরীর জোর-দেওয়া ইন্দ্রিয়জ শিক্ষা থেকে এই ধারণা এসেছে। তার সঙ্গে প্রাচীন ভারতের 'ইন্দ্রিয়ই সর্বজ্ঞানের দ্বার' কথাটি যুক্ত হয়ে এমন প্রভাব বিস্তার করেছে। কিন্তু দ্বার মানেই তো ঘর নয়। ঘর মানেই মানুষের থাকবার যায়গা নয়। শক্তি যে ঘর হিসাবে দাঁড়িয়ে যায় তা ফ্রয়েড সাহেবের তত্ত্বের পরিণাম থেকেই আমরা দেখতে পেয়েছি। এই ইন্দ্রিয়জ শিক্ষার উপর জোর দিতে গিয়ে ইস্কুলে, কিণ্ডারগার্টেনে এবং নার্সারীতে রঙ-মিলতি পাঠ দেওয়া

হয়। রঙ চিনতে পারলে চোখের রেটিনা ক্রিয়া মুখর হয়ে গেল। রেটিনার বড় দুর্বলতার মধ্যে একটি হচ্ছে স্থানের দূরত্ব তাকে মানতে হয়। সেখানে রঙের বা ছবি করায় তেমন ত্রুটি না-ও থাকতে পারে। পৃথিবীর যাবতীয় রঙ চিনলেই যে দৃষ্টির অন্তর্দৃষ্টি খুলে গেল তা তো নয়। তা যদি হত তবে চর্যাপদের সাধকদের আমি নিতান্তই অশিক্ষিত বলব। চর্যাপদের সমগ্র কবিতার মধ্যে দুটি মাত্র বর্ণের উল্লেখ আছে, সাদা আর কালো। এই রঙ দুটি ভাবনার প্রতীক হিসেবেই ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু তাই বলে তাঁদের বর্ণজ্ঞান ছিল না তা স্বীকার করা যায় না ; কারণ কমল, আকাশ, ফুল প্রভৃতি বস্তুর স্বরূপের মধ্যে সেই বর্ণকে স্বীকার করে নিয়েছেন। স্বরূপের মধ্যে, পৃথক ক'রে নয়। রেটিনা দিয়ে কি হবে যেখানে স্বরূপকে দিয়ে মনকে নাড়ানো যায়। রবীন্দ্রনাথের কবিতাতেও দেখা যাবে তেমনি ফুল, নদী, আকাশ, পাখী প্রভৃতির মধ্যে যে সাড়া পেয়েছেন জন্তুজানোয়ারে মধ্যে তেমন নয়। জন্তুজানোয়ারের অবয়ব যেন তার শক্তিকে ঘিরে রেখেছে, তার বাইরে আর কিছু যেন পাওয়া যায় না। মানুষ সেটুকু তো পেয়েছেই, কিন্তু তার আরও পাওয়ার আছে। সে-পাওয়া ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানে তৃপ্ত নয়। এই তৃপ্তি আনতে বা তৃপ্তির চার্ট কসে ব্যাখ্যা করে মানুষের অস্মিতা জানবার জন্য মনোবিদরা ররসাকের 'ইঙ্ক বট টেস্ট' বা 'থিমেটিক এ্যাপারসেপসন টেস্ট' প্রবর্তিত করেছেন। আজ পর্যন্ত কেউ অস্মিতা নির্ণয়ের সিদ্ধ পরীক্ষা আবিষ্কার করতে পারেন নি, তার কারণ হচ্ছে এই ভ্রান্ত পথ। ঐ দুটি পরীক্ষার উপকরণ এমনই মৃত যে মানুষের কল্পনা-পরী ব্যাধির ভয়ে দেশ ছাড়া হয়ে যায়। ওখানে কল্পনা করে শক্তির-আধার মানুষ জাতি বিকৃত হয় মাত্র বড় হতে পারে না। শিক্ষাসূত্র সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য এইজন্য যে সেখানেও কোন পাখীর শিক্ষাকার্য পরীক্ষার কথা নেই। মানুষের মনো-জগতের সঙ্গে মূলতঃ প্রভেদ যেখানে, তাদেরই মানুষের বিকাশের কাছাকাছি বলে সিদ্ধান্ত করে সূত্র নিরূপণ করা হয়েছে। এই সব গবেষণা অনাদরের নয় ; খড়মের মতো ভরত তাকে সিংহাসনে বসিয়ে পুজো করুন তাতে ভরতের মহানুভবতা প্রকাশ পাবে, কিন্তু তাঁর সংযম শক্তি তখনই আদৃত হবে যখন খড়মকেই রামচন্দ্র বলে ভুল না-করবেন।

রবীন্দ্রনাথ শিশুদের জন্য সহজপাঠ লিখলেন। প্রথম ভাগ আর-ও কয়েকখানা তৎকালেও প্রচলিত ছিল। তবু তিনি লিখলেন জীবনের মর্মকেই মেনে। এ সম্পর্কে যে সন্ধানীকার্য করেছিলাম তা অন্যত্র প্রকাশ করেছি। সব হিসেব নিকেশ না দিয়ে শুধু কয়েকটি প্রাসঙ্গিক কথা বলব। শিশুদের মনোজ্ঞ-ধর্মিতা মানতে গিয়ে যোগীন সরকার জীবজন্তুকে তাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছিলেন। তৎকালে পাশ্চাত্য দেশের এক শিক্ষাবিদ ঘোষণাও করে

দিয়েছিলেন, "সত্যি কথা বলতে কি, সমগ্র দৃশ্যমান বস্তু বিশেষ করে জীবজন্তু শিশুদের কাছে বয়স্কদের চেয়েও বিশেষ আগ্রহের।" রবীন্দ্রনাথ এই উক্তি মান্য করলেও, ঐ উক্তির 'বিশেষ করে' অংশটুকু মানতে পারেন নি। জন্তু-জানোয়ারের মধ্যে তিনি আনলেন গোরু, মোষ, বাঘ (২ বার), গাধা, ঘোড়া, হাতি (হাতিটা আবার বুড়ো) , বাঁদর (এ বাঁদর আবার চাঁপাগাছেও নেমেছে), কুকুর। কিন্তু এদের আবির্ভাব এমন সহজে ঘটেছে যে তারা যে বিশেষ কিছু তা বলে মনে হয় না। শিশুদের প্রকৃত পরিবেশ থেকে যেমন করে শব্দ আহরণ করতে হয় ঠিক যেন তাই। এদের সুন্দর করে তুলেছেন। কবির যা কাজ। তবে সহজপাঠ পড়ে উঠলে মনের ভিতর এইটিই বড় হয়ে দাঁড়ায় যে, তার প্রধান অংশ জুড়ে আছে গাছ-লতা-ফল-ফুল-নদী-গ্রাম। পাঠ্যপুস্তকে কল্পনাকে উৎসারিত করবার সুযোগ দিয়েছেন তিনি। সহজ পাঠের প্রথম ভাগে তিনি শিশুর ইচ্ছাও পূরণ করেছেন। যেমন :

দুই হাত তুলে কাকা বলে, থামো, থামো,
যেতে হবে ইস্কুলে, এই বেলা নামো।
আমি বলি কাকা, মিছে করো চেঁচামেচি,
আকাশেতে উঠে আমি মেঘ হয়ে গেছি।

এমনি করে ইস্কুলের ছেলেদের কাছের কথাকে তাঁর পাঠ্যপুস্তকে ব্যবহার করে গেছেন।

আরও একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করবার মতো, তাঁর এই বইতে তৎসম-ইতর শব্দই বেশি। সহজপাঠের শব্দসংখ্যা (৬১৫) বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয়েরই কাছাকাছি (৬২৭)। কিন্তু বর্ণপরিচয়ে তৎসম শব্দসংখ্যা যেখানে ৩৭৫, সহজপাঠে সেখানে মাত্র ১০০টি। বাংলা ভাষার ধ্বনির সহজদিককে রবীন্দ্রনাথ অতি অনায়াসেই চিনে নিতে পেরেছেন। পূর্ব প্রবন্ধের পুনরাবৃত্তি এখানে করতে চাইনা (১৩৬২ সালের জৈষ্ঠ সংখ্যার অগ্রণীতে) তবু আর একটি কথাও বলতে হবে তা হচ্ছে, ধাতু বা ক্রিয়ার মূলের প্রকৃতি নিয়ে। পড়া (পাঠকরা) ক্রিয়াটির উপর ঝোঁক ছিল বিদ্যাসাগরের, তারপরই কর্ ধাতু; রামনন্দ চট্টোপাধ্যায় বেশি ব্যবহার করেছেন 'হওয়া' 'কর্' আর 'খাওয়া'; এই নীতি-আশ্রয়ী শিক্ষাব্রতীদের থেকে রবীন্দ্রনাথ পৃথক হলেন। তাঁর সহজপাঠে 'যাওয়া' (৪০ বার) 'হওয়া' (৪২) ধাতু দুটি বেশি ব্যবহৃত হয়েছে। পশুদের মধ্যে ঘোড়ার উপর পক্ষপাতিত্বও বোধ হয় এই চলতাধর্মের জন্যই। এখানে নীতি তেমন নেই, আছে শক্তিকে আবাহন, গতিকে অনুধাবন। এই বক্তব্যে অন্য শিক্ষাব্রতীদের পুস্তককে অপ্রয়োজনীয় বলা হচ্ছে না, বলবার

কথা এই, রবীন্দ্রনাথ তাঁদের প্রচেষ্টাকে কোন্ দিক দিয়ে সার্থক করতে চেয়েছেন। প্রচেষ্টা একটা পথ, সে-পথ এগিয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ এই পথকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছেন তাঁরই শিক্ষাদর্শ অনুযায়ীই, এই দিকটিই লক্ষ্য করা গেল।

ভাগ্যিস্ বিদ্যাসাগর রবীন্দ্রনাথ শব্দ গবেষণা করে তার থেকে পৌনঃ-পুনিক সঙ্গত শব্দ বের করে এই সব পুস্তক লেখেন নি, তাই তাঁদের শিক্ষানীতি বোঝা যাচ্ছে। এ রকম গবেষণা যে তাঁরা কেউ করেননি তা বোঝা যাচ্ছে পাঁচখানি প্রাথমিক বাংলা পুস্তকে মাত্র ৫২টি শব্দ সবাই ব্যবহার করেছেন পাওয়া গেল, যেখানে সকল মিলে শব্দ সংখ্যা প্রায় দু হাজারের উপর। শব্দ-গবেষণা করে সঙ্গত শব্দ বের করা অন্যায় নয়। অনুপযুক্ত-ও নয়। কিন্তু তাই দিয়ে যখন পুস্তক লিখি তখন তা কেবল শব্দার্থ বোঝার জন্য হতে পারে, ভাষা হৃদয়ঙ্গম হয় না। পূর্বেই উল্লেখ করেছি রবীন্দ্রনাথ ইস্কুলের এই বোঝার-পাট-টার বড়ো বিরোধী ছিলেন।

ভাষা সজীব, তাকে টুক্রো টুক্রো কেটে শব্দের ফাংশন বা ব্যাপার বোঝা যায়, কিন্তু সে ডাক্তারী। চিকিৎসককে সাধারণতঃ ডাকি আমরা ব্যাধি হলে। চিকিৎসক সমাজে অনাবশ্যক নয়। কিন্তু সুস্থ দেহে ডাক্তারী করা জীবনের বা প্রাণশক্তির অপবাদ দেওয়া মাত্র। ভাষা থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে ছেলেদের আশু পরিবেশের মধ্যেকার তাদেরই প্রায়শ উচ্চারিত শব্দগুলি দিয়ে তাদের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা তেমনি ভাষার শক্তিকে অগ্রাহ্য করা। এই অসুন্দর শব্দরাজি হচ্ছে চিন্তাভীরু এমন কি বন্ধ্যা। কোন শব্দই অযথা নয়, ব্যর্থক নয়, ধোঁয়াটে নয়। কোন শব্দই কঠিন নয়, সহজ নয়। শব্দের আছে উদ্ভাবনপ্রক্রিয়া (resourcefulness)। কাজেই দুর্বোধ-সুবোধ না-বেছে ব্যবহার করা উচিত এমন চিন্তা-প্রকল্প, যার সহায়ক ঐ শব্দসমূহ। এইটি করতে গেলেই দেখা যাবে, শব্দ সম্বন্ধে গ্রন্থকারের যেমন ধ্যান চাই তেমনি চাই স্বতঃস্ফূর্তি অক্ষুণ্ণ রাখা। ইংরেজির 'স্ট্রাকচারাল মেথড' এই দিকে ইঙ্গিত নিয়ে আসতে ঘোষণা করে বটে, কিন্তু সে-পদ্ধতিও পথভ্রষ্ট ; কারণ কথোপক-থনের মধ্যে তার হয়ে গেল গতিরুদ্ধ, সে প্রকৃষ্ট চিন্তা জাগানোর সহায়তা করতে চায় না। তত্ত্বের কথা এড়িয়ে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তার প্রয়োগে এইই বোঝায়। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-ধর্মই এমন একস্থানে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস নিয়ে আছে যাতে তিনি শব্দগুলিকে প্রাণহীন ক'রে ব্যবহার করলেন না। এখানেও তাঁর কবি-জীবনের সিদ্ধিই ফল দিয়েছে। শিশু বয়সে একবার মাত্র ভুল করেছিলেন 'দ্বিরেফ' আর 'ভ্রমর' নিয়ে, আর দ্বিতীয়বার করেন নি। সে কাহিনী আমরা জীবনস্মৃতি থেকেই পাই।

সুখের বিষয় বর্তমান যুগে এই উলঙ্গ শব্দ গবেষণায় আর বিশ্বাস করি না,

কিন্তু দু:খের বিষয় ঐ অভিমত আমাদের মস্তিষ্কের ল্যাসলী-সাহেবের-খোঁচানো এমন যায়গায় বিদ্যুতের ক্রিয়াবিঘ্ন ঘটিয়েছে যে, আজও আমরা বিষয় স্বাদনা থেকে বিষয় আয়ত্তিতে বেশি জোর দিই। ভাষা-চিন্তা প্রণালীর গবেষকদের অভিমত আমরা সেখানে গ্রাহ্য করিনা। অথচ বিষয় প্রকৃষ্টভাবে আয়ত্ত করতে গেলে যে তার সঙ্গে অনিবার্যভাবে মূল্যায়ন (valuing) উপলব্ধি (realising) এবং প্রকৃতিবিচার (characterising) জড়িয়ে আছে যা প্রক্ষোভ-বাহী (emotive) স্বাদনা (appreciation) ছাড়া সম্ভব নয়, তা ব্যবহারে অস্বীকার করে বসেছি। রবীন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই সর্ববিষয়ের স্বাদনা পদ্ধতির উপর জোর দিয়েছেন। বর্জনের দিকের চেয়ে গ্রহণ এবং তার সঙ্গে প্রক্ষোভের বিন্যাস বিচার ও পরিশোধন—এই দিকটির উপর আস্থা স্থাপন করেছিলেন। এটি কঠিন কাজ। তাই তাঁকে আমরা সৌন্দর্যের উপাসক বলে শিরোপা দিয়ে বিদায় করে দিয়েছি। সুন্দর-টি আকাশ থেকে তীরের মতো সরু হয়ে কোন এক বিশেষ ব্যক্তির অন্তরে প্রবেশ করে না ; সুন্দরের আকাশ তৈরী করতে হয়। একই বিষয় যেমন অশ্লীল হয় আবার তাই-ই আদিরসের সৌন্দর্য হয়ে ফুটে ওঠে। কেবল পরিমিতির অভাবেই এটি ঘটে তা নয়, স্থান কাল-পাত্রের উপর নির্ভর করেও নয়, অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ তিনটি কাল আর তার মধ্যেকার আকাশ প্রভৃতির উপরও নির্ভর করে। আকাশ যেখানে সঙ্কীর্ণ হতে হতে একেবারে গায়ের সঙ্গে লেপটে আসে, সেই শরীর-মাত্র অবস্থাতেই অসুন্দরের ঘরকন্না। ব্যক্তিজীবনকে বাদ দিয়ে, আকাশ বর্জিত একমাত্র ব্যক্তি ও সমাজের উপর নির্ভর ক'রে যে-শিক্ষা তাই-ই অশিক্ষা, অসুন্দর শিক্ষা।

ঋষির দৃষ্টিতে আর কারিগরের দৃষ্টিতে বোধ হয় তফাৎ এইখানে যে ঋষির দৃষ্টিতে যে-কল্পনা থাকে তাই-ই তাঁকে ঠিকপথে নিয়ে চলতে পারে, আর কারি-গরের দৃষ্টি ইন্দ্রিয়জ মাত্র, ফলে তার পদে পদে ভুল হয় ; অনেক সময় কারিগরি যে বিকৃত পথে চলে তার খেয়ালমাত্র থাকে না। এর একটা বড়ো প্রমাণ পাই প্রশ্নপত্র রচনায়। রবীন্দ্রনাথ অনেকবার প্রশ্ন করেছিলেন। শান্তিনিকেতনের পরীক্ষায়, এবং বাংলাদেশের The National Council of Educationএর fifth standardএ।

শান্তিনিকেতনের 'প্রবেশিকা পরীক্ষা' পাঠ প্রচয় ৩য় ভাগের যে প্রশ্ন করেছিলেন তার দুটি নমুনা তুলছি :

কাঙালিনী :

ধনীর ঘরে পুজোর আয়োজন ও সমারোহ আর দরোজায় দাঁড়িয়ে আছে কাঙালিনী—বিস্তারিত করে এই দৃশ্যের বর্ণনা করো। পুজোবাড়ীতে তোমরা যে-দৃশ্য দেখেছ সেইটি মনে রেখো।

দেবীর বলি :

এই গল্পাংশের মধ্যে যে কয়টি বর্ণনা আছে তাদের কি রকম ক'রে ফলিয়ে তোলা হয়েছে তা বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করো। প্রথম জনশূন্য রাত্রি, দ্বিতীয় জয়সিংহের চরম আত্মনিবেদনের সঙ্কল্প, তৃতীয় মন্দিরে রঘুপতির অপেক্ষা, চতুর্থ জয়সিংহের আত্মহনন।

আদ্য পরীক্ষার 'বাংলা কাব্য পরিচয়ের' একটি প্রশ্ন :

গোষ্ঠযাত্রা : গদ্যে লেখো। নমুনা :—

সাজো সাজো বলে সাড়া পড়ে গেল। বলরামের শিঙ্গা বাজতেই রাখাল বেশে প্রস্তুত হল গোয়ালপাড়া।

১৯৬০ সনের ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশনের একটি প্রশ্ন :

১। প্রবন্ধ রচনা :

(ক) ছিনু মোরা, সুলোচনে, গোদাবরী তীরে,
কপোত-কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষ চূড়ে
বাঁধি নীড় থাকে সুখে ; ছিনু ঘোর বনে,
নাম পঞ্চবটী, মর্ত্যে সুরবনসম।

গোদাবরীতীরে স্থিত রাম ও সীতার কুটীর এমন বিস্তারিতভাবে বর্ণনা কর, যেন তাহা স্বচক্ষে দেখিতেছ ; অর্থাৎ কুটীরের সম্মুখবর্তী নদীর তটভাগ কিরূপ, তাহার সমীপবর্তী বনে কি কি গাছ কিরূপে অবস্থিত, কুটীরের মধ্যে কোথায় কি আছে তাহা প্রত্যক্ষবৎ লিখ।

উপরের প্রশ্নগুলি একটু অনুধাবন করলেই বোঝা যায়, অস্পষ্ট প্রশ্ন এবং তার অনির্দিষ্ট এবং বিভ্রান্ত উত্তর থেকে ত্রাণ পাওয়ার জন্য আজ থেকে ৫৫ বছর আগেও তাঁর কি প্রয়াস ছিল। সঙ্গে সঙ্গে এ-ও লক্ষ্য করবার যে, উত্তর দিতেও ছেলেদের যাতে কল্পনাকে ছেঁটে ফেলতে না হয়, কিংবা কল্পনাকে লুকিয়ে যাতে উত্তর না লেখে সে সম্পর্কেও কবি কত সজাগ। তখনও তো নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার (objective test) এমন হিড়িক পড়ে নি। কোন অবস্থাতেই তিনি ছাত্রদের চিন্তার স্বাধীনতাকে খর্ব করতেন না।

তারপর বর্তমানকালে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপত্র রচনা করার আন্দোলন এল। পরীক্ষাটি বিহিত ভাবে কেমন ক'রে নেওয়া যায় সে সম্পর্কে নানা গবেষণা। কিছুকাল পর ভাষা শিক্ষকেরা আবার চিন্তা করতে বসলেন, অন্তত ভাষা পরীক্ষায় কেবল নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন চলতে পারে না ; রচনা-গত পরীক্ষার গুণ এক্ষেত্রে স্বীকার করতেই হবে। কেউ কেউ রচনা-গত আর নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নরীতি মিশিয়ে প্রশ্ন লিখতে সুরু করলেন। রবীন্দ্রনাথের ঐ প্রশ্ন কিন্তু নৈর্ব্যক্তিক নয়, বরং ছাত্রদের দিকে তাকালে অত্যন্ত ব্যক্তিক। রচনার দিক নির্দেশ করা আছে মাত্র।

কিছুকাল পূর্বে আমেরিকা থেকে পরীক্ষাকার্যে পারদর্শী ডক্টর ব্লুম এদেশে এলেন, তিনিও বললেন কোন্ ধরণের পরীক্ষা করব সেটি বড় কথা নয়। কি প্রশ্ন করব, কেন প্রশ্ন করব—তাইই নির্ণয় করে কোন্ রীতির প্রশ্ন উপযোগী সেই কথা ভাবুন। এইজন্য তিনি নানাধরণের পরীক্ষাই নির্দেশ করলেন। শুধু নির্দেশ নয় সেই অক্লান্তকর্মা অধ্যাপক ভারতের এ প্রান্ত থেকে সে প্রান্ত পর্যন্ত পরিক্রমা করে নানা ধরণের প্রশ্ন রচনা করতে শেখালেন শিক্ষকদের, অধ্যাপকদের, কর্তৃপক্ষদের।

তারপর তাঁর নির্দেশক্রমে নয়াদিল্লীতে পরীক্ষা বিভাগ খোলা হল, সেখানে সেই শিক্ষণ প্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকে পারদর্শী হিসাবে কাজে ঢুকলেন। স্বাধীনভাবে তাঁরা কতগুলো আদর্শ প্রশ্ন রচনা করলেন যা সারা ভারতে অনুসরণ করবে বলে আকাঙ্ক্ষা। এঁরা বিশেষ বিভাগ থেকে (Directorate of Extension Programme for Secondary Education, Ministry of Education Government of India) সোস্যাল স্টাডিজ বা সমাজ অধ্যয়নের উপরও প্রশ্ন রচনা করেছেন। ১১শ শ্রেণীর উপযুক্ত, সমাজ অধ্যয়ন—১ থেকে একটি প্রশ্ন তুলে দিচ্ছি।

১। নির্দেশ :

> মান্‌লীজিএ কি ভারত কী উত্তরী-পূর্বো সীমা পর্ চীন কা অতিক্রমণ জারী রহে ঔর ভারত মেঁ চীন কে বিরুদ্ধ যুদ্ধ ঘোষণা করনে কী স্থিতি আ জায়ে। এয়সী স্থিতি মেঁ নিম্নলিখিত মেঁ সে কৌন্ যুদ্ধ ঘোষণা কা নির্ণয়কর্ সক্‌তা হৈ ? সহী উত্তর কী ক্রম-সংখ্যা মেঁ (√) চিহ্ন লগাএঁ :—
>
> (১) রাষ্ট্রপতি (২) প্রধানমন্ত্রী (৩) কেন্দ্রীয় মন্ত্রিমণ্ডল (৪) সুরক্ষা-মন্ত্রী (৫) সংসদ।

এটি নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নরীতির সব কিছুই যথাযথ মেনে চলেছে, কেবল এই ধরণের প্রশ্নে যে Prefatory Sample বা নমুনা দেওয়ার কথা তা বাদ পড়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু 'গোষ্ঠ যাত্রার' গদ্যে লেখ বলতে গিয়ে 'নমুনা' দিয়ে বসেছেন। Objective testএর রীতি অনুযায়ী এই রকম নমুনা দেওয়া উচিত। পারদর্শীরা সেই ভুল করলেন, কবি সে ভুল করেন নি। কারণ, শিশুদের প্রতিটি নাড়ি-নক্ষত্র যে তাঁর চেনা।

কিন্তু এ-ও ত্রুটি নয়, ত্রুটি অন্যত্র। এই প্রশ্ন করবার সময় প্রশ্নকর্তার মনে ছিল যেন একটি মনোভাব গঠন করবার প্রচেষ্টা যাকে বলে Attitude test, দেশপ্রেমের মনোভাব গঠন করার সুন্দর সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু Achievement test বা অধীত বিদ্যার প্রশ্ন করতে হবে বলে হঠাৎ দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে সংবাদের দিক পরীক্ষা করতেই বসলেন। এই দ্বিধায় প্রশ্নটি খুব মনোজ্ঞ হয়েছে।

কিন্তু যে মনোভাব বা প্রক্ষোভ জাগিয়ে ছেলেদের অনুরাগ সৃষ্টি করা হল, তা হঠাৎ মাঝপথে অতৃপ্ত রেখে তাদের চিত্তকে বিভ্রান্ত করে বসেছে। এই বিভ্রান্তিতে তারা একটু বিচলিত হয়। যেন একটি ইঞ্জিন চলতে চলতে হঠাৎ থেমে গেল। প্রশ্নকর্তা টেকনিকের দিক দিয়ে প্রশ্নটি নিখুঁত করতে চান বলেই Attitude গড়তে গড়তে Achievement-এ আসতে বাধ্য হয়েছেন। কারণ অধীত বিদ্যার পরীক্ষায় ঘটনা এবং সম্ভাব্য ঘটনা মিশিয়ে করা যায় না। কিন্তু Social Studies বা সমাজ অধ্যয়নের প্রশ্ন যে Achievement test অনুযায়ীই করতে হবে তার কোন তো অর্থ নেই; Attitude test-ও কিছু কিছু প্রবিষ্ট করান যায়। নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষায় বিশেষ ক'রে প্রশ্নকর্তাকে আগে থেকে ঠিক ক'রে নিতে হয়, ছেলেদের কোন্ অভিজ্ঞতাকে পরীক্ষা করব। এই সন্ধানী মনোভাব না থাকলে যে-কোন রকমের প্রশ্নই অস্পষ্ট হয়ে পড়ে। আবার, সত্যিকারের খবর নিয়ে হলেই যে সুস্থ প্রশ্ন হয় তা-ও কিন্তু নয়। যেমন ঐ প্রশ্নপত্রের '৮' নং প্রশ্ন:

১। নির্দেশ:

অখবার মেঁ খবর ছপী হৈ কি ব্রিটেন মেঁ বসে হুএ শ্রী ওঁব্রি মেনন নামক এক ব্যক্তি নে অপনী পুস্তক 'বালমীঁকি রামায়ণ' মেঁ কুছ আপত্তিজনক বাতেঁ লিখী হৈঁ। আপকী সমঝ মেঁ নিম্নলিখিত মেঁ সে সাধারণতঃ কৌন-সী কারবাই ভারত সরকার উনকে বিরুদ্ধ করেগী? সহী উত্তর কে সামনে কোষ্ঠ মেঁ সহী (✓) চিহ্ন লগাএঁ।

(১) শ্রী মেনন কে বিরুদ্ধ উনকে জন্মবালে রাজ্য কে ন্যায়ালয় মেঁ মুকদমা চলায়া জায়গা।
(২) শ্রী মেনন কে বিরুদ্ধ ইঙ্গলণ্ডকে ন্যায়ালয় মেঁ মুকদমা চলায়া জায়গা।
(৩) শ্রী মেনন কে বিরুদ্ধ ভারতকে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় মেঁ মুকদমা চলায়া জায়গা।
(৪) শ্রী মেনন কী পুস্তক ভারত মেঁ জব্‌তকর্ লী জায়েগী।
(৫) চুংকি শ্রী মেনন কো লিখনে কী স্বতন্ত্রতা কা মৌলিক্ অধিকার প্রাপ্ত হ্যায়, উনপর কোই মুকদমা নহিঁ চলায়া জা সকতা।

হঠাৎ কোন এক ব্যক্তিবিশেষের নাম নিয়ে এই প্রশ্ন রচনার সার্থকতা বোঝা যায় না। এ দিয়ে ছাত্রদের মানসিক প্রতিক্রিয়া নানারূপ হতে পারে। অনেক ঘটনা ভুলে যাওয়া উচিত স্বাভাবিক সমাজব্যক্তির পক্ষে। সে নিয়মটি মানা হ'ল না। তা ছাড়া ৫নং সম্ভাব্য-উত্তর সম্পর্কে নির্দেশের মিল নেই।

এই সব প্রশ্ন সংবাদমূলক। কিন্তু সংবাদ যখন মানুষের সামনে আসে, তখন সব সংবাদই আর সংবাদমাত্র থাকে না। যদি প্রক্ষোভ অঞ্চল (Emotive aspect) জড়িয়ে পড়ে, তবে দেখতে হয় সেই প্রক্ষোভ উদ্বুদ্ধ করা উদ্দেশ্য কি না। এই বিচার-নির্ভর প্রশ্নই সত্যকার প্রশ্ন। এতো বিজ্ঞানের দোষ নয়, দোষ বিজ্ঞানবাদের।

এইজন্যই বলছিলাম, গবেষকদের গবেষণা কারিগরদের হাতে পড়ে অনেক সময়ই অন্য মূর্তি ধারণ করে।

ইস্কুলে আমরা সাধারণত এই অনুকরণকারীদের হাতে শিক্ষা পাই বলেই প্রকৃত শিক্ষা আমাদের হয় না। এইজন্য রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের প্রথম কার্য প্রণালীতে বলেছিলেন,

'এখন যাঁহারা শিক্ষা দেন তাঁহারা শিক্ষক, তখন যাঁহারা শিক্ষা দিতেন তাঁহারা গুরু ছিলেন।'

এবং,

'শিক্ষক পাওয়া যায়। গুরু সহজে পাওয়া যায় না।'

ইংরেজ আমলে শিক্ষাক্ষেত্রে দুটি অভাব ছিল, (১) অস্বাস্থ্যকর ইস্কুল বাড়ী এবং অপরিসর প্রাঙ্গণ, (২) শিক্ষার আদর্শ। স্বাধীনোত্তর কালে আমরা এর একটি অভাব মেটাতে চেষ্টা করেছি। যাঁরা বলেন, শিক্ষার উন্নয়ন অর্থে আমরা কেবল অট্টালিকা তৈরী করেছি, বাইরের জাঁকজমক এনেছি—তাঁরা ভুলে যান ওটাও দরকার ; এবং ছাত্রদের পক্ষে কোন্‌টি যে প্রথম আর কোন্‌টি দ্বিতীয় তা বলা কঠিন। বিলেতে পাবলিক ইস্কুলের বিরুদ্ধে এত যে আন্দোলন তবু সর্বসাধারণের ইস্কুল পরিকল্পনায়ও তাদের ঐ রকম ইস্কুলই কামনা। যতই দেশ শিল্প নগরীতে রূপান্তরিত হবে ততই ছোটশিশুদের হাঁফ নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। স্বাধীন যুগে আরও একটা সুবিধে হয়েছে, তা হচ্ছে শিশুদের পাঠ্যপুস্তকের সৌন্দর্য। রবীন্দ্রনাথও এর কিছু কিছু আবির্ভাব দেখে গেছেন। ইস্কুল বাড়ী আর বই বা পড়ার উপকরণ দুটোর উন্নতি বিশেষ লক্ষ্যনীয়। তৃতীয় লক্ষ্য করবার মতো, শিক্ষা ব্যাপারের সন্ধানী কার্যকে রাষ্ট্র উৎসাহিত করছেন। এই মনোভাব ভারতবর্ষে অনেকদিনই দেখা যায় নি। যাঁরা এই নতুন যুগের মানুষ তাঁরা কল্পনা করতে পারবেন না যে, রবীন্দ্রনাথ অসহিষ্ণু হয়ে তাঁর কল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে কত কৃচ্ছ্রসাধন করেছেন, কত বিনিদ্র রজনী যাপন করেছেন, দেশবাসীর কত অনাদর সহ্য করছেন, আর সম্পত্তি বাড়ী সব বিক্রী করে তাঁর শান্তিনিকেতনে অঞ্জলি দিয়েছেন। সেই কথাই একটু সঙ্ক্ষেপে বলি।

(দুই)

রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলেন কেন? এ একটা বড়ো রকমের প্রশ্ন। কারণ তিনি একাধিকবার উল্লেখ করেছেন,

"একেবারে গোড়াগুড়ি ইস্কুলে পড়িয়া সেই সকল জ্ঞানলাভের প্রত্যাশা করা দুরাশা। সাধারণ লোকের ভাগ্যে ইস্কুলে পড়ার সুযোগ তেমন করিয়া কখনই ঘটিবেনা। তা ছাড়া ইস্কুলে-পড়া জ্ঞান প্রকৃতির মধ্যে যথেষ্ট গভীরভাবে প্রবেশ করে না।"

তবু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা কেন? একটা কথা অবশ্য এখান থেকেই বোঝা যাচ্ছে, সাধারণ ইস্কুল তিনি তৈরী করতে চান নি, লাভের ব্যবসায় খুলতেও নয়। কারণ ১৯০১ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, তখন জন কয়েক মাত্র শিক্ষার্থী। কাজেই ইস্কুল-মালিক হওয়ার কল্পনা থাকতে পারে না। অধিকন্তু ছাত্রদের মধ্যে আবার কবির নিজেরই দুটি পুত্র—রথীন্দ্রনাথ এবং শমীন্দ্রনাথ। শ্রীযুক্ত প্রশান্ত মহালনবিশ অবশ্য বিশ্বভারতী বুলেটিনে (১৯২৮ এপ্রিল) লিখেছেন, মাত্র পাঁচ জন ছাত্র নিয়ে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তার মধ্যে শমীন্দ্রনাথের নাম নেই। ঠিক পাঁচ জন ছাত্রই কিনা বলা কঠিন, কারণ রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিখছেন,

"তিনি (ব্রহ্ম বান্ধব) তাঁর কয়েকটি অনুগত শিষ্য ও ছাত্র নিয়ে আশ্রমের কাজে প্রবেশ করলেন। তখনই আমার তরফে ছাত্র ছিল রথীন্দ্রনাথ ও কনিষ্ঠ শমীন্দ্রনাথ। আর অল্প কয়েকজনকে তিনি যোগ করে দিলেন।"

তা সে সংখ্যা যাই-ই হোক,

"তখন যে কয়টি ছাত্র নিয়ে বিদ্যালয়ের আরম্ভ হল, তাদের কাছ থেকে বেতন বা আহার্য-ব্যয় নেওয়া হত না, তাদের জীবন-যাত্রার প্রায় সমস্ত দায় নিজের স্বল্প সম্বল থেকেই স্বীকার করেছি।"

শ্রীযুক্ত মহালনবিশ ঐ প্রবন্ধেই কারণ স্বরূপ উল্লেখ করছেন, তপোবনের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আবাল্য অনুরাগ, যে-অনুরাগে তিনি ১৫ বছর বয়সেই 'বনফুল' কাব্য লেখেন। সেই তপোবন-আদর্শ জাগিয়ে বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা করা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। অনেক কারণের মধ্যে এ একটা প্রবল কারণ বটে। কিন্তু তাইই যদি একমাত্র হত, তবে স্যার গুরুদাসের বিরূপ মন্তব্য স্বীকার করে নিতে হয়। তিনি যেদিন কোনো এক বক্তৃতায় তপোবনের শিক্ষায় শ্রদ্ধা নিবেদন করেন, 'তা শুনে সেদিন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেছিলেন, এ কথাটি কবিজনোচিত, কবি এর অত্যাবশ্যকতা যতটা কল্পনা করেছেন আধুনিক কালে ততটা স্বীকার করা যায় না।'

এইসব বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের সামনে, শিক্ষাব্রতী বিদ্যাসাগর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পরে, ব্রজেন শীল, জগদীশ বোসের উপস্থিতি জেনে রবীন্দ্রনাথ যে হঠাৎ তপোবন নিয়ে এমন প্রগল্‌ভ হয়ে উঠবেন তা মনে হয় না। মনে হয়, তাঁর চিত্তের কোন-এক অনুভূতির দুইটি প্রকাশ্য রূপ ছিল তার একটি তপো-বনের আদর্শ অন্যটি শিশুজীবন। আমরা যদি সেই রূপ দুটির পথ ধ'রে তাঁর সেই অনুভূতি-তে যেতে পারি তবেই তাঁর সেই দুর্দম সত্য অনুভূতিতে পেঁছিতে পারব।

একথা বারবার মনে হয়, প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে গ্রীসের পশ্চিমে ক্রোটোনে পীথাগোরাস যে-আদর্শ নিয়ে সমাজের নাড়ী-ছেঁড়া এক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সৌভ্রাত্র-সঙ্ঘ তৈরী করতে, নিজেরই আদর্শ-কে রূপ দিতে, তেমন আত্মমুখী হয়ে রবীন্দ্রনাথ কখনই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে পারেন না ; কারণ তিনি কবি, অঙ্কের দার্শনিক নন, বিমূর্ত চিন্তা করায় তাঁর অনুরাগ বটে, বিলাস নয় ; যে-কোন রকমের সাহিত্য-কর্মই অপর মানুষকে অবলম্বন করে। এ কথা-ও বোধ হয় সত্য নয়, গ্রীসের রাজাদের হাত থেকে সম্পত্তি বাচাঁনোর জন্য গ্রীক দার্শনিক থেলিস্-এর জন্মভূমিতে বণিকসঙ্ঘ যেমন ক'রে 'মিউনিসিপ্যাল' ইস্কুল তৈরী করেছিল, তেমনি ক'রে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজের আশ্রয় থেকে পালিয়ে ভারতবর্ষীয় শিক্ষাকে পুনরুজ্জীবিত করেছি-লেন ; কারণ তা হলে তিনি শান্তিনিকেতনে পরবর্তীকালে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করতেন না। আর একথাও স্বীকার করা যায় না, জন ডিউঈ-এর মতো শিক্ষার একটি নতুন পদ্ধতির পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে-ছিলেন। কারণ শিক্ষার কোন পদ্ধতিই তাঁর কাছ থেকে আমরা পাইনি। তাঁর অনুভূতির প্রকৃতি জানতে হলে সম্পৃক্ত কয়েকটি কাহিনী পর্যালোচনা করা যেহেতু, কবির নিজের কারণ-উল্লেখ বড় জটিল, নানাভাবে উল্লেখ করতে গিয়ে কবিসুলভ নানা কারণ উত্থাপন করেছেন—যেগুলির আপাতদৃষ্টিতে অসামঞ্জস্যপূর্ণ মনে হবে। অথচ আদৌ তা নয়।

শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে একজন হেডমাষ্টার নিয়োগ করার প্রয়োজন তিনি অনুভব করেন।

"কে যেন একজন লোকের নাম করে বললে, 'অমুক লোকটি একজন ওস্তাদ শিক্ষক, যাকে তাঁর পাশের সোনার কাঠি ছুঁইয়েছেন সেই পাশ হয়ে গেছে।'—তিনি তো এলেন। কিন্তু কয়েক দিন সব দেখেশুনে বললেন, 'ছেলেরা গাছে চড়ে, চেঁচিয়ে কথা কয়, দৌড়য়, এ তো ভালো না।' আমি বললাম, 'দেখুন, আপনার বয়সে তো কখনও তারা গাছে চড়বেনা। এখন একটু চড়তেই দিন-না। গাছ যখন ডাল-পালা মেলেছে তখন সে মানুষকে ডাক দিচ্ছে। ওরা ওতে চড়ে পা-ঝুলিয়ে থাকলই-বা।' তিনি আমার মতিগতি দেখে বিরক্ত হলেন। মনে আছে, তিনি

কিণ্ডারগার্টেন-প্রণালীতে পড়াবার চেষ্টা করতেন। তাল গোল, বেল গোল, মানুষের মাথা গোল—ইত্যাদি সব পাঠ শেখাতেন। তিনি ছিলেন পাশের ধুরন্ধর পণ্ডিত, ম্যাট্রিকের কর্ণধার। কিন্তু এখানে তাঁর বনল না, তিনি বিদায় নিলেন।"

এ একটা ঘটনা, রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন। বর্তমান যুগে আমরা নার্সারী কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষা দেওয়ার জন্য কত পয়সা ব্যয় করেও ইস্কুলে স্থান পাই না, আর রবীন্দ্রনাথ হাতের কাছে অমন নিষ্ঠাবান ফ্রয়েবেলের ভক্তকে পেয়ে ছেড়ে দিলেন। রবীন্দ্রনাথ 'ফ্রয়েবল' নিশ্চয়ই পড়েছিলেন, তিনি যদি ধর্মযাজক হতেন বা 'পরিবেশ সৃষ্টি করার' প্রবক্তা হতেন তবে ফ্রয়েবেলের জ্যামিতিক রহস্যবাদ নিয়ে অবজ্ঞা করতেন না ; ফ্রয়েবেল তো প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক, আর ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক—এই তিন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য—এ সম্পর্কে বিশিষ্ট বক্তা। তবে কি রবীন্দ্রনাথ তা চান না ? রবীন্দ্রনাথ শিশু চিত্তকে কি নিয়ন্ত্রণ করতে চান না ? ক্রীড়া করাই তো আর ক্রীড়াধর্মী (Play-way method) শিক্ষা নয় ?

বিলেত থাকা কালে ১৩১৯ সনে একখানি চিঠি লিখেছিলেন যার নাম 'শিক্ষাবিধি'। রবীন্দ্রনাথ এই সময় সেখানকার ইস্কুল দেখে পড়াশুনার বিধিও জানতে চান, যাতে আমাদের দেশে তা প্রবর্তন করতে পারেন। গিয়ে দেখলেন বিধি নিয়ে সেখানে তুমুল ঝগড়া, ' এক দল বলিতেছে, চোখে-কানে ভাবে-আভাসে শিক্ষার বিষয় গুলিকে প্রকৃতির মধ্যে শোষণ করিয়া লইবার ব্যবস্থাই উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা ; আর এক দল বলিতেছে, সচেষ্ট ভাবে নিজের শক্তিকে প্রয়োগ করিয়া সাধনার দ্বারা বিষয়গুলিকে আয়ত্ত করিয়া লওয়াই যথার্থ ফলদায়ক।' বলা বাহুল্য এই দুয়ের একমতও তিনি নিতে পারলেন না। শিক্ষাবিদদের বহু ঘোষিত দম্ভোক্তি সেই মধ্যপন্থাও (ecdictic) গ্রহণ করতে পারলেন না। তিনি কি চান ?

'চিত্তের গতি-অনুসারেই শিক্ষার পথ নির্দেশ করিতে হয়।' এই স্থানে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান বোধ হয় স্বীকার করলেন। এই রকম সমাধানেই এসেছিলেন একদা পেস্টালৎজি। শিক্ষা-কে যিনি প্রথম মনোবিদ্যাসম্মত করেন বলে শিক্ষাশাস্ত্রে সাপ্টা কথা আছে ; যাঁর আকর্ষণে জার্মানীর দার্শনিক পণ্ডিত হার্বার্ট তাঁর সঙ্গে শিক্ষাকার্যে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু মনোবিদ্যা সম্মতই যদি তাঁর শিক্ষা হবে তবে তাঁর ইস্কুলের ছাত্রেরা খাওয়া আর পোষাকের প্রলোভনে এসে আবার দুদিন পর ভেগে যেত কেন ? পেস্টালৎজীর অভিজ্ঞতা না-থাকতে পারে, কিন্তু ভারতবর্ষের রবীন্দ্রনাথের তো থাকবার কথা নয়। কারণ হিন্দু যুগেই দেখা গেছে ছাত্রেরা নানা উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ে আসত, তার মধ্যে

খাওয়া-পাওয়ার প্রলোভনেও। রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন, অত সহজ পথে মানুষের চিত্ত চলে না। ঐ উদ্ধৃত বক্তব্যেরই পূর্ণ অংশ,

"কিন্তু যেহেতু গতি বিচিত্র এবং তাহাকে সকলে স্পষ্ট করিয়া চোখে দেখিতে পায় না, এইজন্যই কোনোদিনই কোনো একজন বা এক দল লোক এই পথ দৃঢ় করিয়া নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারে না। নানা লোকের নানা চেষ্টার সমবায়ে আপনিই সহজ পথটি অঙ্কিত হইতে থাকে। এইজন্য সকল জাতির পক্ষেই আপন পরীক্ষার পথ খোলা রাখাই সত্য পথ আবিষ্কারের একমাত্র পন্থা।"

রবীন্দ্রনাথ মনের এই বিচিত্র গতিকে স্বীকার করতেন। কারণ তাঁর জীবনে এইটিই ঘটেছিল। তিনি ছেলেদের মন জানতেন বলেই, তাদের মন নিয়ে কোন নক্সা করতে যান নি। ইয়োরোপে পদ্ধতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে গিয়ে তাঁর শিশু সম্পর্কে যে জ্বলন্ত বোধ ছিল, অনুভূতির সুদর্শন চক্র ছিল, তাতে সব কিছু মালিন্য ঠিকরে দূরে চলে গেল। তিনি আবার সহজ হলেন। অনেক শিক্ষাবিদই বলেন, নানা পদ্ধতি আলোচনা ক'রে তাঁরা বিভ্রান্তই হয়ে পড়েন। শিশু পর্যবেক্ষণের নানা সূত্র যেন হঠাৎ জেগে উঠে কিল্‌বিল করতে থাকে। জ্ঞানের যে দুর্বিষহ জ্বালা আছে তা তাঁরা হাড়ে হাড়ে যেন টের পান। মনে হয়, গাছের কতগুলো পাতাকে নিয়ে এক রকমের পিঁপড়ে বাসা করে, যা বাইরে থেকে টের পাওয়া যায় না, অথচ হাত দিলেই সর্বাঙ্গ দিয়ে তাদের এমন চলাচল সুরু হয় যে যখন তারা দংশন করতে সুরু করে তখন যেন নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। কণ্ডুয়নে শরীরের চেতনা অন্তত ফিরে আসে, এ যেন তেমনি।

তাঁদের এই জুগুপ্সা স্বাভাবিক। কিন্তু বিজ্ঞানের এই নিন্দুকেরা যে খুব ভালোমানুষ তা-ও কিন্তু নন। কারণ তাঁরা অচেতন। তাঁরা কি চান তা জানেন না। শিক্ষা দিতে গেলেই একটা নক্সা বা পরিকল্পনা চাই। শিক্ষাকে আমরা একটি কাজ ব'লে স্বীকার করে নিয়েছি, রবীন্দ্রনাথ বর্ণিত ফ্রয়েবল-জানা হেডমাস্টারেরই মতো। কাজেই, আমরা ছাত্রকে সমাজ চাহিদা মতো হয় ইঞ্জিনীয়ার, ডাক্তার করব, অথবা আমেরিকার ভাষায় 'সুনাগরিক' ক'রে তুলব। আমরা শিশুর জীবনের দাবীকে স্বীকার করি না। তাকে 'সুনাগরিক' ক'রে গড়ে তুলতে হলে 'নাগরিকতার' যে বৈশিষ্ট্য আছে তা ভাগ ক'রে,তার প্রত্যেকটি উপাদানের সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে শিশু তথা মানুষের মানসিক উপাদান গুলিকে পাকিয়ে পাকিয়ে একটি শক্ত দড়ি ক'রে তুলে সমাজের-খালাসীদের হাতে দেব যাতে সমাজ রূপ জাহাজটাকে বেঁধে ফেলা যায়। আমরা জানি সমাজ চলিষ্ণু, কিন্তু চলমান সমাজকে যদি একান্ত রকমে স্বাধীন ক'রে দিই, তবে সমাজটা

একটা নাগর-দোলা হয়ে উঠবে। অতএব সমাজকে বর্তমানের জন্য বাঁধতেই হবে। একেই বলে শিক্ষা।

রবীন্দ্রনাথ শিশুদের তাই শিক্ষা দিতে চান নি। রবীন্দ্রনাথ তাদের প্রতি মুহূর্তকে স্বীকার করেছেন। তাঁর কাব্য দর্শনের একটা সূত্র পাওয়া যায় যে, তিনি কোন 'ক্ষণ'কে বিচ্ছিন্ন কাল মনে করতেন না, কোন ক্ষণ ক্ষণসর্বস্ব নয়, সে মহাকালের একরকমের দৃষ্টি :

> চকিত ক্ষণিক আলোছায়া তব আলিপন আঁকিয়া যায়
> ভাবনার প্রাঙ্গণে ॥

সেই ক্ষণ পূর্ণ করতে নাইবা পারল, কিন্তু শূন্য রেখে যায় না। সেই স্পর্শেই হৃদয় কেমন করে খুলে যায় কেউ জানে না। এমন ক্ষণের জন্য অপেক্ষা করতে হয় না, হৃদয় উন্মুক্ত রাখতে হয়। রবীন্দ্রনাথ তাই শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর সক্রিয় মতটি বলেছেন,

> 'শিক্ষা হবে প্রতিদিনের জীবনযাত্রার নিকট অঙ্গ, চলবে তার সঙ্গে এক তালে এক সুরে, সেটা ক্লাসনামধারী খাঁচার জিনিস হবে না। আর যে বিশ্বপ্রকৃতি প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ ভাবে আমাদের দেহে মনে শিক্ষাবিস্তার করে সেও এর সঙ্গে হবে মিলিত। প্রকৃতির এই শিক্ষালয়ের একটা অঙ্গ পর্যবেক্ষণ আর একটা পরীক্ষা, এবং সকলের চেয়ে বড়ো তার কাজ প্রাণের মধ্যে আনন্দ-সঞ্চার। এই গেল বাহ্য প্রকৃতি। আর আছে দেশের অন্তঃপ্রকৃতি। তারও বিশেষ রস আছে, রঙ আছে, ধ্বনি আছে।'

এই উক্তির শেষের দিকটি হয়ত অনেকে অমনোযোগের সঙ্গে পড়েন, তাই তাঁরা বিতর্ক তোলেন 'জীবন যাত্রা' মানেটা তা হলে কি প্ল্যানের মধ্যে এল না ? তাহলে পরিভাষা-বিবর্জিত একটি লেখা তুলতে হয় :

> "আমার আকাঙক্ষা হ'ল, আমি ছেলেদের খুশি করব, প্রকৃতির গাছ-পালাই তাদের অন্যতম শিক্ষক হবে, জীবনের সহচর হবে--এমনি ক'রে বিদ্যার একটি প্রাণনিকেতন নীড় তৈরি করে তুলব।"

ছেলেদের তিনি খুশী করতে চেয়েছেন, শিক্ষা দিতে নয়। পাখীর ছানা স্বাভাবিক ভাবে মা-বাপের কাছ থেকে একটু উড়তে শিখেই স্বাধীন হয়ে যায়, কেবল স্বাধীনই নয় স্বাধীন আনন্দ উপলব্ধি করে। ক্ষণিক দিনের আলোকে ক্ষণিকই গান গেয়ে ওঠে, সেই তার জীবনের তৃপ্তি, সেইটুকু তার জীবনের বৃহৎ ক্ষেত্রে যাত্রা সম্পাদন করে। বয়সের স্বভাব ধর্মকে লালন করাই রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা।

একটা কথা উঠতে পারে, তবে কি এই-ই শিক্ষা-গবেষকদের Developmental task ? প্রত্যেক বয়সের চাহিদা মিটিয়ে মিটিয়ে শিক্ষা দিয়ে পূর্ণ মানুষ তৈরী করা ?

Developmental task নয়। কারণ ওটি হচ্ছে কারিগরি, লালন করা নয়। গরম জল টুক-টুক ক'রে তুলে শিশু পরিচর্যা করতে হয় বটে, কিন্তু সূর্যের আলোক খানটুক তুলে এনে সহানো যায় না। বয়সের ধর্মের ঐ সূর্যের আলোর মতোই ব্যাপকতা আছে, তার সান্নিধ্যই এই বয়োধর্ম মানা। যাঁরা developmental task মেনে শিশু তৈরী করেন, তাঁদেরই বলা হয় মানুষ গড়া কারিগর। শিক্ষকের কাজ নাকি মানুষ-গড়া। মানুষ মানুষকে গড়ছে এমন অপমানকর কথা আর হয় না। কিন্তু যুগের এমনই বিকৃত দাবী হয়ে পড়েছে যে, এমন ভাষাও তৈরী করতে হল।

রবীন্দ্রনাথ যদি নক্সাহীন কেবল লালনই করতে চেয়েছেন তবে শান্তি-নিকেতনে কলাভবন, সঙ্গীতভবন, বা নাটকানুষ্ঠান প্রভৃতি চালু ক'রে শিশুদের সুপ্ত চিত্তবৃত্তিকে বিকাশ ঘটাতে গেলেন কেন্? কেনই বা এই Co-curricular বা অনুষ্ঠানগত কার্যক্রমের প্রবর্ত্তনা?

সেগুলিও 'কোকারিকুলার' বা অনুষ্ঠানগত কার্যক্রম নয়। যেমন গাছ-পালা তরুলতা শিক্ষক, তেমনি এগুলিও; কি অর্থে?

"এখানে ছেলেরা জীবনের আরম্ভকালকে বিচিত্র রসে পূর্ণ করে নেবে, এই আমার অভিপ্রায় ছিল। প্রকৃতির সঙ্গে নিত্যযোগে গানে অভিনয়ে ছবিতে আনন্দরস আস্বাদনের নিত্যচর্চায় শিশুদের মগ্ন চৈতন্যে আনন্দের স্মৃতি সঞ্চিত হয়ে উঠবে, এইটেকেই লক্ষ্য করে কাজ আরম্ভ করা গেল।"

'মগ্নচৈতন্য' এবং 'আনন্দের স্মৃতি সঞ্চিত' কথা দুটি অস্পষ্ট হতে পারে বলে আরও স্পষ্ট করে বললেন,

'এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করবার আমার প্রথম উদ্দেশ্য ছিল, বাঙালির ছেলেরা এখানে মানুষ হবে, রূপে রসে গন্ধে বর্ণে চিত্রে সংগীতে তাদের হৃদয় শতদলপদ্মের মতো আনন্দে বিকশিত হয়ে উঠবে।

এ 'বিকাশের' রূপ আরও পরিষ্কার হবে যদি পড়ি,

"এখানকার এই বাঙালির ছেলেরা তাদের কলহাস্যের দ্বারা আমার মনে একটি ব্যাকুল চঞ্চলতার সৃষ্টি করল। আমি স্তব্ধ হয়ে বসে এদের আনন্দপূর্ণ কণ্ঠস্বর শুনেছি। দূর থেকে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার মনে হয়েছে যে, এই আনন্দ, এ যে নিখিল মানব-চিত্ত থেকে বিনিঃসৃত অমৃত-উৎসের একটি ধারা। আমি এই শিশুদের মধ্যে সেই স্পর্শ পেয়েছি।"

আইনস্টাইনের চতুর্মাত্রিক-রূপের ছবি কেমন আমার জানা নেই। কিন্তু মনে করা যাক, একটি মাছ (গবেষণাকারীদের বাক্সের মাছ নয়) সেই অসীম জলরাশির অভ্যন্তর প্রদেশ দিয়ে সঞ্চরণ করছে। জলরাশি থেকে তার কিরূপ স্মৃতি সঞ্চিত হতে পারে? শিশুকে তেমনি এই অবস্থার মধ্যে স্থাপন করতে

চান। বিশ্বের সামগ্রিক অবস্থার মধ্যেই শিশু। তাকে চয়ন ক'রে পৃথক ক'রে এনে শিক্ষা দেওয়া মানুষের আদর্শ শিক্ষা তাঁর কাছে নয়।

রবীন্দ্রনাথ নিজে অনুভব করেছেন, শান্তিনিকেতনে যাঁরা কাজ করেছেন তাঁদের মধ্যেও অনেকে তাঁর শিক্ষার আদর্শকে ধরতে না-পেরে শিক্ষার বহিরঙ্গ দেখেই কি-কি পদ্ধতি চলছে সেখানে তা পুঁথি-পুস্তক থেকে প্রমাণ সহকারে তাঁরা উদ্ধৃত করেছেন ;

"এমন কি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত হয়ে রয়েছেন তাঁরাও অনেকে ভিতরের সত্য-মূর্তিটিকে না দেখে এর পদ্ধতি অনুষ্ঠান উপকরণ-সংগ্রহ প্রভৃতি বাহ্য রূপটিকে দেখছেন, সেখানে আপনার অধিকার নিয়ে আক্ষেপ করছেন। এর কারণ হচ্ছে যে, আমি যে ভাবটিকে প্রকাশ করতে চাই বর্তমান কালে সকলের চিত্ত সেদিকে নেই। তাঁরা কতকগুলি আকস্মিক ও আধুনিক চেষ্টায় নিযুক্ত আছেন, বড়ো প্রয়োজনের সমাদর করতে তাঁদের মন চাচ্ছে না। কিম্বা হয়ত আমার নিজের অক্ষমতা ও দুর্ভাগ্য এর কারণ হতে পারে।"

তাঁর প্রাপ্তি অবশ্য ঘটেছিল,

"তৎসত্ত্বে আমি আমার বিদ্যালয়ের ছেলেদের মধ্যে যে আনন্দের ছবি, যে স্বাধীন বিকাশের প্রমাণ পেয়েছি তাতে নিশ্চিত জেনেছি যে, এরা এখান থেকে কিছু পেয়েছে।"

তাঁর মতে,

"তাদের বিদ্যার কী মার্কা মারা হল এটাই সবচেয়ে বড়ো কথা নয় ; কিন্তু তাদের চিত্তের পেয়ালা বিশ্বের অমৃতরসে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে, আনন্দে উপচে উঠেছে, এই ব্যাপারটি বহুমূল্য। এই হাসি-গান আনন্দে গল্পে ভিতরে ভিতরে তাদের মনের পরিপুষ্টি হয়েছে।"

সেই জন্যই তৃপ্ত রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

"ভাষা কি ইতিহাস কি ভূগোল নূতন উৎকৃষ্ট প্রণালীতে কী শিখিয়েছি না-শিখিয়েছি জানিনে, কিন্তু যে-জিনিসটাকে কোনো বিদ্যালয়ে কেউ অত্যাবশ্যক বলে মনে করে না, অথচ যা সবচেয়ে বড়ো জিনিস, আমাদের বিদ্যালয়ে তার স্থান হয়েছে মনে করে আনন্দে অন্য সকল অভাব ভুলে ছিলুম।"

বর্তমান বিশ্ব সংসার-যাত্রাকেই জীবনযাত্রা বলে। সংসারে বিষয়বুদ্ধি সঞ্চয় করতে না পারলে সে মানুষ হিসাবে অভিহিত হয় না। সার্থকনামা নয়। শিক্ষায় তাই লক্ষ্য হচ্ছে এই, ইস্কুল-কলেজ জীবন শেষে বয়স্ক মানুষের সমাজে এসে রুজি রোজগার করে অপরকে তাক লাগিয়ে দেবে। যারা দরিদ্র, সবার পেছনে না হলেও সার্থকানামাদের কল্যাণে তারা শ্রম দেবে, কারণ তাদের শিক্ষা নিশ্চেষ্ট শিক্ষা, আর এদের সক্রিয়। ইতিহাসের আলো-আঁধারি যুগের কথা মনে করা না-গেলেও ইতিহাসের কৃত্রিম আলোয় অত্যুজ্জ্বল সেই গ্রীসের শিক্ষাব্যবস্থায় এই কথাই দেখা গেছে ; তৎপূর্বে মিশরের শিক্ষায়তনেও লিপি-

করদের মর্যাদায় সেই চিত্রই পরিস্ফুট। বৈদিক যুগে ভারতবর্ষে অবশ্য বণিক-বর্জন শিক্ষা থাকলেও, বণিকদের মহাজনী-পাঠশালার সৌভাগ্য দর্শনে ব্রাহ্মণদের সেই শিক্ষানীতি হয়ত সাধারণ মানুষ মেনে নিতে পারে নি, যার জন্যে হিন্দু যুগে দেখতে পাই পাঠক্রমের সম্প্রসারণ, বৃত্তিশিক্ষার দিকে ঝুঁকে পড়েছে শিক্ষা কার্যক্রম। ইয়োরোপেও চার্চের সম্পদ-প্রসবিনী শিক্ষা ছিল মন্থর এবং ফল-ভোগীরা সংখ্যালঘু; আর তাই বণিক সঙ্ঘের শিক্ষার গা বেয়ে শিল্পপতিদের শাহরিক শিক্ষা এমন বিপর্যয় কাণ্ড বাধিয়ে দিল যাতে ধর্মযাজক এবং রাজা আর শিক্ষাকে দখল ক'রে থাকতে পারল না; সামাজিক মর্যাদার নতুন মোহ সর্বস্তরের মানুষকে ক'রে তুলল তরুণ গরুড় সম, শিক্ষা গণতান্ত্রিক হল। সেই মহাজনী গণতান্ত্রিক শিক্ষার যুগই তখন ভারতবর্ষে। ১৮৮১ সালে হাণ্টার সাহেবের নেতৃত্বে কমিসন বসে গেছে, ১৯০৪ এর শিক্ষা আইনেরও লগ্নক্ষণ।

এই রকম অবস্থায় জগতের ইস্কুলের কাজকর্মের উদ্দেশ্য মোটামটি ছয় রকমের হতে পারে; (১) পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার শিক্ষা, (২) সমাজ ও ব্যক্তির অখণ্ড মন তৈরী করার হাতে খড়ি, (৩) ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য যাতে বোঝা যায় তার পথ নির্দেশ করা, (৪) বিষয় সম্পর্কে অধিক জ্ঞান সঞ্চয় করবার সুযোগ, (৫) কোন্ বিষয় কে পড়বার উপযুক্ত তা নির্বাচন করা, (৬) সমাজের কোন্ কাজে কার যাওয়া উচিত তার উপদেশ দেওয়া। এই সব কারণেই বিভিন্ন ধরণের সিঁড়িওয়ালা ইস্কুল থাকবে, নার্সারী, প্রাইমারী, জুনিয়ার হাই, হাইয়ার সেকেণ্ডারী, ইউনিভার্সিটি। বিষয় সচেতন হওয়ার বেশ বৈজ্ঞানিক স্তর রয়েছে। সে অবস্থায় রবীন্দ্রনাথের এই আনন্দ-ক্ষেত্রে ছেলেরা জেনেশুনে পড়তে আসবেই বা কেন, আর তাকে আমরা আদর্শ শিক্ষা বলবই বা কেন।

রবীন্দ্রনাথ এই বিঘ্ন-সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন। তিনি সে চেষ্টা করেন নি। তিনি চাননি ভারতবর্ষের সর্বত্র এই ধরণের ইস্কুল হোক।

'বর্তমান কালে এখনি দেশে এইরকম তপস্যার স্থান, এই রকম বিদ্যালয় যে অনেকগুলি হবে, আমি এমনতরো আশা করিনে।'

তিনি শুধু দেখতে চেয়েছেন কালের আক্রমণে যা তস্থির হয়ে থাকল তাকে রূপ দেওয়া যায় কিনা। তিনি তাই গুটিকতক ছাত্রকে নিয়েই সুরু করলেন। যাদের অভিভাবক প্রস্তুত থাকবে এই রকম শিক্ষা গ্রহণ করতে তাদের ছেলেরাই আসবে। ছেলেদের মুনি-ঋষি করবার তাঁর উদ্দেশ্য নয়; তাদের খুশী করা। তিনি সফলকাম হয়েছিলেন। মানুষের চিত্তে সম্পদকর্ষণার বেগ এসেছে বলেই তা তাঁর কাছে সত্য নয়, তাকে স্বীকার করে নেওয়া যায় না। তাঁর কথা,

'এই রকম আন্তরিক জিনিসটার বাজারদর নেই বলেই এর অভাব সম্বন্ধে মানুষ স্বচ্ছন্দে নিশ্চেতন থাকে সেরকম বেদনাহীন হতভাগ্য যে কৃপাপাত্র তা অন্তর্যামী জানেন। সংসার-যাত্রায় সে যেমন কৃতকৃত্য হোক, মানবজন্মের পূর্ণতায় সে চিরদিন থেকে যায় অকৃতার্থ।'

আরও স্পষ্ট করে বলেছেন,

'সেইদিনই আমি প্রথম মনে করলেম, শুধু মুখের কথায় ফল হবে না : কেননা এসব কথা এখনকার কালের অভ্যাসবিরুদ্ধ।'

জীবিকার লক্ষ্যকেই তিনি শিক্ষার লক্ষ্য বলে মেনে নিতে পারেন নি ;

'জীবিকার লক্ষ্য শুধু অভাবকে নিয়ে, প্রয়োজনকে নিয়ে; কিন্তু জীবনের লক্ষ্য পরিপূর্ণতাকে নিয়ে—সকল প্রয়োজনের উপরে সে।'

তিনি তাই পরীক্ষার পাসের কথা ভাবেন নি,

'তারা বেশি পাসমার্কা পেয়ে ভালো করে পাস করবে এ লোভ ছিল না—তারা আনন্দিত হবে, প্রকৃতির শুশ্রূষায় শিক্ষকের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তায় পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হবে এই ইচ্ছাই মনে ছিল।'

অভিভাবকদের প্রতি তাঁর সন্দেহ ছিল,

'অভিভাবকেরা হয়ত তা বুঝবেন না, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষকেরা হয়তো তার জন্য পাশের নম্বর দিতে রাজি হবেন না।'

ছেলেরা এখানে বিকশিত হবে অর্থ প্রকাশিত হবে। এই দুটির কোন শব্দই ইংরেজির Development এবং Expression এর প্রতিশব্দ নয়।

'প্রকাশ হচ্ছে আপনাকে দান। আপনাকে দিতে গিয়ে তবে আপনাকে প্রকাশ করি, আপনাকে জানতে পাই।'

বিশ্বচিত্তের সঙ্গে যোগ রেখে এই প্রকাশ ঘটবে, বিচ্ছিন্ন করে নয়।

'বিশ্বপ্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে যে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা আছে, তাতে করে শিশুচিত্তের বিষম ক্ষতি হয়েছে।'

শিশুচিত্তের তাহলে কি প্রয়োজন ?

'প্রকৃতির সাহচর্যে তরুণ চিত্তে আনন্দ সঞ্চারের দরকার আছে, বিশ্বের চারি দিককার রসাস্বাদ করা ও সকালের আলো সন্ধ্যার সূর্যাস্তের সৌন্দর্য উপভোগ করার মধ্য দিয়ে শিশুদের জীবনের উন্মেষ আপনার থেকেই হতে থাকে। আমি চেয়েছিলুম যে তারা অনুভব করুক যে, বসুন্ধরা তাদের ধাত্রীর মতো কোলে করে মানুষ করেছে।'

তবে একটা বিপদ আছে। শিশুদের চিত্তবৃত্তির এই দিকটি যত সুন্দর, তার সমগ্র চিত্তবৃত্তি এত সুন্দর না-ও হতে পারে। শিশুদের মধ্যে মানুষের সব

চিত্তবৃত্তিই তো আছে। সবগুলিকে তো সমর্থন করা যায় না। জগতের অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদরা তাই চরিত্রশিক্ষার একটি বড় মাপকাঠি দিয়েছেন যে সমাজ অনুমোদিত চিত্তবৃত্তিকেই উৎসাহ দেওয়া হবে, অন্যগুলিকে সমূলে উৎপাটন করা উচিত, অথবা নরম ক'রে বলতে হলে—উদ্‌গতি বা Sublimation-এর প্রক্রিয়ায় যাওয়া উচিত। নতুবা অনেক আবিলতা অনেক মালিন্য এসে পড়তে পারে।

এ সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথের মত বড় স্পষ্ট :

'সকলেই জানেন, আমি মানুষের কোনো চিত্তবৃত্তিকে অস্বীকার করি না। বাল্যকাল থেকে আমার কাব্য সাধনার মধ্যে যে আত্মপ্রকাশের প্রবল ইচ্ছা জাগ্রত ছিল মানুষের সকল চিত্তবৃত্তির' পরেই তার ছিল অভিমুখিতা। মানুষের কোনো চিৎশক্তির অনুশীলনকেই আমি চপলতা বা গাম্ভীর্যহানির দাগা দিইনি।'

তিনি স্বর্গলোক চান নি, আর,

'এমনতরো স্বর্গলোক কেউ রচনা করতে পারে না যার মধ্যে কোনো কলুষ নেই, দুঃখজনক কিছু নেই ;......চোখের পাতা ওঠে, চোখের পাতা পড়ে ; কিন্তু পড়াটাই বড়ো নয়, সেটাকে বড়ো বললে অন্ধতাকে বড়ো বলতে হয়।'

যাঁরা শিক্ষা-ইতিহাসের সাধারণ ছাত্র, পৃথিবীর ইস্কুলের বিবর্তন ও ইতিবৃত্তের সামান্য খোঁজ খবরও যাঁরা রাখেন তাঁরাই জানেন, এই 'চরিত্র গঠন' যুগে যুগে কত রকম ব্যাখ্যা আর পদ্ধতিই না নিয়ে এল তবু এমন শিক্ষাপদ্ধতি আজ পর্যন্ত দেখা গেল না যাতে চরিত্র একেবারে লোহার মতো সবল হয়ে দাঁড়িয়েছে। Aldous Huxley-এর 'Ends & Means' বইয়ে লেখক এই বিভ্রান্তিকর চরিত্র সংজ্ঞা নিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন ওবস্তুটি কি, আমরা ইস্কুলে কি চরিত্র গঠন করতে চাই আর তার বাইরে কি রয়েছে ; Laski-র The American Democracy-এর মধ্যে শিক্ষা-পরিচ্ছেদ যিনি পড়েছেন তিনিই জানেন ও জিনিসটি একেবারে যেন একটা কথার কথা মাত্র। তা এইই যদি হয় চরিত্র গঠনের রাস্তা সেক্ষেত্রে সমগ্র মানুষটাকে স্বীকার করাই তো ভালো। কবি তাই সমগ্র মানুষটিকেই গ্রহণ করলেন। তিনি কবি, ছায়া আর কায়া উভয়কেই তিনি সুন্দর করে দেখেন। তাঁর কবিজীবন এই দার্শনিক জীবনকেই সৃষ্টি করল।

এই সমগ্র মানুষ শহরে পাওয়া যাবে না। শহরের এমন এক রূপ যে তাকে কতগুলো জ্যামিতির সরলরেখা ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। সেখানে তার জীবন রকেটের মতো নিমেষে যেন পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণকে অস্বীকার করে উড়ছে। এর জন্য শহরের বাইরে আসতে হবে, অথচ রুশোর নির্দেশিত সমাজকে ছেড়ে নয়।

এই সঙ্গে আর একটি দর্শনও তাঁর মনে দেখা দিল। সে হচ্ছে মানুষের চিত্ত প্রসারের পরিক্রমণ পথ। এই পথটি তিনি 'শান্তিনিকেতন' ১ম খণ্ডে প্রকাশ করেছেন,

"আমাদের তিনটে অবস্থা দেখতে পাই। তিনটে বড়ো বড়ো স্তরে মানবজীবন গড়ে তুলছে, একটা প্রাকৃতিক, একটা ধর্মনৈতিক একটা আধ্যাত্মিক।"

তিনি যদি এই জীবন-পরিক্রমাকেই বুঝে থাকেন তবে তাঁর বিদ্যালয়ের পক্ষে দরকার ইঁট-কাঠ-চূণ-সুরকীর বাইরে একটি গাছপালা-ঘেরা উদার অঙ্গন। শান্তিনিকেতনের কথা তখন তাঁর মনে হল।

প্রকৃতির সাহচর্যে মানুষের হৃদয়-কুসুম উন্মেষিত হয় কি করে—সেই পথটি দেখতে তিনি বের হলেন। শৈশব থেকে সাহিত্য নিয়ে তাঁর মনঃসংযোগ, কলকাতার বাইরে বলতে পেনেটির বাগানে গেছেন, হিমালয়ের অন্তরে গেছেন। শান্তি আর প্রকৃতি এই দুটি বস্তু তাঁর শূন্য মনকে একদা ভ'রে তুলেছিল। সংস্কৃত সাহিত্যে, উপনিষদের রোমান্টিকতায় তাঁর স্বভাবতই তপোবনের আদর্শের কথা মনে হল। ভারতবর্ষের ইতিহাস তাঁর অধ্যয়ন করা ছিল। অতি কাছাকাছি দুটি যুগ তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। ইংরেজের বণিকীসভ্যতা এবং 'যোয়ান বর্তমান' তার জন্য দায়ী; আর তৎপূর্বেকার মুসলমান যুগ সম্পর্কে তখনও ইতিহাস অপরিণত। তার ফলে কিছু কল্পনা, কিছু সাহিত্য আর কিছু ঘটনা এই তিনটি গুণ মিলে তাঁকে হিন্দু-বৌদ্ধযুগের প্রতি আকৃষ্ট করে। তাঁর কবিতাতেও দেখতে পাই, নগর সম্পর্কে তাঁর কালিদাস বা হিন্দুযুগের নগরই হাতছানি দিয়েছে বেশি। উজ্জয়িনী প্রদেশ, রেবা-গঙ্গা, রাজকুমার আর ঘোড়া। ভুল ক'রে কালিদাস এযুগে জন্মেছেন তা নয়, বাস্তব সহর থেকে পালানোর উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের শরণাপন্ন হয়েছেন নিরুপায় হয়ে। রবীন্দ্রনাথের এই তপোবন তাই রোমান্টিক তপোবন, বা বলা যেতে পারে, তপোবন-আদর্শ। খাঁটি বাঙলায় যাকে বলে 'আদল'।

"তখন আমার মনে একটি দূরকালের ছবি জেগে উঠল। যে তপোবনের কথা পুরাণ কথায় পড়া যায় ইতিহাস তাকে কতখানি বাস্তব সত্য বলে গণ্য করবে জানি না। কিন্তু সে বিচার ছেড়ে দিলেও একটা কথা আমার নিজের মনে হয়েছে যে, তপোবনের শিক্ষা প্রণালীতে খুব একটা বড়ো সত্য আছে। যে বিরাট বিশ্বপ্রকৃতির কোলে আমাদের জন্ম তার শিক্ষকতা থেকে বঞ্চিত বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলে মানুষ সম্পূর্ণ শিক্ষা পেতে পারে না।......তাই আমার মনে হয়েছিল যে, তখনকার দিনে তপোবনের মধ্যে মানবজীবনের বিকাশ একটি সহজ ব্যাপার ছিল বটে, কিন্তু তার সময়টি এখনও উত্তীর্ণ হয়ে যায় নি।"

তবু এতো ভাবলোকের কথা, তাঁর সে সম্পর্কে দ্বিধা যে না ছিল তা নয়,

'এই আইডিয়ালের সঙ্গে এখনকার কালের যোগ নেই, এই কথা অনুভব করেছিলাম বলেই

আমি বিশ বছর পর্যন্ত নিভৃত কোণে ছিলুম। এত গোপনে আমি কাজ করে গেছি যে, আমার পরমাত্মীয়েরাও জানেন নি, বোঝেন নি।'

এইভাবে তিনি তপোবনের আদর্শকে গ্রহণ করলেন। শহরের জনতার মধ্যে নির্জনতা, সমাজবিমুখ স্বার্থপরতন্ত্র, কল্পনাভীরু আশুবিলাসের অভিলাষী মন, রৈখিক বিষয়বোধের দুর্বার গতি তাঁকে এমন একটি জীবনের আভাস দিয়েছে, তাঁর যাত্রায় শৈশব থেকে অভ্যস্ত করেছে যে সেইটি অন্য শিশুদের উপভোগ করাতে চান; আর, মানুষের জীবন-পরিক্রমার নিজস্ব অভিজ্ঞতালব্ধ দর্শন তাঁকে শান্ত পরিবেশ এবং সমগ্র পরিবেশ গঠন করতে তপোবনের আলোর সন্ধান দেয়। শিশুদের তপস্বী করবার অভিপ্রায়ে তিনি বিদ্যালয় খোলেন নি, তপোবন সৃষ্টি করতে হবে বলেই তিনি বোলপুর বেছে নেন নি।

অন্যান্য মানবজাতির ইতিহাসে তাদের অরণ্য বাস তিনি পর্যালোচনা করেছেন, কিন্তু তাতে 'শান্তি'-কে খুঁজে পান নি। আদিমবাসীদের অরণ্য-শিক্ষা, মণ্ডলগৃহ, এবং গোষ্ঠ ও শিবির শিক্ষায় তিনি পশ্চাৎ আবর্তন করতে চান নি। কারণ, তাদের শিক্ষায় ধর্মনৈতিক আর আধ্যাত্মিক স্তর অতিক্রম করবার প্রচেষ্টা নেই।

তাঁর শিক্ষায় ধর্মের স্থান, আধ্যাত্মিকতার কথা আছে, কিন্তু শিশুদের ঐ দুটি স্তরে প্রবলগতিতে নিতেই হবে এমন চিন্তা করেন নি। প্রথম স্তরটি তিনি তাদের জন্য রাখলেন, আর অন্য দুটি স্তরের পথ খোলা রাখবার জন্য সচেষ্ট হলেন। এই পথই হল শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের করণীয় দিক, নিয়ম-বন্ধন। এই 'আচরণ' সম্পর্কে অজিতকুমার চক্রবর্তীর লিপি থেকে যেটুকু শ্রীযুক্ত মহালনবিশ উদ্ধৃত করেছেন পূর্বের উল্লেখিত বুলেটিনে—সেইটুকুতেই বেশ স্পষ্ট। তারপর রবীন্দ্রনাথের 'শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম' পুস্তিকায় নিয়মবন্ধন আর একটু দৃঢ় করলেন। কিন্তু পরেই আবার যোগ করলেন,

"কিন্তু প্রধানত নিয়মের সাহায্যেই বিদ্যালয়-চালনার প্রতি আমার বিশেষ আস্থা নাই। কারণ, শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়টি পড়া গিলাইবার কলমাত্র নহে।"

অন্যত্রও লিখেছেন,

'আমার কবিপ্রকৃতি বলেই হয়তো, কনস্টিট্যুশন, নিয়মের কাঠামো—যাতে প্রাণধর্মের চেয়ে কৃত্রিম উপায়ের উপর বেশি জোর, তা আমি বুঝতে পারিনে; সৃষ্টির কার্যে এটা বাধা দেয় বলেই আমার মনে হয়। যাই হোক—'

ঐ 'যাই হোক' শব্দটি মনে রাখবার মতো।

শেষের দিকে তিনি দেখেছেন, শান্তিনিকেতনে তাঁর শিক্ষার তত্ত্ব থেকে অনেক সরে এসেছে। তাতে তিনি হতাশ হন নি। প্রথম কারণ তিনি জানতেন

সমগ্র সমাজ যদি এই ভাবকে উপাসনা না করে তবে তার ঢেউ এখানে লাগবেই। সার গুরুদাসও এইজন্য তাঁকে নিরুৎসাহ করেছিলেন। তাঁর আত্মীয় স্বজনেরাও তাঁর প্রস্তাবে এই জন্যই বাধা দিয়েছিলেন কারণ শহরের আবিলতা শান্তিনিকেতনকে নষ্ট করবেই। এই বাধার কথা তাঁর সর্বক্ষণ মনে ছিল বলেই তিনি হতাশ হন নি। দ্বিতীয় কারণ, যতই সরে যাক তিনি অনুভব করেছেন, তাঁর মূল আদর্শ অক্ষুন্ন আছে। ১৩২৬ এর আষাঢ় মাসে বলছেন,

"কিন্তু আধুনিক কালে এত উজান-পথে চলা সম্ভবপর নয়। কোনো একটা ব্যবস্থা যদি এক যায়গায় থাকে এবং সমাজের অন্য যায়গায় তার কোনো সামঞ্জস্যই না থাকে তা হলে তাতে ক্ষতি হয় এবং সেটা টিঁকতে পারে না। সেই জন্যে এই বিদ্যালয়ের আকৃতি-প্রকৃতি তখনকার চেয়ে এখন অনেক বদল হয়ে এসেছে। কিন্তু হলেও, সেই মূল জিনিসটা আছে।"

কিন্তু এই আদর্শও বোধ হয় অক্ষুন্ন থাকে নি। ১৩৪৭ সালে তিনি আবার বলছেন,

'সে দিনের সে আয়োজন অন্ধ-অনুষ্ঠানের দ্বারা ম্লান ছিল না, অপমানিত ছিল না অভ্যাসের ক্লান্তিতে।......প্রথম যে আদর্শ বহন করে এখানে এসেছিলুম, আমার জীর্ণ শক্তির অপটুতা থেকে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে দৃঢ় সঙ্কল্পের সঙ্গে নিজের হাতে বহন করবার আনন্দিত উদ্যম কোথাও দেখতে পাচ্ছিনে। মনে হয়, এ যেন বর্তমান কালেরই বৈশিষ্ট্য। সব কিছুকে সন্দেহ করা, অপমান করা, এতেই যেন তার স্পর্ধা।'

সমগ্র সমাজকে বদল করবার জন্য যে-শিক্ষা দরকার তার জন্য আর একজন মহাপুরুষের প্রয়োজন ছিল, এবং আমরা তা পেয়েছিও। মহাত্মাজীর বুনিয়াদি শিক্ষা। কিন্তু তিনিও হয়ত 'কাল'-কে ফেরাতে পারেন নি। এই দুই জনের শিক্ষা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক ক্রমে সুন্দর তুলনামূলক আলোচনা করেছেন আর একজন কবি অথচ শিক্ষাবিদ শ্রীযুক্ত সুনীলচন্দ্র সরকার (Viswa Bharati Quarterly., Education Number, May-October 1947) আমি সে প্রসঙ্গ এখানে আলোচনা করতে চাই না।

রবীন্দ্রনাথ ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন কারণ—(১) সব কিছু অনুষ্ঠান একই উদ্দেশ্যে পরিচালিত হবে,

'সকল বিভাগেই যদি এক প্রাণক্রিয়ার অন্তর্গত না হয় তবে এভার বহন করা কঠিন।'

কিন্তু তা না হয়ে সেগুলি হয়ে গেল Aptitude Course আর Extra-Curricular activities.

(২) বিদ্যালয়ের ঘর বাড়ীর রূপ সম্পর্কে তাঁর পৃথক এক ধারণা ছিল। তা হচ্ছে,

'বিদ্যালয়ে ঘর বানাইলে তাহা বোর্ডিং ইস্কুল আকার ধারণ করে। এই বোর্ডিং ইস্কুল বলিতে যে ছবি মনে জাগিয়া উঠে তাহা মনোহর নয়; তাহা বারিক, পাগ্‌লা গারদ, হাসপাতাল বা জেলেরই এক গোষ্ঠীভুক্ত।'

জীবন-মানসের যে-স্তর বিভাগ তিনি করেছিলেন তারই মতো ছেলেদের সমাজীয় করবার স্তর নির্দেশ করেছিলেন, তারই পরিণতিতে তিনি (১) শান্তি-নিকেতন, (২) শ্রীনিকেতন ও (৩) বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা করেন। ব্যক্তি থেকে সমাজ এবং সমাজ থেকে বিশ্বসমাজ এই তিনটি স্তর তিনি বিভাগ করেন। কিন্তু সবারই মধ্যে তো এক প্রাণক্রিয়া চাই। যার জন্য আমেরিকার পণ্ডিত Dr. Alex Aronson বলেছিলেন, 'That is why Santiniketan is an organism, not an organisation' যার জন্য বুদ্ধদেব বসু একে 'সব পেয়েছির দেশে' বলে-ছিলেন, যার কথা প্রমথনাথ বিশীর 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন' গ্রন্থে পাই।

প্রবন্ধটি আর বিস্তৃত না-করে উপসংহারে শুধু এই-ই বলব, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাতত্ত্ব ও আদর্শ রবীন্দ্রনাথেরই মানসিকতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি 'বিশ্বের কবি' বলেই বিশ্বকবি নন, সামগ্রিক বিশ্বের সঙ্গে তাঁর প্রাণশক্তি স্পন্দিত, মুক্ত বিহঙ্গেরই মতো তিনি কলগানে তাকে মুখরিত করতে চান, পরম সাধকের মতো আনন্দ উপলব্ধি করতে চান, মহাশক্তির মধ্যে বিরাজ করতে চান। এরই প্রকাশ তিনি তাঁর নাটকে, গানে, কবিতায়, গল্পে-উপন্যাসে ছড়িয়ে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাতত্ত্ব ও বিদ্যালয় ঐ আনন্দেরই মানবমূর্তি মাধ্যমে প্রকাশ মাত্র। তাঁকে সমগ্র ভাবে বিচার না করে মনোবিজ্ঞান ইত্যাদি নিয়ে বিচার করলে তাঁর সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যাবে না। খণ্ডের মধ্যে হর্ষ থাকতে পারে, আনন্দ নেই। তিনি কতটা সফল হয়েছেন তা বিচার করতে হবে তাঁর মনেরই সহগামী হয়ে।

তাঁর তত্ত্ব এবং আদর্শ বর্তমান যুগে পাওয়া যাবে না বলে তাঁর মহাজীবনকে দায়ী করা চলে না। এর জন্য দায়ী মহাকাল। তিনি শহরের যে-অবস্থা থেকে শান্তিনিকেতনের অবস্থা প্রকাশ করেছিলেন, সে অবস্থা ছিল 'জনতার' মধ্যে 'নির্জনতা'; এখন শহরের অবস্থা একস্থানে দাঁড়িয়ে নেই, সে শীতের কলকাতার ধোঁয়ার মতো দূর থেকে দূরে ছড়িয়ে পড়েছে, সে ধোঁয়া যেন সহসা প্রাণীর রূপ ধরে পায়ে হেঁটে ভারতবর্ষের শরীরের প্রতি রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে। এখন আর জনতার মধ্যে নির্জনতা নয় এখন সমগ্র মানুষের ভীড় যেন, মাটি ছাড়িয়ে উপরের দিকে আর তার পিছনে আরো-ভীড় কেবলই উৎসাহিত করে হাঁকার দিচ্ছে, 'মারো যোয়ান হেঁইয়ো।'

রবীন্দ্রনাথ ও রোমান্টিক সাহিত্য-দর্শন

প্রবাসজীবন চৌধুরী

১। আলোচ্য বিষয়ের অবতারণা।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধগুলি পাঠ করলে পাঠকের মনে কয়েকটি মৌল প্রশ্ন জাগে। বিশেষতঃ যদি পাঠক পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য-দর্শনের সঙ্গে কিঞ্চিৎ পরিচিত থাকেন, কারণ এই ধরণের প্রশ্নের উত্থাপন ও বিশদ আলোচনা পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যিকেরা করেছেন এবং রবীন্দ্রনাথ নিজেও এসবের কিছু খবর অবশ্যই রাখতেন। অন্য অনেক প্রশ্নের মধ্যে যে কয়েকটি পরস্পর-সম্বন্ধীয় প্রশ্ন নিয়ে বর্ত্তমান প্রবন্ধের সূত্রপাত তাদের গোড়া কবির রোমান্টিক সাহিত্য-তত্ত্বে। যেহেতু তিনি সাহিত্য বলতে সাহিত্যিকের চিত্তগত ভাব-প্রকাশ বুঝতেন, জড়প্রকৃতি বা মানসপ্রকৃতির প্রতিফলন বা অনুকৃতি কিম্বা পাঠকের চিত্তে সাধারণ অর্থে শিক্ষা বা আনন্দ দান এর কোনটাই মনে করেননি, সেহেতু তাঁকে কয়েকটি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। সমস্যাগুলি যে তাঁর চিন্তায় সরাসরিভাবে ন্যায়মতে জেগেছিল তা নয়, কিন্তু সেগুলি যে তাঁর চিন্তাকে অন্তরাল হতে চালনা করেছিল তা তাঁর রচনা অনুধাবন করলেই বোঝা যায়। সেই সমস্যাগুলিকে স্পষ্ট করা এবং তাদের যে মীমাংসা রবীন্দ্রনাথ করেছেন তার ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

সমস্যাগুলি সংক্ষেপে এই। সাহিত্য যদি সাহিত্যিকের চিত্তগত ভাবের প্রকাশ হয় তাহলে প্রথমেই এই প্রশ্ন উঠবে যে ভাব তো মানুষের হৃদয়ধর্ম, তার আবেগ-প্রবেগের ব্যাপার, তাই যদি সাহিত্যের উপজীব্য হয় তো সাহিত্য মানুষকে তরল ও দুর্ব্বল করবে। মানুষের কর্ত্তব্য তার ভাবপ্রবণতাকে শাসন করা বিশুদ্ধ বিচারবুদ্ধির সাহায্যে, তাকে শক্ত পৌরুষযুক্ত হতে হবে, সুকুমার বা পেলব হলে চলবে না। একথা প্লেটো প্রথম বলেছিলেন দৃঢ়ভাবে, এবং বর্ত্তমান যুগে বাঙলা সাহিত্য ও সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে একথার প্রাসঙ্গিকতা খুবই প্রকট। আর এক সমস্যা এই সঙ্গে দেখা যায়: ভাব তো ভাল মন্দ দুই প্রকারের হয়, সাহিত্যে কী কোন বাছবিচার না করে ভাবমাত্রেরই প্রকাশ হওয়া উচিৎ? আমাদের দ্বিতীয় সমস্যা এই যে সাহিত্যিকের হৃদয়ের ভাব কী ক'রে অপরের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়? প্রত্যেকটি ভাবের বৈশিষ্ট্য থাকে, তাদের নিজস্ব রূপ ও আস্বাদ থাকে। ভাব এই দিক থেকে ভাবনা বা ধারণা থেকে

ভিন্ন প্রকৃতির। আমাদের ধারণাগুলি মোটামুটি সার্বিক বা সর্বজনীন, ভাব কিন্তু মূলতঃ বিষয়ীগত ও সেইজন্য আপেক্ষিক। আমার দুঃখবোধ বিশেষ একটি ভাব যা আমিই বোধ করি, অন্য কারো দুঃখ হতে তা পৃথক। সুতরাং সাহিত্যিক যদি যথার্থই আন্তরিক হ'ন তাহলে তাঁর ভাবটি অপ্রকাশিতই থেকে যাবে। তৃতীয়তঃ দেখা যায় যে ভাব দুই প্রকারের হয়, সুখকর ও দুঃখকর। এখন সাহিত্যে যদি এই দুই প্রকার ভাবেরই প্রকাশ হয় তাহলে সাহিত্যকে সাধারণ অর্থে আনন্দদায়ক বলা যায় না। সুতরাং হয় দুঃখকর ভাবগুলিকে সাহিত্যে নিষেধ করতে হয়, নয়তো আনন্দের এক নতুন ধারণা প্রস্তাব করতে হয়। প্রথমটি হলে সাহিত্যের পরিসর খণ্ডিত হয়, ট্র্যাজেডি সদলবলে সাহিত্যের আসর ত্যাগ করলে যেন সব ফাঁকা হয়ে যায়, অথচ ট্র্যাজেডি বা করুণ রসের আনন্দ বলতে কী বুঝি তাও তো আজ পর্যন্ত স্পষ্ট করে কেউ বলতে পারেন না। চতুর্থতঃ, ভাবপ্রকাশই যদি সাহিত্যের উদ্দেশ্য হয় তাহলে সাহিত্য আমাদের হৃদয়ে ভাবাবেগের আলোড়নই তুলবে, আমাদের চিত্তে কোন সত্যের সংবাদ দেবে না। অথচ সাহিত্যের সঙ্গে সকলেই সত্যের নিবিড় সম্পর্কের কথা বলেন। সে সত্য কী প্রকারের এবং তাতে আমাদের সন্তোষ হয় কিনা সে প্রশ্ন স্বতঃই ওঠে।

এই প্রশ্নগুলির আলোচনা আমরা ভারতীয় ও পাশ্চাত্য সাহিত্য-চিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে করব। কারণ, প্রথমতঃ, এই পদ্ধতি সমীচীন হবে যেহেতু রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা এই দুই দেশের চিন্তা দ্বারা বহুল পরিমাণে প্রভাবান্বিত হয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ এই প্রকার আলোচনায় বিষয়টির বিশদ্ ব্যাখ্যা ও রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধান্তগুলির সম্যক মূল্যায়ন সহজ হবে। তাছাড়া সমস্যাগুলির ব্যাপকতা ও গুরুত্বও প্রকাশ পাবে।

২। সাহিত্য ও ভাবপ্রকাশ।

সাহিত্য প্রকৃতির অনুকৃতি একথা প্রথমে বলেন প্লেটো, এবং যেহেতু তাঁর মতে প্রাকৃতিক বস্তুসকল অতিপ্রাকৃত তত্ত্বসকলের দুর্ব্বল প্রতিরূপ, সাহিত্যে তাই সত্যের বিকৃত রূপই পাওয়া যায়। আবার যেহেতু ভালমন্দ-নির্বিচারে সাহিত্যে সকল ভাবই অনুকৃত হয় সেহেতু সাহিত্যের উপযোগিতা অল্পই। এমনিতেই ভাবমাত্রেই মানুষকে দুর্ব্বল করে এবং মানুষের কর্তব্য তার হৃদয়-বৃত্তিকে সংযত করা। সুতরাং প্লেটোর মতে শুধু এমন সাহিত্যই সমর্থনযোগ্য যাতে মানুষকে গড়ে তোলবার উপযোগী উচ্চ কয়েকটি ভাবেরই সমাবেশ থাকে। এরিষ্টটল এই অনুকৃতিবাদকে মোটামুটি মেনে নিলেন। ট্র্যাজেডিকে তিনি

মানুষের জীবন-ব্যাপারের, চরিত্র ও সুখদুঃখের অনুকৃতি আখ্যা দিলেন। যদিও এ বিষয়ে নাট্যকারের বিচারবুদ্ধি ও রুচির স্থান থাকে তবুও নাটকের লক্ষ্য মানবজীবনকে দর্শকের সামনে উপস্থিত করা, নাট্যকারের নিজস্ব কোন ভাব বা মতের প্রকাশ নয়। প্লেটোর আপত্তির উত্তরে তিনি বললেন যে অনুকরণ করা মানুষের স্বভাব ও আনন্দকর। ট্র্যাজেডির উপজীব্য ভাবদ্বয়, করুণা ও ভয়, মানুষের পক্ষে মার্জিতভাবে ও পরিমিত মাত্রায় সম্ভোগ করায় উপকার আছে। সুতরাং অনুকৃতি দ্বারা সাহিত্যের উপযোগিতাহানি হয় না। ফলতঃ এরিস্টটলের মতে সাহিত্যের উৎস বা উপাদান-কারণ প্রকৃতি ও তার পরিণাম-কারণ পাঠকচিত্ত।

সাহিত্যের এই ধারণা পাশ্চাত্য জগতে আঠারো শতাব্দী পর্যন্ত চলতি ছিল। সাহিত্যপ্রতিভা বলতে একটি মুকুরের কথাই ভাবা হোত, আর তার উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে শিক্ষা ও আনন্দ দান। শুধু প্লোটাইনাস ও পরে খৃষ্টীয় ধর্মগুরুরা সাহিত্যের অনুকরণীয় বিষয়বস্তুকে প্রকৃতি না বলে অতিপ্রাকৃত আদর্শ বা তত্ত্বসকল এই কথা বলতেন। ইংল্যাণ্ডে এরিষ্টটলের সাহিত্যদর্শনেরই আধিপত্য ছিল। সিডনী, জনসন, পোপ আদির আলোচনায় এই দর্শনেরই পুষ্টিসাধন হয়েছে। কিন্তু এই চিন্তাধারায় বিপ্লব এল ১৭৯৮ সালে যখন কবি ওয়াডস-ওয়ার্থ ও কোলরিজ তাঁদের কাব্য (Lyrical Ballads) প্রকাশ করলেন এবং প্রথমোক্ত কবি লিখলেন একটি জোরালো মুখবন্ধ ও অপর কবি লিখতে লাগলেন সাহিত্য বিষয়ক প্রচুর প্রবন্ধ। পরে কবি কীট্স, শেলী ও বায়রন ও দার্শনিক মিল এই বিপ্লবে যোগ দিলেন। এঁদের কথা হোল যে কাব্য কবি-মানসের ভাবের প্রকাশ ("Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings"—*Wordsworth*), এবং যদিও এঁরা কাব্যের উদ্দেশ্য হিসেবে পাঠকের প্রীতিসাধন বললেন কিন্তু তবু সমস্ত ঝোঁক দিলেন কবিমানস ও ভাবের ওপর। প্রকৃতিকে দেখলেন কাব্যের নিমিত্ত-কারণ বা উপলক্ষ্য হিসেবে। কবির ভাবদৃষ্টিতে প্রকৃতির যে রূপ প্রকাশিত হয় তাই কাব্যের বিষয়বস্তু। এই ভাবদৃষ্টিকেই ওঁরা কবিকল্পনা (Imagination) আখ্যা দিলেন এবং এর মধ্য দিয়ে জগৎবীক্ষণকেই সত্য ও সুন্দর বলে জানলেন। এই কথাই ভারতীয় রসবাদে দেখি। কাব্যের সারবস্তু রস বলা হয়েছে এবং রস অর্থে ভাবের প্রকাশ বলা হয়। প্রাকৃতিক বস্তুসকল বিভাব ও অনুভাব আকারে ভাবের প্রকাশকার্যে সাহায্য করে মাত্র।

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যকে এই ভাবপ্রকাশের বা রসসৃষ্টির ক্ষেত্র মনে করতেন। এ বিষয়ে তিনি পাশ্চাত্য রোমান্টিক সাহিত্য-দর্শন ও ভারতীয় রসবাদ দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন বলতে হবে, যদিও তাঁর স্বাধীন চিন্তার অনেক নিদর্শন

পাই। সাহিত্যের এই ভাবপ্রকাশবাদকে তিনি মোটামুটি ভাবে গ্রহণ করেও কেমন তাঁর স্বাধীন ও মৌলিক চিন্তা দ্বারা এই মতবাদের বাধা-বিপত্তিগুলিকে অতিক্রম করে একটি সুষ্ঠু বিচারসম্মত সাহিত্য-তত্ত্বে উপনীত হয়েছিলেন তার বৃত্তান্তই এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু। উপস্থিত কয়েকটি উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁর ভাব-প্রকাশবাদের পরিচয় ও প্রমাণ দেওয়া যাক্। "আমাদের দেশে বলিয়াছে, বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্। রসাত্মক বাক্যই কাব্য। বস্তুত কাব্যের সংজ্ঞা আর কিছুতেই হতে পারে না। রস জিনিসটা কী? না, যা হৃদয়ের কাছে কোন না কোন ভাবে প্রকাশ পায় তাহাই রস, শুধু জ্ঞানের কাছে যা প্রকাশ পায় তা রস নহে।" (সাহিত্য, তৃতীয় সং, পৃঃ ২৫৯) "প্রকৃতি বর্ণনাও উপলক্ষ; কারণ প্রকৃতি ঠিকটি কীরূপ তা নিয়ে সাহিত্যের কোন মাথাব্যথাই নেই, কিন্তু প্রকৃতি মানুষের হৃদয়ে, মানুষের সুখদুঃখের চারিদিকে, কিরকম ভাবে প্রকাশিত হয় সাহিত্য তাই দেখায়" (সাঃ ২২৬) "আমরা প্রকৃতিকে আমাদের নিজের সুখদুঃখ আশাআকাঙ্ক্ষা দান করে একটা নূতন কাণ্ড করে তুলি, অভ্রভেদী জগৎসৌন্দর্য্যের মধ্যে একটা অমর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করি—এবং তখনই সে সাহিত্যের উপযোগিতা প্রাপ্ত হয়" (সাঃ ২১৪)। "বাহিরের তথ্য ও ঘটনা যখন ভাবের সামগ্রী হয়ে আমাদের মনের সঙ্গে রসের প্রভাবে মিলে যায় তখন মানুষ স্বভাবতই ইচ্ছা করে সেই মিলকে সর্বকালের সর্বজনের অঙ্গীকারভুক্ত করতে......তখন তাকে প্রকাশ করতে চাই নিত্যকালের ভাষায়। কবি সেই ভাষাকে মানুষের অনুভূতির ভাষা করে তোলে; অর্থাৎ জ্ঞানের ভাষা নয়; হৃদয়ের ভাষা, কল্পনার ভাষা" (সাহিত্যের পথে, তৃতীয় সং, পৃঃ ১৫৩)। "এই হৃদয়-বৃত্তির রসে জারিয়া তুলিয়া আমরা বাহিরের জগৎকে বিশেষরূপে আপনার করিয়া লই" (সাঃ ৭)। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে অনুকরণবাদ এবং উদ্দেশ্যবাদ এই দুইয়েরই বিরোধী ছিলেন। সাহিত্য মানুষের একান্ত সৃষ্টি, আবিষ্কার বা অনুকরণ নয় (সাঃ ২০-২৩) এবং যথার্থ সাহিত্য কোন উদ্দেশ্য—শিক্ষার বা লোকহিতকারিতার—নিয়ে রচিত হয় না (সাঃ ১৭৬--৭৮ ও ২৩২ পৃঃ দ্রষ্টব্য) যদিও তার পরিণামে একটি উপকারিতা আছে—মানুষের আনন্দ ও মানুষে মানুষে মিলন।

৩। ভাবপ্রকাশ ও সাহিত্যের উপকারিতা

এখন আমাদের প্রথম প্রশ্নটি তুলছি। ভাবকে প্রশ্রয়দান তো মানুষের পক্ষে কল্যাণকর নয়, ভাবসংবরণ করাই তো তার শিক্ষা ও আদর্শ। সাহিত্যের বিরুদ্ধে প্লেটোর এই আপত্তির উত্তর এরিষ্টটল একভাবে দিলেন বটে কিন্তু তেমন সন্তোষজনক হল না। কারণ, একথা কী ঠিক যে আমাদের অন্তরে ভাবতৃষ্ণা

জেগে থাকে যার শুধু নিবারণ হয় সাহিত্যসম্ভোগে এবং সাহিত্য যে আমাদের ভাবের ভোগীকরণের সুশিক্ষা দেয় ? একথাও কী সত্য নয় যে ভাবপ্রধান কাব্য উপন্যাস নাটকের এক প্রকার মাদকতা আছে যা মানুষকে ভাবপ্রবণ ও স্পর্শকাতর ক'রে তোলে এবং সাহিত্যে সাধারণতঃ ভাবের আতিশয্যই থাকে ; নীতিশাস্ত্রের নিয়মে কোন সাহিত্য রচনা হয় না। ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলেন যে মানুষের মন শহরে থেকে অনুভূতিহীন হয়ে পড়ে, কাব্যরস তাকে অনুভূতিশীল করে এবং তার হৃদয়বৃত্তিগুলিকে প্রাণবন্ত ও সুসংস্কৃত করে। কিন্তু একথাও মনে ধরে না। শেলী বললেন, কাব্য মানুষের কল্পনাশক্তিকে জাগায়ও তার মাধ্যমে মানুষ অপরের সুখদুঃখের সঙ্গে সহজে সহানুভূতিবোধ করে এবং এইভাবে সাহিত্য মানুষকে পরোক্ষভাবে নীতিশিক্ষাই দেয়। একথা স্বীকার করলেও বলতে হয় যে সাহিত্য মানুষকে যে ভাববিলাসী করে। এবং এই আপত্তির উত্তর কী ? সেইজন্য কবি কীট্স ও কোলরিজ সাহিত্যের উপযোগিতার কথা না তুলে তার সৌন্দর্য ও প্রীতিদানের কথাই বল্লেন। দার্শনিক কাণ্ট ও শীলার কাব্যকে ভাবপ্রকাশের ক্ষেত্র হিসাবে না দেখে তাকে মানুষের কল্পনা ও বুদ্ধি এই দুই মানস-ব্যাপারের ক্রীড়াভূমিরূপে দেখতে চাইলেন। কিন্তু এভাবে কাব্যকে এক জটিল রহস্যে পরিণত করতে চাইলেন না অনেকেই। অসকার ওয়াইল্ড, ফ্লবেয়ার ও গোতিয়ে প্রমুখ সাহিত্যিকেরা সাহিত্যকে ভাবপ্রকাশের ক্ষেত্র মনে করেও জোর গলায় বললেন যে সাহিত্য নীতি-নিরপেক্ষ এবং আপন সৌন্দর্যমহিমায় প্রতিষ্ঠিত ; তার বিচার ভালমন্দের মাপকাঠিতে হবে না। মানুষের সাহিত্য ও সৌন্দর্যচর্চা স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যাপার, শিল্পসৃষ্টির তাগিদ ও মূল্য শিল্পের মধ্যেই নিহিত, বাইরে নয়।

এই বিচিত্র মতামতের পৃষ্ঠভূমিতে রবীন্দ্রনাথের মতটি উপস্থিত করি। শেষোক্ত মতবাদটি তাঁর একেবারে অগ্রাহ্য ছিল। সাহিত্যকলা ও সৌন্দর্যকে তিনি ভাবের সামগ্রী মনে করেও তাদের সঙ্গে মঙ্গলের গভীর সম্পর্কে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। সাহিত্য-সৌন্দর্যকে যখন স্বতন্ত্রভাবে দেখা হয়, তখন তার যথার্থ ধর্ম্মই নষ্ট হয়ে যায় (সাঃ ৭৭–৮০)। "মঙ্গলের সঙ্গে সৌন্দর্যের, বিষ্ণুর সঙ্গেই লক্ষ্মীর মিলন পূর্ণ" (সাঃ ৪৮)। সাহিত্য তাহলে ভাবপ্রকাশ করলেও মানুষকে ভাবোন্মত্ত বা অসংযমী করে না। সাহিত্যরস উপভোগ করতে হলে চাই সংযম-শিক্ষা। "শুদ্ধভাবে নিবিষ্ট হইতে না জানিলে আমরা সৌন্দর্যের মর্ম্মস্থান হইতে রস উদ্ধার করিতে পারি না" (সাঃ ৩৪)। "সৌন্দর্যসৃষ্টি দুর্ব্বলতা হইতে, চঞ্চলতা হইতে, অসংযম হইতে ঘটিতেছে, এটা একটা অত্যন্ত বিরুদ্ধ কথা" (সাঃ ৩৭)। "কলাবান গুণীরাও যেখানে বস্তুতঃ গুণী সেখানে তাঁরা তপস্বী ; সেখানে যথেচ্ছাচার চলিতে পারেনা, সেখানে চিত্তের সাধন ও সংযম আছেই।" (সাঃ ৩৭)। এইরূপ সংযম কেমন করে সম্ভব হয় ? এর উত্তর পাই। "রস

মাত্রেই, অর্থাৎ সকল রকম হৃদয়বোধেই আমরা বিশেষভাবে আপনাকে জানি, সেই জানাতেই আনন্দ" (সাঃ পঃ, ১৩৪)। এই আত্মানুভূতির কথা কবি কীট্‌স ও শেলীও বলেছেন কিন্তু তাঁরা এর সঙ্গে কেবল আনন্দের যোগ দেখেছেন, সংযম বা সামঞ্জস্যের কথা বলেননি। মানুষ নিজের আত্মপুরুষকে জানার সঙ্গে সঙ্গেই তার ভাবজীবনে আত্মসচেতনা ও সামঞ্জস্যবোধ আসে। কারণ আত্মা এক 'ঐক্যবিন্দু' যাহা আমাদের ইন্দ্রিয়জজ্ঞান ও হৃদয়বৃত্তি সমূহের কেন্দ্রে বসে তাদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করে (পঞ্চভূত, ১১৯)। এইজন্য সাহিত্যকলা উপভোগে যে ভাবের আলোড়ন হয় তার দৌরাত্মের স্থলে মানবচিত্তে ভাবের মনন বা বিভাবন জাতীয় একপ্রকার ব্যাপার ঘটে এবং ভাব দ্বারা শাসিত বা চালিত না হয়ে মানব-অন্তর ভাবকে আয়ত্তে এনে তার রসগ্রহণ করে। এই কারণে দুঃখের ভাবও যখন সাহিত্যে অনুভব করি তখন ঠিক দুঃখ পাই না, বরং আনন্দই হয়। "দুঃখের অভিজ্ঞতায় আমাদের চেতনা আলোড়িত হয়ে উঠে। দুঃখের কটু স্বাদে দুই চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকলেও তা উপাদেয়। ট্র্যাজেডির মূল্য এই নিয়ে" (সাঃ পঃ, ১৩৫)। এইখানে কীট্‌স শেক্সপিয়রের 'কিং লিয়র' নাটক সম্বন্ধে যে বলেছিলেন, শেক্সপিয়রের ফলের তিক্ত মধুর রস (the bitter sweet of this Sakespearean fruit) তা স্মরণ হয়।

এই আত্মসচেতনার অন্য দুইটি দিক আছে যার গুণে সাহিত্য ভাবপ্রকাশের ক্ষেত্র হয়েও মানুষকে চঞ্চলমতি ভাববিলাসী হতে দেয় না। প্রথম এই যে সাহিত্যসৃষ্টি ভাবের উচ্ছলতা থেকে হয়, অর্থাৎ যে ভাব মানুষের প্রয়োজনকে ছাপিয়ে যায় তাকে অপরের অন্তরে সঞ্চারিত করতে চায় মানুষ তার সাহিত্য-কলার সাহায্যে। সেজন্য মানুষের স্থূলতর ভাবগুলি সাহিত্যে কমই প্রকাশ পায় এবং হলেও তার সাহিত্যিক মূল্য বা প্রভাব অল্পই। যথার্থ সাহিত্যে আমরা এমন ভাবরসই পাই যা আমাদের উন্নত মানধিকতা বা সূক্ষ্মহৃদয়ধর্ম্ম থেকে উত্থিত। স্থূল ভাবগুলি দেহমনের সাধারণ প্রয়োজন মিটিয়েই নিঃশেষ হয়ে যায়। (সাঃ ২৫৯—৬০)। "সাহিত্য মানব-হৃদয়ের ঐশ্বর্য। ঐ ঐশ্বর্যেই সকল মানুষ সম্মিলিত হয়; যাহা অতিরিক্ত তাহাই সর্বসাধারণের।" (সাঃ ২৬১)। সুতরাং আমরা আমাদের পূর্ব্বকথিত এই আনুষঙ্গিক প্রশ্নের উত্তর পেলাম যে সাহিত্য যদি ভাব প্রকাশের ব্যাপার হয় তাহলে ভালমন্দ সব রকম ভাবই কী সাহিত্যের সামগ্রী হবে? উত্তর—না। মানুষের সুস্থ সংস্কৃত ভাবগুলিরই প্রাধান্য হয় সাহিত্যে কারণ তারাই মানুষের সাধারণ জৈবিক প্রয়োজনকে ছাপিয়ে উদ্‌বৃত্ত হয়ে প্রকাশের ও স্থায়িত্বের জন্য উদ্যোগী হয়।

আত্মসচেতনার দ্বিতীয় দিক হচ্ছে এই যে ভাবের প্রকাশ ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত থাকে একটি বৃহৎ ও উন্নত ভাব যার প্রভাবে সাহিত্যে সাক্ষাৎভাবে

প্রকাশিত কোন ভাবই সাহিত্যিক বা পাঠককে দুর্ব্বলতা বা অসংযমের দিকে নিয়ে যেতে পারে না। এই ভাবটি হচ্ছে মানুষে মানুষে মিলনের ভাব। সাহিত্যের মধ্য দিয়ে মানুষ অপরের সঙ্গে একাত্মবোধ করে। "সাহিত্যের প্রভাবে আমরা হৃদয়ের দ্বারা হৃদয়ের যোগ অনুভব করি, হৃদয়ের প্রবাহ রক্ষা হয়, হৃদয়ের সহিত হৃদয় খেলাইতে থাকে, হৃদয়ের জীবন ও স্বাস্থ্য সঞ্চার হয়। যুক্তিশৃঙ্খলের দ্বারা মানবের বুদ্ধি ও জ্ঞানের ঐক্যবন্ধন হয়, কিন্তু হৃদয়ে হৃদয়ে বাঁধিবার তেমন কৃত্রিম উপায় নাই। সাহিত্য স্বতঃ উৎসারিত হইয়া সেই যোগসাধন করে। সাহিত্য অর্থেই একত্র থাকিবার ভাব—মানবের 'সহিত' থাকিবার ভাব-মানবকে স্পর্শ করা, মানবকে অনুভব করা।" (সাঃ ১৭৭)। "সাহিত্যের শিক্ষাতেই আমরা আপনাকে মানুষের এবং মানুষকে আপনার বলে অনুভব করছি।......অতএব সাহিত্য যে সব-গোড়াকার শিক্ষা ও সাহিত্য যে চিরকালের শিক্ষা আমার তাতে সন্দেহ নেই।" (সাঃ ২১০)। "যে দেশে সাহিত্যের অভাব সে দেশের লোক পরস্পর সজীব বন্ধনে সংযুক্ত নহে; তাহারা বিচ্ছিন্ন।" (সাঃ ১১২)। এই মিলনের ভাবটি সাহিত্যে পরিব্যাপ্ত। এই ভাবটিকে কেউ নিন্দনীয় বলবেন না; মানুষকে দুর্ব্বল করার পরিবর্ত্তে এই ভাব তাকে আরো সংহত ও শক্ত করে। এই মিলনের ভাবটি যখন সাহিত্যে সাক্ষাৎভাবে প্রকাশিত ভয়, প্রেম, করুণা আদি নানা ভাবের সঙ্গে জড়িত থাকে, তখন তারা মানুষের কাছে তাদের সাধারণরূপে আসে না। তাদের আস্বাদ ও প্রভাবে অবশ্যই রূপান্তর ঘটে।

এখন আমাদের কথায় বলা যায় যে ভাব যখন তার প্রাকৃতিক অবস্থা ত্যাগ ক'রে সাহিত্যের সামগ্রী হয় তখন সে আর সাহিত্যিক বা পাঠককে সাধারণভাবে প্রভাবিত করে না। তখন সে ব্যক্তি বিশেষের ভোগের বিষয় না হয়ে সর্ব সাধারণের উপভোগের বস্তু হয়ে ওঠে। "ভাবকে নিজের করিয়া সকলের করা ইহাই সাহিত্য, ইহাই ললিতকলা" (সাঃ ১৯) সাহিত্য ব্যক্তিমনের জিনিস নয়, সমষ্টিমনের। "জগতের উপর মনের কারখানা বসিয়াছে এবং মনের উপরে বিশ্বমনের কারখানা—সেই উপরের তলা হইতে সাহিত্যের উৎপত্তি। (সাঃ ২৭)। রবীন্দ্রনাথ এই বিশ্বমনের কথা অন্য কয়েকস্থলেও বলেছেন। (সাঃ ২৬, ৫৯, ৭০, ৭১, ২১৪–১৭)। সুতরাং দেখা যায় যে সাহিত্যের এই মিলনের ভাবটির পেছনে একটি জ্ঞানমূলক পদার্থও আছে। সেটি আত্মচৈতন্যের মধ্য সর্বজনীন চৈতন্যের প্রবাহ, নিজেকে কেবল ব্যক্তিবিশেষ না জেনে সমষ্টিগত মানুষের একটি দৃষ্টান্তভাবে দেখা। "সাহিত্যের বিষয় মানবহৃদয় ও মানবচরিত্র" (সাঃ ১১)। "সাহিত্য ব্যক্তি বিশেষের নহে, তাহা রচয়িতার নহে, তাহা দৈববাণী" (সাঃ ১২)। "আমি ব্যক্তিগত-আমি এই তথ্যটুকুর মধ্যে আমি মানুষ এই সত্যটিকে যখন আমি প্রকাশ করি তখনই বিরাট একের আলোকে

আমি নিত্যতায় উদ্ভাসিত হই। তথ্যের মধ্যে সত্যের প্রকাশই হচ্ছে প্রকাশ। যেহেতু সাহিত্য ও ললিত-কলার কাজই হচ্ছে প্রকাশ, এইজন্য তথ্যের পাত্রকে আশ্রয় করে আমাদের মনকে সত্যের স্বাদ দেওয়াই তার প্রধান কাজ। এই স্বাদটি হল একের স্বাদ, অসীমের স্বাদ," (সাঃ পঃ ৫৪-৫৫)।

অতএব দেখা যায় যে সাহিত্য ভাবপ্রকাশ করে এমন প্রকারে যে আমাদের দৃষ্টিকে নিয়ে যায় ভাবের ক্ষণিকতা ও চঞ্চলতা থেকে তার সত্য স্বরূপটির দিকে, তার বিশেষত্ব থেকে তার সামান্যের দিকে, আর এই ভাবের মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে অবারিত করে বিশ্বমানবমনকে বা চিরকালের মানুষকে যে এই ভাবের ধারক এবং যাকে অনুভব করতে চায় প্রত্যেক মানুষ সাহিত্যকলার মাধ্যমে,— ভাববিনিময়ের দ্বারা। সাহিত্যের এই জ্ঞান বা সত্যের দিকটি আমরা পরে আলোচনা করবো। এখন এইটুকু দেখলাম যে সাহিত্য ভাবপ্রকাশের ক্ষেত্র হওয়া সত্ত্বেও তা মানুষের পক্ষে অহিতকর নয়, বরং কল্যাণকর।

এই প্রসঙ্গে যে বিশেষ প্রশ্নটি ওঠে যে সাহিত্যে কী ভালমন্দ সব প্রকার ভাবেরই সমান স্থান হবে তার আংশিক উত্তর আমরা পূর্ব্বেই দিয়েছি। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের আরও সুস্পষ্ট মত এই যে ভাবপ্রকাশনের সঙ্গে জড়িত থাকে সাহিত্যিকের আত্মজ্ঞান ও মানুষ সম্পর্কে সম্যক ধারণা যার ভাবভাবনাকে তিনি প্রকাশ করেন। এখন মানুষের সম্যক ও সত্য রূপটি কী তাই প্রশ্ন। রবীন্দ্রনাথ বলেন যে মানুষের মধ্যে যা নিত্য ও গৌরবময়, যা সে হতে চায়, তার আদর্শরূপটি, সেটিই তার সত্যরূপ। মানুষের ভুলভ্রান্তি, ক্ষয়ক্ষতি, অনেক দুর্ব্বলতা ও ক্ষুদ্রতা সত্ত্বেও যে তার একটি মহৎ অভিপ্রায়কে সিদ্ধ করতে চায় তার জীবনে, প্রকৃত সাহিত্যিক সেইটিকেই প্রকাশ করেন। "এমনি করিয়াই স্বভাবতই মানুষের যা কিছু নিত্য, যাহা সে কাজেকর্ম্মে ফুরাইয়া ফেলিতে পারে না, তাহাই মানুষের সাহিত্যে ধরা পড়িয়া আপনা আপনি মানুষের বিরাট রূপকেই গড়িয়া তুলে" (সাঃ ৬৮)। কিন্তু তাহলে মানুষের নিম্ন হৃদয়বৃত্তিগুলি কী সত্য নয়? একথার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলেন যে এক অর্থে এগুলি সত্য হলেও এ সত্য শেষ সত্য নয়, তথ্য মাত্র, এবং সেই কারণে এদের স্থান সাহিত্যে থাকা উচিৎ নয়। "কোন্‌খানে মানুষের শেষ কথা। মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সম্বন্ধ বাহ্য প্রকৃতির তথ্যরাজ্যের সীমা অতিক্রম ক'রে আত্মার চরম সম্বন্ধে নিয়ে যায়; যা সৌন্দর্যের সম্বন্ধ, কল্যাণের সম্বন্ধ, প্রেমের সম্বন্ধ, তারই মধ্যে। সেইখানে মানুষের সৃষ্টির রাজ্য। সেইখানে প্রত্যেক মানুষ আপন অসীম গৌরব লাভ করে, সেখানে প্রত্যেক মানুষের জন্য সমগ্র মানুষের তপস্যা।" (সাঃ পঃ ৭১)। সাহিত্যে মানুষের আদর্শ ভাবরূপটিরই প্রকাশ হয়। "দেশে দেশে মানুষ আপনার সত্য প্রকৃতিকে আপনার অসত্য দীনতার হাত থেকে রক্ষা করে এসেছে।

মানুষ আপনার দৈন্যকে বাস্তব জানলেও, সত্য বলে বিশ্বাস করে না। তার সত্য তার নিজের সৃষ্টির মধ্যে সে স্থাপিত করে।" (সাহিত্যের স্বরূপ : ৬৩)

সুতরাং দেখা যায় যে সাহিত্যিক যখন ভাব প্রকাশ করেন তখন তাঁর চিত্তে ভাবগুলির অন্তর্নিহিত অর্থ বা অভিপ্রায়ও পরিস্ফুট হয় এবং সেই সঙ্গে যে মানুষ এই ভাবের আশ্রয়স্থল, যার অন্তরে এই ভাব প্রবাহিত তার সমগ্র ও আদর্শ রূপটিও ধরা পড়ে। রবীন্দ্রনাথ ভাবের প্রকাশ বলতে কোন অর্দ্ধচেতন বা অন্ধচালিত ব্যাপার মনে করতেন না। সাহিত্যিকের একটি আত্মসচেতন সত্যদর্শী ও আদর্শানুরাগী চিত্ত থাকে যা তার সাহিত্যকর্মে ভাবপ্রকাশনে আত্মনিয়োগ করে। এই জন্য ভাবের ভালমন্দ হিসাবে নির্ব্বাচন ও কোন্ ভাব কী মাত্রায় বা রূপে প্রকাশিতব্য তার বিচার স্বতঃই হয়ে যায় সাহিত্যসৃষ্টিতে। এর জন্য সাহিত্যিককে নীতিবাগীশ হতে হয় না এবং সাহিত্যকে নীতিশিক্ষার ভার নিতে হয় না। (সাঃ পঃ ২২–৩)। সাহিত্যপ্রতিভা এমনই যে তার সহিত এরকম স্বতঃবোধ স্বভাবতই জড়িত থাকে এবং যার গুণে সাহিত্যিক তার ভাবপ্রকাশের মাধ্যমে মানুষের আদর্শ রূপকেই ফুটিয়ে তোলেন এবং এইভাবে মানুষকে তার আদর্শের দিকে অগ্রসর হতে সাহায্য করেন।

এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টির মৌলিকতা ও যাথার্থ্য স্বীকার করতে হবে। সাহিত্যে ভাববিনিময়ের মাধ্যমে মানুষে মানুষে মিলের কথা টলষ্টয় প্রথম ঘোষণা করেন বটে এবং সাহিত্যে ভাবের অন্ধ নিষ্ক্রিয় ভোগীকরণের বদলে তার নিরাসক্ত মনন ও সক্রিয় উপভোগের কথা হেগেল, ক্রোচে ও অন্য অনেক সাহিত্য-চিন্তকের মধ্যে পাই। ভারতীয় রসবাদে রসকে অভিনবগুপ্ত একই সঙ্গে রসবেত্তার আনন্দঘন চৈতন্যের আস্বাদ ও ভাবের সাধারণীকৃত অবস্থার উপভোগ বলে বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া ব্যক্তিগত ভাবগুলির এক নিঃস্বার্থ সর্ব-জনীন রূপপ্রাপ্তির কথা এবং এইভাবে মানুষের আধ্যাত্মিক বিকাশের তত্ত্ব আমরা জেমস কেয়ার্ডের রচনাতে (ধর্ম-দর্শন) পাই। রবীন্দ্রনাথ এই সমস্ত রচনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু তাঁর চিন্তায় এই সমস্ত কথা মিলে মিশে এক অভিনব রূপ নিয়ে আমাদের কাছে এক গভীরতর সত্য ও সুষমায় প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর চিন্তায় স্বকীয়তা ও তাঁর উপলব্ধির ঐকান্তিকতা তাঁর রচনায় স্বতস্ফূর্ত। বাস্তবিক পক্ষে বলতে হয় যে সাহিত্য সম্পর্কে প্লেটোর অভিযোগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উত্তর আমরা পেয়েছি রবীন্দ্রনাথের কাছে থেকে। সাহিত্য থেকে মানুষ নিজের সম্যক পরিচয় পায় এবং আত্মসংস্কারের প্রেরণা পায়। "আত্মসংস্কৃতির্বাব শিল্পানি"—ঐতরেয় ব্রাহ্মণের এই উক্তিটিতে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাসী ছিলেন। (সাঃ পঃ ১৩৮ দ্রষ্টব্য)

৪। ভাববিনিময়ের সমস্যা।

আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে ভাব প্রকাশ যদি সাহিত্যের কাজ হয় তো তা কী করে সম্ভব হয়? কারণ একজনের ভাব অপরে কী উপায়ে বুঝবে? দার্শনিক মিল বলেন কাব্য স্বগোতোক্তির মতই, কবি নিজেকে উদ্দেশ্য করেই কাব্য লেখেন। শেলী কবিকে নাইটিঙ্গেল পাখীর সঙ্গে তুলনা করলেন, যে নিজের নির্জন অন্ধকারকে মধুর গান দিয়ে সজীব করে। কিন্তু ওয়ার্ডসওয়ার্থ স্বীকার করেন যে কবি নিজের জন্য লেখেন না, বরং মানুষের জন্য। আমরা পূর্ব্বেই দেখেছি যে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের মধ্যে মানুষে মানুষে একটি মিলনের ভাব দেখেন। "একটা মন আর একটা মনকে খুঁজিতেছে নিজের ভাবনার ভার নামাইয়া দিবার জন্য, নিজের মনের ভাবকে অন্যের মনে ভাবিত করিবার জন্য।" (সাঃ ৯৩) "নীরব কবিত্ব ও আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাস, সাহিত্যের এদুটো বাজে কথা কোন কোন মহলে চলিত আছে" (সাঃ ১৪)। এখন এই ভাববিনিময়ের জন্য মানুষ পরস্পরের হৃদয়ের খবর রাখে এবং একটি সমাজ-মন বা সর্ব্বজনীন ভাবসত্তা আবিষ্কার ক'রে তার অংশীদার হয়েই পরস্পরের সঙ্গে আলাপে প্রবৃত্ত হয়। "দাশুরায়ের পাঁচালী দাশুরথির ঠিক একলার নহে; যে সমাজে সে পাঁচালী শুনিতেছে, তাহার সহিত যোগে এই পাঁচালী রচিত।" (সাঃ ৪৯) "আমরা যদি এইটে বুঝি যে, সাহিত্যে বিশ্বমানবমনই আপনাকে প্রকাশ করিতেছে তবে সাহিত্যের মধ্যে আমাদের যাহা দেখিবার তাহা দেখিতে পাইব" (সাঃ ৭০)। "সাহিত্যকারের সেই মানবত্বই সৃজনকর্ত্তা। লেখকের নিজত্বকে যে আপনার করিয়া লয়, ক্ষণিককে সে অমর করিয়া তোলে, খণ্ডকে সে সম্পূর্ণতা দান করে।" (সাঃ ২৭)। "লেখক উপলক্ষ্য মাত্র, মানুষই উদ্দেশ্য" (সাঃ ২২৮)

সুতরাং আমাদের সমস্যার সমাধান পেলাম। সাহিত্যিক কেবল নিজের মনকেই জানেন না, তিনি তাঁর সমাজমনের মুখপাত্ররূপেই থাকেন। তিনি তাঁর হৃদয়ে উত্থিত ভাবগুলির মধ্যে সেইগুলিকেই প্রকাশ করেন এবং এমন করেই প্রকাশ করেন যাতে তারা সকলের হৃদয়গ্রাহী হতে পারে। সুতরাং তিনি যে একান্ত আত্মভোলাভাবে কেবল ভাবের তাড়নায় সাহিত্য সৃষ্টি করেন তা নয়। তাঁর ব্যক্তিগত ভাবগুলিকে তিনি আত্মসচেতনপূর্ব্বক অবলোকন করেন এবং তাদের মধ্য থেকে নির্ব্বাচন করেন এবং তাদের প্রাথমিক রূপেরও অল্পবিস্তর পরিবর্ত্তন করেন। এর দ্বারা যে তাঁর ঐকান্তিকতা ও রচনার স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাব বিঘ্নিত হয় তা ঠিক বলা যায় না কারণ এই কার্যটি যথার্থ সাহিত্য-মানসে স্বতঃই হয়ে থাকে। কারণ সেই মানস প্রতিভাবান, এবং সাহিত্য-প্রতিভার বিশেষত্ব-হচ্ছে সাহিত্যকারের মনের সঙ্গে বিশ্বমনের যোগ। "কবির কল্পনা

সচেতন হৃদয় যতই বিশ্বব্যাপী হয় ততই তাঁহার রচনার গভীরতায় আমাদের পরিতৃপ্তি বাড়ে।" (সাঃ ৯)। রস-সাহিত্যিকের এমন একটি সহজাত বোধ থাকে যে তাঁর অন্তরের ভাবের এই বিশ্বজনীন রূপদানের ব্যাপারটির মধ্যে কোন সময় বা ক্রম বা কোন যুক্তিবিচারের অবকাশ থাকেনা। তিনি তাঁর 'অন্তরের অনুভূতি' ও 'আত্মপ্রসাদ' দিয়ে নিশ্চয়ভাবে বোঝেন কোন ভাবটি কী আকারে বিশ্বমনে স্থান পাবে। "কবি যদি একটি বেদনাময় চৈতন্য লইয়া জন্মিয়া থাকেন, যদি তিনি নিজের প্রকৃতি দিয়াই বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতির সহিত আত্মীয়তা করিয়া থাকেন, যদি শিক্ষা অভ্যাস প্রথা শাস্ত্র প্রভৃতি জড় আবরণের ভিতর দিয়া কেবল মাত্র দেশের নিয়মে তিনি বিশ্বের সঙ্গে ব্যবহার না করেন, তবে তিনি নিখিলের সংশ্রবে যাহা অনুভব করিবেন তাহার একান্ত বাস্তবতা সম্বন্ধে তাঁহার মনে কোন সন্দেহ থাকিবে না। বিশ্ববস্তু ও বিশ্বরসকে একেবারে অব্যবহিতভাবে তিনি নিজের জীবনে উপলব্ধি করিয়াছেন, এইখানেই তাঁহার জোর।" (সাঃ পঃ ২৪-২৫)। "এই জন্যই দেশে ও কালে যে মানুষ যত বেশী মানুষের মধ্যে আপনার আত্মাকে মিলাইয়া নিজেকে উপলব্ধি ও প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন তিনি ততই মহৎ মানুষ। তিনি যথার্থই মহাত্মা। সমস্ত মানুষের মধ্যে আমার আত্মার সার্থকতা, এ যে ব্যক্তি কোন-না-কোন সুযোগে কিছুনা-কিছু বুঝিতে পারিয়াছে তাহার ভাগ্যে মনুষ্যত্বের ভাগ কম পড়িয়া গেছে। সে আত্মাকে আপনার মধ্যে জানতেই আত্মাকে ছোট করিয়া জানে"। (সাঃ ৫৭)

ভাববিনিময় সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই মীমাংসাটি সকলের গ্রহণযোগ্য। সাহিত্যিকের নৈর্ব্যক্তিকতার কথা পাশ্চাত্ত্য দেশে কবি কীট্স থেকে আরম্ভ করে আধুনিক কালে এলিয়ট পর্যন্ত কোন না কোন আকারে চলে আসছে। দার্শনিক হেগেলও প্রকারান্তরে এই কথাই বলেন। রসবাদীরাও তাঁদের 'সাধারণীকৃতি'র তত্ত্বদ্বারা কবিমানসের, কাব্যে পরিবেশিত ভাবের ও সহৃদয় পাঠকচিত্তের এক স্থান-কাল-নির্ব্বিশেষে অবস্থার কথা বলতে চেয়েছেন। কাব্যে প্রকাশিত ভাব মাখান রসে রূপান্তরিত হয়ে সকলের হৃদয়-সংবাদের বিষয় হয়ে ওঠে তখন সে-ভাব কবির না পাঠকের কারো ব'লে প্রতীত হয় না এবং সেজন্য সাধারণ কোন ভাবের মত ব্যক্তিগতভাবে অনুভূত ও চিত্তচাঞ্চল্যের কারণ না হয়ে সেটি নিবিড় অভিনিবেশ ও উপভোগের বিষয় হয়ে চিত্তকে একঘনতা ও আনন্দ দান করে। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যকারের এই নৈর্ব্যক্তিকতা ও বিশ্ব-চেতনার ধারণা দুটিকে তাঁর মানব-দর্শনের আলোকে স্পষ্টরূপে দেখেছেন ও সাহিত্যের মধ্য দিয়ে মানুষ কেমন করে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে এক ব্যাপক মানব-চেতনার সৃষ্টি করে তার নির্দ্দেশ দিয়েছেন। সাহিত্যে ভাববিনিময়ের প্রশ্নটিকে তিনি এক গভীরতর প্রশ্নের সঙ্গে যুক্ত করে আমাদের সাহিত্য-বিচারকে

এক নতুন বিস্তার দিয়েছেন। সাহিত্য-দর্শনের এই সমস্যাটির সমাধান করেছেন তিনি একটি বৃহত্তর ও সত্যের পৃষ্ঠভূমিতে। ব্যক্তির মধ্য অতিব্যক্তির ও আত্ম-চেতনার মধ্যে বিশ্বমানবচেতনার তত্ত্বটির আলোকে তিনি বর্ত্তমান প্রশ্নটিকে ধরেই তার উত্তর দিয়েছেন।

৫। সাহিত্যের আনন্দ

এখন আমরা আমাদের তৃতীয় প্রশ্নটির অবতারণা করছি। সাহিত্যের কাজ যদি ভাবপ্রকাশ হয় তো দুঃখকর ভাবগুলির কী উপায় হবে? কারণ সাহিত্য তো আনন্দকর হবে। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যকে আনন্দের প্রকাশরূপে দেখেছেন। "সাহিত্যে মানুষ কত বিচিত্রভাবে নিয়ত আপনার আনন্দরূপকে অমৃতরূপকে ব্যক্ত করিতেছে তাহাই আমাদের দেখিবার বিষয়" (সাঃ ৯০)। "অতএব মানুষ আপনার আনন্দ প্রকাশের দ্বারা সাহিত্যে কেবল আপনারই নিত্যরূপ শ্রেষ্ঠরূপ প্রকাশ করিতেছে।" (সাঃ ৮৬)। অথচ তিনি সাহিত্যে দুঃখকর ভাবগুলির প্রবেশে বাধা দেননা। তিনি ওথেলো ও হ্যামলেটের বিক্ষুব্ধ দুঃখবোধকে উচ্চ সাহিত্য সৃষ্টি বলেই জানতেন। (সাঃ ২২৭)। বরং তিনি সহজ আপাত-রমণীয় ও সুখকর সাহিত্যকে নিম্ন শ্রেণীর রচনা বলে জানতেন। তাহলে আমাদের সমস্যার উত্তর কী? উত্তর এই: "কিন্তু এটা মনে রাখা চাই যে সুখের বিপরীত দুঃখ, কিন্তু আনন্দের বিপরীত নয়; বস্তুত দুঃখ আনন্দেরই অন্তর্ভুক্ত। কথাটা শুনতে স্বতোবিরুদ্ধ কিন্তু সত্য"। (সাঃ পঃ ১২৫)। সুতরাং সাহিত্যের আনন্দকে সাধারণ অর্থে সুখ থেকে বিলক্ষণ রসানুভূতির ধারণায় বুঝতে হবে। সে আনন্দ কী? সেটি অনুভূতির আনন্দ যা আত্মোপলব্ধিরই আনন্দ। কারণ—"বাইরের পদার্থের যোগে কোন বিশেষ রঙে, বিশেষ রসে, বিশেষ রূপে আপনাকে বোধ করাকে বলে অনুভব করা। সেইজন্য উপনিষদে বলেছেন, পুত্রকে কামনা করি বলেই যে পুত্র আমাদের প্রিয় তা নয়, আপনাকেই কামনা করি বলেই পুত্র আমাদের প্রিয়। পুত্রের মধ্যে পিতা নিজেকেই উপলব্ধি করে, সেই উপলব্ধিতেই আনন্দ।" (সাঃ পঃ ১২৫)। জ্ঞানে বা প্রয়োজনের তাগিদে কোন বস্তুকে জানার মধ্যে এই আত্মোপলব্ধির অবকাশ নেই। সেখানে জ্ঞাতার চৈতন্য-পুরুষ বিষয়বস্তু থেকে পৃথক থাকে এবং তা আত্মসচেতন থাকে না। "ভাবে জানি আপনাকেই, বিষয়টা থাকে উপলক্ষ্যরূপে সেই আপনার সঙ্গে মিলিত" (সাঃ ৭)। "রসমাত্রেই অর্থাৎ সকল রকম হৃদয়বোধেই আনন্দ" (সাঃ পঃ ১৩৪) এই হৃদয়বোধের মধ্যে যে সকল বোধ শারীরিক মানসিক কষ্ট বা অন্য স্বার্থহানির ভয়-জনিত মানুষ তাদের মধ্য দিয়েই প্রবলভাবে উপলব্ধি

করে নিজেকে। মানুষ তার সমস্ত দুঃখকর ভাবগুলিকে ছাপিয়ে এক অপরূপ আত্মানুভূতির আনন্দ উপভোগ করে তার সাহিত্যিক মানসিকতার স্তরে।

সুতরাং দেখা যায় যে দুঃখের অনুভূতিই হোক আর সুখেরই হোক, যদি তা গভীর হয় তো তার ফলে আত্মানুভূতিই নিবিড় হয়। "আপনার কাছে আপনার প্রকাশের এই স্পষ্টতাতেই আনন্দ। অস্পষ্টতাতেই অবসাদ।" (সাঃ পঃ ১২৪)। এই আত্মোপলব্ধির আনন্দের কারণ আত্মচৈতন্যের বিস্তার-বোধ। কারণ ভাবযোগে মানুষ বহিপ্রকৃতি ও অপর মানুষের সঙ্গে মিলিত হয়। "সেই মনের বিশ্বের সম্মেলনে মনের দুঃখ জুড়িয়ে যায়, তখন সেই সাহিত্য থেকেই সাহিত্য জাগে।" (সাঃ পঃ ১৫৬)। "অনুভূতির গভীরতা দ্বারা বাহিরের সঙ্গে অন্তরের একাত্মবোধ যতটা সত্য হয় সেই পরিমাণে জীবনের আনন্দের সীমানা বেড়ে চলতে থাকে, অর্থাৎ নিজেরই সত্তার সীমানা।" (সাঃ পঃ ১২৫)। এই আত্মোপলব্ধির আনন্দ সুখের চেয়ে দুঃখের অনুভূতির মাধ্যমে বেশী মাত্রায় জাগরিত হয়। কারণ দুঃখের অনুভূতি সুখের চেয়ে নিবিড়। "দুঃখের তীব্র উপলব্ধিও আনন্দকর কেননা সেটা নিবিড় অস্মিতা-সূচক।......দুঃখে আমাদের স্পষ্ট করে তোলে, আপনার কাছে আপনাকে ঝাপসা থাকতে দেয় না। গভীর দুঃখ ভূমা, ট্র্যাজেডির মধ্যে সেই ভূমা আছে, সেই ভূমৈব সুখম্।" (সাঃ পঃ ৯)। "একদিন এই কথাটি আমার কোনো একটি কবিতায় লিখেছিলাম। বলেছিলাম, আমার অন্তরতম আমি আলস্যে, আবেশে, বিলাসের প্রশ্রয়ে ঘুমিয়ে পড়ে; নির্দয় আঘাতে তার অসাড়তা ঘুচিয়ে তাকে জাগিয়ে তুলে তবেই সেই আমার আপনাকে নিবিড় করে পাই; সেই পাওয়াতেই আনন্দ" (সাঃ পঃ ১৩৬)। কবিতাটি "ঝুলন"। মানুষের আত্মচেতনার মধ্যেই সুপ্ত আছে বিশ্বচেতনা, ব্যক্তিপুরুষের মধ্যেই পরমপুরুষের প্রকাশ। "বেদনা অর্থাৎ হৃদয়বোধ দিয়েই যাঁকে জানা যায়, জানো সেই পুরুষকে অর্থাৎ পার্সোন্যালিটিকে। আমার ব্যক্তিপুরুষ যখন অব্যবহিত অনুভূতি দিয়ে জানে অসীম পুরুষকে, জানে হৃদয় মনীষা মনসা, তখন তাঁর মধ্যে নিঃসংশয়রূপে জানে আপনাকেও।" (সাঃ পঃ ১৩৭)

এইরূপে ভারতীয় আধ্যাত্ম সাধনার প্রচলিত ধারণার সঙ্গে যুক্ত করে রবীন্দ্র-নাথ দুঃখের অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যে গৌরবপূর্ণ স্থান দিয়েছেন ও তার উপযোগিতা ব্যাখ্যা করেছেন। এমনিতেই কোন ভাব যখন নিবিড়ভাবে অনুভূত হয়ে সাহিত্যের মাধ্যমে অপর সকলের জন্য পরিবেশিত হয় তখন তার রস প্রতিপত্তি ঘটে যে কারণে সেই ভাব আর ব্যক্তিগত ও লৌকিক রূপে সাহিত্যিকের মনকে প্রভাবিত না ক'রে তার আত্মচেতনাকে উদ্বুদ্ধ করে এবং সেই সঙ্গে সেই আত্ম-চেতনার মধ্য অন্তর্নিহিত বিশ্বচেতনা ও সর্ব-মানবচেতনাকে জাগায়। সেই

জন্য সেই ভাবের সাধারণ যে ধর্ম্ম, সুখদুঃখ উৎপন্ন করা,—তাকে অতিক্রম ক'রে জাগে এক আনন্দ যা রসানুভূতি এবং যাকে অলঙ্কারশাস্ত্রে 'ব্রহ্মাস্বাদসহোদরা' ও অলৌকিক বলা হয়। রবীন্দ্রনাথ এই তত্ত্বের সঙ্গে যোগ করলেন একটি কথা যে দুঃখের ভাব এই রসানুভূতির ও আনন্দের পরিপন্থী না হয়ে সহায়কই হয় কারণ দুঃখের বোধ সুখ অপেক্ষা আরো নিবিড়। সুতরাং সাহিত্যে দুঃখের প্রকাশ সাহিত্যিক আনন্দের বিঘ্ন না হয়ে তার পরিপোষকই হয়।

এইখানে লক্ষ্য করতে হবে যে তিনি দুটি তত্ত্বের কথা বলেছেন। এক ভাবোপলব্ধির মাধ্যমে আত্মচেতনা ও বিশ্বচেতনা বা পরমপুরুষের বোধ ও তার আনন্দের তত্ত্ব, দ্বিতীয় ভাবোপলব্ধির মাধ্যমে বাহিরের প্রকৃতি ও মানুষের সঙ্গে সাহিত্যিক ও সাহিত্য-পাঠকের যোগ এবং সেই কারণে তাদের আত্মচেতনার বিস্তার ও তার আনন্দ। "আত্মার কার্য আত্মীয়তা করা" (পঞ্চভূত ৩২)। "মাকড়সা যেমন মাঝখানে থাকিয়া চারিদিকে জাল প্রসারিত করিতে থাকে, আমাদের কেন্দ্রবাসী আত্মা সেইরূপ চারিদিকের সহিত আত্মীয়তা বন্ধন স্থাপনের জন্য ব্যস্ত আছে ; সে ক্রমাগতই বিসদৃশকে সদৃশ, দূরকে নিকট, পরকে আপনার করিতেছে। বসিয়া বসিয়া আত্মপরের মধ্যে সহস্র সহস্র সেতু-নির্মাণ করিতেছে। ঐ যে আমরা যাহাকে সৌন্দর্য বলি সেটা তাহার সৃষ্টি। সৌন্দর্য আত্মার সঙ্গে জড়ের মাঝখানে সেতু।" (পঞ্চভূত ৩১)

এই দুটি তত্ত্ব ছাড়াও আর একটির কথা রবীন্দ্রনাথ কয়েক স্থলে বলেছেন যার সঙ্গে আমরা বর্ত্তমান প্রশ্নটিকে যুক্ত করে দেখে তার উত্তর নির্দ্দেশ করতে পারি। সেটি প্রকাশতত্ত্ব এবং এরই সঙ্গে জড়িত ঐক্যতত্ত্ব। মানুষ কেবল বেঁচে থাকে না, এমন কি তার বুদ্ধি ও জৈবিক প্রয়োজনের তাগিদে জ্ঞান আহরণেই তৃপ্ত থাকে না, সে আপনাকে প্রকাশ করতে চায়। "শরীরের পিপাসা ছাড়া আর এক পিপাসাও মানুষের আছে। সংগীত চিত্র সাহিত্য মানুষের হৃদয়ের সম্বন্ধে সেই পিপাসাকেই জানান দিচ্ছে। ভোলবার জো কী। সে যে অন্তর-বাসী একের বেদনা। সে বলছে, "আমাকে প্রকাশ করো, রূপে, রঙে, সুরে বাণীতে, নৃত্যে। যে যেমন পারো আমার অব্যক্ত ব্যথাটিকে ব্যক্ত করে দাও।" (সাঃ পঃ ৫৩)। এই প্রকাশের রূপ কী? যখন আমাদের কল্পনায় বা স্বতঃবোধে বস্তুর কোন সমগ্র রূপ ধরা পড়ে তখনই তার প্রকাশ হয় আমাদের কাছে এবং সেই সঙ্গেই আমাদের চৈতন্যেরও প্রকাশ হয়। "রসমাত্রেই তথ্যকে অধিকার ক'রে তাকে অনির্বচনীয়ভাবে অতিক্রম করে। রসপদার্থ বস্তুর অতীত এমন একটি ঐক্যবোধ যা আমাদের চৈতন্যে মিলিত হতে বিলম্ব করে না। এখানে তার প্রকাশ আর আমার প্রকাশ একই কথা।" (সাঃ পঃ ১২৮)। এই প্রকাশ ও অন্তর-বাহিরের সম্মেলনের মূলে আছে আত্মার দুটি তত্ত্ব। একটি এই যে আত্মার

ধর্ম্ম আত্মীয়তা ও আত্মপ্রকাশ করা, বিশ্বকে আত্মসাৎ করার আগ্রহ, কারণ সমস্ত বিশ্বই আত্মার বহিপ্রকাশ। দ্বিতীয়টি এই যে আত্মার মধ্যে যে ঐক্যভাব আছে তাহাই এক অর্থে অসীম বা ভূমা এবং বাহিরের কোন কিছুর মধ্যে যখন মানুষ সমগ্রতা বা ঐক্য দেখে তখন তার সঙ্গে মিলিত হয়। "কাব্যে চিত্রে গীতে শিল্পকলায় গ্রীক শিল্পীর বিচিত্র রেখার আবর্ত্তনে যখন আমরা পরিপূর্ণ এককে চরম রূপে দেখি তখন আমাদের অন্তরাত্মার একের সঙ্গে বহিলোকের একের মিলন হয়।" (সাঃ পঃ ৪৯)। "গোলাপ ফুলে আমরা সৌন্দর্য পাই। বর্ণে গন্ধে রূপে রেখায় এইফুলে আমরা একের সুষমা দেখি। এর মধ্যে আমাদের আত্মারূপী এক আপন আত্মীয়তা স্বীকার করে, তখন এর আর-কোনো মূল্যের দরকার হয় না। অন্তরের এক বাহিরের একের মধ্যে আপনাকে পায় বলে এরই নাম দিই আনন্দরূপ।" (সাঃ পঃ ৫০)। সংসারের কোন কিছুকে এই সামগ্রিকভাবে দেখা লৌকিক বা স্বার্থমূলক দেখা থেকে পৃথক যে দেখা খণ্ডিত। নিখিলকে ছিন্ন করে হয় লাভ, নিখিলকে এক করে হয় রস"। (সাঃ পঃ ৫২)। এই সমগ্রতার মধ্য অসীমের প্রকাশ। "অখণ্ড একের মূর্ত্তি যে আকারেই থাকনা, অসীমকেই প্রকাশ করে ; এইজন্যই সে অনির্বচনীয়, মন এবং বাক্য তার কিনারা না পেয়ে ফিরে ফিরে আসে।" (ঐ ৫১)

এখন এই দর্শনকোণ থেকে দেখলে দুঃখের অভিজ্ঞতাও আমাদের আনন্দে রূপান্তরিত হয় যদি সেই দুঃখকে লৌকিকভাবে খণ্ড তথ্যরূপে না নিয়ে তাকে একটি সমগ্র অখণ্ড সত্যরূপে উপলব্ধি করি। তখন সেই দুঃখই হয় উপলব্ধির বস্তু, তার মধ্যে একটি ঐক্যের ও অসীমতার প্রকাশ দেখি যেমন দেখি ভাল ট্র্যাজেডিতে। সেই অখণ্ড মূর্ত্তির মধ্য দিয়ে দুঃখের এক বৃহৎ তাৎপর্য ফুটে ওঠে। সুতরাং দেখা গেল যে সাহিত্যের মধ্যে দুঃখের স্থান থাকাতে তার আনন্দের কোন ব্যাঘাতের পরিবর্ত্তে নানা কারণে বৃদ্ধিই হয়। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-দর্শনের এই বিষয়টিকে তাঁর বিস্তৃত জীবন-দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে রেখে কয়েকটি গূঢ় মন্তব্য করেছেন। উপনিষৎ থেকে তিনি জেনেছেন যে "আনন্দ হতেই সমস্ত উৎপন্ন হয়, সমস্ত বাঁচে, আনন্দেরই দিকে সমস্ত চলে।" (সাঃ পঃ ৩০)। "শুধু তাই নয় , দুঃখের পরিমাপেই আনন্দের পরিমাপ" (ঐ)। "আনন্দ-রূপমমৃতং যদ্বিভাতি" (সাঃ পঃ ৪১, সাঃ ৯০)। উপনিষদ-বাক্য উদ্ধৃত ক'রে রবীন্দ্রনাথ বলেন যে আমাদের দেশে পরমপুরুষকে সচ্চিদানন্দ বলা হয়,—এই আনন্দের মধ্যেই প্রকাশের তত্ত্ব। (সাঃ পঃ ৪৬)

এই আনন্দ তাহলে সাধনালব্ধ, সহজ লভ্য নয়। বস্তুর যে সৌন্দর্যমূর্ত্তি গভীর সামগ্রিক-দৃষ্টিতে ধরা পড়ে তা নিছক মনোহারিতা থেকে ভিন্ন প্রকৃতির। এই সৌন্দর্য ও আনন্দের অনুভূতি সাধনা ও অনুশীলনের অপেক্ষা রাখে এবং

এর প্রকৃতি ও আবেদন সূক্ষ্ম ও মিশ্রিত ধরণের, এর মধ্য আপাতদৃষ্টিতে দুঃখকর ভাবের ও কুশ্রীতার স্থান থাকে। (সাঃ পঃ ১৪২)। এই উচ্চস্তরের সৌন্দর্য ও আনন্দ যথার্থ সাহিত্যের সামগ্রী। সাহিত্যস্থষ্টি তাই মধুর ভাবালুতার ব্যাপার নয়। এর মধ্যে অপ্রীতিকর ভাবের যথেষ্ট প্রবেশ আছে এবং এদের সাধনালব্ধ এক উচ্চ দৃষ্টিশিখর থেকে অবলোকন ক'রে সামগ্রিক রূপে উপলব্ধি করতে হয় সাহিত্যিককে। সাহিত্য তাই স্বতঃস্ফূর্ত্ত পৃথক পৃথক ভাবের উচ্ছ্বাস নয়। সাহিত্যে আবশ্যক ভাব সম্বন্ধে নিবিড় বোধ; ও মনুষ্যজীবন ও বিশ্বপ্রকৃতি যা ভাবের মাধ্যমে চিত্তে প্রবেশ করে তাদের সম্যক ও সামগ্রিক রূপদর্শন। তাহলে স্বীকার করতে হয় যে সাহিত্যকে যখন রবীন্দ্রনাথ ভাবপ্রকাশের ক্ষেত্র ও আনন্দের প্রকাশ বলেন তখন এই দুইটি কথাই একটু বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। সেই বিশেষ অর্থ দুটি বুঝতে পারলেই আমাদের বর্ত্তমান সমস্যাটির সুষ্ঠু সমাধান হয়।

সাহিত্য-দর্শনে রবীন্দ্রনাথের এই চিন্তাধারাটি যে কত প্রগাঢ় ও সুদূরপ্রসারী তা সহজবোধ্য। তুলনা করলে দেখা যায় যে পাশ্চাত্যে ও প্রতীচ্যে এই সমস্যাটির কোন উত্তরই তেমন সন্তোষজনক হয়নি। এরিষ্টটল বললেন যে ট্র্যাজেডিতে জীবনের অনুকরণ হয় এবং এই অনুকরণের এক স্বাভাবিক আনন্দ আছে এবং এর থেকে জীবন সম্পর্কে জ্ঞানও হয়। তাছাড়া মানুষের পক্ষে মাঝে মাঝে ভয় ও করুণার ভাব ভোগ করা ভাল, এর দ্বারা তার অন্তরে জমে ওঠা এই ভাবগুলির সুষ্ঠু নিষ্কাশন সম্ভব হয়। বলা বাহুল্য ট্র্যাজেডির আনন্দের অনুভূতিতে বাস্তব পক্ষে এরিষ্টটল বর্ণিত কোন প্রকার আনন্দই আমরা দেখতে পাই না। এরিষ্টটলের ক্যাথারসিস (Catharsis) কথাটির সাধারণ অর্থ মোক্ষন বা নিষ্কাশন, কিন্তু অন্য অর্থে পরিশোধনও হয় এবং কেউ কেউ বলেন যে এই দুঃখকর ভাবগুলির লৌকিক ভোগে মানুষের যে ব্যক্তিগত স্বার্থ আঘাত পায় নাটকে তার পরিবর্ত্তে সেগুলি আমাদের নৈর্ব্যক্তিক ও নিঃস্বার্থ মননের বিষয় হ'য়ে আনন্দকর হয়। একথা আমাদের রসবাদেও পাই। দুঃখের ভাবটি নাটকে অলৌকিক রসে রূপান্তরিত হয় এবং তখন দর্শকের নৈর্ব্যক্তিক চৈতন্যই আত্মপ্রকাশ করে ও নিজের আনন্দঘন স্বরূপটিই আস্বাদন করে। এই আত্মচৈতন্য দুঃখের ভাবটি দ্বারা অনুরঞ্জিত বা চিত্রিত হয় মাত্র; তার লৌকিক রূপ ও প্রভাব বিলুপ্ত হয়। এরিষ্টটল এই আনন্দঘন চৈতন্যের কথা বলেন নি, তবে অনুমান করা যেতে পারে যে তিনি এইরূপ মতবাদের সমর্থন করতেও পারতেন। (এ বিষয়ে লেখকের প্রবন্ধ "Catharsis in the light of Indian aesthetics", Journal of Aesthetics and Art Criticism, Dec. 1956. দ্রষ্টব্য)। তাহলেও তাঁর বা রসবাদীদের সাহিত্যিক আনন্দের

উৎপত্তি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণাগুলি বিশেষ সন্তোষজনক নয়। বরং কবি কীট্‌স ও অন্যান্য কয়েকজনের কথা বেশী সত্য বলে মনে হয় যে অনুভূতির নিবিড়তাই সাহিত্যে আনন্দের কারণ এবং এর সঙ্গে জড়িত থাকে সাহিত্যকার ও পাঠকের আত্মচেতনা। এই আত্মচেতনার ফলেই আমরা দুঃখের ভাবটি দ্বারা উত্তেজিত ও আত্মহারা না হয়ে তাকে মনন ও উপভোগ করতে সমর্থ হই। কিন্তু এই আত্মচেতনার আনন্দের কারণ ও প্রকৃতি, ব্যক্তিচৈতন্যের সঙ্গে সমষ্টি চৈতন্যের ও পরমপুরুষের সম্পর্ক ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য তত্ত্ব—এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন তার কিছুই কীট্‌সের বা তাঁর পরবর্ত্তী চিন্তায় পাই না। দার্শনিক কাণ্ট ও শিলার ও অপর কয়েকজন এই সমস্যাটির সমাধান করতে চেয়েছেন এক সূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্বের সাহায্যে। এঁদের মতে সাহিত্য-কলায় জীবন বা জগতের কোন বস্তু বা ভাব তার লৌকিকরূপে প্রকাশ পায়না ; তার আকার বা রূপ বা বিন্যাসমাত্রই প্রকাশিত হয়ে এক রকম বিশেষ ধরণের আনন্দের সৃষ্টি করে। কিন্তু একথা আমাদের অভিজ্ঞতা দ্বারা সমর্থিত হয় না। কাণ্টের মতে সাহিত্যে কোন ভাব প্রকাশ হয় না, সেখানে চলে মানুষের বুদ্ধিও কল্পনাশক্তির পরস্পরের সহিত স্বাধীন ক্রীড়া। সাহিত্যের এই রকম ব্যাখ্যা এতই বাস্তব-জীবন-সম্পর্ক-শূন্য ও বিমূর্ত্ত (formalistic) যে একে সত্য বলতে দ্বিধা হয়। অন্য কেহ কেহ বলেন যে সাহিত্যে দুঃখ আমাদের সেই প্রকার আনন্দ দেয় যেমন বাস্তব জগতে,যেখানে কোন ঘটনার বৈচিত্র্য ও বিশেষ ক'রে অপরের বিপর্যয় আমাদের কৌতূহল নিবৃত্তি করে ও একরকম স্বাভাবিক যদিও অন্যায় আনন্দ দেয়। এখানে যদি বলা যায় যে নাটকে নায়কের দুঃখ দেখে কারো কারো আনন্দের বদলে দুঃখই হয় তাহলে উত্তর হবে যে এই রকম দর্শকেরাও একরকম আনন্দ পায়—আত্মনির্যাতনের আনন্দ। এ ধরণের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ সাহিত্যদর্শনে বিশেষ কোন সুবিধা করে না। বলা বাহুল্য সাহিত্যিক আনন্দের ব্যাখ্যায় এই বিশ্লেষণ একেবারেই অবান্তর মনে হয়। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের আলোচনার সার্থকতা প্রচুর।

৬। সাহিত্য ও সত্য

এখন আমরা রবীন্দ্রসাহিত্যদর্শনের শেষ সমস্যাটির সম্মুখীন হই। সাহিত্য যদি ভাবপ্রকাশের ব্যাপার হয় তাহলে তার সত্যাসত্যের প্রশ্ন কী করে ওঠে ? অথচ রবীন্দ্রনাথ নিজেই সাহিত্যকে সত্যপ্রকাশের ক্ষেত্র বলেছেন। তিনি ক্রোচে প্রমুখ দার্শনিকদের মত এই সাহিত্যিক সত্যকে কেবল প্রকাশকার্যের সত্য বা আন্তরিকতা মনে করতেন না। "প্রকাশই হচ্ছে সাহিত্যের প্রথম

সত্য। কিন্তু ওইটেই কি শেষ সত্য?" (সাঃ ২১৭)। "এখন আমরা কেবল দেখিনে প্রকাশ পেলে কিনা, দেখি কতখানি প্রকাশ পেলে" (সাঃ ২১৭)। সুতরাং সাহিত্য কোন সত্যবস্তুকে প্রকাশ করে, বিষয়বস্তুর যাথার্থ্যের দ্বারাই তার মূল্যায়ন হয়, প্রকাশশক্তির উৎকর্ষের দ্বারা নয়। তাহলে প্রকাশের বিষয়-বস্তুর গুরুত্ব স্বীকার ক'রে তার প্রকৃতির ওপরই দৃষ্টি দিতে হবে সাহিত্য-চিন্তায়। অথচ এই বিষয়-বস্তু তো মানুষের ভাবসকল, তারা তো ব্যক্তিগত ও পরিবর্ত্তনশীল, এদের মধ্যে জ্ঞানের সামগ্রী কোথায়?

রবীন্দ্রনাথ ভাবপ্রকাশের মাধ্যমে মানবচরিত্রের প্রকাশকেই সাহিত্যের উদ্দেশ্য মনে করেন। তাঁর মতে মানুষের যতখানি সত্যরূপ যে সাহিত্যে পরিস্ফুট হবে সে সাহিত্য ততই সত্য ও মহান হবে। কারণ এই ভাব সাহিত্যের ব্যক্তিগত নয়, বিশ্বমানবেরই। এ কথা পূর্ব্বেই দেখেছি। মানুষ বিশ্বপ্রকৃতিকে তার অনুভূতি দ্বারা সামগ্রিক রূপে পায় এবং এই রূপটিই তার কাছে সত্য। কারণ অনুভূতির আন্তরিকতা ও নিবিড়তা দিয়েই এই সত্যের বিচার হয়। এই সত্য তাই সার্বিক মানব-সত্য। কারণ, বস্তুর প্রকাশ ও বিশ্বমানবের প্রকাশ একই সঙ্গে হয়, বা একই ব্যাপারের দুই দিক মাত্র। একে রসের সত্যও বলা চলে। "রসপদার্থ বস্তুর অতীত এমন একটি ঐক্যবোধ যা আমাদের চৈতন্যের সঙ্গে মিলিত হতে বিলম্ব করে না। এখানে তার প্রকাশ আর আমার প্রকাশ একই কথা।" (সাঃ পঃ ১২৮)। অথচ এই রসের সত্যেরও একটি সার্বিকতা ও নিত্যতা আছে। তা না হ'লে এই সাহিত্যিক ভাববস্তুকে কোনরূপেই সত্য আখ্যা দেওয়া চলে না।

এই সাহিত্যিক সত্য কিন্তু প্রাকৃত সত্য বা তথ্য থেকে বিলক্ষণ। তাহলে কি এই সত্য বিজ্ঞানের সত্য থেকে বড় না ছোট? রবীন্দ্রনাথ বলেন, বড়। কারণ মানুষ তাঁর কাছে আর সকলের উচ্চে। চণ্ডীদাসের বাণী—"সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই" রবীন্দ্রনাথ সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করেছিলেন। পুরাতন গ্রীক দার্শনিক প্রোটাগোরাসের কথা, "মানুষই সর্ব-বিষয়ের পরিমাপ" এই সত্যই নির্দেশ করে। সুতরাং সাহিত্য যখন ভাবপ্রকাশের মাধ্যমে মানুষের সত্যরূপটি দৃষ্টিগোচর করে তখন তার সত্য বিজ্ঞানের সত্যের চেয়ে বড় হয়। বিজ্ঞানও মানুষ সম্বন্ধে নানা তথ্যের সন্ধান দেয় এবং আধুনিক যুগে অনেক সাহিত্যে এই বৈজ্ঞানিক সত্যের ছাপ পাওয়া যায়। বিজ্ঞান দেখায় মানুষের মধ্যে জান্তব প্রকৃতির কত বড় অংশ আছে। মানুষের যৌন প্রবৃত্তি আদি অনেক হীন শারীরিক বৃত্তিগুলিকে দমনের বদলে প্রকারান্তরে চরিতার্থ করতেই শেখায়। আধুনিক সাহিত্যে তাই এসেছে এক ধরণের উচ্ছৃঙ্খলতা ও বেআব্রুতা। কিন্তু বিজ্ঞানের এ শিক্ষা সত্য হলেও নীচু স্তরের সত্য, কারণ মানুষের সত্য বলতে

সমগ্র মানুষের সত্য বোঝায় এবং এই সামগ্রিক মানুষকে বুঝতে হলে ভাবদৃষ্টি চাই। সেই ভাবদৃষ্টি দ্বারা দেখলে দেখা যায় যে মানুষের এই সব হীন প্রবৃত্তিগুলি বিকৃতি মাত্র, তারা বাস্তব হলেও সত্য নয়। (সাহিত্যের স্বরূপ, ৬৩)। মানুষ তার আদর্শকেই বড় সত্য মনে করে। সেই আদর্শের দিকেই সে চলতে চায় তার বাস্তব অবস্থাকে অতিক্রম ক'রে। সাহিত্যিকের ভাবদৃষ্টিতে মানুষের এই গৌরবময় রূপই স্পষ্ট ও সত্য হয়ে ধরা পড়ে। "সাহিত্যে শিল্পে এই যে তার মনের মত রূপ, এরই মূর্ত্তি নিয়ে ছিন্নবিচ্ছিন্ন জীবনের মধ্যে সে আপনার সম্পূর্ণ সত্য দেখতে পায়, আপনাকে চেনে" (সাঃ স্বঃ ৬৩) বৈজ্ঞানিক সত্যকে বড় মনে করা এবং তার দোহাই দিয়ে সাহিত্যে নির্লজ্জতার আমদানী করা—এসব রবীন্দ্রনাথ সহ্য করতেন না। (সাঃ পঃ ৮০—৮৫ দ্রষ্টব্য)। যদি এই বৈজ্ঞানিক সত্যকেই একমাত্র সত্য মনে করা হয় তো রবীন্দ্রনাথ বলবেন, "সাহিত্যে আমরা সত্য চাইনে মানুষ চাই।" (সাঃ ২২৫)

সুতরাং সাহিত্যিক বা রসভিত্তিক সত্যকে বৈজ্ঞানিক বা তথ্যমূলক সত্যের ওপরে স্থান দিতে হবে। প্রথমতঃ বিজ্ঞান মানব প্রকৃতির চেয়ে বহিঃপ্রকৃতি বা জড়জগত নিয়েই বেশী ব্যাপৃত এবং মানুষকেও এক জড় বিশেষ রূপে দেখতে চায়। দ্বিতীয়তঃ বিজ্ঞান মানুষের যে পরিচয় দেয় তা বাস্তব হলেও এক অর্থে সত্য নয় কারণ মানুষের আদর্শগত রূপই মানুষকে তার ভবিষ্যত উন্নত অবস্থায় নিয়ে যায়। সাহিত্য মানুষের এই সত্যতর ও মহত্তর রূপটিকে উদ্‌ঘাটিত করে। সাহিত্যকার যখন মানবভাবসকলকে প্রকাশ করে তখন প্রকৃতিবর্ণনা, চরিত্র-রচনা বা সৌন্দর্যসৃষ্টি উপলক্ষ্য মাত্র, তার উদ্দেশ্য মানুষকে তার সমগ্রতায় ও বৃহৎ পরিণাম-সত্যে প্রকাশ করা। মানুষের সেই সত্যটিকে সাহিত্যিক তার নিজের অন্তরেই মর্ম্মসত্যরূপে পায়। (সাঃ ২০৫) তার এই প্রতিভাকে বিশ্বমানবমন বলা যায় (সাঃ ২৫)। এবং সাহিত্যিক যখন তার ভাবরস সহযোগে প্রকৃতি বা মানুষের বর্ণনা করে তখন তার নিজের মানবত্বকে প্রকাশ করে এবং এই মানবত্বই বিশ্বমানবত্ব। এই মানবত্ব মানুষের কোন আংশিক শক্তি বা উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করে না, বরং তার সম্পূর্ণ চরিত্রেরই প্রকাশ। "লেখকের নিজের অন্তরে একটি মানবপ্রকৃতি আছে এবং লেখকের বাহিরে সমাজে একটি মানবপ্রকৃতি আছে; অভিজ্ঞতাসূত্রে প্রীতিসূত্রে এবং নিগূঢ় ক্ষমতা-বলে এই উভয়েরই সম্মিলন হয়; এই সম্মিলনের ফলেই সাহিত্যে নূতন নূতন প্রজা জন্ম গ্রহণ করে।" (সাঃ ২০২)। "সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ হচ্ছে মানবজীবনের সম্পর্ক। মানুষের মানবিক জীবনটা কোনখানে? যেখানে আমাদের বুদ্ধি এবং হৃদয়, বাসনা এবং অভিজ্ঞতা সবগুলি গ'লে গিয়ে মিশে গিয়ে একটি সম্পূর্ণ ঐক্যলাভ করেছে। যেখানে আমাদের বুদ্ধি প্রবৃত্তি এবং রুচি সম্মিলিতভাবে

কাজ করে। এক কথায়, যেখানে আদত মানুষটি আছে। সেইখানেই সাহিত্যের জন্ম লাভ হয়। মানুষ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় খণ্ড খণ্ড ভাবে প্রকাশ পায়। সেই খণ্ড অংশগুলি বিজ্ঞান দর্শন প্রভৃতি রচনা করে,—পর্যবেক্ষণকারী মানুষ বিজ্ঞান রচনা করে, চিন্তাশীল মানুষ দর্শন রচনা করে, এবং সমগ্র মানুষটি সাহিত্য রচনা করে।" (সা: ২০৩—৪)। "আমি গীতিকাব্যই লিখি আর যাই লিখি কেবল তাতে যে আমার ক্ষণিক মনোভাবের প্রকাশ হয় তা নয়, আমার মর্মসত্যটি তার মধ্যে আপনার ছাপ দেয়। মানুষের জীবনকেন্দ্রগত এই মূল সত্য সাহিত্যের মধ্যে আপনাকে নানা আকারে প্রতিষ্ঠিত করে।" (সা: ২০৫)। "অন্তরের প্রকৃতি, বাহিরের জ্ঞান এবং আজন্মের সংস্কার আমাদের জীবনের মূলদেশে মিলিত হয়ে একটি অপূর্ব ঐক্য লাভ করেছে; সাহিত্য সেই অতিদুর্গম অন্তঃপুরের কাহিনী।" (সা: ২২২–৩)। "অতএব মানুষ আপনার আনন্দ প্রকাশের দ্বারা সাহিত্যে কেবল আপনারই নিত্যরূপ, শ্রেষ্ঠরূপ, প্রকাশ করিতেছে।" (সা: ৮৬)

আমরা দেখলাম রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের যথার্থ বিষয়বস্তু বলতে মানুষের সম্পর্কে সমগ্র সত্যকে বোঝেন। সাহিত্যের যে সাক্ষাৎ বিষয়-বস্তু,—মানুষের নানা ভাবমিশ্রিত বহিঃপ্রকৃতি ও মনুষ্য-চরিত্রের নানা রূপবর্ণনা,—তার সার্থকতা শুধু সাহিত্যিকের নিজের আত্মপ্রকৃতির পরোক্ষ প্রকাশ। এখন যেহেতু সৎ-সাহিত্যিকের আত্মপ্রকৃতি বিশ্বমানবপ্রকৃতিরই প্রতিভূ, সাহিত্যের প্রকৃত বিষয়বস্তু মানবপ্রকৃতি। এই বিষয়বস্তুর সত্যাসত্যের ওপরই সাহিত্যের ভালমন্দ নির্ভর করে। সুতরাং শেষ পর্যন্ত সাহিত্যিকের ব্যক্তিত্বের ওপরই তার রচিত সাহিত্যের সত্য প্রতিষ্ঠিত। যদি সে ব্যক্তিত্ব মানবপ্রকৃতির যথার্থ প্রতিনিধিত্ব না করে, যদি তা সংকীর্ণ হয়, তাহলে তার সৃষ্ট সাহিত্যও সেই অনুপাতে মিথ্যা হবে। কিন্তু সত্য মানব প্রকৃতি কী তা কে নিশ্চয়ভাবে বলবে? এবং যদি তা না বলা যায় তাহলে সাহিত্যিকের ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণতা ও সাহিত্যের সত্য সম্বন্ধেও কোন স্থির জ্ঞান হয় না। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস যে সৎসাহিত্যিক নিজের 'অনুভূতি ও আত্মপ্রসাদ' দ্বারা নিশ্চয়ভাবেই জানে তার সত্য। (সা: ২৪–২৫)। এবং এই সাহিত্য-প্রতিভার মত সাহিত্য বিচারের প্রতিভাও পাওয়া যায়। কিছু সংখ্যক এমন সাহিত্য-রসিক সব সময়ই থাকে যাদের পরখ করবার শক্তি অসামান্য। "সাহিত্যের নিত্য বস্তুর সহিত পরিচয় লাভ করিয়া নিত্যত্বের লক্ষণগুলি তাঁহারা জ্ঞাতসারে এবং অলক্ষ্যে অন্তঃকরণের সহিত মিলাইয়া লইয়াছেন; স্বভাবে এবং শিক্ষায় তাঁহারা সর্বকালীন বিচারকের পদ গ্রহণ করিবার যোগ্য।" (সা: ২৯)। সুতরাং এবিষয়ে সত্যাসত্যের প্রমাণ এইরূপ প্রতিভাবান ব্যক্তিদের অভিমত। যেহেতু এই সত্য

প্রাকৃত ঘটনা বা তথ্যের সত্য নয় বরং অনুভূতি বা উপলব্ধির বিষয়, এ আদর্শগত বা ভাবনির্ভর, যেহেতু এর বিচার হ'বে মহানুভব ব্যক্তিদের অনুভব দ্বারা। এখানে প্রশ্ন ওঠে যে যদি এই মহানুভব ব্যক্তিরাও পরস্পরের সহিত একমত না হন্ তাহলে কী হবে? প্রকৃত পক্ষে মানুষের প্রকৃতি ও আদর্শ সম্পর্কে বিশ্বের সকল মনস্বীদের সর্বাঙ্গীন মতৈক্য নেই তবে কার্যকরী-ভাবে এ বিষয়ে আমরা একটি মোটামুটি মতসমষ্টিকে সর্বমহামতিসম্মত বলে ধরতে পারি। বিশ্বের মহৎ কবি ও দার্শনিকদের মানুষ সম্বন্ধে ধারণাগুলিকে পাশাপাশি রাখলে তাদের মধ্যে একটি মিল পাওয়া যায়। এই মিলটুকুকে সত্য জ্ঞান করে তার আদর্শেই কোন সাহিত্যের সারবত্তা বিচার করতে হবে। এ বিষয়ে ভালমন্দ বিচারের আরও নির্ভরশীল কোন উপায় নেই।

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের এই সত্যকে সৌন্দর্যের সঙ্গে একীকরণ করেছেন কারণ সৌন্দর্য বলতে তিনি ভাবের বা অনুভূতির অখণ্ডতা ও নিবিড়তা বোঝেন এবং এতেই যথার্থ আনন্দের স্বাদ পেয়েছেন। "জ্ঞান যেমন ক্রমে ক্রমে সমস্ত সত্যকেই আমাদের বুদ্ধিশক্তির আয়ত্তের মধ্যে আনিবার জন্য নিয়ত নিযুক্ত রহিয়াছে, সৌন্দর্যবোধও তেমনি সমস্ত সত্যকেই ক্রমে ক্রমে আমাদের আনন্দের অধিকারে আনিবে; এই তাহার একমাত্র সার্থকতা।" (সাঃ ৭৬)। "জগতের মধ্যে সৌন্দর্যকে এইরূপ সমগ্রভাবে দেখিতে শেখাই সৌন্দর্যবোধের শেষ লক্ষ্য। ......বিশ্বের সমগ্রের মধ্যে মানুষের এই সৌন্দর্যকে দেখার বৃত্তান্ত, জগৎকে তাহার আনন্দের দ্বারা অধিকার করিবার ইতিহাস, মানুষের সাহিত্যে আপনা-আপনি রক্ষিত হইতেছে।" (সাঃ ৭৭)। এই সৌন্দর্যকে রবীন্দ্রনাথ নিছক রমণীয়তা থেকে এবং আনন্দকে সুলভ ইন্দ্রিয়জ রূপসম্ভোগের সুখ থেকে পৃথক করেছেন। (সাঃ ৪০–৪৪)। সৌন্দর্যানুভূতিতে থাকে এক সমগ্রতা ও অসীমতা যার আবেদন চিত্তের উচ্চস্তরে। এই অনুভূতির জন্য চাই সংযম, সামঞ্জস্য-বোধ, অনুশীলন। (সাঃ পঃ ১৪২)। কারণ এই সৌন্দর্যে আছে চরিত্র, কেবল লালিত্য নেই। এ অরূপ যার প্রকাশ হয় রূপের মাধ্যমে, এ এক সত্য যার আবির্ভাব হয় রসের আধারে। "সাহিত্যকলার ক্ষেত্রে যারা পেটুক তারাই রূপের লোভে অতি-ভোগের সন্ধান করে—তাদের মুক্তি নেই। কারণ রূপের মধ্যে সত্যের আবির্ভাব হলে সত্য সেই রূপ থেকেই মুক্তি দেয়।" (সাঃ পঃ ৬৯)। "কলাসৃষ্টিতে রস-সত্যকে প্রকাশ করবার সমস্যা হচ্ছে—রূপের দ্বারাই অরূপকে প্রকাশ করা, অরূপের দ্বারা রূপকে আচ্ছন্ন করে দেখা, ঈশোপনিষদের সেই বাণীটিকে গ্রহণ করা, পূর্ণের দ্বারা সমস্ত চঞ্চলকে আবৃত ক'রে দেখা এবং মা গৃধঃ—লোভ কোরনা—এই অনুশাসন গ্রহণ করা।" (ঐ পৃষ্ঠা)। এই সত্য, সুন্দর ও আনন্দ আবার মঙ্গলময়ও বটে। কারণ মঙ্গল বলতে রবীন্দ্রনাথ অনুভতির নিবিড়তা,

ঐশ্বর্য ও সামঞ্জস্য বুঝতেন, একে প্রয়োজন-সাধনের ধারণা দিয়ে সংকীর্ণভাবে দেখেন নি। "বস্তুত মঙ্গল মানুষের নিকটবর্ত্তী অন্তরতম সৌন্দর্য" (সাঃ ৪৪)। "বস্তুত সৌন্দর্য যেখানেই পরিণতি লাভ করিয়াছে সেখানেই সে আপনার প্রগল্‌ভতা দূর করিয়া দিয়াছে।......সেই পরিণতিতেই সৌন্দর্যের সহিত মঙ্গল একান্ত হইয়া উঠিয়াছে।" (সাঃ ৪৭)। মানুষের সৌন্দর্যানুভূতিতে তার কল্যাণ-বোধ যোগ দেয়। তাই তার সাহিত্য-কলায় তার সৌন্দর্যসৃষ্টি অর্থে তার আদর্শ রূপটির স্থাপনাই বোঝায়। "সেখানে কল্যাণী সতী সুন্দর হইয়া দেখা দেন, কেবল রূপসী নহে।" (সাঃ ৪৯)

এখন রবীন্দ্রনাথের এই মতটি বিচার করলে তার মৌলিকতা নজরে পড়ে। সাহিত্যের সত্যকে তিনি একদিকে যেমন প্রাকৃত বিষয়বস্তুর সত্য থেকে ভিন্ন করেছেন অপরদিকে তেমনি আবার তিনি একে প্রকাশের ঐকান্তিকতা বা অনুভূতির নিবিড়তা মাত্র বলে একটি আকারগত (formal) তত্ত্বে পর্যবসিত করেন নি। তাঁর মতে সাহিত্যানুভূতির একটি নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু আছে অথচ এটি ভাবধর্মী এবং এর সত্য নির্ভর করে মহানুভব ব্যক্তিদের অন্তর্দৃষ্টি বা স্বতঃ-বোধের ওপর। এই সত্যটি মানুষের মর্মসত্য। মানুষের স্বরূপ কী, তার পরিণতি কোথায়, তার দুঃখদুর্দশা, আশাআকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়ে তার ভবিষ্যৎ তার কোন রূপটিকে ফুটিয়ে তুলতে চায় সেইটেই সাহিত্যের বিষয়বস্তু। এখানে দেখি রবীন্দ্রনাথের মানবধর্ম তাঁর সাহিত্য-দর্শনকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। যেখানে অনেক পাশ্চাত্য ও ভারতীয় সাহিত্যচিন্তকেরা সাহিত্যকে সযত্নে দর্শন বা ধর্ম্ম থেকে পৃথক করেছেন এবং সাহিত্য মানুষের কোন প্রয়োজন সাধন করে না এমন দেখিয়েছেন, সেখানে রবীন্দ্রনাথ পরোক্ষভাবে বলেছেন সাহিত্যে আমরা রসের মাধ্যমে আত্মজ্ঞানই পাই এবং আনন্দ ও সৌন্দর্যের যোগে জীবনের গতিবিধি সম্বন্ধে শিক্ষা পাই। এক কথায় সাহিত্য আমাদের সামনে জীবনের আদর্শ তুলে ধরে এবং যেদিকে আমাদের সত্য প্রকৃতি অনুসারে আমরা চলেছি সেই দিকে আরো সচেতন ও নিশ্চিত পদে চলতে সাহায্য করে। সাহিত্যের এই ধরণের ধারণা কিছুটা এরিষ্টটলের মধ্যে পাই যেখানে সাহিত্যিক যেন প্রকৃতির মধ্যস্থিত তার পরিণামকারণকে উদ্‌ঘাটিত ক'রে তার বিকাশের সাহায্য করে। রবীন্দ্রনাথ কেবল মানুষের বিকাশ সম্বন্ধেই এই ধরণের কথা বলেন। অথচ তিনি সাহিত্যিককে দার্শনিক বা নীতিবিদ্‌ হতে বলেন না। সাহিত্যিক মানবহৃদয়ের ভাবপ্রকাশের কাজ নিয়েই সাক্ষাৎভাবে ব্যাপৃত। বিশ্বচরাচর ও মানবজীবন কত রূপে তার চিত্তে প্রবেশ ক'রে কত বিচিত্রভাব জাগায় তার বর্ণনাই সাহিত্যের সাক্ষাৎ উদ্দেশ্য। কিন্তু এই ভাবগুলির দ্বারাই সাহিত্যিকের ব্যক্তিমানস প্রকাশ পায় এবং যে পরিমাণে তার ব্যক্তিমানস বিশ্ব-

মানসের প্রতিরূপ সেই পরিমাণে তার সাহিত্য মানবসত্যের প্রকাশক। এইরূপ কথা কবি শেলীও কিছুটা বলেছেন। নাটকের উপযোগিতার কথা বলতে তিনি বলেন যে নাটক আমাদের আত্মজ্ঞান ও আত্মমর্যাদা দেয়। তিনি কবিকে মনুষ্য-সমাজের দ্রষ্টা ও নিয়ামক বলেছেন। অথচ তিনি সাহিত্যকে দর্শন বা নীতি শিক্ষার পর্যায়ে ফেলেন নি। কবি কীট্‌সও এই রকম সাহিত্যে কোন দার্শনিক অভিসন্ধির বিরোধী ছিলেন অথচ তিনি সাহিত্যের মানবধর্মিতায় বিশ্বাসী ছিলেন। কবিকল্পনায় সুন্দররূপে যা ধরা পড়ে তাই সত্য। (What imagination seizes as beauty is true, whether it existed before or not)। সাহিত্যের এই মানবিক দিকটির প্রতি অনেকেই জোর দিয়েছেন, যেমন টলষ্টয় ও রোঁমা রোঁলা, কিন্তু সেই সঙ্গে সাহিত্যকে দর্শন বা নীতিশাস্ত্র থেকে পৃথক রাখার উপায় সম্বন্ধে সার্থকভাবে কোথাও নেই। সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ পথপ্রদর্শক। দর্শন বা নীতিধর্মের সঙ্গে মিশিয়ে ফেললে সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যহানি হয়। অথচ এই বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করতে গিয়ে অনেকে সাহিত্যকে প্রকাশ ব্যাপারের রূপমূলক (formal) ধর্মেই আবদ্ধ করেছেন, তার বিষয়বস্তু বা বক্তব্য বলে কিছু স্বীকার করেন নি। কাব্যের আদর্শ ভাষা-হীন সঙ্গীত, একথা বললেন ওয়ালটার পিটার এবং আধুনিক কালে মালার্মে ও এলিয়ট প্রমুখ কবি এই আদর্শ কার্যে প্রয়োগ করেন। কিন্তু এ ধরণের কাব্য কেমন অসার মনে হয়। অথচ কাব্য যদি প্রত্যক্ষভাবে ধর্ম্ম দর্শন বা নীতি-মূলক কথা বলে তাহলে তার জাত যায়। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ নির্দেশিত ধারণাটিতে আসতে হয়। সাহিত্যের অব্যবহিত বা উপস্থিত কাজ জগৎ ও জীবনকে হৃদয়ের ভাবরসে জারিয়ে তোলা, কিন্তু তার চরম উদ্দেশ্য এই ভাবরসের মাধ্যমে মানুষের একটি সমগ্র বা আদর্শ রূপ ফুটিয়ে তোলা যে-রূপ পাঠকচিত্তে জাগাবে প্রেরণা। সেইজন্য সাহিত্যিককে হতে হবে মানুষের আদর্শ প্রতিনিধি, দায়িত্বহীন কলাকৌশলী বা রূপকার হলেই হবে না। মানব জীবনের অর্থ ও মানবচরিত্রের মর্ম উদ্‌ঘাটন করাই তার প্রকৃত কাজ। সাহিত্যের সত্য বলতে তাই মানুষ সম্পর্কিত তত্ত্বকে বুঝতে হবে।

রবীন্দ্রনাথের লোক-সাহিত্য বিচার

আশুতোষ ভট্টাচার্য

লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন উপকরণের সংগ্রহ কার্য যেমন কঠিন, ইহার বিচারও তেমনই জটিল। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য জগতে লোক-সাহিত্য সংগ্রহের যে পদ্ধতি সাধারণতঃ গ্রহণ করা হইয়া থাকে, তাহা প্রধানতঃ যান্ত্রিক। এমন কি, যন্ত্রের সাহায্যে তাহা অনেক ক্ষেত্রেই সংগৃহীত হইয়া তাহা ভিত্তি করিয়াই ইহার আলোচনা হইয়া থাকে। আজ হইতে সত্তর বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁহার 'লোক-সাহিত্য' গ্রন্থের উপকরণগুলি সংগ্রহ করেন, তখনও পাশ্চাত্ত্য দেশে এই যান্ত্রিক পদ্ধতিতে লোক-সাহিত্যের উপকরণ সংগৃহীত হইবার সূচনা দেখা দেয় নাই, তথাপি তখনও সেখানে যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হইত, তাহা অনেকটা যান্ত্রিক নিয়মেরই অনুসারী ছিল। তথাপি এ' কথা সত্য, তাহাতে কতকটা হৃদয়ের স্পর্শও অনুভব করা যাইত। রবীন্দ্রনাথের লোক-সাহিত্য সংগ্রহের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, তিনি এই বিষয়ক যে যান্ত্রিক নিয়মটি আধুনিক যুগে প্রবর্তিত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কতকগুলি বিভিন্নমুখী দিক হইতে লোক-সাহিত্যের উপকরণ সংগৃহীত হইতে পারে; প্রথমতঃ ভাষাতত্ত্বের দিক। ইহাতে প্রাদেশিক শব্দের উচ্চারণ বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার প্রয়োজন হয় বলিয়া প্রতিটি শব্দ ও তাহার উচ্চারণের খুঁটিনাটি সম্পর্কে সতর্ক থাকিবার প্রয়োজন। সামগ্রিক ভাব, কিংবা রস কিংবা চিত্রের পরিবর্তে এখানে শব্দ দেহের গঠনটিই লক্ষ্য। সুতরাং ইহা সাহিত্যের প্রয়োজন নহে, ব্যাকরণের প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার লোক-সাহিত্য সংগ্রহের ভিতর দিয়া যে এই পথ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহা সকলেই জানেন। এমন কি, কোন কোন শব্দ যেখানে তাঁহার নিজস্ব আদর্শ ও নীতিবোধে আঘাত করিয়াছে, সেখানে তিনি সমগ্র বিষয়টিই পরিত্যাগ করিয়াছেন। একটি মাত্র ক্ষেত্রে একটি ছড়া তিনি পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই, তবে তাঁহার একটি আপত্তিকর শব্দ তিনি পাঠকের নিকট অনেক জবাবদিহি করিয়া তবে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহার কথা পরে বলিব।

ভাষাতত্ত্ব না হইলেও বাংলা ব্যাকরণের আলোচনার জন্য বাংলা দেশে লোক-সাহিত্যের উপকরণ রবীন্দ্রনাথের পূর্বেও কেহ কেহ সংগ্রহ করিয়াছেন। খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকগণ যখন এদেশে আসিয়া বাংলা ভাষা শিক্ষায় মনোযোগী হইয়াছিলেন, তখন তাঁহারাই নিজেদের প্রয়োজনে বাংলা ব্যাকরণ প্রণয়ন

করিয়াছিলেন ; সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুসরণ করিয়া তাঁহারা বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন নাই, বাংলা ভাষার প্রত্যক্ষ প্রয়োগের ক্ষেত্র হইতে তাঁহারা বাংলার রূপটি সন্ধান করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, সেই জন্য বাংলার পল্লীজীবন হইতে তাহার ভাষার নিদর্শন সন্ধান করিতে গিয়া তাঁহারা কিছু কিছু বাংলা প্রবাদ সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই সূত্রেই বাংলার লোক-সাহিত্য রূপে বাংলার প্রবাদই প্রথম সংগৃহীত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের লোক-সাহিত্য সংগ্রহের মধ্যে কোন প্রবাদ স্থান পায় নাই। অর্থাৎ ভাষাতত্ত্ব কিংবা বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রচনার উপযোগী হইবে ভাবিয়া তিনি তাঁহার লোক-সাহিত্যের উপকরণ সংগ্রহ করেন নাই। বাংলার আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক ভাষা সম্পর্কে অনুসন্ধানে ব্রতী হইয়া উনবিংশ শতাব্দীতে একজন বিশিষ্ট পাশ্চাত্ত্য ভাষা-তত্ত্ববিদ্ বাংলা লোক-সাহিত্যের কিছু কিছু উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তিনি স্যার জর্জ গ্রীয়ারসন, তবে তিনি উপরোক্ত খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকদিগের মত প্রবাদ মাত্র সংগ্রহ করেন নাই, বাংলা লোক-সাহিত্যের অন্যান্য কয়েকটি বিশিষ্ট উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি উত্তর বাংলার কৃষকদের নিকট হইতে শুনিয়া 'মাণিক চন্দ্র রাজার গান' নামে যে গীতি-কাহিনী প্রকাশ করিলেন, তাহাই বাংলার লোক-সাহিত্যে প্রথম সংগৃহীত গীতিকা বা Ballad। তারপর তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষা সমীক্ষা (Linguistic Survey) প্রসঙ্গে ইহার বিভিন্ন অঞ্চলের লোক-গীতিও কিছু কিছু মুদ্রিত করিয়া প্রকাশিত করিয়াছিলেন। মূলতঃ ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক আলোচনার সুবিচারের জন্যই তিনি ইহাদিগকে প্রকাশিত করিলেও ইহাদের দ্বারা আরও একটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল, ইহারা প্রবাদমাত্র ছিলনা বলিয়া ইহারা একটি পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যিক আবেদন প্রকাশ করিতেও সমর্থ হইল ; তাহার ফলেই বাংলা লোক-সাহিত্যের অনুরূপ বিভিন্ন উপকরণের অনুসন্ধানের জন্য অনেকের মনেই আগ্রহ সৃষ্টি হইল। একদিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিতে গেলে, স্যার জন গ্রীয়ারসনকেই বাংলা গীতিকা ও লোক-সঙ্গীতের সর্বপ্রথম সংগ্রাহক বলা যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পরবর্তীকালে বাংলা লোক-সাহিত্যের উপকরণ সংগ্রহ কার্যে ব্রতী হইয়া কিছু কিছু গ্রাম্যসঙ্গীত সংগ্রহ করিলেও কোনও গীতিকা তাঁহার সংগ্রহে স্থান পায় নাই। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার লোক-সাহিত্য-বিষয়ের আলোচনায় নিজের সংগ্রহ ব্যতীত অন্য কাহারও সংগ্রহের উল্লেখ করেন নাই ; সুতরাং দেখা যায়, বাংলা ভাষাতত্ত্ব কিংবা ব্যাকরণ রচনার জন্য সেদিন লোক-সাহিত্যের যে সকল উপকরণ সংগৃহীত হইতেছিল, রবীন্দ্রনাথ তাহাদের বিষয় কিছুমাত্র অবগত ছিলেন না।

আধুনিক পাশ্চাত্ত্য দেশে সমাজ-বিজ্ঞান কিংবা নৃতত্ত্ববিষয়ক আলোচনার

জন্যও অনেক সময় লোক-সাহিত্যের উপকরণ অবলম্বন করা হইয়া থাকে এবং সেই প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন উপকরণ সংগৃহীত হইয়া থাকে। সমাজ-বিজ্ঞান কিংবা নৃতত্ত্ব বিষয়ক আলোচনা আমাদের দেশে এখনও নিতান্ত অপরিণত অবস্থায় আছে এবং এই উদ্দেশ্যে এই পর্যন্ত কেহ আজও লোক-সাহিত্যের উপকরণ সংগ্রহ কিংবা তাহার ব্যবহার করেন নাই। রবীন্দ্রনাথ যদিও ইহাদের এই বিষয়ক মূল্য উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন বলিয়াই মনে হয়, তথাপি এই উদ্দেশ্যে তাহার উপকরণ সমূহ তিনি সংগ্রহ করেন নাই। সমাজ-বিজ্ঞান কিংবা নৃতত্ত্ববিষয়ক আলোচনার জন্য লোক-সাহিত্যের যে উপকরণ সংগৃহীত হয়, তাহা সংগ্রাহকের ব্যক্তিগত নীতি ও রুচিবোধ দ্বারা কোন দিক দিয়াই নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে না—সমাজের মধ্যে যাহা যে ভাবে প্রচলিত আছে, তাহা কোন দিক দিয়া পরিবর্তিত কিংবা মার্জিত করিয়া লইবার অধিকার কাহারও নাই, অবশ্য লোক-সাহিত্যের সকল উপকরণ সম্পর্কেই এই কথা প্রযোজ্য, তথাপি সাধারণ লোক-সাহিত্য সংগ্রাহক যেমন তাঁহার রুচি এবং নীতিবোধের অনুগামী না হইলে লোক-সাহিত্যের বিশেষ কোন উপকরণ সংগ্রহ না করিয়া তাহা পরিত্যাগ করিতে পারেন, সমাজ কিংবা নৃতত্ত্ববিদ্ তাহা পারেন না, তাহাতে সকল কিছুই যথাযথ সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিতে হয়; গ্রাম্য জীবনের স্থূল পরিচয় তাঁহার পরিত্যাগ করিবার যেমন অধিকার নাই, মার্জিত করিবারও কোনও অধিকার নাই। রবীন্দ্রনাথ এইভাবে তাঁহার লোক-সাহিত্যের উপকরণগুলি সংগ্রহ করেন নাই। একটি দৃষ্টান্ত দিলেই এই বিষয়ে কি নীতি যে তিনি অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাহা সম্যক বুঝিতে পারা যাইবে। তিনি, 'আজ দুর্গার অধিবাস, কাল দুর্গার বিয়ে' এই ছড়াটি সংগ্রহ করিতে গিয়া ইহার শেষ চরণের অর্ধেক অংশ পরিবর্তন করিয়াছেন এবং ইহার জন্য তিনি পাঠক সমাজের নিকট অত্যন্ত বিনীতভাবে নিবেদন করিয়াছেন,—

'এইখানে, পাঠকদিগের নিকট অপরাধী হইবার আশঙ্কায় ছড়াটি শেষ করিবার পূর্বে দুইটি একটি কথা বলা আবশ্যক বোধ করি। যে ভগিনীটি আজ খাটের খুরা ধরিয়া দাঁড়াইয়া অজস্র অশ্রুমোচন করিতেছেন তাঁহার পূর্ব ব্যবহার কোনো ভদ্রকন্যার অনুকরণীয় নহে। বোনে বোনে কলহ না হওয়াই ভাল, তথাপি সাধারণতঃ এরূপ কলহ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু তাই বলিয়া কন্যাটির মুখে এমন ভাষা ব্যবহার হওয়া উচিত হয় না, যাহা আমি অদ্য ভদ্রসমাজে উচ্চারণ করিতে কুণ্ঠিত বোধ করিতেছি। তথাপি সে ছত্রটি একেবারেই বাদ দিতে পারিতেছি না। কারণ, তাহার মধ্যে কতকটা ইতর ভাষা আছে বটে, কিন্তু তদপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে বিশুদ্ধ করুণ রস আছে। ভাষান্তরিত করিয়া বলিতে গেলে মোট কথা এই দাঁড়ায় যে, এই রোরুদ্যমানা বালিকাটি ইতিপূর্বে কলহকালে তাঁহার সহোদরাকে ভর্তৃখাদিকা বলিয়া অপবাদ

করিয়াছেন। আমরা সেই গালিটিকে অপেক্ষাকৃত অনতিরূঢ় ভাষায় পরিবর্তন করিয়া নিম্নে ছন্দ পূরণ করিয়া দিলাম।

বোন কাঁদেন বোন কাঁদেন খাটের খুরো ধরে।
সেই যে বোন গাল দিয়েছেন স্বামীখাকী ব'লে॥

কোন শব্দটিকে যে রবীন্দ্রনাথ এখানে 'ইতর ভাষা' বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে, অথচ এ' কথা সত্য এই শব্দটি দীনবন্ধু, অমৃতলাল প্রভৃতির রচনার মধ্যে প্রায় সর্বত্রই ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট নীতি, রুচি ও রসবোধ পল্লী হইতে সংগৃহীত ছড়ার মধ্যেও ইহাকে গ্রহণ করিবার পক্ষপাতী ছিল না। কিন্তু এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, রবীন্দ্রনাথ এ' কথাও মনে করেন নাই যে, ইহা উন্নত রুচি ও নীতিবোধ আঘাত করে বলিয়া ইহা সর্বথা পরিত্যাজ্য। তিনি যে কৈফিয়ৎ দিয়াছেন, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেই তিনি বিশেষ একটি শব্দ পরিবর্তন করিয়া লইয়াছেন, পরিবর্তন করিতে না হইলে তিনিই সর্বাপেক্ষা সুখী হইতেন। ছড়ার প্রত্যেকটি শব্দই যে একটি রস, বাক্য ও চিত্রগত অখণ্ডতা রক্ষার সহায়ক, তাহা তিনি যথার্থই উপলব্ধি করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার ভদ্র সমাজে পরিবেশনের করিবার মত যোগ্যতা থাকাও যে আবশ্যক এ' কথা তিনি মনে করিতেন। এই মনোভাব কিংবা রুচিবোধ দ্বারা লোক-সাহিত্যের যে উপকরণ সংগ্রহীত হইতে পারে, তাহা সাহিত্য রসোপলব্ধির যতখানিই সহায়ক হউক, অন্ততঃ সমাজ কিংবা নৃতত্ত্ববিদের প্রয়োজনীয়তা সিদ্ধ করিতে পারে না; কারণ, সমাজ কিংবা নৃবিদ্যা আলোচনার জন্য সকল তথ্যই প্রয়োজনীয় কোন কিছুই বর্জনীয় নহে। এমন কি সমাজের গালাগালির ভাষা ও সমাজতত্ত্ববিদের আলোচনার বিষয় হইয়া থাকে।

কেহ কেহ এ কথা মনে করিতে পারেন যে, ইতিহাস রচনার প্রয়োজনেও লোক-সাহিত্যের উপকরণ ব্যবহৃত হইতে পারে। স্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে রংপুরের কৃষক সমাজ হইতে সংগৃহীত গোপী-চন্দ্র বিষয়ক গীতি-কাহিনীতে একাদশ শতাব্দীর সমাজ-চিত্রের সন্ধান পাইয়াছেন। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য লোকশ্রুতিবিদ্‌গণ লোক-সাহিত্যের কোন বিষয়ের মধ্যেই নিরবচ্ছিন্ন ঐতিহাসিক তথ্য সন্ধান করিবার পক্ষপাতী নহেন। ইতিহাস রচনার প্রয়োজনে লোক-সাহিত্য যেমন সেখানে সংগৃহীতও হয় না, তেমনই ইহার কোন তথ্যই ঐতিহাসিক নজির হিসাবেও ব্যবহৃত হয় না। এই সম্পর্কে একজন পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত বলিয়াছেন, It is like a forest tree with its roots deeply buried in the past but which continually puts forth new branches, new leaves, new fruits.

পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ নিতান্ত আধুনিককালে এই সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অর্ধ শতাব্দী পূর্বেই তাঁহার 'ছেলে ভুলানো ছড়া' প্রবন্ধের ভিতর দিয়া এ' কথার উল্লেখ করিয়াছিলেন। তিনি,বলিয়াছিলেন,

'অনেক প্রাচীন ইতিহাস প্রাচীন স্মৃতির চূর্ণ অংশ এই সকল ছড়ার মধ্যে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে, কোনো পুরাতত্ত্ববিৎ আর তাহাদিগকে জোড়া দিয়া এক করিতে পারেন না।'

উপরি উদ্ধৃত ইংরেজ সমালোচকের সাম্প্রতিক এই উক্তির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অর্ধ শতাব্দীরও পূর্বেকার এই উক্তির বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। ইংরেজ সমালোচক বলিয়াছেন, লোক-সাহিত্যের বিষয় মাত্রেরই প্রাচীন কোন ঐতিহ্য থাকিলেও ইহা নূতন নূতন যুগে উত্তীর্ণ হইয়া নূতন নূতন উপকরণ সংগ্রহ করিয়াই ইহার প্রাণধারা অব্যাহত রাখিয়া চলে। সুতরাং ইহার মধ্যে ইতিহাসের তথ্য যাহা থাকে, তাহা প্রত্যক্ষ গোচর নহে, ঐতিহ্যের রূপে ইহার মর্মমূলে সমাহিত হইয়াই থাকে, যাহা প্রত্যক্ষ হয়, তাহা সমসাময়িক নূতন উপকরণ মাত্র। রবীন্দ্রনাথের উক্তিরও ইহাই অর্থ। 'প্রাচীন ইতিহাস, প্রাচীন স্মৃতির চূর্ণ অংশ' রক্ষা করিয়াই লোক-সাহিত্যের পরিচয়, অথচ এ' কথাও সত্য যে এই সকল বিচ্ছিন্ন ঐতিহাসিক উপকরণগুলিকে একত্র যোগ করিয়া ইতিহাসের কোন পূর্ণাঙ্গ পরিচয় ইহাদের মধ্য হইতে উদ্ধার করা যায় না।

'কোনো পুরাতত্ত্ববিৎ তাহাদিগকে জোড়া দিয়া এক করিতে পারেন না'

কথার অর্থই এই যে লোক-সাহিত্যের উপকরণ ঐতিহাসিকের কোন প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে পারে না, অথচ ইতিহাসের বিচ্ছিন্ন উপকরণ যে তাহাতে নাই, তাহাও নহে। কবিত্বের দিক হইতেও রবীন্দ্রনাথ ইহার একটি ব্যাখ্যা দিয়াছেন ; তিনি লিখিয়াছেন,

'বালকের কল্পনা ঐতিহাসিক রচনার জন্য উৎসুক নহে। তাহার নিকট সমস্তই বর্তমান এবং তাহার নিকট বর্তমানেরই গৌরব। সে কেবল প্রত্যক্ষ ছবি চাহে এবং সেই ছবিকে ভাবের অশ্রু বাপ্পে ঝাপসা করিত চাহে না।'

লিখিত সাহিত্যের ভিতর দিয়া সমসাময়িক সমাজ-জীবনের রূপ প্রকাশ পাইয়া থাকে ; সেইজন্য মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য হইতে কিংবা উনবিংশ শতাব্দীরও কথা ও নাট্যসাহিত্য হইতে আমরা সমসাময়িক সমাজ জীবনের একটি পরিচয় পাইতে পারি। কিন্তু লোক-সাহিত্য হইতে তাহা পাইবার উপায় নাই। লোক-সাহিত্যের মধ্যে যে জীবনের পরিচয় পাই, তাহা অতীত জীবনের নহে, ভবিষ্যৎ জীবনেরও নহে ; অতীত জীবনের কোন ভার ইহা ধরিয়া রাখিতে পারে না, ভবিষ্যৎ জীবনের ছায়ালোক ইহার কল্পনা অধিকার করিতে পারে না, কেবলমাত্র প্রবাহমাণ জীবনের ধারায় ইহা অগ্রসর হইয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ যে উদ্দেশ্য লইয়া তাঁহার বাংলার লোক-সাহিত্যের সংগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা তিনি নিজেই প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে,

'তাহাদের মধ্যে যে একটি সহজ স্বাভাবিক কাব্যরস আছে'

সেইটিই তাঁহার নিকট 'আদরণীয় বোধ হইয়াছিল,—' আর কোন প্রেরণার বশবর্তী হইয়া তিনি ইহাদের সংগ্রহের কার্যে ব্রতী হন নাই।

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল হইতে সাম্প্রতিক কালে কিংবা রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কালেও যাঁহারা লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহারা কেবল মাত্র ইহাদের প্রতি কাব্যরসের আকর্ষণ বশতঃ এই কার্য করিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। ভাষাতত্ত্ববিদ্ কিংবা সমাজ-নৃতত্ত্ব বিদ্ ব্যতীত পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে লোক-সাহিত্যের উপকরণ আর কেহই এ' যাবৎ সংগ্রহ করেন নাই। রবীন্দ্রনাথের মত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কোন কবির ত কথাই নাই, সাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন সাহিত্যিকও এই কার্যে ব্রতী হন নাই।সুতরাং রবীন্দ্রনাথ ইহাদের ভিতর দিয়া যে রস বস্তুর সন্ধান পাইয়াছেন, অন্য কেহ তাহা পান নাই। ইহা যে বাংলা লোক-সাহিত্যের পক্ষে একটি পরম সৌভাগ্যের বিষয় হইয়াছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

পৃথিবীর অন্যান্য অংশের কথা বাদ দিলেও আজ প্রায় দুইশত বৎসর যাবৎ বাংলা দেশেই বাংলা সাহিত্যের যে অনুশীলন হইতেছে, তাহার ভিতর দিয়াও যে সকল প্রতিভার উদয় হইয়াছিল, তাহাদের কেহই এই বিষয়ের যথার্থ গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কিংবা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইঁহাদের কাহারও রচনার ভিতর দিয়া বাংলার লোক-সাহিত্যের প্রতি কোন আকর্ষণের পরিচয় প্রকাশ পায় নাই, তাঁহাদের সাহিত্যের মূলে বাংলার লোক-সাহিত্যের যে কোন প্রভাব ছিল, তাহাও মনে করিবার কোন কারণ নাই। অথচ রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র তাঁহার 'লোক-সাহিত্যে'র প্রবন্ধ কয়টির ভিতর দিয়াই নহে, নিজের ধ্যান ধারণার মধ্যেও ইহার রস স্বাঙ্গীকৃত করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি যে লিখিয়াছেন,

"বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বান"

এই ছড়াটি বাল্যকালে 'আমার নিকট মোহমন্ত্রের মতো ছিল' এবং 'সেই মোহ এখনও আমি ভুলিতে পারি নাই,' ইহা কেবল মাত্র তাঁহার বাংলার জাতীয় সাহিত্যের একটি বিশেষ রূপের প্রতি লৌকিক প্রশস্তি বাচন নহে, রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিশেষ কতকগুলি পর্ব বিশ্লেষণ করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, এই কথা কত গভীর সত্য। বাংলার লোক-সাহিত্যের প্রতি আমাদের যথার্থ

পরিচয় নাই বলিয়া রবীন্দ্রপ্রতিভার এই বিষয়টি সম্পর্কে আমরা এখনও সম্যক-সচেতন হইতে পারি নাই।

লোক-সাহিত্যের বিষয় মাত্রেরই সংগ্রহ কার্য স্বভাবতঃই জটিল, রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তাহা আরও জটিল ছিল। কারণ, রবীন্দ্রনাথ যে পরিবারে মানুষ হইয়াছিলেন, তাহার সঙ্গে পল্লীজীবনের যোগ খুব নিবিড় ছিল না। বিশেষতঃ এই বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোন পদ্ধতি পূর্ব হইতে তাঁহার পরিচিত ছিল না, সুতরাং এই বিষয়ে তাঁহার নিজস্ব পরিকল্পনা অনুযায়ীই তাঁহাকে কার্য করিতে হইয়াছে। তাঁহার সংগ্রহের বৈচিত্র্য ও বিস্তারের দিক দিয়া লক্ষ্য করিলে সেই পরিকল্পনা যে কত সর্বাঙ্গসুন্দর ও সার্থক ছিল, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে। শুধু নিজের দিক দিয়াই যে তাহা সার্থক ছিল, তাহা নহে—তাঁহার নিজের সার্থকতা দ্বারা অন্যকে যে এই কার্যে তিনি উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও তাহাদের কার্যে ব্যাপক সার্থকতা লাভ করিয়াছিলেন। ১৩০১ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের 'ছেলে ভুলানো ছড়া' প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার প্রায় দশ বৎসর পর পর্যন্ত বাংলা দেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বাংলার লোক-সাহিত্যের বিচিত্র উপকরণ সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইতে থাকে।

রবীন্দ্রনাথ যে যুগে তাঁহার বাংলার লোক-সাহিত্যের উপকরণ সংগ্রহ করিতেছিলেন, একদিক দিয়া বিচার করিতে গেলে তাহাই রবীন্দ্র-সাহিত্যের সমৃদ্ধতম রচনার যুগ। রবীন্দ্র কাব্য সাধনার দিক দিয়া তাহা প্রধানতঃ 'মানসী'ও 'সোনার তরী'র যুগ, কথাসাহিত্যের দিক দিয়া 'গল্পগুচ্ছে'র যুগ এবং নাট্য রচনার দিক দিয়া নাট্যকাব্য অর্থাৎ 'রাজা ও রাণী' 'বিসর্জন' 'চিত্রাঙ্গদা' রচনার যুগ। রবীন্দ্র জীবনের কোনও কীর্তিকেই বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিবার উপায় নাই, ইহাদের প্রত্যেকটি ধারাই একটি অখণ্ড যোগ সূত্র দ্বারা আবদ্ধ। সুতরাং রবীন্দ্র কবিমানসের ক্রমঃবিকাশ যাঁহারা অনুসরণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা তাঁহার জীবনের একটি পর্বে বাংলার লোক-সাহিত্য তাঁহার মধ্যে যে প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছিল, তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে না পারিলে তাঁহার সেই যুগের সাহিত্য রস-বিচার কিছুতেই সার্থক হইতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ বাংলার লোক-সাহিত্য হইতে যে রস-প্রেরণা একদিন লাভ করিয়াছিলেন, তাহা উপলব্ধি করিতে না পারিলে রবীন্দ্রনাথের 'মানসী', 'সোনারতরী' 'চিত্রা'র রসোপলব্ধি যেমন সার্থক হইতে পারে না, তেমনই 'গল্পগুচ্ছে'র ভিতর দিয়া বাঙ্গালীর গৃহ ও পারিবারিক জীবনের প্রতি তাঁহার যে মমতা প্রকাশ পাইয়াছে তাহাও সম্যক উপলব্ধি করিতে পারা যাইবে না। অথচ এ' কথা সত্য, রবীন্দ্র কাব্য পাঠক মাত্রই এই বিষয়টি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, ইহা রবীন্দ্রনাথের সাধনার সঙ্গে যুক্ত হইয়া কোনভাবে যে তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করিয়াছে, তাহা

কেহই এ' পর্যন্ত উপলব্ধি করেন নাই। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রেরণার মৌলিক ভিত্তিটির সন্ধান করিতে না পারিলে, রবীন্দ্র সাহিত্য অনুশীলন আমাদের যে যথার্থ সত্যের সন্ধান দিতে পারিবে না, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। অথচ এ' পর্যন্ত রবীন্দ্র সাহিত্য পাঠক ও গবেষকের নিকট রবীন্দ্রনাথের উপর বাংলার লোক-সাহিত্যের প্রভাবের বিষয় যথার্থ গুরুত্ব লাভ করিতে পারে নাই। রবীন্দ্রনাথ কবি এবং কাব্যরসের আস্বাদন লাভ করিয়াই লোক-সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করিয়াছিলেন বলিয়া বিষয়টির গুরুত্ব যত বেশি, তিনি যদি ঐতিহাসিক কিংবা সমাজ-তত্ত্বগত দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া লোক-সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করিতেন, তবে রবীন্দ্রসাহিত্য পাঠকের নিকট তাহা কোনও গুরুত্ব লাভ করিবার কথা ছিল না। কিন্তু তাঁহার লোক-সাহিত্য বিষয়ক আলোচনায় দেখা যায়, তিনি কবি হইয়া লোক-সাহিত্যের মধ্য হইতে কাব্যেরই প্রেরণা লাভ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,

"বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বান' এই ছড়াটি আমার শৈশবের মেঘদূত ছিল।"

রবীন্দ্রনাথের নিসর্গ-চেতনা কিংবা রবীন্দ্রকাব্যের উপর বাংলার বর্ষা-প্রকৃতির প্রভাব বিষয়টি বুঝিবার জন্য রবীন্দ্রনাথের 'শৈশবের মেঘদূত' যে কি ছিল, তাহা যে পরবর্তী জীবনে তাঁহার উপর কি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহাও সম্যক্ বুঝা দরকার। রবীন্দ্রনাথ যদি ঐতিহাসিকের দৃষ্টিকোণ হইতে লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয় সংগ্রহ করিতেন, তবে ঐতিহাসিকগণ তাঁহার সংগৃহীত তথ্য লইয়া আলোচনা করিতেন, তিনি যদি সমাজতত্ত্ব কিংবা নৃতত্ত্ব-বিদের দৃষ্টিকোণ হইতে লোক-সাহিত্যের সংগ্রহ ও বিচার করিতেন, তবে সমাজ ও নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ তাঁহার সংগৃহীত তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া আলোচনা করিতেন, কিন্তু তিনি নিজে কবি হইয়া যখন কাব্যরসের প্রেরণায় বাংলার লোক-সাহিত্যের সংগ্রহ ও বিচার করিয়াছেন, তখন রবীন্দ্র কাব্যসাহিত্যের আলোচনায় তাহা যদি ভিত্তিরূপে স্বীকৃত না হয়, তবে রবীন্দ্রনাথের কবিধর্মের মৌলিক স্বরূপটির সঙ্গে আমাদের পরিচয় হইতে পারে না। কিন্তু এই বিষয়ে বাংলার বিদগ্ধ সমাজ সম্যক্ অবহিত হইয়াছেন বলিয়া কিছুতেই মনে হইতে পারে না।

পূর্বেই বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথের ছড়ার সংগ্রহই আধুনিক বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম ছড়ার সংগ্রহ। ইতিপূর্বে বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রচনার উদ্দেশ্যে ইংরেজ ধর্মপ্রচারকগণ যে প্রবাদ ও বিশিষ্টার্থক বাক্যাংশে (idiom)র সংগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে কিছু কিছু ছড়াও সংগৃহীত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহা প্রাধানতঃ প্রবাদ-ধর্মী রচনাই ছিল এবং প্রবাদ বলিয়া মনে করিয়াই সংগৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ছড়ার সংগ্রহ অবিমিশ্র

ছড়ারই সংকলন, কাব্যধর্মী ছড়া ব্যতীত তাহার সংগ্রহে আর কোন বিষয়ই স্থান পায় নাই। ছড়া সংগ্রহ প্রকাশিত হইবার পর রবীন্দ্রনাথ পল্লী সঙ্গীতেরও একটি আলোচনা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু পল্লীসঙ্গীতের স্বতন্ত্র কোন সংকলন তিনি প্রকাশ করেন নাই। রবীন্দ্রনাথ বাংলার পল্লীসমাজের কেবলমাত্র একটি অংশের সঙ্গেই যে সুনিবিড় পরিচয় স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহার পল্লীসঙ্গীত-গুলি প্রধানতঃ সেই অঞ্চল হইতেই সংগৃহীত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের উক্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পরবর্তী কাল হইতে বাংলার পল্লীসঙ্গীতের যে সুবিপুল সম্ভার সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সঙ্গে তুলনা করিলে 'গ্রাম্য-সঙ্গীত' শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের পল্লীসঙ্গীতের উদ্ধৃতি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ও বৈচিত্র্যহীন বলিয়া মনে হইবে। তথাপি এ' কথা সত্য পল্লীসঙ্গীতের মধ্যেও যে উচ্চাঙ্গের কাব্যসম্মত জীবন-রস আছে, তাহা তিনিই সর্বপ্রথম আমাদিগকে দেখাইয়া দিয়াছিলেন। পল্লীসঙ্গীতের নিজের সংগ্রহ ব্যতীতও তিনি এই পথে বহু উৎসাহী কর্মীকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন, সমস্ত জীবন-ব্যাপী এই বিষয়ক তাঁহার অনুরাগ কোন দিক দিয়াই শিথিল হইয়া পড়িবার অবকাশ পায় নাই।

ছড়া এবং সঙ্গীত ব্যতীত রবীন্দ্রনাথ লোক-সাহিত্যের আর কোন বিষয় সংগ্রহ করিয়া প্রকাশিত করেন নাই। লোক-কথা (Folk-tales)র ভিতর দিয়াও তাঁহার যে অনুরাগ প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা প্রত্যক্ষ কোন লোক-কথা-সংগ্রহের ভিতর দিয়া প্রকাশ না পাইলেও, তিনি তাঁহার জীবনে ইহার সুগভীর প্রেরণার কথা স্বীকার করিয়া যেমন প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন, তেমনই বিভিন্ন সংগ্রাহককে এই কার্যে উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ছড়ার সংগ্রহ 'ছেলে ভুলানো ছড়া' বলিয়া উল্লেখ করিলেও তাঁহার সংগৃহীত ছড়াগুলি বিশ্লেষণ করিলে ইহাদের মধ্যে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর ছড়ার সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করা যায় ; প্রথমতঃ ছেলে ভুলানো ছড়া, দ্বিতীয়ত ছেলেখেলার ছড়া। এই দুই শ্রেণীর ছড়ার মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য আছে। ছেলে ভুলানো ছড়াগুলি শিশুর জননী কিংবা শিশুধাত্রীর রচনা, সেইজন্য ইহাদের দেহে ও আত্মায় পরিণত বুদ্ধির স্পর্শ লাগিয়া যায়। শিশু ইহার অর্থ বুঝেনা, মাতৃকণ্ঠে উচ্চারিত সুরটুকু শুনিয়াই মুগ্ধ হয় মাত্র। রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক সংগৃহীত নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটির মধ্য হইতে এই বিষয়টি স্পষ্ট হইতে পারে। যেমন,

মাসি পিসি বনগাঁ বাসী বনের মধ্যে ঘর।
কখনো মাসি বলেন না যে খই মোয়াটা ধর ॥
কিসের মাসি কিসের পিসি কিসের বৃন্দাবন।
এতদিনে জানিলাম মা বড় ধন ॥

ইহার মধ্য দিয়া শিশুর অকারণ আনন্দের অভিব্যক্তির পরিবর্তে যে পরিণত জীবন ও সমাজ-বোধের পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। শিশুর সঙ্গে জননীর সম্পর্কের আন্তরিকতা ও নিবিড়তার কথা স্মরণ করিলে মাসি কিংবা পিসির কথা যে কিছুতেই আসিতে পারে না ইহাই এই ছড়াটির বক্তব্য। ইহা সুপরিণত জীবন অভিজ্ঞতার পরিচায়ক, শিশুর অকারণ আনন্দের অভিব্যক্তি মাত্র নহে। এই শ্রেণীর ছড়া শিশুর রচনা নহে; বরং পরিণত বুদ্ধি মানব-মনেরই সৃষ্টি। সেইজন্য ইহার যে আবেদন শিশুর নিকট প্রকাশ পায়, তাহা ইহার অর্থগত কিংবা ভাবগত নহে; বরং ইহার একান্ত সুর এবং ছন্দোগত। রবীন্দ্রনাথ এই ছন্দকে ছড়ার ছন্দ বলিয়াছেন এবং তিনি কেবল মাত্র ছড়ার ভাব দ্বারা নহে, ছড়ার ছন্দ দ্বারাও যে কি ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার কাব্য পাঠকের অবিদিত নাই। রবীন্দ্র-নাথের পূর্ববর্তী কাল পর্যন্ত বাংলা কাব্যের ছন্দ বাংলা প্রাচীন রীতিকেই অনু-সরণ করিয়াছিল, এমন কি মাইকেল মধুসূদন দত্ত যতই নূতন ছন্দের প্রবর্তক বলিয়া পরিচিত হোন না কেন, বাংলার ছড়ার ছন্দকে কোন দিক দিয়াই তিনি তাঁহার কাব্য রচনায় নিয়োজিত করিতে পারেন নাই। রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম বাংলার অলিখিত (Unwritten) সাহিত্যের একটি বিশেষ রূপকে লিখিত সাহিত্য ধারার মধ্যে সার্থকভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার লোক-সাহিত্য-প্রীতির ভিতর দিয়াই বাংলা ছড়ার ছন্দের যথার্থ শক্তির পরিচয় তিনি লাভ করিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক সংগৃহীত ছড়ার মধ্যে দ্বিতীয় যে আর এক শ্রেণীর ছড়ার কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহার বিষয় খেলা। এই ছড়াগুলির প্রধান বিশেষত্ব এই যে ইহারা কিশোরমতি ছেলেমেয়েদের নিজস্ব রচনা, ছেলেভুলানো ছড়ার মত শিশুধাত্রীর রচনা নহে। শিশুর রচনা বলিয়াই ইহারা অর্থহীন, কিন্তু ছন্দ কিংবা তালহীন নহে, বরং ছন্দ ও তালের পরিচয় ইহাদের মধ্যে আরও প্রত্যক্ষ। রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক সংগৃহীত নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটি তাহার প্রমাণ—

আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে।
ঢাক মৃদং ঝাঁঝর বাজে ॥
বাজতে বাজ্‌তে চল্‌ল ডুলি।
ডুলি গেল সেই কমলা পুলি ॥
কমলা পুলির টিয়েটা।
সুয্যি মামার বিয়েটা ॥
আয় রঙ্গ হাটে যাই।
গুয়া পান কিনে খাই ॥ ইত্যাদি

খেলার ছড়া বিভিন্ন প্রকৃতির হইয়া থাকে, যেমন ছেলেদের খেলার ছড়া. মেয়েদের খেলার ছড়া, ইহাদের মিশ্র খেলার ছড়া। নিজেরা ছড়া বলিতে আরম্ভ করিয়া ছেলে এবং মেয়েরা প্রথম এক সঙ্গেই খেলা করিয়া থাকে, তখনকার ছড়াগুলি হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়; কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই ছেলে এবং মেয়েদের খেলা পৃথক্ হইয়া যায়; ছড়ার ভিতর দিয়া এই পার্থক্যের পরিচয়টিও গোপন থাকে না। রবীন্দ্রনাথের সংগ্রহের মধ্যে ছেলেদের স্বতন্ত্র খেলার ছড়া নাই বলিলেই হয়; এমন কি, কোন ছড়ার মধ্যেই মেয়েদেরও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র খেলার ছড়ার সুস্পষ্ট লক্ষণ অনুভব করা যায় না—কেবলমাত্র মিশ্র খেলার ছড়ার পরিচয়ই প্রকাশ পাইয়াছে। উপরে যে ছড়াটি উদ্ধৃত করিলাম, তাহা মিশ্র খেলার ছড়ারই নিদর্শন। ছড়াটি একটি ডোম চতুরঙ্গের বা যুদ্ধ যাত্রার বর্ণনা দিয়া আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু নিতান্ত ঘরকন্নার কথা দিয়া শেষ হইয়াছে। সেইজন্য ইহার প্রথমাংশে একটু পৌরুষের স্পর্শ থাকিলেও শেষাংশে অন্তঃপুরজীবনের স্তরে নামিয়া আসিয়াছে। সুতরাং পুরুষ এবং নারী উভয়ের জীবন অভিজ্ঞতারই পরিচয় ইহার মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের সংগ্রহে এই শ্রেণীর ছড়ার সংখ্যা অবশ্য খুব বেশি নাই।

রবীন্দ্রনাথের লোক-সাহিত্য সংগ্রহ যত অসম্পূর্ণই হোক, তাহার উপর ভিত্তি করিয়া তিনি লোক-সাহিত্যের যে বিচার করিয়াছেন, তাহা কোন দিক দিয়াই অসম্পূর্ণ বলিয়া নির্দেশ করিবার উপায় নাই। তিনি ইহার মূল সুর ও তত্ত্বটির সন্ধান পাইয়াছিলেন বলিয়া ইহার সম্পর্কে যে কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা কেবলমাত্র আমাদের দেশের নহে, সর্বদেশেরই লোক-সাহিত্য সংগ্রহ ও বিচারের ভিত্তি স্বরূপ হইতে পারে।

"হৃদয়ের অসংখ্য পত্রপুট"

অমলেন্দু বসু

> জীবনে জীবন যোগ করা
> না হলে, কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা।
> ("জন্মদিনে")

বাঙলা কাব্যের মূলধারা সঙ্গীতপ্রবণ আর সে-ধারা রবীন্দ্রনাথের কাব্যে অশেষ সমৃদ্ধিসম্পন্ন, একথা কোনো বাঙলা কাব্যরসিকের কাছে নূতন নয়। রবীন্দ্রনাথ গান লিখেছেন কয়েক হাজার, গান ছাড়া তাঁর অন্য কাব্যও স্বতঃ-প্রবৃত্তিতেই গীতোচ্ছ্বল। বস্তুত অনেক কবিতা, যা' গোড়ায় কবিতা হিশেবেই রচিত হয়েছিল, পরে বাঁধা হয়েছে গানের সুরে। বিষয়বস্তুর নির্বাচনে ও শিল্প-বাঁধুনিতে তাঁর গীতধর্মের যে-নিরন্তর প্রকাশ, আবার তাঁর বাক্‌প্রতিমার প্রয়োগেও সেই একই ধর্মের নিঃসংশয় লক্ষণ। অন্যত্র প্রকাশিত এক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের বাক্‌প্রতিমার বিশ্লেষণ করে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে কবির প্রতিমাপ্রয়োগে যদি ধ্বনি-স্পর্শ-গন্ধ-দৃষ্টি সব কয়টি ইন্দ্রিয়বেদিতার পুনরাবৃত্ত প্রকাশ, তবুও ধ্বনিই প্রবল, অর্থাৎ কবির সৃজনীপ্রতিভা ধ্বনিময় রূপেই প্রধানত তৃপ্তি পায়। তাঁর কাব্যে দৃশ্যময়, ঘ্রাণময়, স্পর্শময় প্রতিমা অতুলনীয় সৌন্দর্যবান কিন্তু সুরেলা প্রতিমাতেই তাঁর কবিচিত্তের সহজতম ও প্রকৃষ্টতম অভিব্যক্তি।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যের মূল ধর্ম গীতময় একথা মেনেই ক্ষান্ত থাকলে তাঁর কবিপ্রতিভার বহুবিস্তৃত বহুদ্যুতিময় অভিব্যক্তির সদ্বিচার হবেনা। সহৃদয় জ্ঞানী পাঠক জানেন রবীন্দ্রনাথের মতো এমন সার্বভৌম প্রতিভা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। সাহিত্যের কোনো বিভাগ নেই যেখানে তাঁর কলাকৌশল স্বচ্ছন্দ নয়, মানবজীবনের উল্লেখযোগ্য দিক এমন কমই আছে যেখানে তাঁর প্রতিভা অল্পবিস্তর আত্মপ্রকাশের সুযোগ পায়নি, আর যদিও তিনি শেষদিককার কাব্যে বারংবার ক্ষোভ জানিয়েছেন যে তাঁর কবিতা সর্বত্রগামী হয়নি—একমাত্র বিধাতার লীলায় ছাড়া সর্বত্রগামিতার শক্তি কোথায়ই বা আছে?—আমরা জানি এমন বিচিত্র ও দূরদুরান্তগামী কল্পনাকে অলোকসামান্য বলা উচ্ছ্বসিত বীরপূজা নয়, নিরাবেগ যথার্থ উক্তি মাত্র। তাঁর জন্মগ্রহণের শতাব্দীপূর্তি বৎসরে যখন এই বহুসমন্বিত প্রতিভা সম্বন্ধে চিন্তা করি তখন সে-প্রতিভার যে-কোনো বিশেষ প্রকাশের সঙ্গে অন্যান্য বিশেষপ্রকাশের সম্পৃক্তি অধ্যয়ন করা আবশ্যক।

সুরধর্মের প্রধান প্রকাশ লিরিক্ কাব্যে আর লিরিক্ কাব্য "সব্‌জেক্‌টিভ্", মন্ময়ী, কবির ব্যক্তিত্ব-আশ্রয়ী, আত্মমগ্ন। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে "প্রভাত সংগীতের" "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" থেকে "শেষ লেখার" "তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি" অবধি এ-আত্মমগ্নতা নিরবশেষ কিন্তু তাঁর বহুগ্রাহী বিশাল কবিমানস কেবল আত্মমগ্নতায় উদ্বেজিত হয়না, যাকে বলি "অব্‌জেক্‌টিভ্" বা তন্ময়ী শিল্পপ্রকৃতি সেই বিষয়মগ্ন রচনা ও তাঁর কাব্যে প্রথম থেকে শেষ অবধি উপস্থিত আর এহেন রচনায়ও তাঁর কবিপ্রতিভার উত্তুঙ্গ প্রকাশ। তাঁর কাব্যের অব্‌জেক্‌টিভ্ বা বিষয়াশ্রয়ী অংশ সমনোযোগে অধ্যয়ন না করলে যে-কাব্যের মহত্ত্ব পাঠকচিত্তে সম্পূর্ণরূপে প্রতিভাত হয়না। বাক্ নির্ভর যে শিল্পকর্ম, যাকে বলি সাহিত্য, তার genre অথবা শিল্পগোত্র অনেকগুলি, কিছু শিল্পগোত্র আপন অবয়বের অবশ্যতায় মন্ময়তায় পরিপোষক, কিছু বা তন্ময়তার। কোনো কোনো সাহিত্যিকের সৃষ্টি হয়তো একটিমাত্র শিল্পগোত্রেই সীমিত এবং সম্পূর্ণ, কারুর বা একাধিকে, অল্প কয়েকজন সৃজন প্রেরণা ছড়িয়ে দিতে পারেন সব কয়টি সাহিত্য গোত্রে, এমনকি বাক্‌নির্ভর শিল্প ব্যতীত অন্য শিল্পেও। সকল রকম সাহিত্যগোত্রের অনুশীলনেই রবীন্দ্রনাথের অপার পারদর্শিতা। নাটকে, গল্পে, উপন্যাসে, তাঁর রচনা বিষয়মগ্ন, সেখানে রূপকারের স্বকীয় ব্যক্তিত্ব বিলুপ্ত। গানগুলি আত্মমগ্ন রচনা, রূপকারের ব্যক্তিত্ব দ্বিধাহীনভাবে সেখানে প্রকট। নির্বাচিত সাহিত্যগোত্রগুলির স্বধর্ম অনুসারে রচনাও আত্মমগ্ন অথবা বিষয় মগ্ন। সুতরাং এসব সাহিত্য গোত্রের বিচার থেকে সিদ্ধান্ত করা চলেনা রবীন্দ্রনাথের বীজ সাহিত্যপ্রতিভা আত্মমগ্ন কিনা অথবা বিষয়মগ্ন। কিন্তু যখন লিরিক্ বা গীতধর্মী কবিতাগুলির অধ্যয়নে নিযুক্ত হই—রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ কবিতাই গীতধর্মী—তখন তাঁর সৃজনী প্রতিভার বীজস্বরূপ সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগে : কবিতার খাতে তিনি কোন্ অনুভূতির স্রোতোপথ সঞ্চালিত করেছেন, প্রকট স্বকীয় ব্যক্তিত্বের অথবা কল্পিত চরিত্রের ও ঘটনার? অন্যান্য সাহিত্য-গোত্রের অনুশীলনে আত্মমগ্নতা ও বিষয়মগ্নতার যে-ভেদরেখা সুস্পষ্ট, কাব্যে সে-রেখা তত সহজে নির্ণয়সাধ্য নয় বলেই এ-প্রশ্ন ওঠে।

(২)

শেষ বয়সের একটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :-

> **আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ,**
> **চুনি উঠল রাঙা হয়ে।**

আমি চোখ মেললুম আকাশে—
জ্বলে উঠল আলো
পুবে পশ্চিমে।
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম, সুন্দর,—
সুন্দর হল সে।
তুমি বলবে, এ যে তত্ত্বকথা,
এ কবির বাণী নয়।
আমি বলব, এ সত্য,
তাই এ কাব্য।
এ আমার অহংকার,
অহংকার সমস্ত মানুষের হয়ে।
মানুষের অহংকার পটেই
বিশ্বকর্মার বিশ্বশিল্প।

(শ্যামলী, 'আমি')

মন্ময় শিল্পের গোড়ার কথা এখানে। ইংরেজ কবি কোল্‌রিজ্ বলেছেন তুলনীয় কথা :—

O lady ! we receive but what we give,
And in our life alone does nature live.

মন্ময় শিল্পীর চেতনা-ই রঙীন, অতএব সে-চেতনার এলাকায় যত বস্তু যত অভিজ্ঞতা গ্রাহ্য হয়েছে, চেতনার অঙ্গীভূত হয়েছে, সবই সে-চেতনার রঙে রঙীন, আমিত্বের অহংকারপটে শিল্পায়িত। যে-পান্নায় সবুজ রং, যে-চুনিতে রক্তবর্ণ, যে-গোলাপে সৌন্দর্য দেখেন শিল্পী, বহির্জাগতিক বস্তুতে যে-গুণ তিনি আরোপ করেন, সে-গুণ, সে-রং, সে-সৌন্দর্য তাঁর আপন চেতনা থেকেই উৎসারিত। আত্মমগ্ন শিল্পে "আমির" চেতনার বাহিরে বস্তুর কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। শিল্পীব্যক্তিত্বের এই সর্বগ্রাহী একান্ত আত্মকেন্দ্রিক বিশ্ববীক্ষাতে পশ্চিম ইওরোপীয় রোমান্টিক শিল্পের উদ্ভব ও বিকাশ। কিন্তু আত্মমগ্ন চেতনা absolute নির্বিকল্প চেতনা নয়, মানুষের পক্ষে বস্তুনির্ভর নৈর্ব্যক্তিক চেতনাও সম্ভব। আমার চেতনায় ধরা না পড়লেও, এমন কি আমিই যদি নিরস্তিত্ব হয়ে যাই, আমার চেতনা-ই অবলুপ্ত হয়ে যায় যদি, পান্নার রং তবুও সবুজ থাকবে, চুনি থাকবে রাঙা, গোলাপের রং থাকবে অমলিন। মানুষের অন্তর্জগতের বাহিরে অবস্থিত যে-জটিল বৃহৎ জগৎ তাকে স্বাধিকার-সম্পন্ন জগৎ ব'লে মানা যেতে পারে, মানা গেছে, আর যখন তেমন মানা যায়, তখন শিল্পীর ঐকান্তিক অহংচেতনা নেপথ্যগামী হয়ে এই বিচিত্র বহির্জগৎ অবলোকন করে, যে-জগতের সঙ্গে আপন

সম্পর্ক প্রণিধান করে। প্রত্যেক মানুষের পক্ষেই মস্ত দার্শনিক সমস্যা meum এবং tuumএর, 'আমি' ও 'তুমি'র সাজুয্যসাধন, অন্তর্জগতের সঙ্গে বহির্জগতের বিরোধলোপ, আপনাকে বাহিরে মেশানো, বাহিরকে আপন করা। শিল্পীর পক্ষে সমস্যা অব্‌জেক্‌টিভ্‌ সংবেদনা, মন্ময় ও তন্ময়, আত্মমগ্ন ও বিষয়মগ্ন চেতনা মিলিয়ে দেওয়া। শুধু বিষয়বিন্যাসে যে-শিল্প নিযুক্ত তাকে ইওরোপীয় সমালোচনাশাস্ত্রে বলা হয়েছে রিয়লিস্‌টিক্‌, বস্তুধর্মী, প্রত্যক্ষধর্মী। কিন্তু জগতের কোনো শ্রেষ্ঠ শিল্পীই নিছক আত্মমগ্নতায় অথবা নিছক বিষয়মগ্নতায় সঙ্কুচিত থাকেন নি—না কালিদাস, না দান্তে না শেক্‌স্‌পীয়র। "রোমান্টিক" ও "ক্লাসিকের" যে-ভেদজ্ঞান, পশ্চিম ইওরোপীয় সাহিত্যেই তা' বিদ্যমান ও প্রযোজ্য, সে-ভেদজ্ঞানও আবার রেনেসাঁস-পরবর্তী সমালোচনা শাস্ত্রের দৃষ্টি। ভর্জিল বা শেক্‌স্‌পীয়র নিজেদের এই জাতিভেদে খণ্ডিত করতেন বলে কোনো প্রমাণ নেই। ভারতীয় সাহিত্য-চিন্তায় কবিকর্ম সম্বন্ধে অনেক বিশ্লেষণ পাওয়া যাবে কিন্তু কবিপ্রতিভার পরস্পর-ত্যাগী দ্বিখণ্ডন মিলবেনা। বস্তুত ক্লাসিক ও রোমান্টিকের লাইন-টানা ব্যবধান-জ্ঞান ও সে-ব্যবধানের মানদণ্ডে ভারতীয় কাব্যের শ্রেণীকরণ আমাদের অনেক ইওরোপীয় কুসংস্কারের অন্যতম। যদি কোনো বাঙালী লেখক মনে প্রাণে শেলি অথবা এলিয়টের বঙ্গীয় সংস্করণ হতে চান (কেননা তিনি লিখছেন বঙ্গভাষায়) তাহলে তাঁর পক্ষে এই দ্বিখণ্ডন প্রযোজ্য এবং সাধু কিন্তু রবীন্দ্র-নাথকে আমরা যখন রোমান্টিক বলি—"আমারে যে ওরা বলে রোমান্টিক"—তখন প্রকাশ করি সাহিত্য-পরীক্ষার্থীর অতি-সীমিত বিদ্যা আর রবীন্দ্রনাথের সার্বভৌম বহু-সমন্বয়ী জটিল প্রতিভা সম্বন্ধে অবিচার করি। রবীন্দ্রনাথের সৃজনীপ্রতিভা সংজ্ঞায় বাঁধা যায় না, তার ভাগীরথী-মোহানায় বহুধারার অনির্ণেয় মিলনরেখা। সেই বহুধারার একটি ধারায় ঐকান্তিক চেতনা-আশ্রয়ী আত্মমগ্ন গীতিকাব্য, আরো এক ধারায় প্রচ্ছন্ন ব্যক্তিত্ব বিষয়মগ্ন গীতিকাব্য। গীতি-কাব্যের বিষয়মগ্নতার দিকে রবীন্দ্র-কাব্যানুরাগীর দৃষ্টি আকর্ষণ করাই এ-প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র বলেছেন :—

> সব চেয়ে দুর্গম যে মানুষ আপন অন্তরালে,
> তার কোনো পরিমাপ নাই বাহিরের দেশে কালে।
> সে অন্তরময়,
> অন্তর মিশালে তবে তার অন্তরের পরিচয়।
>
> (জন্মদিনে, ১৫ পৃঃ)

স্বষ্টির ঝরনা বেয়ে যে-রস নামছে আকাশে আকাশে
তাকে মেনে নিয়েছি আমার দেহে মনে।
সেই রঙিন ধারায় আমার জীবনে রং লেগেছে
যেমন লেগেছে ধানের খেতে,
যেমন লেগেছে বনের পাতায়,
যেমন লেগেছে শরতে বিবাগী মেঘের উত্তরীয়ে। পত্রপুট, ২৫ প:)

প্রত্যেক মানুষের অন্তর এক একটি স্বয়ম্প্রতিষ্ঠ জটিল জগৎ, অপরের কাছে দুর্গম ও রহস্যময়, সে-অন্তরের সঙ্গে আপন অন্তর মিশালে তবে পাওয়া যাবে সে-অন্তরের পরিচয়। আপন অন্তর মিশানো যাবে কেমন করে? আপন অন্তরের আমিত্ব দমিয়ে (আমিত্বের সম্পূর্ণ বিলোপসাধন সম্ভব নয়), যেন আমিত্বের বাহিরে দাঁড়িয়ে, অন্য চরিত্রের অন্য ঘটনার সঙ্গে তাদাত্ম্য স্থাপন করতে হবে।

"আপন হতে বাহির হ'য়ে বাহিরে দাঁড়া"।

জীবনে জীবন যোগ করতে হবে, অন্য জীবনের শরিক হতে হবে। স্বকীয় ব্যক্তিত্বের দুরূহ আত্মবিসর্জনের পরিবর্তে বিষয়মগ্ন শিল্পী লাভ করেন বহির্জীবনের রং, সে-রঙে শিল্প উজ্জ্বল হয়ে ওঠে নব নব সম্পদে। কীট্‌স্‌ বলেছিলেন: As for the poetical character itself...it is not itself—it has no self—it is everything and nothing—it has no character (কবিপ্রকৃতি সম্বন্ধে বল্‌ব, এর কোনো স্বকীয়তা নেই, অহংচেতনা নেই, একে বলা যায় সব কিছুই আবার কিছুই নয়, এর কোনো প্রকৃতি-ই নেই।) এই যে হৃদয়ের অসংখ্য অদৃশ্য পত্রপুট মাধুকরী ব্রতীর মতো কবি-বনস্পতির গূঢ়তম মজ্জায় নিহিত করে চারিদিক থেকে আহরণ-করা তেজোরস্‌, এই যে আপন হতে বাহির হওয়ার শক্তি, এ এক আশ্চর্য ইন্‌টেলেক্‌টিভ্‌ শক্তি, এমন এক অসামান্য শৈল্পিক মনন শক্তি যার গভীর প্রেরণায় কবি নিজ সংবেদনার সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ছাড়িয়ে আকীর্ণ হ'য়ে পড়েন দিকে দিকে। নিছক আত্মমগ্ন গীতিকাব্যের তুলনায় বিষয়মগ্ন গীতিকাব্য অনেক বেশি মনন সমৃদ্ধ আর এই অহংবিলোপী বহিরাশ্রয়ী কবি-কল্পনায় স্বষ্ট হয় কাহিনী, চরিত্র, ঘটনা। তেমন স্বষ্টির অভাব নেই রবীন্দ্রনাথের গীতিকাব্যে।

(৩)

আপন সংবেদনার সম্মোহ থেকে বাইরে দাঁড়াবার ক্ষমতা প্রথম সুস্পষ্ট হয় (১২৯৩ সালে) "কড়ি ও কোমলে":

"এই আমার প্রথম কবিতার বই যার মধ্যে বিষয়য়ের বৈচিত্র্য এবং বহির্দৃষ্টি প্রবণতা দিয়েছে।"

এর পরে কিছুকাল কবি যেন বিষয়াশ্রয়ী রচনায় নিজকে প্রধানত নিযুক্ত রেখেছেন : "রাজর্ষি" উপন্যাস ; নানাশ্রেণীর নাটকের মধ্যে "মায়ার খেলা", "রাজা ও রাণী", "বিসর্জ্জন", "চিত্রাঙ্গদা", "গোড়ায় গলদ", "বৈকুণ্ঠের খাতা" ; ছোটো গল্প অনেকগুলি। এমনি ক'রে আমরা পৌঁছই "কথা" (১ মাঘ ১৩০৬) ও "কাহিনী"তে (২৪ ফাল্গুন ১৩০৬)। ইতিমধ্যে প্রচুর গীতিকবিতা বেরিয়েছে "মানসী", "সোনার তরী"ও "চিত্রা"য়। এই দেড় দশক কালে বিষয়মগ্ন কাব্যে রবীন্দ্রনাথের সৃজনীপ্রতিভা আকৃষ্ট হয়েছে বারবার, মার্জ্জিত এবং সংহতও হয়েছে। "বিদায়-অভিশাপ", "গান্ধারীর আবেদন", "সতী", "নরকবাস", "কর্ণকুন্তী-সংবাদ" প্রভৃতি কথোপকথন-কাব্য বাঙলা সাহিত্যে নূতন সৃষ্ট গোত্র। এ ধরণের কাব্যের আদর্শ রবীন্দ্রনাথ বিদেশী সাহিত্য থেকে পেয়েছিলেন কিনা জানিনা (কোনোরকম প্রমাণ পাচ্ছিনা) তবে ব্রাউনিংয়ের "পিপ্‌পা পাসেস্‌" ও "ইন্‌ এ ব্যাল্‌কনি" নাটকীয় পরিস্থিতিতে কথোপকথন-কাব্য বটে আর ওয়াল্টার স্যাভেজ্ ল্যাণ্ডরের "ইম্যাজিনারি কনভার্সেশন্‌স্‌" গদ্যে রচিত কথোপকথন। এহেন কাব্যের আদর্শের জন্য রবীন্দ্রনাথ অন্য কারুর কাছে ঋণী ছিলেন এমন মনে করার কোনো সঙ্গত কারণ দেখছিনা কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ব্রাউনিংয়ের কবিতার অনুরাগী ছিলেন আর ব্রাউনিংয়ের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি নাটকীয় কাব্যে, তিনি তাঁর দু'টি গ্রন্থের নামকরণ করেছিলেন "ড্রামাটিক লিরিক্‌স্‌" ও "ড্রামাটিক রোমান্সেস্‌"। উত্তমর্ণ অধমর্ণের হিসেবে নয়, শক্তিধর দুজন কবি একই ধরণের কাব্যে নিবিষ্টচিত্ত হয়েছিলেন ব'লে এ-দুই কবির করণকৌশল এককালে আলোচনা করা যেতে পারে। "বিদায়-অভিশাপ" ও "গান্ধারীর আবেদন" নাটকীয় ঘটনা-সংস্থানের ভিত্তিতে রচিত কাব্যের কুশলী দৃষ্টান্ত। এসব কাব্যে প্রচলিত নাটকের বিস্তার নেই, জটিল সম্পূর্ণতা নেই (আরিস্‌টট্‌ল্ বলেছিলেন আদ্য মধ্য অন্ত, তিন অংশের অবশ্য প্রয়োজন নাটকে), কাহিনী ভাব চরিত্র ও ঘটনার অন্তর্বিন্যাস নেই, আছে বিশেষ মুহূর্ত্তের সংহতপ্রভ উদ্ভাস। যে-ঘটনাপারম্পর্যের পটভূমিতে ন্যস্ত এই বিদ্যুৎ-চকিত মুহূর্ত্তটি ও চরিত্রগুলির তাৎক্ষণিক প্রগাঢ় আবেগ, সে-পারম্পর্য্য সম্বন্ধে কবি উদাসীন নন কেননা পটভূমির অক্ষমতা সম্মুখচিত্রেও অর্শায়, কিন্তু পুরোদস্তুর নাটকে যদিও পটভূমি নির্মাণ করতে হয় বিস্তর মাল-মশলায়, কথোপকথন-কাব্যে শুধু সংক্ষিপ্ত নির্দেশ দিয়েই কবি ক্ষান্ত। "বিদায়-অভিশাপে"র শুরুতে চার পাঁচ ছত্রের একটি উল্লেখের পরেই আরম্ভ হয়েছে কবিতাটি। পটভূমি-তথ্য এ-কাব্যে অতি প্রয়োজনীয় কেননা সে-তথ্য ছাড়া

কাব্য কাহিনীর উদ্বেলিত আবেগের সঙ্গে সমচিত্ত হওয়া পাঠকের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়, কার্যকারণ সম্বন্ধে অবহিত না হ'লে পাঠক এগিয়ে যেতে পারেন না আবেগের অভিমুখে। তথ্য সরবরাহের জন্য কুশলী রবীন্দ্রনাথ পৃথক উল্লেখের চেয়ে বরং কাব্যের অন্তর্গত উক্তিতে নির্ভর করেন বেশি। কচ ও দেবযানীর কথোপ-কথনের গোড়ার দিকেই আমরা জানতে পারি ঘটনা শুরু হয়েছে সেই ক্ষণে যখন গুরুগৃহবাস সমাপ্ত হওয়ার পরে দেবলোকে প্রত্যাবর্ত্তনের প্রাক্কালে দেবযানীর কাছে বিদায় ভিক্ষা করছেন কচ। আরো কিছু তথ্য ক্রমে জানতে পারি: গুরুগৃহে গোরু চরাতেন কচ, মধ্যাহ্নে ঘুমোতেন বটতরুতলে, সেবা করেছেন হোমধেনুটির, আশ্রম-স্রোতস্বিনী বেণুমতী ছিল তাঁর প্রবাসসঙ্গিনী। এ পর্যন্ত কথোপকথনে শুধু বিদায়কালীন স্মৃতিমন্থিত চিত্তের আর্দ্রতা, এখনো শুরু হয়নি নাটকীয় মুহূর্ত্ত। কিন্তু যে- মুহূর্ত্তে বেণুমতী-নদীর বর্ণনায় প্রবাস-সঙ্গিনী কথাটি ব্যবহার করলেন কচ—সুচতুরা নারী কি এমন শব্দ ব্যবহারের দিকেই এগিয়ে দিচ্ছিলেন প্রেমপ্রকাশভীরু পলায়নেচ্ছু পরদেশী প্রেমিককে?—সে-কথার রেশ টেনে নির্ঘাত প্রশ্ন হ'ল: আরো কোনো সহচরী ছিল তব পাশে"? আর তার পরে তর্কের ও আবেগের শৃঙ্খলিত প্রবাহে বেরিয়ে এলো আরো প্রশ্ন, বেদনার্ত্ত বাক্য, আর সর্বশেষে প্রত্যাখ্যাতা নারীর হৃদয়-নিঙড়ানো অভিশাপ:

শুধু উপকার।
শোভা নহে, প্রীতি নহে, কিছু নহে আর?
* * *
বিদ্যা এক ধারে
আমি এক ধারে—কভু মোরে কভু তারে
চেয়েছ সোৎসুকে; তব অনিশ্চিত মন
দোঁহারেই করিয়াছে যত্নে আরাধন
সংগোপনে। আজ মোরা দোঁহে একদিনে
আসিয়াছি ধরা দিতে। লহো সখা, চিনে
যারে চাও। * * *
* * * আমার হৃদয়
বিদ্যা নিতে এসে কেন করিলে হরণ
স্বর্গের চাতুরী জালে। বুঝেছি এখন,
আমারে করিয়া বশ পিতার হৃদয়ে
চেয়েছিলে পশিবারে—কৃতকার্য হয়ে
আজ যাবে মোরে কিছু দিয়ে কৃতজ্ঞতা।
* * *
আমার এ প্রতিহত নিষ্ফল জীবনে
কী রহিল, কিসের গৌরব।

*   *   *   তোমা-'পরে
এই মোর অভিশাপ—যে বিদ্যার তরে
মোরে কর অবহেলা, সে-বিদ্যা তোমার
সম্পূর্ণ হবে না বশ ; তুমি শুধু তার
ভারবাহী হয়ে রবে, করিবে না ভোগ।

নাট্যায়িত আবেগপুঞ্জের সর্ব্বোচ্চ শিখরে আমরা পেঁ ছিলাম ছোট ছোট কতকগুলি শিখর পেরিয়ে। দেবযানীর কথাগুলিতে কূটনীতির ধূম্রজাল নেই কিন্তু আছে গভীর আবেগের সঙ্গে জুড়ে-যাওয়া চাতুরীময় আবেদন যার প্রভাবে নেহাৎ সুরলোকবাসী আদর্শবিৎ না হ'লে হয়তো অন্য যে কোনো পুরুষের মতোই কচেরও প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হত। দেবযানীর প্রতিটি যুক্তিতে, প্রতিটি আবেদনে তার চরিত্রের একটা না একটা দিক প্রতিভাত হয়েছে, মূলত দেবযাযানীর দৃষ্টিকোণ থেকেই আমরা এই নাটকীয় সংঘাতের দর্শক। সংঘাত যখন স্পষ্টভাষায় প্রকাশিত হ'ল, দেবযানী যখন আত্মস্থ আশায় বলল, "বিদ্যা একধারে, আমি একধারে", কচের নির্বাচন মুহূর্ত্ত যখন এসেই পড়েছে, সঙ্কট অনিবার্য, যখন এ-সঙ্কটের পরিণাম জানার জন্য আমাদের তীব্র উৎকণ্ঠার তুলনায় যেন আমরা ভাবছি উত্তাল তরঙ্গের শীর্ষন্যস্ত জলরাশি পরক্ষণে কি এগিয়ে যাবে আপন বেগভারে না পিছুটানে পড়বে পিছিয়ে, নাটকের এই সূচাগ্রসংহত অবস্থায় মিলনের সম্ভাবনা বিলীন হয়ে যায়, এর পরে দেবযানীর অভিশাপবাণী অবশ্যম্ভাবী। কবিতাটির কেন্দ্রিত বিষয়বস্তু এই সঙ্কটক্ষণ। একটা সম্পূর্ণ নাটকে যেন অনেকক্ষণ ধ'রে তুবড়িতে বারুদ পোরা হয়েছিল, কিন্তু নাট্যায়িত কবিতার কারবার শুধু সেই ঠাসা তুবড়ির বিদারণ-কালটি। ব্রাউনিংয়ে যেমন, রবীন্দ্রনাথেও তেমনি, নাট্যায়িত কবিতার আসল ঝোঁক ঘটনাসংস্থানে নয়, ঘটনার নির্যাস যে-আবেগ তার উপর। কবি এক্ষেত্রে বিষয়মগ্ন হয়েও আবেগ-পরায়ণ। এমন ঝোঁকা "গান্ধারীর আবেদন" প্রমুখ অন্যান্য কাব্যনাট্যগুলিতেও। "মেঘদূত" অথবা "যেতে নাহি দিব" শ্রেণীর কবিতায় ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের নিরন্তরাল অপ্রচ্ছন্ন প্রকাশ, তিনি নিজেই নিজের কথা বলছেন, কিন্তু খণ্ড নাটকগুলিতে তিনি দাঁড়িয়েছেন নেপথ্যে, কথা যাঁরা বলছেন তাঁদের ভাবপুঞ্জের সঙ্গে তিনি একাত্ম হয়েছেন তাই ব'লে সে-ভাবগুলি ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের ভাব নয়। কিন্তু কী আত্মমগ্ন কাব্যে, কী বিষয়মগ্ন কাব্যে, কবিতায় তিনি আবেগপ্রধান। কবির লিরিক্‌ধর্মী প্রতিভা নাটকীয় ঘটনাসংস্থানেও আবেগের স্রোতোপথ পেয়েছে অর্থাৎ তাঁর প্রতিভায় সব্‌জেক্‌টিভ্‌ ও অবজেক্‌টিভ্‌ শিল্পের মূল লক্ষণগুলি স্বতন্ত্র নয়, বরং পরস্পর সম্পৃক্ত।

(৪)

অনেক কবিতা পাই যেখানে নাটকীয় আঙ্গিকের আভাস নেই, না কথোপ-কথন না চরিত্রসৃষ্টি, অথচ কল্পিত ঘটনার পটভূমিতে বিষয়াশ্রিত আবেগ সেখানে প্রকাশিত হয়েছে। ধরা যাক, "স্বুরদাসের প্রার্থনা"। স্বুরদাস ঐতিহাসিক পুরুষ বটেন কিন্তু এ-কবিতার উক্তি ও ভাবধারা সম্পূর্ণ কল্পিত আর এ-উক্তি পুরোপুরি লিরিক্যাল, আবেগোজ্জ্বল। ঘটনাসংস্থান ও বক্তা থেকে কবি সরেছেন অনেক দূরে, উক্তি ও সংস্থান তাঁর নিজের নয়, অথচ উক্তির আবেগের সঙ্গে এই সৃজনমুহূর্তে তিনি একাত্ম। এ-কবিতায় রবীন্দ্রনাথের একই সময়ে আত্মমগ্ন ও বিষয়মগ্ন হওয়ার নিপুণ নিদর্শন। তুল্য নিদর্শন "স্বর্গ হইতে বিদায়" নামক সুপরিচিত কবিতায়। এখানে বিষয় কল্পনা আরো মুক্ত। তবু খানিকটা ঐতিহাসিকতা "স্বুরদাসের প্রার্থনায়" আছে, এ-কবিতায় সেটুকুও নেই, কবির কল্পনা অবাধ। কবি কল্পনা করছেন কোনো মর্ত্যবাসী দেহান্তে পুণ্যবলে লক্ষশত বৎসর স্বর্গলোকে যাপন করার পরে আজ মর্ত্যে ফিরে যাচ্ছেন আবার দেহ ধারণ করার জন্য। এইটুকুই নাটকীয় ঘটনাসংস্থান, বাকি এই মর্ত্যবাসীর ভাবধারা ও আবেগ আর সে-আবেগে কবির আদাত্ম্য ভাষা হয়েছে গীতোদ্বেল। এমন সম্ভব যে এ-কবিতায় (এ ধরনের অন্যান্য কবিতায়ও) কতকগুলি উক্তি পাওয়া যায় যার ভাববস্তু কবির স্বকীয় ভাববস্তুর সঙ্গে একেবারে মিলে গেছে ("মর্ত্যভূমি স্বর্গ নহে, সে যে মাতৃভূমি", এহেন আরো উক্তি সাক্ষাৎভাবেই রবীন্দ্রনাথের কাব্যে উপস্থিত, এখানে তাঁর নিজেরই প্রত্যয়) কিন্তু তাহ'লেও শিল্পীর কৃতিত্ব আপন ভাবের নাট্যরূপায়নে। নাট্যায়িত ঘটনার মৃদুরেখ পটভূমিতে সংস্থিত আবেগ নিয়ে যত কবিতা রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছিলেন তার তালিকা দেওয়া এ-প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য একথা বলা যে রবীন্দ্রনাথের কবিতা বিষয়াশ্রয়েও গীতপ্রাণ। কোনো কোনো কবিতার আবেগ উত্তম পুরুষের জবানিতে প্রকাশিত হয়নি আদৌ: "দুই পাখি", "পরশপাথর", বহু কাহিনী-কবিতা। এক্ষেত্রে পাঠক অবশ্য মনে করবেন না যে কাব্যোক্ত আবেগ কবির নিজেরই আবেগ। কিন্তু যেসব কবিতায় উত্তম পুরুষের আবির্ভাব, সেখানে 'আমি', 'আমার', 'আমারে', 'মোরে' পুনঃপুনঃ উপস্থিত, সেখানেও কল্পিত চরিত্রের জবানিতে ভাব প্রকাশ করতে পারেন কবি। দু'টি মাত্র দৃষ্টান্ত দিচ্ছি: 'সান্ত্বনা" ও "প্রণয় প্রশ্ন", "চিত্রা" ও "কল্পনা" থেকে নেওয়া। এখানে উত্তম পুরুষের হাল্‌কা ওড়নায় বক্তার স্ত্রীত্ব ঢাকা পড়েনি। আভ্যন্তরীণ প্রমাণে পাই:

একাকিনী; বাসরের রাণী; আঁচলখানি; তোমারে করিব রাজা; বেণীমুক্ত কেশজাল

স্পর্শিবে তাপিত ভাল। কোমল বক্ষের তাল মৃদুমন্দ বোল; আমার মধুর অধর; চরণে আমার বীণাঝংকার বাজে; মোর অঞ্চলখানি; ইত্যাদি।

নারীর উক্তি দুই কবিতায়; কল্পিত প্রেমিকার উক্তি কল্পিত প্রেমিকের প্রতি, কল্পিত কিন্তু অতিমৃদু আভাস-দেওয়া ঘটনার পটভূমিতে। রবীন্দ্রনাথে প্রেমের বহু কবিতায় এহেন নাট্যায়িত আবেগ, স্বকীয় ও পরকীয় ভাব ও উক্তির সাযুজ্য। ড্রামাটিক্ ও লিরিক্যালের এমন সংমিশ্রণের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় ব্রাউনিংয়ে, যে-ইংরেজ কবির অনুরাগী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ব্রাউনিংয়ের মতো রবীন্দ্রনাথও বহু ড্রামাটিক্ লিরিক্ রচনা করেছেন।

গীতিকাব্যেও যে নাট্যতা সম্ভব একথার উপরে জোর দেওয়ার কারণ আছে। অসতর্ক পাঠক যে নাট্যধর্মী কবিতাকে কবির স্বকীয় উক্তি ব'লে মনে করতে পারেন তার একটি উদাহরণ দিচ্ছি। ইংরেজ কবি টেনিসন্ প্রথম জীবনে (১৮৩০ খৃষ্টাব্দে, পরে কবিতাটি দীর্ঘকাল আর ছাপা হয়নি) একটি কবিতা রচনা করেন, Supposed confessions of a second-rate sensitive mind not in unity with itself; এ-কবিতার আলোচনায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ সমালোচক হ্যারল্ড নিকল্‌সন্ মেনেছেন যে যদিও এটি কল্পিত চরিত্রের উক্তি তবুও এখানে প্রকাশিত হয়েছে কবির নিজ গূঢ় ধর্মীয় ও দার্শনিক অন্তর্দ্বন্দ্ব। নাটকীয় উক্তির মতামতকে ভ্রম করা হয়েছে কবির নিজ মতামত ব'লে। অথচ কবিতাটি আত্মজৈবনিক ব'লে মনে করার কোনো সযৌক্তিক কারণ নেই। ১৮৩০ সনেই কবিভ্রাতা চার্ল্‌স্ টেনিসনের একটি কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত হয়, তার একটি কবিতার শিরোনামা, Supposed to be written by any feeble-minded man, meditating self destination; এ-কবিতাটি সনেট, টেনিসনের কবিতাটি ২০০ লাইনের বেশি, কিন্তু দুটি কবিতারই মূল প্রতিপাদ্য এক—কল্পিত আত্মপ্রত্যয়হীন ব্যক্তির স্বীকারোক্তি। এমন অনুমান অসঙ্গত হবে না যে দু'ভাই এহেন কল্পিত চরিত্রের মনস্তত্ত্ব আলোচনা ক'রে যার পর ব্যাখ্যা রূপায়িত করেছেন কবিতায়। দু'ভাই যে যৌগিক আলোচনায় এককালে কিছু কবিতা রচনা করেছিলেন তার আরো প্রমাণ আছে আর টেনিসনের পূর্বযুগে কীট্‌স্ ও তাঁর কোনো কোনো বন্ধু একই বিষয়বস্তু অবলম্বনে আলাদা কবিতা লিখেছেন। টেনিসনের কবিতার চিত্তবিক্ষোভ থেকে কবিচরিত্র সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করার ভ্রম এই কারণে উৎপন্ন হয়েছে যে সমালোচক ড্রামাটিক লিরিক্ ও পার্সনাল লিরিকের তারতম্য করেননি। রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতাগুলিতে প্রত্যক্ষ স্বকীয়ভাব ও নাট্যায়িত কল্পিত ভাব দুয়েরই প্রকাশ, সেজন্য মনোযোগী পাঠকের পক্ষে এ-দু'ধরনের ভাবের তারতম্য করা দরকার।

কল্পিত ঘটনা-সংস্থানের পটভূমি যে রবীন্দ্রনাথের গীতিকাব্যের লক্ষ্যণীয় করণকৌশল একথার অন্য প্রমাণও পাই। কতকগুলি যুগ্ম কবিতা পাচ্ছি, তাদের নামকরণ, ভাববস্তু, রচনাকাল লক্ষ্য করুন :—

কড়ি ও কোমল	"পুরাতন" (রচনাকাল উল্লিখিত হয়নি।) "নূতন" (,, ,,)
মানসী	"নারীর উক্তি" (২১ অগ্রহায়ণ ১২৯৪) "পুরুষের উক্তি" (২৩ অগ্রহায়ণ ১২৯৪)
,,	"ব্যক্তপ্রেম" (১২ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৫) "গুপ্তপ্রেম" (১৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৫)
,,	"অনন্ত প্রেম" (২ ভাদ্র ১২৯৬) "ক্ষণিক মিলন" (৯ ভাদ্র ১২৯৬)
সোনার তরী	"নিদ্রিতা" (১৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯) "সুপ্তোত্থিতা" (১৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯)
চৈতালি	"প্রথম চুম্বন" (১০ শ্রাবণ ১৩০৩) "শেষ চুম্বন" (১০ শ্রাবণ ১৩০৩)
কল্পনা	"মদন ভস্মের পূর্বে " (১২ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৪) "মদন ভস্মের পর" (১২ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৪)

এখানে সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়ার চেষ্টা হয়নি, আমার উদ্দেশ্য কিছু দৃষ্টান্তের সাহায্যে রবীন্দ্রনাথের গীতিকাব্যের কয়েকটি মূল সূত্রের অনুসন্ধান। উল্লেখ-যোগ্য যে ব্রাউনিংয়ে ঠিক এই ধরণের কতকগুলি Composition piece কবিতা আছে :

Meeting at night	Parting at morning
One way of love	Another way of love
Love in a life	Life in a love
Before	After
The Italian in England	The Englishman in Italy

রবীন্দ্রনাথে যেমন, ব্রাউনিংয়েও তেমনি এসব কবিতার রচনাকাল ঘনিষ্ঠভাবে সমকালীন, দুয়েক দিনের ব্যবধানে অথবা কখনো একই বৈঠকে লেখা।

কবিতাগুলিতে কবি স্পষ্টতই পরস্পর বিপরীত অথবা পরস্পর অনুপূরক ভাবের কাব্যরূপদানে নিযুক্ত, হয়তো শুরুতেই চিন্তা করেছিলেন বৈপরীত্যের ও অনুপূরণের সংযোগ অথবা প্রথমে কল্পিত ভাব নিয়ে একটি কবিতা রচনা করার পরে মনে করেছিলেন অন্য দিক থেকেও ভাবটি কাব্যরূপ নিতে পারে। যেমন খণ্ড নাটকগুলিতে উক্তিগুলি debate এর রূপ নিয়েছে, একজনের একটি কথাতেই সিদ্ধান্ত হয়নি বরং সে-কথার পাল্টা কথা হয়েছে আর কথা ও পাল্টা কথার সংযুক্ত ছাঁদে সিদ্ধ হয়েছে কবিতার সমগ্রতা, তেমনি এসব স্বতন্ত্র অথচ ভাবসংশ্লিষ্ট কবিতাযুগলে যেন দুই কণ্ঠের ধ্বনিতে রূপায়িত হচ্ছে ঐক্যতান। কথা যদি দিলেন নারীর মুখে, দিলেন পুরুষেরও মুখে, আর দুই কবিতায় একই স্তবকের বুনট। প্রেমিকের যে-প্রেমে নারীর হৃদয় আজ প্রেম-সচেতন, প্রেম-ব্যাকুল, আজ সে-প্রেমিকের হৃদয় বুঝি শুকিয়ে গেছে, সত্য প্রেমের বদলে আজ হাসি ও সোহাগের ছলনা। ব্যাহত-প্রেম নারীর অভিযোগ "নারীর উক্তি"তে। অভিযোগের উত্তর "পুরুষের উক্তি"তে : বিলীয়মান প্রেম বিশুষ্ক হয়েছে অতৃপ্ত বাসনায় কেননা,

"এসেছিনু আশা করে।
অনেক লইতে গিয়ে হারাইনু তাই।"

যে-অত্যুচ্চ আদর্শমুগ্ধ প্রেমে রঞ্জিত করা হয়েছিল প্রেমিকাকে, সে-আদর্শে ও বাস্তবে সঙ্গতি মিললনা,

"কেন তুমি মূর্তি হয়ে এলে।
রহিলে না ধ্যান ধারণার"।

সৌন্দর্যপূজারী প্রেমের গহীন অন্তরে বাস করে বিক্ষুব্ধ বাসনা অতএব, পুরুষের প্রস্তাব, উত্তুঙ্গ প্রত্যাশা থেকে নেমে দুজনকেই সন্তুষ্ট হতে হবে ঘরোয়া প্রেমে :

প্রাণ দিয়ে সেই দেবীপূজা
চেয়ো না, চেয়ো না তবে আর।
এসো থাকি দুইজনে সুখে দুঃখে গৃহকোণে,
দেবতার তরে থাক্ পুষ্প-অর্ঘ্যভার।

"ব্যক্ত প্রেম" ও "গুপ্ত প্রেম" নারী ও পুরুষের বিতর্ক নয়, নারীরই কথা দুই কবিতায়, দুই নারীর চিত্তপ্রকৃতিতে কোনো মূল প্রভেদ নেই, প্রভেদ তাদের দৈহিক রূপে। একের রূপ নিয়ে গেছে তাকে শতলক্ষ আঁখি-ভরা কৌতুককঠিন ধরার দৃষ্টির সম্মুখে, লুকানো প্রাণের যে-প্রেমকে সে মানত পবিত্র ব'লে সে-প্রেমকে যে-আব্রু করল প্রেমিক আর তারপরে "ভুল ভেঙে গেছে" এ-অছিলায় ত্যাগ

করল—অতি-পুরাতন প্রেম-লাঞ্ছণার কাহিনী। অন্যদিকে "গুপ্তপ্রেমের" প্রেমিকা আপন কুরূপের দরুণ প্রকাশ-ব্যগ্র প্রেম গুপ্ত রাখতে বাধ্য হয়েছে। এক কবিতা অপর কবিতার অনুপূরক। "নিদ্রিতা" কবিতায় যে-নিদ্রামগ্না রাজবালার গলায় মালা পরানো হ'ল, অন্য কবিতায় সুপ্তোত্থিতা সে-রাজবালা জানালার পাশে বসে' ভাবছে, "কে পরালে মালা।" এসব কবিতার সৃষ্টিপ্রেরণা বিষয়মগ্ন কল্পনায়, ঘটনা-সংস্থান ও আবহাওয়া নাট্যায়িত, ভাব ও চরিত্র কবির আত্মজীবনের বাহির থেকে সঞ্চয়িত। জোড়ায় জোড়ায় কবিতাগুলি যেন প্রত্যেক জোড়ার মধ্যে ক্ষুদ্রপরিসর এক নাটকীয় আবেগ-সংঘাতের চূর্ণতরঙ্গ।

(৫)

পরস্পর বিপরীত অথবা সম্পূরক কবিতা-যুগল ছাড়াও নাট্যায়িত আবেগ-সম্পন্ন কবিতার দৃষ্টান্ত হিসেবে "প্রণয় প্রশ্ন" ও "সান্ত্বনা"র উল্লেখ করেছি। এহেন আরো কবিতার অভাব নেই। আলাদা আলাদা কাব্যগ্রন্থে না গিয়েও শুধু "সঞ্চয়িতা"তেই অনেক দৃষ্টান্ত পাই :

"বধূ" (৭৫ পৃঃ), "ভ্রষ্টলগ্ন" (২৯৭), "মার্জনা" (২৯৮), "শুভক্ষণ" (৪৮৭), "দান" (৪৯২), "কৃপণ" (৪৯৩), "কূয়ার ধারে" (৪৯৪)। "মহুয়ার"

কয়েকটি কবিতাই এই গোত্রের অন্তর্গত। কত বিভিন্ন পরিবেশ এহেন কবিতায়। গ্রাম্য বালিকা বিয়ের পরে পাষাণকারা রাজধানীতে রুদ্ধশ্বাস; আত্মপরিচয় দানে অসমর্থ সঙ্কোচভারনতা প্রতীক্ষাপরায়ণা নারী চ'লে -যাওয়া প্রেমিকের উদ্দেশে ত্রিযামা যামিনী গান করছে, 'হতাশ পথিক, সে যে আমি, সেই আমি' ; শুধু ভালোবাসার অপরাধে অপরাধিনী প্রেম-গরবিণী নারীর মার্জনা-ভিক্ষা ; রাজপথ দিয়ে রাজার দুলাল চ'লে যাবেন সেই মহামূল্য ক্ষণের প্রতীক্ষায় সজ্জিতা হচ্ছে নারী, রাজার দুলাল যখন সত্যই চ'লে গেলেন, সে-নারী ঘোমটা খসায়ে বাতায়ন থেকে এক নিমেষ তাঁকে দেখতে পেল কিন্তু বক্ষের যে-মণিহার সে ফেলে দিল পথের ধূলার উপর, সে-হার কেবল রথের চাকায় গুঁড়িয়েই গেল, কেউ জানল না সে কাকে কী দিল; প্রেমিকের মালার আকাঙ্ক্ষিনী নারী প্রেমিক চ'লে যাওয়ার পরে পেল মালা নয়, তরবারি—আর সেই তরবারি করল তার বাঁধন-ক্ষয়, সাজাল তাকে নিঃশঙ্কতার সাজে ; ভিখারিণী নারীর দেখা হ'ল পথে স্বর্ণরথগামী মহারাজার সঙ্গে, মহারাজ স্বয়ং ভিক্ষা চাইলেন তার কাছে, অপ্রস্তুত হ'য়ে সে দিল একটি ছোট কণা আর ঘরে ফিরে এসে দেখল সে-কণাটির পরিবর্তে তার ঝুলিতে রয়েছে একটি সোনার কণা ; কূয়ার ধারে শরমভীতা নারীর কাছে

একদা একং পান্থ এসে জল চেয়েছিল এই স্মৃতিটুকু সম্বল ক'রে তারপর থেকে দিন কাটাচ্ছে সে। পরিবেশ বা ঘটনা অতীব মৃদু, যতটুকু না হ'লে কাব্যনিহিত আবেগ পরিস্ফুট হবেনা ঠিক ততটুকুই। কবির ঝোঁক আবেগের উপরেই আর সেজন্যই এসব কবিতা গীতধর্মী। প্রসঙ্গত লক্ষ্য করছি যে যদিও এই কবিতা কয়টির উল্লেখ করেছি এদের অন্তর্নিহিত ভাব সম্বন্ধে কোনো প্রাক্-নির্বাচন তত্ত্ব পোষণ না ক'রেই তবুও দেখতে পাচ্ছি এসব কবিতায় কয়েকটি সাদৃশ্য বিদ্যমান। সব কয়টি কবিতাতেই নারীর উক্তি আর সে-উক্তি ("বধূ" কবিতাটিতে ছাড়া) অপূর্ণপ্রেম নারীর। রবীন্দ্রনাথের বহু বাক্‌প্রতিমা চলা, গতি, পথ, পথিক ইত্যাদি সমার্থ শব্দ-সংক্রান্ত। এসব কবিতায়ও চ'লে-যাওয়া প্রেমিক। কবিতাগুলিতে রূপকার্য আরোপ সম্ভব তবে শুদ্ধ প্রেমাবেগ-নিষিক্ত নাট্যায়িত গীতিকবিতা হিসেবে এগুলিকে বিচার করতে কিছু বাধা নেই।

নাট্যায়িত প্রেমের গীতিকবিতা "মহুয়া"তে কয়েকটি পাওয়া যায়।

"পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি", "বোলো তারে, বোলো—এতদিনে তারে দেখা হল", "আমরা দুজনা স্বর্গ-খেলনা গড়িব না ধরণীতে", "চিরকাল রবে মোর প্রেমের কাঙাল, একথা বলিতে চাও বোলো", "নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার",

এসব বৃদ্ধ বয়সের নব পর্যায়ের প্রেমকাব্য, "শেষের কবিতা"র পরিবেশ বাদ দিয়ে দেখলেও এসব কবিতার বিষয়াশ্রয়ী ঘটনাসংস্থান স্পষ্ট যদিচ সংযত আর নারীর দৃষ্টিভঙ্গি এখানেও প্রধান। রবীন্দ্রনাথের প্রেমকাব্য অধ্যয়ন-কালে নারীর বিচিত্র আবেগ সম্বন্ধে অবহিত হওয়া দরকার, নারীর প্রেম এত সূক্ষ্ম পল্লবায়ন লাভ করেছে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে যে অন্য কাব্যে তার তুলনা সহসা স্মরণে আসেনা। ড্রামাটিক বটে এসব লিরিক্ তবুও লিরিক্।

নাট্যায়িত আবেগের গীতি কবিতায় অন্য বিষয়বস্তুও পাব। মা ও ছেলে নিয়ে "শিশু" ও "শিশু ভোলানাথে" যেসব কবিতা আছে সেগুলিও কল্পিত পরিবেশে সন্নিবিষ্ট অথচ তাদের ভাবপুঞ্জে যে-আশ্চর্য গভীরতা ও যাথার্থ্য তার তুলনা বিখ্যাত ইওরোপীয় শিশুকাব্যে পাওয়া দুষ্কর, ব্লেইক, ভিক্টর য়ুগো অথবা স্যুইনবর্ণের কাব্যে তো নয়, রবর্ট লুই স্টিভ্‌ন্‌সন্-এর কাব্যেও নয়। অসীম ক্ষমতা রবীন্দ্রনাথের আপন হ'তে বাইরে দাঁড়াবার। আপন বয়স, স্বভাব, পরিবেশের সীমিত বৃত্ত ছাড়িয়ে অন্য বয়স অন্যরকম স্বভাব অন্য পরিবেশ থেকেও তিনি আহরণ করেছেন গীতিকাব্যের প্রাণস্থ আবেগ। মনে হয় বৃদ্ধ-চিত্তের অনুভূতি তাঁর কাব্যে বেশি নেই—স্বকীয় অনুভূতির কথা বলছিনা, একেবারে শেষের কাব্যগ্রন্থ কয়টিই নিজ বার্দ্ধক্যের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচিত —তা'হলেও "গানভঙ্গ" কবিতায় দুজন অবিস্মরণীয় সমদরদী বৃদ্ধের সাক্ষাৎ পাই। অন্য পরিবেশে আপন কল্পনা অনায়াসে প্রবেশ করাবার মহতী শক্তি

তাঁর ছিল ব'লেই আর যেহেতু কর্মজীবনে অথবা কবি জীবনে শুদ্ধ অহং চেতনায় আবদ্ধ কোনো কালেই থাকতে চাননি সেজন্য রবীন্দ্রনাথ বারংবার গল্পে উপন্যাসে নাটকে নাট্যায়িত গীতিকাব্যে লীলাধর কল্পনাকে নিয়ে গেছেন লোকে লোকান্তরে, এক মানবচিত্ত থেকে অন্য চিত্তে। বিধাতার সৃষ্টির মতোই তাঁর অশেষ বিস্তীর্ণ বিচিত্র সৃষ্টি।

এই সৃষ্টির আরেক বিকাশ কাব্যকাহিনীতে, তার বিশ্লেষণ স্বতন্ত্র আলোচনার অপেক্ষার্থী কিন্তু রীতিমত কাহিনীগুলি ছাড়াও অন্য একধরনের তুল্য কবিতার উল্লেখ এখানে করা যায়। লক্ষ্য করুন "চৈতালি"র এসব কবিতা :

"দেবতার বিদায়", "বৈরাগ্য", "কর্ম", "দিদি", "পরিচয়", "পুঁটু", "দুইবন্ধু", "সঙ্গী", "স্নেহদৃশ্য", "করুণা"।

এগুলিকে কাহিনী কাব্য বলা সম্ভব নয় কেননা সে-কাব্যের বিস্তার ও বুনট এখানে অনুপস্থিত। কাহিনী নয় চিত্র, ছোট্ট একেকটি ঘটনা, তাতে যেন কাহিনীর অতিমৃদু সম্ভাবনা উঁকি দেয়। যে-ভৃত্য সকাল বেলায় দেরিতে কাজে এসে প্রভুর ক্রুদ্ধ বচনের উত্তরে শুধু বল্‌ল

"কালি রাত্রি দ্বিপ্রহরে মারা গেছে মোর ছোটো মেয়ে";

যে-ছোটো মেয়েটি

"জননীর প্রতিনিধি, কর্মভারে অবনত অতি ছোটো দিদি"

সারাদিন নদী তীরে বাসন মাজে আর তারি যে-ছোটভাই, নেড়ামাথা, কাদা-মাখা, গায়ে বস্ত্র নেই, পোষা প্রাণীটির মতো পিছে পিছে এসে দিদির আদেশের অপেক্ষায় স্থিরধৈর্যভরে ব'সে থাকে ; আরেকদিন সেই যে-ছোটো ছেলেটি বাচ্চা ছাগলের চিৎকারে কেঁদে উঠ্‌ল আর তার দিদি ছুটে এসে বাচ্চা ভাইকে এক কোলে আর বাচ্চা ছাগলকে অন্য কোলে নিয়ে সোহাগ করল ; যে-গ্রাম্য যুবক একদা প্রিয় মহিষকে ডাকল "পুঁটুরাণী আয়" ; যে-মানুষ ও যে-পশু তাকাল একে অপরের পানে মুগ্ধ মূঢ় স্নিগ্ধ চোখে আর স্নেহের কৌতুকে ; বেদের যে-মেয়েটি খেলা করেছিল পালিত কুকুরের সঙ্গে ; যে-ভিখারিণী মা বিশ বছরের অস্থি-চর্মসার ছেলেকে কোলে নিয়ে রেল স্টেশনে ভিক্ষা করে ; আর যে-বারাঙ্গনা এক দোকানির গাড়ি-চাপা ছেলের জন্য হাহাকার ক'রে উঠল,—তাদের স্নেহকৌতুক করুণাময় জীবনের সঙ্গে কবি একাত্ম হয়েছেন কাব্যসৃষ্টির মুহূর্তে, সিনেমার ফিতের মতন এদের ক্ষণিক জীবনদৃশ্যগুলি পর পর চ'লে যায় আমাদের চোখের সামনে। এ-সমস্ত ঘটনাংশ নিয়ে ইচ্ছে হ'লে কবি হয়তো বিস্তৃত কাহিনী রচনা করতে পারতেন যেমন পারতেন দীর্ঘতর যদিও চিত্ররূপে তুল্য আরো কবিতায়, যেমন

"ছেলেটা" ("পুনশ্চ"), "ছুটির আয়োজন" ("পুনশ্চ"), "শ্যামা" ("আকাশ-প্রদীপ")।

মিনিয়েচার আর্ট এসব সীমিতক্ষেত্র সংযত বিষয়াশ্রয়ী দৃশ্যচিত্রে। এরকম দৃশ্যচিত্রের আরো বিস্তৃত ও জটিলতর, প্রায় কাহিনীতে রূপায়িত কবিতা

"তীর্থযাত্রিনী" ("সেঁজুতি"), "ঘরছাড়া" ("সেঁজুতি"), "শনির দশা" ("ছড়ার ছবি")।

পলাতকা থেকে শুরু করে প্রায় শেষ কাব্য অবধি আধুনিক জীবনের কাহিনী-কবিতা রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন সেগুলিতে তাঁর কাহিনীকাব্যের অভিনব করণ-কৌশল,আর এসব কবিতার স্বতন্ত্র আলোচনা প্রয়োজন কিন্তু কী তাঁর অল্প উপন্যাস নাটকের আলোচনায় কী ঐতিহাসিক কী সাম্প্রতিক জীবনের কাহিনী-কাব্যের আলোচনায় "চৈতালি"র vignette গুলির, ক্ষুদ্র চিত্র কবিতাগুলির অবহেলা অসম্ভব কেননা একই মূল বিষয়াশ্রয়ী সৃজনীপ্রতিভার লীলা সর্বত্র।

(৬)

এ-প্রবন্ধের গোড়ায় সব্‌জেক্‌টিভ্‌ ও অব্‌জেক্‌টিভ্‌, আত্মমগ্ন ও বিষয়মগ্ন, দুই শ্রেণীর সৃজনীপ্রতিভার উল্লেখ করেছি। সাহিত্যের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা-কালে আমরা এই শ্রেণীবিভাগ মানি আর বাস্তবিক বহু লেখকেরই কৃতিত্ব মোটামুটি এই বিভাগের নিকষে মাপা যায়। সচরাচর লেখকগণ আজীবন হয় এধরনের নয়তো অন্য ধরনের রচনায় নিযুক্ত থাকেন, অথবা কিছুকাল এক ধরনের অন্য সময় অন্য ধরনের লেখায়। অন্তত পক্ষে তাঁদের রচনায় দুই ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি সুস্পষ্ট।

কিন্তু সাহিত্যতত্ত্বের ছককাটা রাস্তা মহতী প্রতিভার জন্য নয়, সে-প্রতিভা আবিষ্কারের, নব-সন্ধানের উন্মাদনায় বের ক'রে নেয় নূতন রাস্তা আর সাহিত্য-তাত্ত্বিক তখন এই নবসাফল্যের অনুসরণে তত্ত্বের অদল-বদল করেন। সব্‌-জেক্‌টিভ্‌ অব্‌জেক্‌টিভ্‌, রোমান্টিক ক্লাসিক, এসব দ্বৈতবাদী সাহিত্যসংজ্ঞা আঠারো উনিশ শতকের পশ্চিম ইওরোপীয় সাহিত্য বিপ্লবের অন্যতম অবশেষ, সে-যুগের সাহিত্যিক কর্মের আলোচনায় সুষ্ঠু সংজ্ঞা বটে কিন্তু তাদের কোনো শাশ্বত ও সার্বিক প্রয়োগ-সম্ভাবনা নেই। স্রষ্টার প্রেরণা অবশ্য কোনো সময় বিষয়মগ্ন হতে পারে কোনো সময় বা আত্মমগ্ন কিন্তু এমন মনে করার সপক্ষে প্রমাণ নেই যে মহতী প্রতিভার পক্ষে এই দুই ধরনের প্রেরণা পরস্পর বিরোধী অথবা বিরোধ না থাকলেও এদের মিলন অসম্ভব। বস্তুত মহতী প্রতিভায় যে

একই কালে একই আধারে বিষয়মগ্নতা ও আত্মমগ্নতা নিহিত থাকতে পারে তার উজ্জ্বল প্রমাণ (ইওরোপীয় সাহিত্যে) গ্যেটে, আর কাব্য সম্বন্ধে শেলির বিখ্যাত প্রবন্ধে ও শেলির উপরে লেখা ব্রাউনিংয়ের প্রবন্ধে দুই প্রেরণার আত্মীয়তা স্বীকার করা হয়েছে। আমাদের সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের সৃজনীচিত্ত বিষয়মগ্ন ও আত্মমগ্ন এই কথা এ-প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য। তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য গীতধর্মী আর সে-সংগীত যেমন কস্তুরীমৃগসম আপন গন্ধে পাগল হয় আবার আপন হতে বাহির হ'য়ে বাহিরেও দাঁড়ায় আর জীবনে জীবন যোগ করে, হৃদয়ের অসংখ্য অদৃশ্য পত্রপুট ছড়িয়ে দেয় চারিদিকে।

'জগৎ দেখিতে হইব বাহির'

শ্রীপ্রমথ নাথ বিশী

কবি কাহিনীতে দেখিয়াছি নলিনীর ব্যক্তিগত প্রেম কবিকে দীর্ঘকাল তৃপ্তিদান করিতে পারে নাই, তিনি নলিনীকে পরিত্যাগ করিয়া বৃহৎ মানব-সমাজের পরিচয় লাভের উদ্দেশ্যে বহির্গত হইয়াছেন। তিনি সারা বিশ্ব ভ্রমণ করিলেন কিন্তু তৃপ্তি কোথায়? কবি ভাবেন একী হইল—নলিনীর ব্যক্তিগত প্রেম আর বৃহৎ মানব সমাজের অস্পষ্ট প্রেম দুইই সমান অতৃপ্তিকর। এমন হওয়া কি অসম্ভব যে ব্যক্তি-গত প্রেম ও সার্ব্বজনীন প্রেমের সমন্বয়েই তৃপ্তি! ব্যক্তি প্রেম বৃহত্তের পটভূমিতে স্থাপিত হইলে তবেই হয়তো সত্য হইয়া উঠে, এখানে তাহা হয় নাই বলিয়াই হয়তো এমন নৈরাশ্যজনক হইল,। কবি যে তখন এই কথাগুলি এমনভাবে চিন্তা করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ কবি কাহিনীতে নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পরবর্ত্তী কাব্য সমূহের সাক্ষ্যে এমন মনে করা অন্যায় নয়।

কবি কাহিনীতে তিনটি সত্যকে পাই, নলিনী বা মানুষের ব্যক্তিরূপ, বৃহৎ মানব সমাজের রেখাক্ষরে অঙ্কিত অস্পষ্টরূপ আর প্রকৃতি। এই তিনের মধ্যে এই বয়সে প্রকৃতির সঙ্গেই কবির কিছু পরিচয় ছিল—তাই তিনি শেষ পর্য্যন্ত নলিনীর যখন মৃত্যু হইল, বৃহৎ মানব সমাজ যখন পরিচয়ের অস্পষ্টতায় তাঁহাকে হতাশ করিল—তখন প্রকৃতির কাছে শেষ সান্ত্বনা লাভের আশায় আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। প্রকৃতি তাঁহাকে বঞ্চিত করে নাই। বিশ্বপ্রকৃতির যোগ্য প্রতিনিধি হিমালয় কবি মনের নির্ভর হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এই হিমালয়ও আর ঠিক আগের নলিনীর সহিত কবির পরিচয় লাভের আগের প্রকৃতি নয়। ইহা নলিনীর দেহাতীতরূপে সমৃদ্ধতর। কবি জানেন যে মানুষের মন চায় মানুষেরই মন, যে মানুষের মনের প্রসঙ্গেই কেবল মানুষ নয় প্রকৃতিও পূর্ণাঙ্গ। আবার তিনি অবচেতনভাবে জানেন না যে প্রেমের ব্যক্তিরূপটাও প্রেমের সার্ব্ব-জনীনরূপের প্রসঙ্গেই পূর্ণাঙ্গ। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দাঁড়ায় যে মানব সমাজের ঘনিষ্ট পরিচয় লাভটা কবিজীবনের মূখ্য ও অপরিহার্য্য উদ্দেশ্য। এবারে সেই পরিচয় লাভের উদ্দেশ্যে যাত্রা। প্রভাত সঙ্গীত বিশ্ব পরিচয়ের গাঙ্গোত্রী।

আধুনিক আলঙকারিকগণ কাব্যে image বা চিত্রোপমার উপরে বিশেষ গুরুত্ব দেন। তাঁহারা বলেন চিত্রোপমার মধ্যে অজ্ঞাতসারে কবিমনের গূঢ়ার্থ

প্রকাশিত হইয়া থাকে। রবীন্দ্র কাব্যের চিত্রোপমা সম্বন্ধে এ কথা প্রযোজ্য সন্দেহ নাই। বোধকরি রবীন্দ্র কাব্যের সার্থকতম চিত্রোপমা নদী প্রবাহ। বারে বারে ইহার দেখা পাওয়া যাইবে। নদী প্রবাহ যেমন ক্রমে পূর্ণাঙ্গ হইয়া উঠে তেমনি এই উপমাটি ক্রমেই গুরুতর অর্থবাহী হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রকাব্যের পদ্মানদী ইহারই বাস্তবমূর্তি। ইহারই আনুষ্ঠানিক ও প্রথম নিঃসংশয় প্রকাশ প্রভাত সঙ্গীতের নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে—যখন ভগ্ন স্বপ্ন নির্ঝর 'জগৎ দেখিতে হইব বাহির', বলিয়া গহ্বর ছাড়িয়া বৃহৎ—বিশ্বের মুখে বহির্গত হইয়া পড়িয়াছে। শৈশব সঙ্গীতের পথিক কবিতাতেও এই ভাবটি বিদ্যমান কিন্তু চিত্ররূপের অসম্পূর্ণতা হেতু তেমন করিয়া বাণীবাহী হইয়া উঠিতে পারে নাই। পথ চলায়, কিন্তু নিজে চলে না। নদী চলে এবং চালায়—বাণী বাহী উপমা হিসাবে ইহাতেই তাহার পূর্ণতা। ভগ্ন স্বপ্ন নির্ঝর, ইহা কবি সত্তাছাড়া আর কিছুই নয়। আপনার জীর্ণ ও ক্ষুদ্র গহ্বর ছাড়িয়া, ক্ষুদ্র বলিয়াই জীর্ণ-বৃহৎ জগতের অভিমুখে বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

জগৎ দেখিতে হইব বাহির,
আজিকে করেছি মনে,
দেখিব না আর নিজেরি স্বপন
বসিয়া গুহার কোণে।

সেখানে কবি-নির্ঝরের কি কাজ ?

আমি ঢালিব করুণাধারা,
আমি ভাঙিব পাষাণকারা ;
আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল পারা।

ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী কবিতা আহ্বান সঙ্গীতে গুহাবদ্ধ কবি নির্ঝরের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা দেখিতে পাই।

ওরে তুই জগৎ ফুলের কীট,
জগৎ যে তোর শুকায়ে আসিল,
মাটিতে পড়িল খ'সে,
সারা দিন রাত গুর্মার গুর্মার,
কেবলি আছিস বসে।

এ জগৎ-সর্ব্বজনের বৃহৎ জগৎ নয়। গুহবদ্ধনির্ঝরের জীর্ণ ও ক্ষুদ্র জগৎ। কথাটা কবি স্বয়ং স্পষ্টভাবেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

"জগতে কেহ নাই সবাই প্রাণে মোর'—ও একটা বয়সের বিশেষ অবস্থা। যখন হৃদয়টা সর্বপ্রথম জাগ্রত হয়ে দুই বাহু বাড়িয়ে দেয় তখন মনে করে সে যেন সমস্ত জগৎটাকে চায়, যেমন নবোদগত দন্ত শিশু মনে করেছেন, সমস্ত বিশ্ব সংসার তিনি গালে পুরে দিতে পারেন। (৬০)

৬০ প্রভাত সঙ্গীত, জীবন স্মৃতি

কিন্তু একবার বৃহৎ জগতে বাহির হইয়া পড়িবা মাত্র ক্ষুদ্র জগতের দুঃস্বপ্ন কাটিয়া যায়—তখন নির্ঝর 'অনন্ত জীবনের' আস্বাদ পায়—

তোরা ফুল, তোরা পাখী, তোরা খোলা প্রাণ,
জগতের আনন্দ যে তোরা,
জগতের বিষাদ পাসরা।
পৃথিবীতে উঠিয়াছে আনন্দ লহরী
তোরা তার একেকটি ঢেউ,
কখন উঠিল আর কখন মিলালি
জানিতেও পারিল না কেউ।

নিঝর যতই অগ্রসর হইতেছে ততই জীবন লক্ষ্য তাদের সম্মুখে স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে—

আজিকে একটি পাখি পথ দেখাইয়া মোরে
আনিল এ অরণ্য বাহিরে।
আনন্দের সমুদ্রের তীরে।
সহসা দেখিনু রবিকর।
সহসা শুনিনু কত গান।
সহসা পাইনু পরিমল,
সহসা খুলিয়া গেল প্রাণ।

তখন আর সে একক নয়, তখন সকলের সঙ্গে সমস্রোতে তাহার যাত্রা—

জগৎ স্রোতে ভেসে চলো
যে যেথা আছ ভাই।
চলেছে যেথা রবিশশী—
চল্‌রে সেথা যাই।

এবং অবশেষে—

জগতে হয়েছে সারা প্রাণের বাসনা।

'মানুষের ধর্ম্ম প্রবন্ধের মানব সত্য নামে পরিশিষ্টে প্রভাত সঙ্গীতের নবলব্ধ অভিজ্ঞতাকে কবি নির্ভুলভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। নির্ঝর যে জগতের অভিমুখে বহির্গত কবি তাহার নাম দিয়াছেন—"সর্ব্বমানবচিত্তের মহাদেশ।"

অন্তরে অন্তরে সকল মানুষের যোগের ক্ষেত্র এই চিত্তলোক। কারও চিত্ত হয়তো বা সংকীর্ণ বেড়া দিয়ে ঘেরা, কারো বা বিকৃতির দ্বারা বিপরীত। কিন্তু, একটি ব্যাপক চিত্ত আছে যা ব্যক্তিগত নয়, বিশ্বগত। সেটির পরিচয় অকস্মাৎ পাই। একদিন আহ্বান আসে।......এই হচ্ছে সেদিনকার কথা যেদিন অন্ধকার থেকে আলো এলো বাইরের, অসীমের। সেদিন চেতনা নিজেকে ছাড়িয়ে ভূমার মধ্যে প্রবেশ করলো। সেদিন কারার দ্বার খুলে বেরিয়ে পড়বার জন্যে, জীবনের সকল বিচিত্র লীলার সঙ্গে সঙ্গে যোগযুক্ত হয়ে প্রবাহিত হবার জন্য অন্তরের মধ্যে তীব্র ব্যাকুলতা। সেই প্রবাহের গতি মহান বিরাট সমুদ্রের দিকে। তাকেই এখন বলেছি বিরাট পুরুষ। সেই যে মহামানব তারই মধ্য দিয়ে নদী মিলবে, কিন্তু সকলের মধ্য দিয়ে। এই যে ডাক পড়লো, সূর্যের আলোতে জেগে মন ব্যাকুল হয়ে উঠলো ; এ আহ্বান কোথা থেকে। এর আকর্ষণ মহাসমুদ্রের দিকে, সমস্ত মানবের ভিতর দিয়ে, সংসারের ভিতর দিয়ে, ভোগত্যাগ কিছুই অস্বীকার করে নয়, সমস্ত স্পর্শ নিয়ে পড়েছে এক জায়গায়........

সেখানে যাওয়ার একটা ব্যাকুলতা অন্তরে জেগেছিলো, মানবধর্ম্ম সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করেছি,—সংক্ষেপে এই তার ভূমিকা। এই মহা সমুদ্রকে এখন নাম দিয়েছি মহামানব। সমস্ত মানুষের ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান নিয়ে তিনি সর্ব্বজনের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর সঙ্গে গিয়ে মেলবারই এই ডাক। (৬১)

৬১ মানব সত্য, মানুষের ধর্ম্ম, র-র ২০শ খণ্ড।

এই ব্যাখ্যার পরে আর কিছু বলিবার প্রয়োজন হয় না। কেবল একটি কথা। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের অভিজ্ঞতাকেই কবি নিজ জীবন তত্ত্বের ভিত্তি বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন দেখা যায়। আমরাও তাহা স্বীকার করিয়া লইয়াই দেখাইতে চেষ্টা করিব যে এই ক্রমঃস্ফীত নদীর দুই তীরে, একতীরে সুখ দুঃখ বিরহ মিলন" মানুষের সংসার, অন্যতীরে "নিরুদ্দেশ সৌন্দর্য্য লোক"—রবীন্দ্র সাহিত্য জগৎ ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান-চেতনা

শ্রীদীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

দীর্ঘ জীবনের শেষ প্রান্তে এসে সাতাত্তর বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ একটি চটি বই লিখলেন—তার নাম বিশ্বপরিচয়। বিষয়বস্তু এমন নয় যে সহজে দায়সারা যাবে। আর দায়সারা মনোবৃত্তি যে তাঁর স্বভাবের সীমানাবহির্ভূত ছিল, তা কে না জানে। আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে সাধারণের পরিচয় ঘটিয়ে দেবার কাজ নিতান্ত সহজ নয়। সহজ নয় তাঁদেরও পক্ষে যাঁরা এ-পথের নিয়মিত পথিক—কেননা আধুনিক বিজ্ঞানের মূলসূত্রগুলি আর যাই হোক স্বতঃপ্রতীয়মান (self-evident) মোটেই নয়, যাকে আমরা সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান বলি কেবল তারই উপর নির্ভর করে এর বনেদ গড়ে ওঠে নি। পিছনে আছে নানা জটিল পরীক্ষার দীর্ঘ ঐতিহ্য এবং চিন্তার ক্ষেত্রে বিস্ময়কর সাহসিকতা। জীনস, এডিংটন, দ্য ব্রগলী, গ্যামো প্রমুখ যে সমস্ত উজ্জ্বল নাম বিজ্ঞান সাহিত্যে সার্থকতার স্মারক হয়ে আছে, বৈজ্ঞানিক চিন্তা এবং আবিষ্কারের ক্ষেত্রেও তাদের স্থান প্রথম সারিতে। বিজ্ঞানের দুরূহ তত্ত্বকে একই সঙ্গে সহজ ও জীবন্ত করে তুলতে প্রয়োজন সেই দুর্লভ বিচারশক্তির যা শুধু নীর থেকে ক্ষীর নয়, দুধের থেকেও ক্ষীরটুকুকে ছেঁকে তুলে নিতে পারে। আরো বেশী প্রয়োজন সেই স্থষ্টিশক্তির যা বিজ্ঞানের নৈর্ব্যক্তিক তথ্যরাজিকে শুধু সত্যের জোরে নয় সৌন্দর্যেরও জোরে সহৃদয় হৃদয়সংবাদী এবং গ্রহণীয় করে তুলতে পারে। এর জন্যে চাই একাধারে সাহিত্যবোধ ও বিজ্ঞানে অধিকার। চাই বিষয়কে বশ করে তার থেকে রস নিঙড়ে বার করবার সুকঠিন সাধনা।

তবু সব কিছু জেনে বুঝেই রবীন্দ্রনাথ এই কঠিন কাজে হাত দিয়েছিলেন। নিজের ক্ষমতার সীমা সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন, তার প্রমাণ মিলবে বইটির ভূমিকালিপিতে। এটি অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে উদ্দেশ্য করে লেখা চিঠির আকারে কবির সুন্দর কৈফিয়ৎ। শুরুতেই তিনি বলছেন,

> "অনধিকার প্রবেশে ভুলের আশঙ্কা করে লজ্জিতবোধ করছি, হয়তো তোমার সম্মান রক্ষা করাই হোলো না।......যাই হোক, আমার দুঃসাহসের দৃষ্টান্তে যদি কোনো মনীষী, যিনি একাধারে সাহিত্যরসিক ও বিজ্ঞানী, এই অত্যাবশ্যক কর্তব্যকর্মে নামেন তাহলে আমার এই চেষ্টা চরিতার্থ হবে।"

আজকে, তাঁর মৃত্যুর প্রায় বিশবৎসর পরে, আমরা আনন্দের সঙ্গেই স্বীকার করছি যে এই বাংলাদেশে তাঁর ঈপ্সিত লোকপ্রিয় বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনার একটা

স্থায়ী ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে। তাঁর আগে যদিও এধরণের উদ্যম সম্পূর্ণ বিরল ছিল না, তবু নিয়মিতভাবে এ-প্রচেষ্টা প্রধানত তাঁরই প্রেরণায় শুরু হয়েছে। পরে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রমুখ সংস্থাও এ বিষয়ে ব্রতী হয়েছেন। যা হয়েছে তাকে কোনক্রমেই যথেষ্ট বলা চলে না, তবু কিছু কাজ যে হয়েছে এও কম কথা নয়। বোধ করি একথা বললে অত্যুক্তি করা হবে না যে এসবের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্বপরিচয়' বইটি বিশিষ্টতার দাবী রাখে। প্রথমত তার ভাষা অননুকরণীয়। বিজ্ঞান বিষয়ক বইয়ের ভাষা এতখানি কাব্যমণ্ডিত হওয়া প্রয়োজন হয়ত নয়, বাঞ্ছনীয় কিনা সেবিষয়েও তর্ক চলতে পারে। কিন্তু এসম্বন্ধে শেষ কথা সম্ভবতঃ সেই সুপ্রচলিত ইংরেজী প্রবাদ বাক্যটি— Nothing succeeds like success. রবীন্দ্রনাথের এই কাব্যগুণসম্পন্ন ভাষার একটি গুণ এই যে তার হাল্কা চালে পাঠককে বিষয়বস্তুর দুরূহতা ভুলিয়ে দিয়ে বেশ একটা বৈঠকী মেজাজ এনে দেয়। আর তলে তলে স্বচ্ছ হিউমারের একটি অন্তঃসলিলা ধারা রয়েছে, যা রচনাকে ঝিমিয়ে পড়তে দেয় নি। এবং এসব সম্ভব হয়েছে তথ্যের যথার্থ্যের প্রতি কোনরকম অবিচার না করে। না, বিশ্ব-পরিচয়ের মত একটি চটি বইয়ের রচয়িতা হিসেবে নিজের পরিচয় দিতে অনেক কৃতী বিজ্ঞানীও লজ্জিত হতেন না।

বিশ্বপরিচয় কিন্তু তার নানা গুণ সত্ত্বেও রবীন্দ্র রচনাবলীর মধ্যে বলতে গেলে অদ্বিতীয়, অর্থাৎ দোসরহীন। এবং রবীন্দ্রনাথও কোনদিন বৈজ্ঞানিক রচনায় যশঃপ্রার্থী হবার লক্ষণ প্রকাশ করেন নি। বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর অন্য যে টুকরো প্রবন্ধ বা রচনা আছে তা হাতে গুণে দেওয়া যায়। ছেলেবেলায় রিচার্ড প্রকটরের লেখা বই এবং মহর্ষির মুখে শোনা জ্যোতির্বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা থেকে যে লেখাটি খাড়া করেছিলেন সেটি খুব সম্ভবতঃ 'গ্রহগণ জীবের আবাস-ভূমি' এই নাম দিয়ে তত্ত্ববোধিনী প্রত্রিকাতে বেরিয়েছিল। এছাড়া উল্লেখযোগ্য লেখা হচ্ছে জগদীশচন্দ্র বসুর বিলাত প্রবাসকালে তাঁর বৈজ্ঞানিক কৃতি সম্বন্ধে নব-পর্যায় বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত দুখানি প্রবন্ধ। এই রচনাদুটির নাম হচ্ছে "আচার্য জগদীশের জয়বার্তা" (বঙ্গদর্শন, আষাঢ় ১৩০৮) এবং "জড় কি সজীব?" (বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ ১৩০৮)। এর প্রথমটি পড়েই জগদীশচন্দ্র তাঁকে লিখেছিলেন,

> "তুমি যে এত সহজে বৈজ্ঞানিক সত্য স্থির রাখিয়া এরূপ সুন্দর করিয়া লিখিতে পার, ইহাতে আমি আশ্চর্য হইয়াছি।"

লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে, সেই সুদূর ১৯০১ সালে, যখন বাংলায় পারি-ভাষিকের নামমাত্র ছিল না, তখন নতুন গবেষনালব্ধ বিষয়ের বিবরণ এতে কতখানি প্রাঞ্জলভাবে দেওয়া হয়েছে। একমাত্র তুলনা যা মনে পড়ে তা হচ্ছে

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিবিধ প্রবন্ধে'র কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক রচনা। সেখানেও ঋজু সরল সুন্দর ভাষায় বৈজ্ঞানিক বিষয়ের অবতারণা করেছেন এমন এক দিকপাল সাহিত্যিক বিজ্ঞানে যাঁর পেশাগত দখল ছিল না।

একথা সোজাসুজি মেনে নেওয়া ভাল যে রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন না এবং অনধিকার চর্চায় তাঁর অভিরুচিও ছিল না। তিনি ভালভাবেই জানতেন, এপথের সাধনা স্বতন্ত্র এবং সিদ্ধিও ভিন্ন ধরণের। রবীন্দ্রনাথের স্বভাবের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে তিনি বহুমুখী ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়েও অব্যাপারে হস্তক্ষেপ সহজে করতে চাইতেন না, জীবনীশক্তির অপচয় এড়াবার জন্যই। তবু এও সত্য যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কর্মবহুল সৃষ্টিবহুল জীবনের মধ্যেও অবসর করে নিয়ে বেশ কিছু সংখ্যক বিজ্ঞানগ্রন্থ পড়েছেন এবং হজম করবার চেষ্টা করেছেন। সেও জীবনের কোন একটি বিশেষ অধ্যায়ে নয়, নানা পর্বে। এসম্বন্ধে তাঁর নিজের জবানবন্দীই শোনা যেতে পারে—

"জ্যোতির্বিজ্ঞানের সহজ বই পড়তে লেগে গেলুম। এই বিষয়ের বই তখন কম বের হয় নি। স্যার রবর্ট বল-এর বড় বইটা আমাকে অত্যন্ত আনন্দ দিয়েছে। এই আনন্দের অনুসরণ করবার আকাঙ্ক্ষায় নিউকোম্বস, ফ্লামরিয়ঁ প্রভৃতি অনেক লেখকের অনেক বই পড়ে গেছি—গলাধঃকরণ করে গেছি শাঁসসুদ্ধ বীজসুদ্ধ। তারপরে একসময় সাহস করে ধরেছিলুম প্রাণতত্ত্ব সম্বন্ধে হক্সলির একসেট প্রবন্ধমালা। জ্যোতির্বিজ্ঞান আর প্রাণিবিজ্ঞান কেবলি এই দুটি বিষয় নিয়ে আমার মন নাড়াচাড়া করেছে। তাকে পাকা শিক্ষা বলে না, অর্থাৎ তাতে পাণ্ডিত্যের পাকা গাঁথুনী নেই। কিন্তু ক্রমাগত পড়তে পড়তে মনের মধ্যে বৈজ্ঞানিক একটা মেজাজ স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল। অন্ধ বিশ্বাসের মূঢ়তার প্রতি অশ্রদ্ধা আমাকে বুদ্ধির উচ্ছৃঙ্খলতা থেকে আশা করি অনেক পরিমাণে রক্ষা করেছে। অথচ কবিত্বের এলাকায় কল্পনার মহলে বিশেষ যে লোকসান ঘটিয়েছে সে তো অনুভব করিনে।"

এখানে রবীন্দ্রনাথ যে-কটি গ্রন্থকারের নাম উল্লেখ করেছেন, তাঁদের বই অন্তত: আরামকেদারায় বসে দিবানিদ্রার ভূমিকা হিসেবে পড়বার খুব উপযুক্ত নয়। তবু যে কেন তিনি 'শাঁসসুদ্ধ বীজসুদ্ধ' সব 'গলাধঃকরণ' করেছেন, সে প্রশ্নের উত্তর তিনি নিজেই দিয়েছেন। বস্তুজগতের সত্যকে জানবার তৃপ্তি ছাড়াও বিজ্ঞানের কাছ থেকে তিনি যা চেয়েছেন এবং পেয়েছেন, সে ওই বৈজ্ঞানিক মেজাজ। কবি হলেও তাঁর স্বভাবে গদ্যময় (prosaic) উপাদানের অভাব ছিল না, বিজ্ঞানের অনুশীলনে যা তৃপ্ত হয়েছে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির একটি প্রাথমিক সূত্রই হল এই যে সত্য কখনো কারো মনে অকস্মাৎ আপনাআপনি উদ্ভাসিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করে না, তাকে পাওয়া যেতে পারে গভীর অনুশীলনের মাধ্যমে। এবং এই অনুশীলনই আবার আমাদের সত্য-সন্ধানের হাতিয়ারগুলিকে শাণিত ও নিপুণতর করে তোলে। রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানী-

ছিলেন না, কিন্তু বৈজ্ঞানিক অনুশীলনপদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ আস্থা ছিল। তাঁর পরিশীলিত বুদ্ধি দিয়ে তিনি বুঝেছিলেন, বিজ্ঞানচর্চার প্রত্যক্ষ ফল যেমন বস্তুজগৎ সম্বন্ধে নতুন জ্ঞানলাভ, তেমনি তার পরোক্ষ ফল হল মনের মুক্তি। বিজ্ঞান যে নানা আপাতসত্য ও অর্ধসত্যের কুহেলিকার আবরণ সরিয়ে দিয়ে সত্যের পরিপূর্ণ নির্মল সরল অনাড়ম্বর রূপটি প্রকাশ করবার চেষ্টা করে, তার সেই প্রচেষ্টার প্রধান সম্বল হল খোলা মন এবং অসীম ধৈর্য। সে-প্রচেষ্টার মধ্যে একটা গভীর সংযম আছে, শৃঙ্খলা আছে। বিজ্ঞানী বিশ্বাসও করে না, অবিশ্বাসও করে না—জ্ঞাতব্য বিষয়কে বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের একধাপ উপরে স্থাপন করতে চায়। সেইজন্যেই তার পক্ষে জিজ্ঞাসা, স্বচ্ছ দৃষ্টি এবং ধৈর্যের এত বেশী প্রয়োজন। বিজ্ঞানের আবিষ্কার অনেক সময় বাইরে থেকে চটকদার বলে মনে হতে পারে, কিন্তু যথার্থ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মধ্যে কোথাও চটক বা ভেলকির স্থান নেই। বস্তুতঃ ভেলকির প্রতি শীতল অনাস্থা এবং সংযত অনুসন্ধিৎসাই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মূলকথা। ফললাভের কথা বাদ দিলেও মনোভাব হিসেবে এটি তাঁর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল। তিনি যে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও প্রাণিবিজ্ঞান সম্বন্ধে দুরূহ বই পড়তে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, তার পিছনে বিশুদ্ধ অন্বেষা ছাড়াও এই শ্রদ্ধা অনেকখানি ছিল।

রবীন্দ্রনাথ যাকে বৈজ্ঞানিক মেজাজ নাম দিয়েছেন বৈজ্ঞানিক গবেষণার পক্ষেও তার মূল্য যে-কোন তত্ত্ব বা আবিষ্কারের চেয়ে কিছু কম নয়। বরঞ্চ বিজ্ঞানের রাজ্যে যে-তত্ত্ব বা যে-আবিষ্কারকে আজ যুগান্তকারী বলে মনে হচ্ছে, আগামীকাল নতুন কোন সাক্ষ্যপ্রমাণের বলে তার মূল্য অল্পবিস্তর নাচক হয়ে যেতে পারে, কিন্তু যে জিজ্ঞাসা, ধৈর্য এবং অন্তহীন তপস্যার মনোভাব যাবতীয় আবিষ্কারকে সম্ভবপর করে তোলে, তার প্রয়োজন কোনদিনই ফুরোয় না। ইতিহাসে বারবার দেখা গেছে, যখন প্রথাবদ্ধ চিন্তার ঘূর্ণীপাকে পড়ে বিজ্ঞানের অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে গেছে , তখন শুধুমাত্র সূক্ষ্ম যন্ত্রর সাহায্যে গৃহীত সুনিপুণ পর্যবেক্ষনের দ্বারা বিজ্ঞানকে সেই দ'য়ের থেকে টেনে তোলা যায় নি। এ সম্বন্ধে মনীষী বার্ণালের উক্তি প্রণিধানযোগ্য—

"The greatest difficulty of discovery is not so much to make the necessary observations, but to break away from traditional ideas in interpreting them. From the time, when Copernicus established the movement of the earth and Harvey the circulation of blood, down to that when Einstein abolished the ether, and Planck postulated the quantum of action, the real struggle has been less to penetrate the secrets of Nature than to overthrow established ideas, even though these, in their time, had helped to advance science."

(J. D. Bernal, Science in History)

বিজ্ঞানের নিজের এলাকায় যা ভাবনার অগ্রগতিকে রুদ্ধ করে। বৃহত্তর সমাজের যেকোন ক্ষেত্রে সেই established ideas বা প্রথাবদ্ধ চিন্তা আরো অনেক ব্যাপক দুর্বিপাকের সৃষ্টি করে। কেননা এই প্রথাবদ্ধ চিন্তা সহজেই সামাজিক স্থিতাবস্থাকে (social status-quo) জীইয়ে রাখবার ব্যাপারে কায়েমী স্বার্থ গোষ্ঠীর হাতের হাতিয়ার হয়ে দাঁড়ায়। একদিন যে মতবাদ রীতিমত বৈপ্লবিক ছিল, পরবর্তীকালে চর্চার অভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষার অভাবে তার স্পন্দমান জীবন্ত অংশটুকু ক্ষয়ে ক্ষয়ে নিঃশেষ হয়ে যায় এবং অচল অনড় হয়ে তার কাঠামোটা সাধারণ্যের মনোলোক অধিকার করে জাঁকিয়ে বসে। তখন সেই একই ভাবধারা সমস্ত নতুন ভাবধারার গতিরোধ করে, ক্ষমতাশীল গোষ্ঠীর কপচানো বুলির আকারে তা সনাতন প্রতিষ্ঠালাভ করে এবং ঐ সম্প্রদায়ের আধিপত্যকেই কায়েম রাখতে সাহায্য করে। যে অ্যারিস্ততেলীয় চিন্তাধারা এককালে জীবন্ত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার ফলশ্রুতি হিসেবে দেখা দিয়েছিল, মধ্যযুগে তাই চার্চের কায়েমী স্বার্থের অবাধ রাজত্বের নৈতিক সমর্থন জুগিয়েছে। শেষ পর্যন্ত রেনেসাঁর যুগে নব্য বিজ্ঞানের গতিরোধ করতে অ্যারিস্ততেলিসের দোহাই বেশী করে দেওয়া হয়েছে। এই নতুন বিজ্ঞান মানুষকে প্রশ্ন করতে শেখাল, সেটা চার্চের পক্ষে বিপজ্জনক। অ্যারিস্ততেলিস কিভাবে তাঁর সিদ্ধান্তে উপণীত হয়েছিলেন সেটা বড় কথা নয়, দরকারী কথা এই যে তিনি প্রাচীন, সুতরাং অভ্রান্ত। যে-আমলে ছাপা বই নেহাৎ দুষ্প্রাপ্য ছিল এবং তার পাঠক-সংখ্যা ছিল প্রায় নগণ্য, সেই সুদূর রেনেসাঁর যুগে কেন যে ছাপা বইয়ের মাধ্যমে সৌরকেন্দ্রিক মতবাদ (heliocentric theory) প্রচারের জন্য ব্রুনোকে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল, গ্যালিলিওকে কারাগারে ঢোকানো হয়েছিল, তার হদিস মিলবে এইখানে। মধ্যযুগের পুরোহিততন্ত্র অন্তত এটুকু বুঝেছিলেন যে সেদিন যা ছিল পুঁথির পাতায় আবদ্ধ কূটতর্কমাত্র, কালক্রমে তা চার্চের বিপক্ষে শক্তিশালী চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে, কেননা তার মধ্যে এমন এক দৃষ্টিভঙ্গীর বীজ লুকিয়ে আছে চার্চের সনাতন ধর্মের সঙ্গে যার কোনমতেই রফা চলতে পারে না। শেষ পর্যন্ত তার অন্তর্নিহিত সত্যের জোরেই নব্যবিজ্ঞান নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করল। এর পরবর্তীকালে বিজ্ঞানের অগ্রগতি যে সর্বদাই মানবকল্যাণের পথে চালিত হয়েছে তা নয়। কিন্তু ব্যাপকভাবে সত্যের কণ্ঠরোধ করে দীর্ঘদিন অবাধে মানসিক দাসত্বের অনুষ্ঠান চালানো ক্রমশই অধিকতর কঠিন হয়ে পড়েছে।

এযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক হিসেবে রবীন্দ্রনাথ আজীবন এই মানসিক দাসত্বেরই বিরোধিতা করে এসেছেন। বিশেষ করে এদেশের যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে তাঁর প্রতিভাকে আপন ক্ষেত্র খুঁজে নিতে হয়েছিল, তাতে মনো-

লোকের জাড্য এবং দাস্যভাব ছিল সর্বব্যাপী। এখানকার পুরোপুরি সামন্ত-তান্ত্রিক অতিবৃদ্ধ সমাজ তখন সবে সম্প্রসারণশীল আধুনিক ধনতন্ত্রের সংস্পর্শে এসে আলোড়িত হতে শুরু করেছে। বাইরের দিকে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের আচার অনুষ্ঠানের কিছু কিছু অনুকরণ শুরু হয়েছে, কিন্তু বৃহত্তর সমাজ তখনও ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের অনুশাসন এবং মধ্যযুগীয় মূল্যমানে আকণ্ঠ নিমগ্ন। ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে রবীন্দ্রনাথ, বিজ্ঞানী না হয়েও, তাঁর প্রখর দূরদৃষ্টি ও ইতিহাস-চেতনার সাহায্যে বুঝেছিলেন যে পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের বাহ্য কাঠামোর চাইতেও আমাদের বেশী দরকার তার সহজাত মূল্যমান, যা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীকে বদলে দিয়ে সামাজিক অগ্রগতির পথ উন্মুক্ত করতে পারে। সমাজ ও রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে তাঁর নানা রচনায় পশ্চিমের জ্ঞানবিজ্ঞানের এই মূল্যমানকেই তিনি স্বাগত জানিয়েছিলেন। এ বিষয়ে তাঁকে রামমোহন রায়ের যথার্থ উত্তরসূরী বলা যায়। এবং ঠিক এইখানেই তাঁর বিজ্ঞান চেতনার সঙ্গে তাঁর বৃহত্তর মানবচেতনার পরিণয় ঘটেছিল। এদেশে বিজ্ঞানচর্চার সম্বন্ধে তাঁর যে উৎসাহ, তার যথার্থ উৎস এইখানে। এদিক দিয়ে ইউরোপে রেনেসাঁর যুগে বিজ্ঞানচর্চার যে ঐতিহাসিক তাৎপর্য ছিল, রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান চেতনার মধ্যে তার সমর্থন খুঁজে পাই।

বিজ্ঞানের এই তত্ত্বগত দিকটি ছাড়াও ফলিত বিজ্ঞান যেখানে মানব কল্যাণের ভূমিকায় নিযুক্ত হয়ে মানুষের অগ্রগতির পথকে প্রশস্ত করেছে সেখানে রবীন্দ্রনাথ তাকে বারবার অভিনন্দিত করেছেন। যন্ত্রের প্রতি তাঁর কোন অন্ধ বিদ্বেষ বা বিরূপতা ছিল না। যন্ত্রের অপব্যবহারকেই তিনি নিন্দা করেছেন। যন্ত্রকে নয়। যন্ত্র যেখানে মানুষের কায়িক পরিশ্রম লাঘব করে তার সামনে আত্মোন্নতির উপযুক্ত অবসর এনে দিয়েছে, অপরিমিত প্রাকৃতিক সম্পদকে অবারিত করে দিয়েছে, সেখানে রবীন্দ্রনাথ তাকে অভ্যর্থনা করেছেন। তিনি যেখানে বলছেন,

নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র।
তুমি চক্রমুখর মন্দ্রিত, তুমি বজ্রবহ্নি বন্দিত,
তব বস্তুবিশ্ববক্ষোদংশ ধ্বংসবিকট দন্ত।
তব দীপ্ত-অগ্নি-শত-শতঘ্নী-বিঘ্নবিজয় পন্থ।
তব লৌহগলন শৈলদলন অচলচলন মন্ত্র।।
কভু কাষ্ঠলোষ্ট্র-ইষ্টক-দৃঢ় ঘনপিনদ্ধ কায়া,
কভু ভূতল-জল-অন্তরীক্ষ-লঙ্ঘন লঘু মায়া।
ওর খনি-খনিত্র-নখ-বিদীর্ণ ক্ষিতি বিকীর্ণ-অন্ত্র।
তব পঞ্চভূতবন্ধনকর ইন্দ্রজালতন্ত্র।।

সেখানে তিনি যন্ত্রকে মানুষের হাতের কল্যাণ-প্রহরণ হিসেবেই দেখেছেন। যে-কবি মানুষের ভিতরকার শাশ্বত সত্যকে বন্দনা করেছেন, শেষ পর্যন্ত মানবতার

মাপকাঠিতেই সমস্ত কিছুর মূল্যায়ণ করেছেন, মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে যন্ত্রের অপরিসীম সম্ভাবনার কথাও তিনি পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। ভাবলে আশ্চর্য লাগে, আবহমান কাল থেকে মানব-ইতিহাসের নানা কলঙ্ক ও বিভ্রাটের জন্য যেভাবে যন্ত্রকে ও বিজ্ঞানকে দায়ী করা হয়ে আসছে, চিন্তার সেই বিভ্রান্তি থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। তাঁর নিজের জীবদ্দশাতেই বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তায় মানুষের জীবনযাত্রায় যে বিপুল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, তিনি সাধ্যমত তাকে বোঝবার চেষ্টা করেছেন এবং যেখানে কল্যাণের চিহ্ন দেখেছেন তাকে স্বাগত করেছেন। সস্তা রক্ষণশীলতার ছেঁদো যুক্তির অবতারণা করে বলেন নি, যন্ত্রই সব সর্বনাশের মূল, বলেন নি সামাজিক সংঘাত এড়াতে হলে আমাদের বিজ্ঞান বর্জন করে সরল আদিম সংগঠনের মধ্যে ফিরে যেতে হবে। শেষ পর্যন্ত সামাজিক সংঘর্ষের মূল তিনি সামাজিক অবিচারের মধ্যেই খুঁজেছিলেন এবং মানুষের বিবেকের কাছে তার প্রতিকার প্রার্থনা করেছিলেন। বিজ্ঞানের সুসমঞ্জস প্রয়োগ এই প্রতিকারের সহায় হতে পারে এমন বিশ্বাসও তাঁর ছিল। বিশেষ করে ডিগনিটি অফ লেবার কথাটিতে তিনি বিশ্বাস করতেন না। মানুষ বাধ্য হয়ে শারীরিক শ্রম করে, সে আলাদা কথা। কিন্তু এই মূঢ় শ্রমের জন্যই তার জন্ম এমন কথা বলা মানে মানুষের প্রগতির সম্ভাবনাকে অবমাননা করা। সচরাচর যে শ্রমের জয়গান করা হয়ে থাকে, তার মধ্যে এমন একটা ইঙ্গিত নিহিত থাকে যে যারা প্রাণপাত করে অল্পসংখ্যক লোকের জন্য নিশ্চিন্ত অবসর সহজলভ্য করে তোলে, তাদের পরিশ্রম সার্থকও পবিত্র, সুতরাং আফশোষের কিছু নেই। এই বিপুলসংখ্যক শ্রমোপজীবী মানুষকে একসময়ে তিনি সভ্যতার পিলসুজ আখ্যা দিয়েছিলেন। অন্যেরা আলো পায়, এদের গা দিয়ে মলিন তেলটুকু গড়িয়ে পড়ে। কিন্তু যখন তিনি দেখলেন বিজ্ঞানের সার্থক প্রয়োগের ফলে এদেরই ভাগ্যের চাকা ঘুরে গেল, এদের জন্যও আলোর বরাদ্দ জুটল, তখন ক্লান্ত জরাক্লিষ্ট শরীরেও সে দৃশ্য দেখবার জন্য তিনি বিদেশে ছুটে গেলেন।

তাঁর নিজের কর্মক্ষেত্রের স্বল্প পরিসরের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানকে মানবকল্যাণের ভূমিকায় নিযুক্ত করবার জন্য যথাসাধ্য প্রয়াস পেয়েছেন। এ-ব্যাপারেও তাঁর চিন্তার স্বচ্ছতা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। দেশের কাজ বলতে তিনি বুঝতেন প্রধানতঃ গ্রামোন্নয়নের কাজ এবং একাজে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির প্রয়োজন তিনি ভালভাবেই বুঝেছিলেন। পুত্র রথীন্দ্রনাথকে তিনি সাহিত্য বা দর্শন নয়, কৃষিবিজ্ঞান পড়তে আমেরিকায় পাঠিয়েছিলেন। তিনি জানতেন, দেশপ্রেম সম্বন্ধে একশোটা বক্তৃতা দেওয়ার চেয়ে যদি দেশে ধান চাষের উন্নততর প্রণালীর প্রচলন করতে পারেন তবে অনেক বেশী কাজ হবে। চাষ-আবাদের

উন্নতি সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়ে এবং আগ্রহ প্রকাশ করে তিনি যেসমস্ত চিঠিপত্র লিখেছেন, সেগুলি বাস্তব জ্ঞান ও প্রখর বিচারশক্তির উজ্জ্বল উদাহরণ। শ্রীনিকেতনে সেই পুরণো আমলে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে যে পরীক্ষামূলক খামার ও গবেষণাকেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছিল, তখনকার দিনে এদেশে তার খুব বেশী তুলনা মেলে না।

শান্তিনিকেতনের শিক্ষাব্যবস্থাতে বিজ্ঞানের স্থান ছিল যথেষ্ট উঁচুতে। বলা বাহুল্য, গবেষক বিজ্ঞানী তৈরী করা স্কুলের শিক্ষার কাজ নয়। কবি চাইতেন, ছেলেদের মন এমনভাবে গড়ে দেওয়া হোক যাতে করে তারা বিজ্ঞান অনুশীলনের যথার্থ প্রেরণা পায়। এদেশের শিশুরা প্রশ্ন করতে শেখে না, প্রকৃতির বিচিত্র ঐশ্বর্য তাদের মনে কৌতূহল জাগিয়ে তোলে না। জাগলেও সে কৌতূহলকে বিকশিত করে ফলপ্রসূ করে তোলবার আয়োজন থাকে না, এছিল তাঁর দীর্ঘকালের অভিযোগ। অথচ এই কৌতূহলই হচ্ছে বৈজ্ঞানিক গবেষণার আসল উৎস। শান্তিনিকেতনের শিক্ষাপদ্ধতিতে এদিকে যথাসাধ্য দৃষ্টি দেওয়া হয়েছিল। পাঠক্রমের বাইরেও নানাবিধ গল্প এবং আলোচনার মাধ্যমে ছেলেদের মনে প্রাণিজগৎ ও বৃহত্তর বিশ্বলোক সম্বন্ধে ঔৎসুক্য জাগিয়ে তোলবার চেষ্টা চলত। একাজে রবীন্দ্রনাথ কয়েকজন সুযোগ্য সহকর্মীও পেয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে জগদানন্দ রায় এবং তেজেশচন্দ্র সেনের নাম বিশেষভাবে করতে হয়। জগদানন্দ রায়ের সুপরিচিত রচনাগুলির উদ্ভব শান্তিনিকেতনের সে-আমলের গল্প বলার সান্ধ্য আসর থেকে। তেজেশবাবু শান্তিনিকেতনের বাইরে ততটা সুপ্রসিদ্ধ নন, কেননা তিনি আড়ালে থাকতেই ভালবাসতেন। বিদ্যালয়ের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে ঘুরে ঘুরে তিনি গাছপালা ফুল পাখী এবং পোকামাকড়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন, ধৈর্যের সঙ্গে তাদের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন, তাঁর কথা ভাবলেই এই দৃশ্যটি মনে পড়ে। শান্তিনিকেতনের শিক্ষার মধ্যে এই প্রকৃতি পরিচয় ছিল একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। এছাড়া আরেকটি জিনিষ ছিল, যাকে বলা হত sense-training। সাধারণত পারিপার্শ্বিক বস্তুজগৎ সম্বন্ধে আমাদের ইন্দ্রিয়গত বোধ এবং পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা নিতান্ত সীমাবদ্ধ। আরো সীমাবদ্ধ সে সম্বন্ধে আমাদের সচেতনতা। কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে অমুক বাড়ীটা কত উঁচু, কিংবা অমুক রাস্তাটা কত দূরে, তবে নেহাৎ আন্দাজে দায়সারা গোছের উত্তর দেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। দৈর্ঘ্য, দূরত্ব, উচ্চতা, ঘনত্ব ইত্যাদি প্রাথমিক ধারণাগুলি বিজ্ঞানের ভিত্তিস্বরূপ তো বটেই, এদের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষবোধ জাগিয়ে তোলা সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার পক্ষেও অপরিহার্য হওয়া উচিত। শান্তিনিকেতনে কবি ছোটদের জন্য ধাপে ধাপে এই শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। এর থেকেই বোঝা যাবে বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ ও বিচারবুদ্ধির উপর তাঁর কতখানি শ্রদ্ধা ছিল।

বিজ্ঞানের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সর্বাঙ্গীণ সম্পর্কের কথা বলতে গিয়ে আর একটি বিষয়ের অন্ততঃ উল্লেখ করা উচিত। সে হচ্ছে এযুগের প্রথম ভারতীয় বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর নিবিড় বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার কথা। সেই সুদূর অতীতে যখন এদেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণার কোন ঐতিহ্য ছিল না। বিদেশী সরকার বরং এ সম্বন্ধে ক্ষীণতম প্রচেষ্টাকেও নিরুৎসাহ করতে ব্যগ্র ছিলেন, তখন রবীন্দ্রনাথ একদিকে ব্যক্তিগতভাবে উৎসাহ দিয়ে এবং অন্যদিকে অসময়ে সাধ্যমত পাথেয় জুগিয়ে তাঁর কাজে সহায়তা করেছেন। বলা বাহুল্য এর মধ্যে নিছক বন্ধুকৃত্য ছাড়াও একটি মিশনারী প্রেরণা ছিল। এইসূত্রে কবি যে একসময় ভিক্ষাপাত্র হাতে অন্যের দ্বারস্থ হতেও কুণ্ঠাবোধ করেন নি তার একটা বড় কারণ এই যে এদেশে বিজ্ঞান চর্চার পথ প্রশস্ত করে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তাঁর গভীর বিশ্বাস ছিল।

রবীন্দ্রনাথ ও রাজনীতি

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ যে রাজনীতিক ছিলেন না, সে বিষয়ে আশা করি মতভেদ হবেনা। আমরা সাধারণতঃ রাজনীতিকদের দুই শ্রেণীতে ভাগ করি—স্টেটস্-ম্যান ও পোলিটিশিয়ান। এঁদের বাইরে আছেন ডেমাগগ্, কুইস্‌লিঙ্ প্রভৃতি ইতর শ্রেণীর রাজনীতিক। রবীন্দ্রনাথকে রাজনীতিক সংজ্ঞার কোনোটির মধ্যেই ফেলা যায় না। মুস্কিল এই যে, যখন আমরা কোনো মহাপুরুষ সম্বন্ধে স্তুতিবাক্য ব্যবহার কর্‌তে আরম্ভ করি তখন ভাবাবেগে বিশেষণের দীর্ঘমালা আমরা তার কণ্ঠে আরোপ করি। বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে এই বিশেষণের মালার অনেকগুলিই সার্থকভাবে শোভা পেতে পারে; কিন্তু রাজনীতিক বিশেষণ অপবাদে তাঁকে ভূষিত করবার চেষ্টা কর্‌লে অপবাদটা অপমানে পরিণত হবে, কারণ রাজনীতিক বল্‌লেই আমাদের মনের চোখে ভেসে ওঠে বিশেষ টাইপের লোক—কখনো সভামঞ্চে বক্তৃতারত, কখনো নির্বাচনের পূর্বে জনতার সঙ্গে মাখামাখির জন্য চেষ্টান্বিত। ইহাদের কেহ দক্ষিণাবর্ত্তী, কেহ বামপন্থী, কেহ সাম্প্রদায়িক, কেহ সুবিধাবাদী স্বাধীন। এই সব রাজনীতিকের কোনো সংজ্ঞার মধ্যেই যখন রবীন্দ্রনাথকে ফেলা যাচ্ছেনা, তখন রবীন্দ্রনাথ ও রাজনীতি নিয়ে কী আলোচনা হতে পারে?

রবীন্দ্রনাথ কবি ও মনীষী ছিলেন বলে রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁর যে অনুপ্রবেশ ছিল, তা তত্ত্বজ্ঞানী ও দার্শনিকের দৃষ্টি। যে পথিকের দৃষ্টি পথের মধ্যে পায়ের কাছে সীমিত নয়, যে দূর দূরান্তরে ও পারিপার্শ্বিকের প্রতিও নিবদ্ধদৃষ্টি, সেই মানুষকে পথ দেখাতে পারে। রবীন্দ্রনাথ ঋষির দৃষ্টিতে বহুদূর দেখ্‌তে পেতেন বলেই আজও তাঁর রাজনীতিক প্রবন্ধগুলি অপাঠ্য হয়নি। সমসাময়িক রাজনীতিক ঘটনাকে পাশ কাটিয়ে একটা তুরীয় অসম্ভাব্য আদর্শবাদের কথা রবীন্দ্রনাথ প্রচার করেননি। তাই দেখতে পাই—ভারতে জাতীয় আন্দোলন বা ন্যাশনাল স্ট্রাগ্‌ল সুরু হতেই প্রশ্ন উঠ্‌লো—নেশন কি? ভারতীয়েরা কি একটা নেশন '? এই নেশানত্ব লাভ করবার যেসব পথ য়ুরোপ বা পাশ্চাত্য দেশে অনুসৃত হয়ে এসেছে, ভারতে কি তা সম্ভব হয়েছে—যে আমরাও নেশানত্ব দাবী কর্‌তে পারি। রক্তের সঙ্গে রক্তের যোগ অবাধ হলে জাতিভেদ দূর হয়; নেশন গড়ে রক্তের বন্ধনে। অথচ ভারতে তার বাধা হিন্দু সমাজের মধ্যে; তার লৌকিক ধর্ম-বিশ্বাসের সঙ্গে তার সমাজ-ভাবনা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত—জাত্ গেলে ধর্ম

যায়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে যখনই রাজনীতি ও নেশানত্ব নিয়ে দেশে আন্দোলন চল্‌ছে, তখনই অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করে জয়ধ্বনি শোনা যায়। হিন্দু সমাজতত্ত্বের এবং যুগপৎ ডিমক্রেসির দোহাই পেড়ে ইংরেজকে তার শাদা-কালো ভেদনীতি, তার সাহেব ও নেটিভের পার্থক্য বোধকে তিরস্কৃত করি। দুটোই একসঙ্গে সম্ভব নয়। বর্ণহিন্দু বা শিক্ষিত সমাজের জন্য সুবিধা, সুযোগ ও সাম্য দৃষ্টির ষোলআনি দাবী ইংরেজের কাছেই পেশ করবো কবির মতে এ হচ্ছে অবাস্তব রাজনীতি। রাজনীতি, জীবননীতি থেকে পৃথক্ করা যায় না—এই কথা বারে বারে বলেছেন।

ভারতীয়দের এই দুর্বলতা ইংরেজ খুব ভালো করেই জেনে নিয়েছিল, তাই সিপাহী বিদ্রোহেরও ওহাবী-উৎপাতের পর মুসলমানরা পড়েছিল কুদৃষ্টিতে, ভারতীয় হিন্দুরা ও বিশেষ করে বাঙালিরা হয়েছিল লক্ষ্মী ছেলের দল। সিপাহী বিদ্রোহের পর কয়েক বৎসর বেশ চলে। কিন্তু ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের ফলে ভারতীয়দের মনের আগল গেল খুলে, চোখের ঠুলি গেল সরে,—তারা ভারতের সত্যকার অবস্থা দেখ্‌তে ও বুঝ্‌তে সুরু কর্‌লো। আমরা চিরকালই মুখর—তাই সেই মুখরতা বন্ধ করবার জন্য লর্ড লীটন ভার্ণাকুলার প্রেস্ অ্যাক্ট পাশ কর্‌লেন (১৮৭৮); আবার দিল্লীতে মহারানী ভিক্টোরিয়াকে ভারত সাম্রাজ্ঞী বলে ঘোষণা কর্‌বার জন্য মুগল বাদ্‌শাহদের অনুকরণে দরবার কর্‌লেন। বালক রবীন্দ্রনাথ তার প্রতিবাদ করে কবিতা লিখে হিন্দু মেলায় পড়লেন। সে কবিতার কী দশা হয়েছিল এবং কিভাবে তা উদ্ধার পেয়েছে, তা রবীন্দ্র সাহিত্য-পাঠকদের কাছে সুপরিচিত।

ইংরেজের টনক নড়লো কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার তিন বৎসর পর। প্রথমে তাঁরা ভেবেছিলেন কংগ্রেসের খেল্‌না নিয়ে শিক্ষিত ভারতীয়রা পার্লামেণ্টের প্রতি-রোধক বা অপোজিশন দলের অভিনয় করে খুসী থাক্‌বে। কিন্তু দেখা গেল খেলার লাঠি ওস্তাদের হাতে পড়লে মারের লাঠি হতে পারে। পাশ্চাত্য শিক্ষার গুণে ভারতীয়রা আত্মপ্রতিষ্ঠ হবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলো।

কংগ্রেস যখন আত্মশক্তিতে,প্রতিষ্ঠ হবার জন্য উৎসুক—ঠিক সেই সময়েই স্যর সৈয়দ আহমদ্ ঘোষণা কর্‌লেন যে মুসলমানদের পক্ষে কংগ্রেসে যোগদান করার প্রয়োজন নেই; সুরু হলো ভেদনীতির ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ। রবীন্দ্রনাথ লিখ্‌লেন—

"এতদিনে ইংরেজ একথা কতকটা বুঝিয়া থাকিবে যে, হিন্দুর হস্তে পলিটিক্স্ তেমন মারাত্মক নহে। আবহমান কালের ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেও ভারতবর্ষে পোলিটিক্যাল ঐক্যের কোনো লক্ষণ কোনোকালে দৃষ্টিগোচর হয়না। ঐক্য কাহাকে বলে মুসলমান তাহা জানে এবং [illegible] নহে। মুসলমান যদি দূরে থাকে, তবে কংগ্রেস্ হইতে আত

আশঙ্কার কোনো কারণ নাই।" সাধনার যুগে এই কথাগুলি লেখা (১৮৯৩); "ইংরাজ ও ভারতবাসী" শীর্ষক সুপরিচিত প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত।

ইংরেজ সরকারের সঙ্গে অসহযোগের কথা তখন রাজনীতিক্ষেত্রে আলোচিত হয়নি; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—

"ইংরেজ হইতে দূরে থাকিয়া আমাদের নিকট কর্ত্তব্য সকল পালনে একান্তমনে নিযুক্ত হওয়া প্রয়োজন। কেবলমাত্র ভিক্ষা করিয়া কখনোই আমাদের মনের যথার্থ সন্তোষ হইবে না।"

ইংরেজ হইতে দূরে থাক্‌বার কথা ছিন্নপত্রের মধ্যেও পাই তিনি লিখ্‌ছেন—

"হে মৃৎ পাত্র, ঐ কাংস্য পাত্রের কাছ থেকে দূরে থেকো। ও যদি রাগ করে তোমাকে আঘাত করে তাতে, তুমি চূর্ণ হয়ে যাবে, আর ও যদি সোহাগ করে তোমার পিঠ চাপড়ে মারে তাতেও তুমি ফুটো হয়ে অতলে মগ্ন হয়ে যাবে।"

পাঠক অবগত আছেন ১৮৬১ সালের ভারত কাউন্সিল অ্যাক্ট পাশ হবার পর ১৮৯২ সালে ঐ অ্যাক্টের পরিবর্ত্তন হয়। এই নূতন সংবিধান রচিত হবার পূর্বে বহু কমিশন, কমিটি বসে—ভারতীয়দের হাতে কতখানি দায়িত্ব দেওয়া যায় সেটাই ছিল প্রশ্ন। তখন রবীন্দ্রনাথ 'মন্ত্রী অভিষেক' প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধ লিখ্‌বার প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পরে তিনি লিখেছিলেন—

"যখন মন্ত্রী অভিষেক প্রবন্ধটি লিখেছিলুম, তারপরে এখন কালের প্রকৃতি বদ্‌লে গেছে। ......দুই কালের মধ্যে প্রধান পার্থক্য এই যে, তখন রাজদ্বারে আমাদের ভিক্ষার দাবি ছিল অত্যন্ত সংকুচিত। আমরা ছিলুম দাঁড়ের কাকাতুয়া, পাখা ঝাপ্‌টিয়ে চেঁচাতুম, পায়ের শিক্‌ল আরো ইঞ্চি কয়েক লম্বা করে দেবার জন্য। আজ বল্‌ছি দাঁড়ও নয়, শিকলও নয়, পাখা মেল্‌ব অবাধ স্বারাজ্যে। তখন সেই ইঞ্চি-দুয়েক মাপের দাবি নিয়েও রাজপুরুষের মাথা গরম হয়ে উঠ্‌তো।"

এই নূতন সংবিধানের সময় থেকেই হিন্দু মুসলমান বিরোধের সূত্রপাত হলো। পুনায় গোরক্ষিণী সভা স্থাপিত হয় ১৮৯৩ এ; আর তখন থেকেই গোমাতা রক্ষা ও গোমাতা হত্যা নিয়ে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মাথা ফাটাফাটির পর্ব আরম্ভ হলো—আজও তা নিবৃত্ত হয়নি। একটা কথা বোধহয় এখানে অবান্তর হবে না; দেখা গেছে ইংরেজ যখনই সংবিধানের পরিবর্ত্তন করেছে, তখনই হিন্দু মুসলমানের ভেদটা প্রত্যেক বার স্পষ্ট করে তুলে ধরেছে। ১৯০৯ সালের সংবিধান সংস্কারের মুখে ১৯০৬ সালের শেষে মুস্‌লীম্ লীগের উদ্‌ভব হয়—সাম্প্রদায়িক স্বার্থরক্ষার জন্য। তারপর ১৯২১, ১৯৩৫, ১৯৪৫ এর সংবিধান পরিবর্ত্তন যেমন হয়েছিল, হিন্দু মুসলমানের ভেদটাও দীর্ঘতর হয়ে চলেছিল। অবশেষে তার পরিণতি হলো দুইটি পৃথক্ রাজ্যসৃষ্টির মধ্যে; কিন্তু ইংরেজ দেশ ছেড়ে যাবার আগে সেখানে ভেদের কাঁটাগুলি নির্মূল করে যায় নি।

রবীন্দ্রনাথ ১৮৯০ সাল থেকে ১৯৪১ সাল পর্য্যন্ত এই অর্দ্ধ শতাব্দী ধরে যে সব প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তা' ধীরচিত্তে পাঠ কর্‌লে আমরা দেখতে পাই যে রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনীতিক বোধ—দেশের নানাযুগের রাষ্ট্রনেতাদের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। রাষ্ট্রনীতিক নেতারা আশু প্রতীকারের পথ খুঁজেছেন—কখনো বয়কট্‌, কখনো অসহযোগ, কখনো আইন অমান্য। রবীন্দ্রনাথ ভারত সমাজকে অখণ্ডভাবে দেখে সমস্যার বিশ্লেষণ ও সমাধানের যে পথ বাৎলিয়েছেন—তা রাষ্ট্রনীতির পেশাদার নেতাদের মনঃপূত কখনো হয়নি; তাঁরা চেয়েছেন টাট্‌কা প্রতীকার। তাই খিলাফতের মতো একটা অবাস্তব বিষয়কে রাজনীতির সঙ্গে জুড়ে দিতে গিয়ে হিন্দু ও মুসলমানের উগ্রধর্মীয় চেতনাকেই উস্‌কে দেওয়া হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ-এর সমর্থন করেন নি।

গোড়া থেকেই তিনি দেশবাসীর অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের কথা বলে এসেছেন। আর বলেছেন হিন্দু সমাজের জাতিভেদের বিরুদ্ধে। অস্পৃশ্যতা বর্জনের কথা কত কাব্যে, গানে, গদ্যরচনায়, নাটকে লিখে গেছেন। "স্বদেশী সমাজে", "অবস্থা ও ব্যবস্থা" প্রবন্ধে গ্রাম উদ্যোগের কথা, "ভারত তীর্থ" কবিতায় অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে তাঁর রুদ্রবাণী রাষ্ট্রনীতিকদের কানে প্রবেশ করেনি। গ্রামকে কেন্দ্র করে স্বদেশী সমাজ গঠনের প্রস্তাব যেদিন করেছিলেন, পেশাদার অর্থনীতিবিদ্‌দের দ্বারা সেদিন কবি বিদ্রূপিত হয়েছিলেন। সামাজিক অচলায়তন ভাঙ্‌বার জন্য নাটক লিখে ধর্মধ্বজীদের নিকট তিরস্কৃত হয়েছিলেন তিনি। "এস আর্য্য, এস অনার্য্য" বলে আহ্বান করার বিশ বৎসর পর গান্ধীজি "হরিজন" আন্দোলন আরম্ভ করেন। রাজনৈতিক মিলনের আশায় পুনা প্যাক্ট্‌ হলো।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে মুসলমানদের দলে পাবার জন্য তাদের মধ্য যুগীয় খিলাফৎ আন্দোলনকে কবি সমর্থন কর্‌তে পারেন নি বলে কী নিন্দিতই না হয়েছিলেন। রাষ্ট্রনীতির সঙ্গে চরকা খদ্দরকে মিশানোর মধ্যে যে মধ্যযুগীয় মনোভাব সুপ্ত ছিল, কবি তার সমর্থন কর্‌তে পারেন নি; যা বলেছিলেন তা হচ্ছে সুকল্পিত প্ল্যানিং এর কথা।

পল্লী সমাজ বা পল্লী স্বরাজ গঠনের কথা বলেই কবি ক্ষান্ত হননি, নিজের সাধ্যমতো তার চেষ্টার ত্রুটি করেননি। শ্রীনিকেতনে তাঁরই পরীক্ষাগার খুলেছিলেন,—তখন কেউ বলেনি "ফিরে চল্‌ মাটির টানে।" গ্রামোদ্যোগ ভাবনা এসেছে অনেক পরে।

কাব্যের মধ্য দিয়ে, গানের ভিতর দিয়ে তিনি দেশমাতৃকার বন্দনা নানাভাবে করেছিলেন, কিন্তু তাঁর দেশপ্রীতি মাঝে মাঝে উগ্র স্বাদেশিকতার কবি সুলভ ভাবালুতায় দীপ্ত হয়ে উঠলেও, তা স্থায়ী রূপ নেয়নি। দেশকে ও বিশ্বকে

এক সূত্রে গাঁথ্‌তে চেয়েছেন তিনি। সমগ্র বিশ্বের ভাবনা থেকে দেশের ভাবনাকে বিচ্ছিন্ন করে যে সার্থকতা লাভ করা যায় না, একথা কবি বারে বারে বলেছেন, এমনকি উৎকট স্বাদেশিকতার মধ্যেও তাঁর অন্তর থেকে বিশ্বমাতা, বিশ্বদেবের নাম ধ্বনিয়া উঠেছে। তাই দেখ্‌তে পাই স্বাদেশিকতা ও বিশ্বমানবিকতা পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিরূপে কবির মনকে আচ্ছন্ন করেনি—তারা তাঁর জীবনে, তাঁর রচনায়, তাঁর ধ্যানে ও গানে পরিপূর্ণ এককরূপেই দেখা দিয়েছে।

মানবের সমগ্র জীবনকে একটি অখণ্ড ঐক্যসূত্রে বাঁধ্‌বার জন্য একদেশ দর্শী ভাবনা কখনো উগ্র হয়ে ওঠেনি। রবীন্দ্রনাথ কবি বলে ভাবালুতার তরঙ্গে ক্ষণে ক্ষণে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে তাঁর রচনা কিন্তু তাহা তাঁহার সদাচলমান জীবন ধারায় পথ রোধ করে দাঁড়ায়নি।

রবীন্দ্রনাথ জান্‌তেন ভারতের ধর্মমূঢ় ও ধর্মান্ধ জাতি সমূহের জন্য ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্ররচনারই প্রয়োজন—একথা ভারতের সংবিধান রচনার বহুপূর্বে বলেছেন, লিখেছেন।

ভারতের প্রদেশে প্রদেশে, জাতিতে জাতিতে যে জোড় মেলেনি, তা কবি ভালো করেই জান্‌তেন। যখন ১৯৩৭ সালে কংগ্রেস কয়েকটি প্রদেশে মন্ত্রীত্ব লাভ কর্‌লেন, তখনই প্রাদেশিকতার, হিন্দী ভাষার দৌরাত্ম্যের যে সব ঘটনা ঘটেছিল, তাতে কবি আতঙ্কিত হয়ে যা লিখেছিলেন, তা যে কত সত্য, তা স্বাধীনতা লাভের তেরো বৎসর পরেও প্রমাণিত হচ্ছে। আজ যে কেবল পাকিস্তানের সঙ্গে স্থান নিয়ে, নদীর জল নিয়ে মন কষাকষি চল্‌ছে তা' নয়, আজ ভারতের মধ্যে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে বিবাদ চল্‌ছে কখনো একটা গ্রাম নিয়ে, কখনো জলধারা নিয়ে। এর উপর ভাষা নিয়ে যে কাণ্ড হয়ে গেল—তার ক্ষত কতকালে শুকাবে এবং আদৌ শুকাবে কিনা তা' কেউ বল্‌তে পারে না। রবীন্দ্রনাথ দিব্য-চক্ষে যেন এসব দেখ্‌তে পেয়ে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেছিলেন যে ভাবী রাজ্য হবে লোকরাজের, অর্থনৈতিক ভিত্তিতে সমবায়ের উপর হবে তার প্রতিষ্ঠা। রবীন্দ্র সাহিত্য থেকে তার ভূরি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

রবীন্দ্রসঙ্গীত

কাজী মোতাহের হোসেন

রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রকৃত মর্যাদা বুঝতে হ'লে সমসাময়িক প্রচলিত সঙ্গীতের গতিপ্রকৃতির পটভূমিতে ফেলেই দেখতে হয়।

রামপ্রসাদের শ্যামাসঙ্গীত এবং তাঁর বিশিষ্ট সুর উনবিংশ শতাব্দীতে খুবই প্রচলিত ছিল, এখনও প্রচলিত রয়েছে, যদিও এর জনপ্রিয়তা আগেকার তুলনায় অনেক হ্রাস পেয়েছে। এর প্রধান কারণ, ধর্মসঙ্গীতের ধারা এখন আর পৌরাণিক দেবদেবী-মুখী নেই। স্রষ্টিকর্তার ধারণাতেই একটা আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। স্রষ্টিকর্তা এখন কল্পলোকবিহারী হৃদয়দেবতা, যার সঙ্গে মানুষের সহজতর সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে।

নিধুবাবুর টপ্পা জাতীয় প্রণয়সঙ্গীতও বর্তমানে কতকটা অবহেলিত। তাঁর একটি গান এই—

> নয়নেরে দোষ কেন।
> আঁখি কি মজাতে পারে   না হ'লে মন-মিলন।
> আঁখি যত জনে হেরে   সবাই আর মনে ধরে
> সেই যাকে মনে করে   সেই তার মনোরঞ্জন ॥
>
> —(বাঙ্গালীর গান—দুর্গাদাস লাহিড়ী)

প্রাচীন কালের অনেক গানের মত এই সুন্দর গানটাতেও যেন একটা সাধারণ তত্ত্বকথা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। তবে, টপ্পার তান-প্রধান সুরের মনোহারিত্বের জন্য বিশেষ বিশেষ মহলে এখনও এসবের আদর আছে।

দাশরথি রায়ের পাঁচালি এক সময় শহর-পল্লী মাৎ করে রেখেছিল। এখন আর তার সে কদর নেই। এগুলোর বিষয়বস্তু রামলীলা, রাধাকৃষ্ণের লীলা, ইত্যাদি। এসব গানে দ্ব্যর্থপ্রয়োগ অথবা ধ্বনিসাদৃশ্যযুক্ত শব্দসমষ্টির বাহুল্য দেখা যায়। কিন্তু এ যুগে ও-সব অনেকটা স্থূল ও শ্রুতিকটু ব'লেই গণ্য হয়। যেমন,—

> বৃন্দে গো কেশবের বিচ্ছেদ কে সবে প্রাণে।
> আমার শব-রূপ যে, সব আঁধার সেই প্রাণ-কেশব বিনে ॥
> না শুনে গান বাঁশরীর,   না হেরে শ্যাম-শরীর,
> করে কি শরীর কিশোরীর,   সে গোবিন্দ জানে ॥—(বা গা)

বলা বাহুল্য, এখানে কথা আছে, কবিত্ব নেই।

শ্রীধর কথকের গান এখনও মাঝে মাঝে শোনা যায়। সে বোধ হয় এর মানবীয় গুণের জন্য। যেমন—

ভালবাসি ব'লে কিরে আসিতে ভালবাসনা।
আপন করম-দোষে না পুরিল বাসনা ।।
সতত আমার মন তব রূপ করে ধ্যান
অধীনে রেখেছে কেবল ভাবিতে তব ভাবনা ।।—(বা গা)

এখানে অতি প্রত্যক্ষ বা স্থূল ভাবে প্রিয়তমকে অনুযোগ করা হ'চ্ছে, ভালবাসার প্রতিদান পাওয়া যায়নি ব'লে। তবু রেকর্ড-করা সুরের কারুকার্যের জন্য এগান এখনও বেঁচে রয়েছে।

গোবিন্দ অধিকারী, মধুকান, ও রূপচাঁদ পক্ষী সম্বন্ধেও মোটামুটি উপরোক্ত মন্তব্য করা যায়। সাতুবাবু ও গিরিশ ঘোষের দুই একটা গান বর্তমান যুগেও ওৎরাবার মত ব'লে মনে হয়। যেমন,—

নয়নে আমার বিধি কেন পলক দিয়েছে
দরশন সুখে আমায় বিমুখ ক'রেছে।
মন যারে সদা চায় নয়ন বিবাদী তায়
সুখ সাধে একি দায় প্রমাদ ঘটেছে।—(সাতুবাবু)

আর,—

হায় রে হায় প্রেমিক যে জন, সে কেন চায় ভালবাসা।
দিলে নিলে বদল পেলে ফুরিয়ে গেল প্রেম'পিয়াসা।
প্রেমে চায় ভালবাসি, পরাব না পরবো ফাঁসি
চায় না প্রেম কেনা বেচা ভালবেসে পুরায় আশা ।।—(গিরিশ ঘোষ)

কৃষ্ণমোহন মজুমদারের—

"তুমি কার কে তোমার কারে বলরে আপন
মহামায়া নিদ্রাবশে দেখাচ্ছে স্বপন।"

আর, অমৃতলাল গুপ্তের—

"দিবা অবসান হ'ল কি কর বসিয়া মন
উত্তরিতে ভব নদী ক'রেছ কি আয়োজন।"

আমরাও ছেলে-বেলায় শুনেছি। এগুলো তত্ত্বপ্রধান হ'লেও এর ভিতর এমন একটা চিরন্তন সত্যের যাদুস্পর্শ রয়েছে যে, এখনও অনেক ভক্তের প্রাণ উদাস করে দেয়।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের দেশপ্রেমমূলক গান,

"ধন্যধান্য পুষ্পেভরা"

আর হাসির গান,

"আমরা বিলাত ফের্তা ক ভাই"—

এবং আরও অনেক গান, আপন উৎকর্ষ বলেই চালু রয়েছে। ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদের,

"ভালবাসে তাই ভাল বাসিতে আসে, আমি যে বেসেছি ভাল সে বাসা সে ভালবাসে;"

আর অতুল কৃষ্ণ মিত্রের,

"ও তায়, সেধে শুধু কেঁদে সারা হই, পায়ে ধরি যত তত পায়ে ঠেলা রই"

কিম্বা,

"আমার সাধ না মিটিল আশা না পুরিল সকলি ফুরায়ে যায় মা"—

ইত্যাদি গান এখনও একেবারে পুরোনো ব'লে বর্জিত হয়নি। মুন্সী বেলায়েত হোসেনের—

"একে আমার জীর্ণ তরী প্রেমনদীতে তুফান ভারি"—

এ ধরণের গান এখনও পল্লীগ্রামে শুনতে পাওয়া যায়। রামলাল দাস দত্তের—

"তনয়ে তার তারিণী," "বারে বারে যে দুঃখ দিয়েছ দিতেছ মা তারা"

এখনও দিব্বি বেঁচে আছে, বোধহয় সহজ অকপট বাণীর গুণে, আর গ্রামোফোন রেকর্ডের কল্যাণে। রজনীকান্ত সেনের—

"পাতকী বলিয়ে কিগো পায়ে ঠেলা ভাল হয়," তোমারি দেওয়া প্রাণে তোমারি দেওয়া দুখ, তোমারি দেওয়া বুকে তোমারি অনুভব," "সেথা আমি কি গাহিব গান, যেথা গভীর ওঙ্কারে সাম-ঝঙ্কারে কাঁপিত দূর বিমান"—

এসব গান বিশ ত্রিশ বছর আগেও শুনেছি, এখন আর শুনতে পাইনে। এসব দেখে মনে হয়, গানের স্থায়িত্বকাল নির্ভর করে কতকটা অন্তর্নিহিত গুণের উপর, আর কতকটা রেকর্ড বা অন্যবিধ প্রচারণার মারফতে।

রবীন্দ্রনাথের পরিবারে সঙ্গীতচর্চার বিশেষ চল ছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের,

"দে লো সখি দে, পরায়ে চুলে, সাধের বকুল ফুলহার,"

আর গণেন্দ্র নাথ ঠাকুরের,

"গাওহে তাঁহারি নাম, রচিত যাঁর বিশ্বধাম"—

এখন পর্যন্ত পুরোনো হয়নি। বোধহয় মার্জিত ভাষা ও ভাব, আর ব্রহ্মসঙ্গীতের প্রচলন এগুলোকে আরও অনেক দিন বাঁচিয়ে রাখবে।

এ পর্যন্ত নমুনা সূত্রে যা দেখা গেল, তার থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, রবীন্দ্র-পূর্বকালে গানের বিষয়বস্তু অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। পৌরাণিক দেবদেবীর বন্দনা ও লীলা বর্ণনা, তত্ত্বকথা, সংসারের অনিত্যতা, ভব-নদী পার হওয়ার পাথেয়, আর কবি, তরজা প্রভৃতি উপলক্ষে বাক-যুদ্ধই ছিল প্রধান বিষয়। তবে, মাঝে মাঝে টপ্পা, পাঁচালি ও রঙ্গমঞ্চের মাধ্যমে মানবীয় প্রেম আর দেশ-প্রেমের গানও প্রচলিত ছিল। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রশস্তি, সামাজিক ঘটনা বা নব্য-আচার-ব্যবহার সম্পর্কিত বিদ্রূপাত্মক গানও বেশ কতকগুলো রচিত হয়েছিল। এ পর্যায়ে রূপচাঁদ পক্ষী, প্যারীমোহন কবিরত্ন, মনোমোহন বসু, অমৃতলাল বসু প্রভৃতির নাম উল্লেখ যোগ্য। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে জনসমাজের রুচির পরিবর্তন ও মূল্য শেষে যথেষ্ট বিবর্তন ঘটেছে। এই বিবর্তনে বৈদেশিক সুরের মিশ্রণ ব্যাপারে এবং রুচির দিক দিয়েও ডি. এল. রায়ের দান অবশ্যই সামান্য নয়; তবু একথা অসঙ্কোচে বলা যায় যে প্রধানতঃ ঠাকুর বাড়ীর সাঙ্গীতিক পরিবেশ আর ব্রহ্মসঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য অবদানই সামাজিক ও সাহিত্যিক রুচি উন্নয়নে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে। আগেকার দিনে সঙ্গীতের সঙ্গে বাইজী, বাগানবাড়ী আর বারবনিতার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। এর বাইরে যে সঙ্গীত, তা হয়ত কবি তরজা ও ধর্মীয় উৎসবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। আজ যাকে পারিবারিক সঙ্গীত বলি, অর্থাৎ মাতাপিতা পুত্রকন্যা সবাই মিলে এক সঙ্গে পারিবারিক জলসায় যে সঙ্গীত, নৃত্য, যন্ত্রবাদন উপভোগ করে থাকি, তা বলতে গেলে রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রভাবেই সম্ভব হ'য়েছে। নানা উৎসব উপলক্ষ্যে, বিভিন্ন ঋতু প্রভৃতির জন্য অজস্র সঙ্গীত রচনা করে রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীত উপভোগের ক্ষেত্রে প্রসারিত করেছেন। অবশ্য, ঋতুসঙ্গীতের প্রতিকল্প 'বারমাস্যা' আমাদের গ্রামে গ্রামে প্রচলিত ছিল; কিন্তু সে-গান গৃহ প্রাঙ্গনে হ'ত না, তা হ'ত বাইরে, বিশেষ ক'রে ধানের ক্ষেতে নিড়ানের সময় বা ধান কাটার সময়। রবীন্দ্রনাথই গানকে বাইরে থেকে গৃহস্থের ঘরের কোণে ডেকে এনে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

এইবার বিভিন্ন পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের রচিত গীতের কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া যাক।

(১) ওহে সুন্দর, মম গৃহে আজি পরমোৎসব রাতি
রেখেছি কনকমন্দিরে কমলাসন পাতি।
তুমি এস হৃদে এস হৃদি-বল্লভ হৃদয়েশ
মম অশ্রু-নেত্রে কর বরিষণ করুণ হাস্য ভাতি।
তব কণ্ঠে দিব মালা দিব চরণে ফুলডালা
আমি সকল কুঞ্জ কানন ফিরি এনেছি যুথি জাতি।
তব পদতল-লীনা আমি বাজাব স্বর্ণবীণা—
বরণ করিয়া লব তোমারে মম মানস-সাথী।—গীতবিতান, পৃঃ ২৪৫

এটা প্রেমসঙ্গীত, মানসসাথীর উদ্দেশে লেখা। মানসসাথী সুন্দর ও হৃদিবল্লভ। এটা কি ভগবৎ প্রেমের গীত? অসম্ভব নয়। উৎসব, কনক-মন্দির, কমলাসন, স্বর্ণবীণা প্রভৃতি পদ বাগেদবীর প্রতি ইঙ্গিত করতে পারে, কিন্তু 'হৃদিবল্লভ' পদটা এর সাথে খাপ খেতে চায় না। তবু, লীলাপরায়ণ বা লীলাপরায়ণা দেবদেবী 'কখনও পুরুষ, কখনও নারী' রূপে প্রকাশ পেতে পারেন, —অন্ততঃ, কাব্যিক প্রশ্রয় স্বীকার ক'রে গানটিকে ভগবৎ-গীতি বলে চালিয়ে দিলে হয়ত বহু লোকের সমর্থন পাওয়া যেতে পারে। আবার, মানবীয় প্রেম ব'লে চালিয়ে দেওয়াতেও হয়ত কারো আপত্তি হবে না। তখন 'কনকমন্দিরে কমলাসন'এর একটু ভিন্ন অর্থ হবে; নায়িকা-ই তখন পুষ্প-আহরণ-কারিণী, পূজারিণী, প্রেমময়ী, বীণাবাদিনী, কনকবরণী কন্যারূপে উদ্ভাসিতা হ'য়ে উঠবে। আমি ত এই দ্বিতীয় অর্থই অধিক সঙ্গত মনে করি। সে যাই হোক, অর্থগ্রহণে একটু সন্দেহের মধ্যে থাকা ভাল—এক এক জন এক এক অর্থে নিতে পারেন। হয়ত ভাষার মধ্যে একটু প্রচ্ছন্নতার আমেজ দিয়ে উভয় দিকই খোলা রাখা হ'য়েছে। এর ফলে গানটির আবেদন দ্বিগুণ বিস্তৃত হ'য়ে গেছে। প্রেমের ধর্মই এই যে, সব বুঝে ফেললে ত ফুরিয়েই গেল; কিছু স্পষ্ট আর খানিকটা গোপন থাকলেই প্রেমের মাদকতা বজায় থাকে।

ভাষার দিক দিয়েও গানটিতে দ্ব্যর্থ-অলঙ্কারের বহুল প্রয়োগ নেই—একবার মাত্র 'হৃদে এস' আর 'হৃদয়েশ' সদৃশ ধ্বনির ব্যবহার পীড়াদায়ক ত নয়ই বরং অতীব মনোহর হ'য়েছে। পরিমিত অলঙ্কারের এই গুণ। তা' ছাড়া এই কবিতা পড়ে বা গানটি শুনে মানসপটে যে চিত্র উদিত হয়, তার মার্জিত শান্ত রূপও বিশেষ লক্ষ্যণীয়।

(২) সংসার যবে মন কেড়ে লয় জাগেনা যখন প্রাণ
তখনো হে নাথ প্রণমি তোমায় গাহি ব'সে তব গান।
অন্তরযামী ক্ষম সে আমার শূন্য প্রাণের বৃথা উপহার
পুষ্পবিহীন পূজার আয়োজন ভক্তিবিহীন তান।
ডাকি তব নাম শুষ্ক কণ্ঠে আশা করি প্রাণপণে
নিবিড় প্রেমের সরসবরষা যদি নেমে আসে মনে।

সহসা একদা আপনা হইতে ভরি দিবে তুমি তোমার অমৃতে
এই ভরসায় করি পদতলে শুষ্ক হৃদয় দান।।—গীতবিতান, পৃঃ ১৮৯

এ গানটি নিঃসংশয়ে ভগবৎ-প্রেমের। এতে হা-হুতাশ নেই ; এতে অকৃতী, অধম, পামর, হীনমতি ইত্যাকার শব্দ প্রয়োগে আত্মধিক্কার নেই, বৈতরণী পার হবার আকাঙ্ক্ষাও নেই ;—আছে হৃদয়-দৈন্যের অকৃত্রিম স্বীকৃতি, প্রেম-বন্যার জোয়ারে অবগাহন করবার আকুতি, আর অন্তর্যামীর অপ্রত্যাশিত দানের আশায় তাঁর চরণে শরণাগতি। কেমন সরল, মর্মস্পর্শী গীত—অন্তর্যামীর মন গলাবার উপযোগীই বটে।

(৩) যদি বারণ কর তবে গাহিব না, যদি শরম লাগে মুখে চাহিব না।
যদি বিরলে মালা গাঁথা সহসা পায় বাধা
তোমারই ফুলবনে যাইব না।
যদি থমকি থেমে যাও পথ মাঝে আমি চমকি চলে যাব অন্য কাজে
যদি তোমার নদী-কূলে ভুলিয়া ঢেউ তুলে
আমার তরী খানি বাহিব না।—স্বরবিতান, পৃঃ ৩১৯

আশা করি, এ গানটিকে কেউ ঐশী প্রেমর দিকে টানতে চাইবেন না। তবে, সম্ভাবনা যে একেবারে নেই, তা-ও বলতে পারি নে। রাধা-কৃষ্ণের লীলার দোহাই দিয়ে এমন একটা পরিবেশের কল্পনা হয়ত করা যেতে পারে। তবে শ্রীকৃষ্ণকে এমন নির্লিপ্ত প্রেমিক রূপে কল্পনা করা একটু কষ্টকর বইকি। এ গানে মানবীয় প্রেমের অভিমান-বাণী, বা প্রিয়তমার সম্ভাব্য সুখের পথে কাঁটা হ'য়ে না থাকার সংকল্প প্রবলভাবে অথচ মধুরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে নায়কের গভীর প্রেমের আভাসও যে নায়িকার হৃদয়ঙ্গম হবে না, তা-ও বিশ্বাস করা যায় না। মার্জিত-রুচি নায়ক সচরাচর মার্জিত রুচি নায়িকার প্রতিই আকৃষ্ট হ'য়ে থাকে। কাজেই আশা করা যায়, নায়কের অভিমানের মর্যাদা রক্ষা হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

রবীন্দ্রপূর্ব প্রেমসঙ্গীত পর্যালোচনা ক'রে বোধ হয় হাজার-করা একটিও এই পর্যায়ের বাণীসমৃদ্ধ ও সুরুচিসম্পন্ন গান খুঁজে পাওয়া যাবে না। রবীন্দ্রনাথের প্রেম-সঙ্গীত কাব্য ও সুর সম্পদে এত বৈচিত্র্যপূর্ণ যে, তার প্রধান প্রধান ভাবগুলোও উদ্ধৃতি দিয়ে দেখানো একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধের কলেবরে কিছুতেই সম্ভব নয়। তাই সে অসম্ভব চেষ্টা থেকে নিরস্ত হলাম।

(৪) শুনলো শুনলো বালিকা রাখ কুসুম মালিকা
কুঞ্জে কুঞ্জে ফেরনু সখি শ্যামচন্দ্র নাহি রে।
দুলই কুসুম মঞ্জরী ভ্রমর ফিরহি গুঞ্জরি
অলস যমুনা বহরি যায় ললিত গীত গাহি রে।। ইত্যাদি।
—গীতবিতান, পৃঃ ৭৫৩

গানটি বৈষ্ণব গীতির ছাঁচে রচিত 'ভানুসিংহের পদাবলী'র অন্তর্গত। এমন প্রকৃতির সঙ্গে মিশ খাওয়া শান্ত প্রেমের নমুনা সুবোধ্য বহির্বঙ্গীয় ভাষায় খুঁজে পাওয়া খুবই কঠিন। তবে 'নিধুবাবু'র একটি গান (রাধিকা গোঁসাই কর্তৃক রেকর্ডে গীত) ভাবের প্রশান্তিতে সমপর্যায়ের ব'লে মনে হয়। যতদূর মনে আছে, তার কয়েকটা চরণ উদ্ধৃত করছি :

সোহাগে মৃণালভুজে বাঁধিল শ্রীরাধা শ্যামে।
চপলা অচলা হ'ল নীলাচলে মিশাইল,

* * * *

গোপনে গোপিনী কুল সে মাধুরী নেহারিল,
শোভিল কদম্বমূল শ্রীরাধা-শ্যাম সমাগমে॥

নিধুবাবু হিন্দী গানে ওস্তাদ ছিলেন। হয়ত কোনও হিন্দী গানের ভাব ও সুর এই গানে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। তাই যদি হয়, তবে রবীন্দ্রনাথের বাংলা-মৈথিলীর পাশে নিধুবাবুর হিন্দী-বাংলা বা ব্রজবুলি-বাংলা গানকে পাশে দাঁড় করানো যায়। গানের রাজ্যে এই ওস্তাদে ওস্তাদে মোকাবেলা করানোতে হয়ত এঁদের কেউই আপত্তি করবেন না। রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব দোঁহাবলীর অন্তর্নিহিত ভাবরূপ আত্মস্থ করে কেমন অবলীলাক্রমে সরস সঙ্গীত রচনা করতে পেরেছেন তারই নমুনা দেখানোর উদ্দেশ্যে এ গানটি উদ্ধৃত করা হ'য়েছে।

(৫) "জনগণ-মন-অধিনায়ক, জয় হে"

কিম্বা

"হে মোর চিত্ত, পুণ্য-তীর্থে জাগোরে ধীরে"

—এই তুলনাহীন গান-দুটোর পূর্ণ উদ্ধৃতি বা এর উপর টীকা টিপ্পনির কোনও প্রয়োজন নেই।

"আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে"—

—এটাও রামপ্রসাদী সুরের একটি সুপরিচিত স্বদেশী গান। দেশবাসী সকলে পরস্পর মিলে মিশে একই উদ্দেশ্যে একত্র সম্মিলিত হ'লে যে আনন্দ উপচে ওঠে, এ গানটিতে তাই প্রকাশ করা হ'য়েছে।

"অয়ি ভুবন মনোমোহিনী"—

—বিখ্যাত দেশ-প্রেমের গান। এখানে দেশের প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য আর পিতা-পিতামহদের মানস-সম্পদের ঐতিহ্যের কথা স্মরণ ক'রে তার থেকে প্রেরণা লাভ করবার কথা বলা হ'য়েছে।

"ও আমার দেশের মাটি, তোমার পায়ে ঠেকাই মাথা"—

—এ গানটাতে বলা হ'য়েছে দেশের প্রকৃতি আমাদের হৃদয়ে তার ছাপ মুদ্রিত করে দিয়েছে ; দেশের মৌলিক উপাদান, ক্ষেতের শস্য, আমাদের দেহের গঠনে ও পোষণে নিয়োজিত হ'য়েছে। এসব সত্ত্বেও এই দেশের দুর্দশা মোচনে আমাদের অ-চেষ্টা যে কত বেদনাদায়ক তাই ফুটিয়ে তোলা হ'য়েছে।

উল্লিখিত সংগীতগুলো থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে,—রবীন্দ্রসঙ্গীতে শুধু প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদ নয়, দেশের মানুষ ও বিশ্বের মানুষের মধ্যে আদান-প্রদান-মূলক উপযুক্ত সম্পর্ক স্থাপনের উপরও বিশেষ জোর দেওয়া হ'য়েছে। এ হিসাবে দ্বিজেন্দ্রলালের

"ধন-ধান্য-পুষ্পেভরা আমাদের এ বসুন্ধরা"

কিম্বা,

"যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিল জননী ভারতবর্ষ"

অথবা, বঙ্কিমচন্দ্রের

"বন্দে মাতরম্
সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরম্"

দেশাত্ম-বোধক গান হিসাবে উপাদেয় হ'লেও এগুলো সর্বৈবভাবে এক-দেশদর্শী। এগুলোর দৃষ্টি আত্ম-নিবদ্ধ ও সঙ্কীর্ণ পরিধিতে সীমাবদ্ধ,—এর মধ্যে বৃহত্তর জগতের সঙ্গে কোনও যোগাযোগের কথা নেই, অন্যকে টেনে আপন করবার কোনও কল্পনা নেই, ঐতিহাসিক দূরদৃষ্টিরও কোনও পরিচয় মেলে না। অবশ্য, মানসধর্ম ও কালধর্মের জন্যই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্র-লালের এই পার্থক্য হ'য়েছে। সে যা হোক, রবীন্দ্রনাথ যে এঁদের চেয়ে উর্দ্ধে উঠতে পেরেছেন, এজন্য তাঁর ঋষি-তুল্য দূরদৃষ্টি আর অনন্যসাধারণ মনীষার প্রশংসা না ক'রে পারা যায় না।

(৬) "বৈশাখ, হে মৌনী তাপস" —গীতবিতান, পৃঃ ৪৩৪

"রিমঝিম ঘন ঘন রে বরষে ॥
গগনে ঘনঘটা শিহরে তরুলতা
ময়ুর ময়ুরী নাচিছে হরষে ॥
দিবানিশি সচকিত দামিনী চমকিত
চমকি উঠিছে হরিণী তরাসে ॥" —ঐ পৃঃ ৬৪৪

"আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ।" —ঐ পৃঃ ৪৮৩
"হায় হেমন্ত লক্ষ্মী, তোমার নয়ন কেন ঢাকা" —ঐ পৃঃ ৪৯৪
"শীতের হাওয়ায় লাগল নাচন" —ঐ পৃঃ ৪৯৫
"আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে" —ঐ পৃঃ ৫০১

এগুলোতে বছরের বিভিন্ন ঋতু ও প্রাকৃতিক শোভার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যে নিবিড় যোগ অনুভব করেছেন, তা-ই প্রকাশ পেয়েছে কাব্য-সঙ্গীতে। তাঁর ঋতুসঙ্গীতের মধ্যে বর্ষা-সঙ্গীতই সংখ্যায় সর্বাধিক, তারপর বসন্ত, শরৎ, গ্রীষ্ম, শীত, হেমন্ত। অনেকগুলোই একাধারে গান ও কবিতা। এটি রবীন্দ্র সঙ্গীতের বিশেষত্ব। তিনি বাণীসম্পদকে গানের কর্তব্যের মধ্যে ডুবিয়ে দিতে কিম্বা তবলা-মৃদঙ্গের চাঁটির আঘাতে পর্যুদস্ত করতে চান নি ; বরং এসবের মধ্যে সামঞ্জস্য সৃষ্টি ক'রে পারস্পরিক শোভা বর্ধন করতে চেয়েছেন। এই বিশেষত্ব প্রথমে ওস্তাদেরা স্বীকার করতে চাননি ; পরে জন-সমর্থনের চাপে প'ড়ে কবির নতুন সার্থক পরীক্ষণকে শুধু স্বীকৃতি কেন, ধ্রুপদ-খেয়াল-ঠুংরী-টপ্পা-ভজনের মত একটা বিশেষ মর্যাদা দিতে বাধ্য হ'য়েছেন। ঋতুসংগীতে—বর্ষা ও বসন্তের ক্ষেত্রে—একমাত্র নজরুল ইসলামই রবীন্দ্রনাথের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী রূপে খ্যাতি লাভ ক'রেছেন।

(৭) "হ্যাদে গো নন্দরাণী' —গীতবিতান, পৃঃ ৫৮২
"খাঁচার পাখী ছিল সোনার খাঁচাটিতে" —ঐ পঃ ৭৭৭
"মেঘের কোলে রোদ হেসেছে বাদল গেছে টুটি" —ঐ পৃঃ ৪৮২

প্রভৃতি বহু শিশু-সঙ্গীত রচনা ক'রে রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীত ভাণ্ডারের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেছেন।

(৮) "প্রলয় নাচন নাচলে যখন আপন ভুলে"- —গীতবিতান, পৃঃ ৫৪৫
"সহসা ডালপালা তোর উতলায়ে" —ঐ পৃঃ ৫১৪
"আমি পথ ভোলা এক পথিক এসেছি" —ঐ পৃঃ ৫০৬
"আজ খেলা ভাঙার খেলা খেলবি আয়" —ঐ পৃঃ ৫১৯
"কাছে আছে দেখিতে না পাও" —ঐ পৃঃ ৪১২

এই সব ক্রিয়াসঙ্গীত, সমবেত সঙ্গীত ও বিবিধ কাব্যসঙ্গীত রচনা করে রবীন্দ্রনাথ গৃহের আনন্দ বর্ধন করেছেন। তাঁর অনেক গান আবৃত্তিতে, নৃত্য-সহযোগে বা রঙ্গমঞ্চে গীত হ'য়ে থাকে। বিশেষ বিশেষ উপলক্ষেও অনেক অনেক গান রচিত হ'য়েছে। এখন আর নলকূপ খনন, হলকর্ষণ, শস্য বপন, বিদায়োৎসব, শোকসভা, সম্মানিত অতিথির শুভাগমন, বিবাহ, জন্মদিন, গৃহপ্রবেশ, শিক্ষারম্ভ, বর্ষ-বিদায়, নববর্ষ প্রভৃতির জন্য গানের অভাব হয়না। শুভ গুহ ঠাকুরতা তাঁর "রবীন্দ্রসঙ্গীতের ধারা"-য় এসবের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ শান্তি-নিকেতন আশ্রমে প্রতিদিন নিয়মিতভাবে ঋতু উৎসব, প্রভাতী বৈতালিক সঙ্গীত, ধর্ম সঙ্গীত, ইত্যাদি গাওয়ার ব্যবস্থা ক'রে রেখেছেন।

"আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে দেখতে আমি পাইনি"—(দেহতত্ত্ব)—গীতবিতান পৃঃ ২৬
"যার অদৃষ্টে যেমনি জুটেছে"—(বাউল), ঐ, পৃঃ ৫৭৪
"আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে"—(রামপ্রসাদী)—ঐ, পৃঃ ২৪৭
"আমি সংসারে মন দিয়েছিনু, তুমি আপনি সে মন নিয়েছ"—(কীর্তন)-ঐ, পৃঃ ১৩৯
"খরবায়ু বয় বেগে চারিদিক ধায় মেঘে
ওগো নেয়ে নাওখানি বাইয়ো।"—(সারি)—ঐ, পৃঃ ৫৬৫
"তোমার খোলা হাওয়া লাগিয়ে পালে টুকরো ক'রে কাছি
ডুবতে রাজি আছি আমি ডুবতে রাজি আছি।"—(ভাটিয়ালী)—ঐ, পৃঃ ২১৭

এগুলো ভাবের দিক দিয়েই হোক, বা সুরের দিক দিয়েই হোক, লোক-সংগীতের কোঠায় পড়ে। লোকসঙ্গীত যেন দেশের, তথা পল্লীর, আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে থাকে, আর আপনা-আপনি লোকের হৃদয়ে প্রবেশ করে। তাই, অনায়াসে সে সুর স্থানীয় বৈশিষ্ট্য-সহকারে লোকের কণ্ঠে অধিষ্ঠিত হয়।

(১০) "পায়ে পড়ি শোন ভাই গাইয়ে"—গীতবিতান, পৃঃ ৫৯৫
"কাঁটাবন-বিহারিনী সুর-কানা দেবী
"বদ-কণ্ঠ লোকবাসী আমরা কজনা"—ঐ, পৃঃ ৫৯৬
"চাম্পৃহ চঞ্চল চাতকদল চলহে"—সে
"ভালমানুষ নইরে মোরা ভালো মানুষ নই,
গুণের মধ্যে ঐ আমাদের গুণের মধ্যে ওই"—গীতবিতান, ৫৯৪

এই সব হাসির গান নিশ্চয়ই দ্বিজেন্দ্রলাল ও নজরুল ইসলামের এই শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ অবদানের সঙ্গে তুলনীয়; হয়ত বা সূক্ষ্মতার দিক দিয়ে অধিক পরিপাটিও হ'তে পারে। রবীন্দ্র-পূর্ব কালের হাসির গানের অধিকাংশই এত স্থূল যে সে সবের সঙ্গে এগুলোর তুলনাই চলতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ গানে তিনি নিজেই সুর দিয়েছেন। তাঁর প্রথম দিকের গান প্রায়ই রাগরাগিণীতে বাঁধা ও নিয়মিত তালে সন্নিবিষ্ট। তিনি রাগরাগিণী ও তালে কতদূর দক্ষ ছিলেন তার প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে দুর্গাদাস লাহিড়ী মশাইয়ের ১৯০৫ সালে প্রকাশিত "বাঙ্গালীর গান" নামক সংগ্রহ পুস্তক থেকে। এই সময় পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ যে সব গান রচনা করেছেন তার থেকে উক্ত সংগ্রহ পুস্তকে ২৮১টি গান উদ্ধৃত হ'য়েছে। তার মধ্যে তালের হিসাবে দেখা যায় ৭৬টি একতালা; ৪৭টি কাওয়ালী; ৪০টি ঝাঁপতাল; ২০টি আড়া-ঠেকা; ১১টি খেমটা; ৮টি যৎ ও চৌতাল; ৬টি ঠুংরী ও রূপক; ৪টি আড় খেমটা ও তাল ফেরতা; আর ৩টি তেওরা; ২টি ক'রে ছেপকা, ধামার, ও সুর-ফাক্তা; আর ১টি করে মধ্যমান, ঢিমে তেতালা, ও তেওট। আর বাকী ৪৯টিতে তাল লেখা নেই,—এর কতকগুলো কীর্তন, বাউল ও ভজন। রাগ-রাগিণীর

গণনায় দেখা যায়, ২৩টি ভৈরবী ; ১৭টি বেহাগ ; ১১টি বাহার, ১০টি ক'রে ঝিঁঝিট, কীর্তন ; ৮টি ক'রে কাফি, খাম্বাজ, ভায়রোঁ ; ৬টি ক'রে সিন্ধু, ইমন কল্যাণ ; ৫টি ক'রে ললিত, জয়জয়ন্তী, ভজন, বিভাস, টোরী দেশ ; ৪টি ক'রে শাহানা, গৌড়সারং, গৌরী, রাম প্রসাদী, আলাইয়া, হাম্বীর, মুলতান ; ৩টি ক'রে পূরবী, সিন্ধু-কাফি, কানাড়া, বাউল, খট ; ২টি ক'রে মল্লার, দেশ-সিন্ধু, প্রভাতী, ধনু, গৌড়-মল্লার, সরফর্দ্দা, রামকেলী, কেদারা, পিলু ; আর ১টি ক'রে ছায়ানট, ককুভ, কালেংড়া, আশাবরী টোরী, আনন্দ-ভৈরবী, সুরট, সরফর্দ্দা, বড় হংস সারঙ, নোগিয়া, আশা-ভৈরবী, সোহিনী, বাগেশ্রী, খট-ললিত, দক্ষিণী, টোরী-ভৈরবী, সিন্ধু-ঝিঁঝিট, আশাবরী, রামকেলী, ভূপালী, বেলাওল, মালকোষ, শঙ্করাভরণ, সিন্ধু-ভৈরবী, জিলাফ-বারোয়োঁ, কল্যাণ, বসন্তবাহার, জিলফ, বারোয়াঁ। এগুলো বিশুদ্ধ শাস্ত্রসম্মত রাগরাগিণী বা যৌগিক রাগ (মিশ্ররাগ নয়)। এ ছাড়া ৫৩টি গানে মিশ্ররাগিণী ব্যবহার করা হ'য়েছে। বাকী ৭টি গানে বিভিন্ন-রাগিণী, কিম্বা অনির্দিষ্ট বা অ-নামীয় রাগিনী ব্যবহৃত হ'য়েছে। এর থেকে দেখা যায়, ১৯০৫ সালের আগেই রবীন্দ্রনাথ ১৯টি বিভিন্ন তাল, এবং ৬৫টি বিভিন্ন রাগরাগিণী ব্যবহার করেছেন। পরবর্তীকালে তিনি ছয়টি নতুন তাল সৃষ্টি করেছেন,—যথা ঝম্পক (৩, ২) ; ষষ্টি ; রূপকড়া (৩, ২, ৩) ; নবতাল ; একাদশী ; ও নবপঞ্চক (২, ৪, ৪, ৪, ৪)।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে, তালের মধ্যে—একতালা, কাওয়ালী, ঝাঁপতাল, আড়াঠেকা ও খেমটা তাল রবীন্দ্রনাথের প্রিয় ছিল ; আর রাগরাগিণীর মধ্যে প্রিয় ছিল ভৈরবী, বেহাগ, বাহার ঝিঁঝিট, কীর্তন, কাফি, খাম্বাজ ও ভায়রোঁ। (শুভ গুহ ঠাকুরতা ১৯০৯।১০ সাল পর্যন্ত রবীন্দ্র-প্রিয় রাগরাগিণীর ৪০৪টি গানের ভিত্তিতে যে তালিকা দিয়েছেন, তার সঙ্গে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত রচিত গানে রাগরাগিণীর উল্লিখিত পছন্দ-তালিকার সঙ্গে বেশ সাদৃশ্য দেখা যায়।) উপরের সংখ্যাতত্ত্ব থেকে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ কতকগুলি কূট তাল এবং অল্প-পরিচিত রাগরাগিনীতেও সঙ্গীত রচনা করেছেন। এতগুলো রাগ-রাগিণীর বিশুদ্ধতা রক্ষা ক'রে সুর দেওয়া, এবং তাল লয় সহকারে গাইতে পারা অবশ্যই যেমন তেমন কথা নয়।

রবীন্দ্রনাথ প্রথম দিকে শাস্ত্র-সম্মত বিশুদ্ধ রাগরাগিণীই অধিক ব্যবহার করেছেন। আবার, সঙ্গে সঙ্গে গায়ন-প্রণালীতে বাণীর মর্যাদার দিকেও বেশ নজর রেখেছেন। মধ্যবর্তী কালে শাস্ত্রানুযায়ী রাগরাগিণীর মধ্যেও বৈচিত্র্যের উদ্দেশ্যে বা সুরকে ভাবানুসারী করবার জন্য অনেক সময় অপ্রত্যাশিত সুর সংযোজন করেছেন। শেষ পর্যায়ে অর্থাৎ জীবনের শেষ বিশ বছরে শাস্ত্রের লৌহ-বন্ধন অস্বীকার করেই ভাব, সুর, আর বাণীর মধ্যে আশ্চর্যজনক সামঞ্জস্য

বিধান করেছেন,—আপন কবিপ্রকৃতি, মৌলিক সুরবোধ ও রসানুভূতির অলক্ষ্য ও অলঙ্ঘ্য তাগিদেই। এর সমর্থন স্বরূপ যোগ্যতর সমঝদারের দেওয়া দুটো উদাহরণ এই :—*

"মোর প্রভাতের এই প্রথম খণের কুসুমখানি।
তুমি জাগাও তারে ঐ নয়নের আলোকখানি—গীতবিতান, পৃঃ ২২
"যাবার বেলা শেষ কথাটি যাও ব'লে।
কোন্ খানে মন লুকানো দাও ব'লে।।—ঐ, পৃঃ ৩৪০

আর, রাগসঙ্গীত বা মার্গসঙ্গীত লোকসঙ্গীতের চেয়ে অনেক বেশী সাধনা সাপেক্ষ, এতে ব্যাকরণ ও অলঙ্কারের অনেক মারপ্যাঁচ আছে, সুতরাং ওস্তাদের কাছে শিখতে হয়। তবু অধিকারীর অধিকার স্বীকার করতেই হয়। অধিকারী তাঁকেই বলে, যিনি সঙ্গীতের ঠাট, জাতি, প্রকৃতি, সুর, তাল, লয়, অলঙ্কার প্রভৃতি বাহ্যরূপের সঙ্গে সঙ্গে এর ভাব-রূপটাও সম্যক্ আয়ত্ত করেছেন। এই অধিকারীরাই সঙ্গীতের স্রষ্টা হ'তে পারেন—এঁরাই ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরী, টপ্পা, ভজন ইত্যাদি সৃষ্টি করেছেন, আর রাগ-রাগিণীতেও অনেক নতুন বৈশিষ্ট্যের প্রবর্তন করেছেন। রবীন্দ্রনাথও ঐ অধিকারীদের মধ্যেই একজন। তিনি বাল্যকালে কালোয়াতি সঙ্গীতের পরিবেশে মানুষ হ'য়েছেন; কৈশোর ও যৌবনে দেশবিদেশ ভ্রমণ ক'রে সঙ্গীতের বিবিধ স্থানীয় বৈশিষ্ট্য ও রীতি-প্রকৃতির সঙ্গে পরিচিত হ'য়েছেন; আপন গৃহেও উদার পরিবেশে নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা-উদ্ভাবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রয়েছেন; তার উপর অনুভূতিশীল কবিচিত্ত দিয়ে সঙ্গীতের বাণী, তাল ও সুরের মধ্যে ক্ষেত্রোপযোগী সুসঙ্গত অনুপাতের প্রবর্তন ক'রেছেন। এর ফলে রবীন্দ্র সঙ্গীতে এক প্রকার ক্লাসিক্যাল বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। সুষ্ঠুভাবে পরিবেশন করতে হ'লে এতেও বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন। শুভ গুহ ঠাকুরতা তাঁর বইয়ে একটি সুদীর্ঘ ভূমিকায় এর অলঙ্করণ নীতি, উচ্চারণ প্রণালী, শ্বাসগ্রহণ পদ্ধতি, কণ্ঠস্বর নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্র নাথের বহু গান স্বরলিপিতে বিধৃত হ'য়েছে। তবু শুধু ওর সাহায্যে বাড়ীতে একলা ব'সে কর্তব বা 'রেয়াজ' করাই যথেষ্ট নয়। এ গানের গতি-প্রকৃতির বিশেষ বিশেষ ঝোঁক রয়েছে, তা আয়ত্ত করতে হ'লে রীতিমত ওস্তাদ ছাড়া গতি নেই। তবু, আটঘাট বেঁধে যতই শিক্ষাদান বা শিক্ষা-গ্রহণ করা হোক, জনপ্রিয়তার মূল্য-স্বরূপ মুখে মুখে এর পরিবর্তন বা বিকৃতি বেশী দিন ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। এমনকি, কিছুকাল পরে ওস্তাদদের মধ্যেই পার্থক্য দেখা দেবে। তবে এতে অতি মাত্রায়

---

*শুভ গুহ ঠাকুরতার "রবীন্দ্র সঙ্গীতের ধারা দ্রষ্টব্য।

ঘাবড়াবার কিছু নেই। আমার মনে হয়, প্রতিভাবানেরা যেন হাতে হাতে প্রবহমান সঙ্গীত-সূত্র ঊর্ধ্বে ধরে রেখেছেন। কিন্তু টেলিগ্রাফের তারের মত খুঁটির মাথায় সূত্রটা সঠিক উচ্চতা রক্ষা করলেও একটু দূরে গিয়ে প্রাকৃতিক নিয়মেই তা নুয়ে পড়ে। পূর্ববর্তীদের খুঁটির খানিক সামনে রবীন্দ্রনাথ যেমন অগ্রসরশীল সঙ্গীত-সূত্রের এক প্রান্তে নতুন খুঁটি গেড়েছেন, ভবিষ্যতে আর একজন 'প্রতিভা' এসে নুয়ে পড়া সূত্রের প্রান্ত আবার তুলে ধরবেন, তারপর আর একজন, তারপর আর একজন। এই ভাবে অগ্রগামী সূত্র ওঠা-নামা করতে করতেই চলতে থাকবে,—উন্নতিপ্রবাহ ত চিরকাল এমনি ক'রে ঢেউ খেতে খেতেই ছুটে চলে।

রবীন্দ্রনাথের নাটক

হরপ্রসাদ মিত্র

বন্ধ ঘরে নির্জন-বাসের প্রহর গেছে প্রথমে,—তারপরে শুরু হয়েছে মানুষের স্পর্শ।—রবীন্দ্রনাথের নিজের কথা দিয়ে তাঁর আপন জীবনের প্রথম দুটি পর্বের কথা খুবই সংক্ষেপে বলতে হ'লে তা বোধ হয় এইভাবেই বলা যেতে পারে। প্রথম অবস্থাটিকে তিনি বলেছিলেন—'গুহাচরের' অবস্থা ; দ্বিতীয় অবস্থাকে—'লোকালয়ের বাস'। নিজেরই মনের বিচিত্র ভাব-ভাবনা অবলম্বন করে তাঁর প্রথম যে আত্মময় আদান-প্রদানের ঋতু,—তাকে তিনি 'আবেগের বাষ্পপুঞ্জ'-চিহ্নিত' বলে গেছেন। এবং অতঃপর 'ছবি ও গান' লেখবার সময়ে তাঁর মনে নতুন যে প্রবৃত্তির কাজ শুরু হয়েছিল, তাকেই তিনি বলে গেছেন 'বহির্মুখী প্রবৃত্তি'। 'ছবি ও গান' লেখবার সময়ে তাঁর বয়ঃসন্ধি চলছিল। তবে, প্রথম কৈশোরের 'অনুদ্দিষ্ট বেদনা-বোধ' তখন অতিক্রান্ত। সেই 'ছবি ও গান' রচনার সমকালীন মনোভাবের কথা বলতে গিয়ে তিনি নিজে জানিয়েছিলেন, 'ছবি এঁকে তখন প্রত্যক্ষতার স্বাদ পাবার ইচ্ছা জেগেছে মনে কিন্তু ছবি আঁকবার হাত তৈরি হয়নি তো'। 'রচনাবলী'-সংস্করণে এ মন্তব্য ছাপা হয়েছে। 'ছবি ও গান' সম্বন্ধে এই ছিল তাঁর আপন কথা।

তারপর তিনি একথাও বলেছেন যে, সন্ধ্যা-সংগীত, প্রভাত- সংগীতের অবরুদ্ধ আলোকের প্রহর কাটিয়ে, বহির্মুখী প্রবৃত্তির তাড়নায় তিনি বেরিয়ে গিয়েছিলেন অন্য এক পথে। তাঁর নিজের কথায়—

> 'বেদনার ভিতর দিয়ে ভাব প্রকাশের প্রয়াসে সে শ্রান্ত, কল্পনার পথ সৃষ্টি করবার দিকে পড়েছে তার ঝোঁক। এই পথে তার দ্বার প্রথম খুলেছিল বাল্মীকি-প্রতিভায়। যদিও তার উপকরণ গান নিয়ে কিন্তু তার প্রকৃতিই নাট্যীয়। তাকে গীতিকাব্য বলা চলে না।'

'নাট্যীয়' কথাটার অভিপ্রেত অর্থ সম্বন্ধে 'রচনাবলী'-সংস্করণে তাঁর সেই 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর ভূমিকায় তিনি নিজেই লিখেছিলেন—'অর্থাৎ সে আত্মগত নয়, সে কল্পনায় রূপায়িত।' 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর দ্বিতীয় দৃশ্যে 'হেদে গো নন্দরাণী, আমাদের শ্যামকে ছেড়ে দাও' গানটির সম্বন্ধে তাঁকে বলতে শোনা গেছে যে,—সে গান 'একটি ছবি, যার রস নাট্যরস'। এবং 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' সম্বন্ধে তাঁকে পুনরপি বলতে শোনা গেছে, 'এই আমার হাতের প্রথম নাটক যা গানের ছাঁচে ঢালা নয়। এ বইটি কাব্যে এবং নাট্যে মিলিত।'

রবীন্দ্রনাথের নাটক-নাটিকার কথা আলোচনা করতে গেলে তাই প্রথমেই তাঁর এই কাব্য, গদ্য এবং গান—এই ত্রি-পথ-সমাবেশের কথা মনে পড়ে—এবং সেই কারণেই তাঁর রচনা-ধারার একটি কালানুক্রমিক তালিকা দরকার হয়। তাঁর নাটক-নাটিকার সংখ্যা কম নয়। তাদের শ্রেণীও এক নয়। 'বাল্মীকি-প্রতিভা' বা 'প্রকৃতির প্রতিশোধ',—'গোড়ায় গলদ' আর 'চিরকুমারসভা'—আবার, 'শারদোৎসব', 'ডাকঘর', 'ফাল্গুনী', 'রাজা', 'রক্তকরবী', 'মুক্তধারা', 'অচলায়তন',—আবার তাঁর 'বৈকুণ্ঠের খাতা', কিংবা 'মুকুট'—এইসব প্রসিদ্ধ লেখার শ্রেণী-বৈচিত্র্যের কথা মনে রেখে সাধারণভাবে তাঁর নাটকের প্রকৃতির কথা ভাবতে গেলে তাঁর অন্যতম প্রিয় প্রসঙ্গ মুক্তি-তত্ত্বের কথা মনে পড়ে। গানে, কবিতায়, গদ্য-রচনায়, নাট্য-সাহিত্যে—সর্বত্রই তিনি মানব-জীবনের অনিবার্য মুক্তি-সাধনার কথা বলেছেন। নাটক রচনার কাজে জীবনের প্রাত্যহিক, সাধারণ দৃশ্যক্ষেত্র তিনি যে উপেক্ষা করেছেন, তা নয়। তবে, নাটকের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব পথ কী, সে-প্রশ্নের জবাব দিতে হলে একথা বলতেই হয় যে,—তিনি রূপকভাষী,—সংকেত-ব্যবহারে দক্ষ,—গানে সিদ্ধহস্ত,—এবং অন্তর্মুখিতার সাধক।

সে সব লক্ষণ কেবল যে তাঁর নাটকেই দেখা গেছে, তা নয়। অন্যান্য সাহিত্য-শাখার মধ্যেও তাঁর এইসব স্বাভাবিক প্রবণতার প্রকাশ ঘটেছে। তিনি গানেও ইশারা করেছেন,—আবার নাটকেও তাই। 'বনফুল' থেকে 'চিত্রা' অবধি তাঁর কাব্য-রচনাবলীর মধ্যেই কি কম ইশারা আছে? সৌন্দর্য, মুক্তি, কল্যাণ ইত্যাদি, ভাবনাই তাঁর নিজস্ব প্রধান প্রধান ভাবনা। তাঁর 'শারদোৎসব', 'তপতী', 'অচলায়তন', 'রক্তকরবী', 'রাজা' প্রভৃতি নাট্য-রচনায় এইসব ভাবনাই তো ব্যক্ত হয়েছে।

তাঁর আমলের আগে, এসব ভাবনাকে ঠিক নাটকের ভাবনা বলে ভাবা হোতোনা। বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে 'নীলদর্পণ' বা 'একেই কি বলে সভ্যতা',—অথবা 'প্রফুল্ল' বা 'বিবাহ-বিভ্রাট' বা 'চন্দ্রগুপ্ত' ইত্যাদি প্রসিদ্ধ নাটকের প্রকৃতি আলাদা। রামনারায়ণের পরে,—মধুসূদন আর গিরিশচন্দ্রের হাতেই সত্যিকার আধুনিক বাংলা নাটকের জন্ম হয়। সেটা উনিশ শতকের শেষার্ধের ঘটনা। গিরিশচন্দ্রের মধ্যে শেক্স্পীয়র আর রামকৃষ্ণ, এই দু'জনেরই গভীর প্রভাব বর্তেছিল। বাংলার প্রাচীন যাত্রা,—আর সংস্কৃতের নাটক-নাটিকার ধারা,—এই দুইয়ের সঙ্গে ইউরোপের নাট্যাদর্শ স্মরণ করা,—এবং তারই ফলে নবযুগের নতুন বাংলা নাটকের উদ্ভব বা সূচনার সংকেত—এই ছিল সে-আমলের ঐতিহাসিক লক্ষণ।

মধুসূদন তাঁর 'পদ্মাবতী' নাটকে অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করেছিলেন,—অথবা রামনারায়ণের 'কুলীন কুলসর্বস্ব' নাটকে হাস্য-পরিহাসের তীব্রতা ছিল,—এ-ধরণের তথ্য বা মন্তব্য সম্বন্ধে কোনো-রকম আপত্তি ওঠবার হেতু নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নাটক সত্যিই নাটক না-কি কবিতা?—তাতে ঘটনা এবং সংঘাতই প্রধান ব্যাপার না-কি তা কেবল গানের রেশের মতন?—এ-ধরনের কথা উঠলে সংক্ষেপে কী-ই বা বলা যায়? তাঁর 'রাজা' (প্রথম প্রকাশ ১৩১৭) নাটকের প্রথম দৃশ্যটিই অন্ধকার। সেই অন্ধকার ঘরে রানী সুদর্শনা আর তাঁর দাসী সুরঙ্গমাকে দেখা যায়। প্রথমে রানী-ই কথা আরম্ভ করেন—'আলো, আলো কই? এ-ঘরে কি একদিনও আলো জ্বলবে না।' তার জবাবে দাসী সুরঙ্গমা বলে—'রানীমা, তোমার ঘরে ঘরেই তো আলো জ্বলছে—তার থেকে সরে আসবার জন্যে কি একটা ঘরেও অন্ধকার রাখবে না?' এ নাটকে রাজার সঙ্গে রানী সুদর্শনার মিলন হয়েছে শেষ দৃশ্যে। প্রথম দৃশ্য বা সূচনার সংখ্যা—এক; শেষ দৃশ্য বা সমাপ্তির সংখ্যা, কুড়ি। সুদর্শনার ইচ্ছে ছিল যে, রাজা আপনি এসে আদর করে তাকে গ্রহণ করবেন। কিন্তু রাজা আসেন নি। দশম দৃশ্যে নিজের অনাদর উপলব্ধি করে সুদর্শনা বড়োই ব্যথিত হয়েছে। তার আগে রাজবেশী এক প্রতারকের গলায় সে মালা দিয়েছে। তারপর অষ্টম দৃশ্যে যখন আগুন লেগেছে রানীর প্রাসাদে,—রানী নিজের ভুল বুঝতে পেরে যখন লজ্জায় ভেঙে পড়েছে, সেই সময়ে আবার সেই 'অন্ধকার কক্ষে' রাজা এসে দেখা দিয়েছেন। সুদর্শনা রাজাকে সেদিন দেখেছে বটে, কিন্তু—দেখে কেবল এই কথাই বলতে পেরেছে যে—'ভয়ানক, সে ভয়ানক....কালো, কালো, তুমি কালো।'

এই অন্তরালবর্তী, অদৃশ্য 'রাজা' এক রূপক,—রানী সুদর্শনা আর এক রূপক,—দাসী সুরঙ্গমা তৃতীয় এক রূপক। সুরঙ্গমাও রাজাকেই কামনা করে। কিন্তু রাজা তো অনাগত। তবু সুরঙ্গমার নৈরাশ্য নেই। তাকে বলতে শোনা যায়—'সে যেন এইরকম পর্বতের মতোই চিরদিন কঠিন হয়ে থাকে—আমার কান্নায় আমার ভাবনায় সে যেন টলমল না করে। আমার দুঃখ আমারই থাক্, সেই কঠিনেরই জয় হোক্।' দশম দৃশ্যের এই উক্তির পরে, শেষের একটি গানে সুরঙ্গমা বলেছে—'আমি কেবল তোমার দাসী......বিনা-মূল্যের কেনা আমি শ্রীচরণ-প্রয়াসী।' রাজা যে আমাদেরই গভীরে আমাদের নিত্য-জাগর প্রেম, সৌন্দর্য, কল্যাণের মূর্তি,—তিনি প্রেয় নন্, রম্য নন,—তিনি যে শ্রেয়,—কঠিন তিনি, প্রেমিক তিনি,—তিনি যে সুন্দর—এবং 'সুন্দর' হলেই শোভন হতে হবে, সত্যিই এ-রকম কোনো বাধ্যবাধকতা যে নেই,—এখানে

সেই কথাই ব্যক্ত হয়েছে। রাজা 'সুন্দর' নন—রাজা 'অনুপম'। কুড়ির অন্তিম দৃশ্যে সুদর্শনাকে রাজা বলেছেন: 'তোমারই মধ্যে আমার উপমা আছে।' সে-কথার জবাবে সুদর্শনা বলেছে: 'আমার মধ্যে তোমার প্রেম আছে, সেই প্রেমেই তোমার ছায়া পড়ে, সেইখানেই তুমি আপনার রূপ আপনি দেখতে পাও —সে আমার কিছুই নয়, সে তোমার।' 'রাজা'র ধ্যানের মধ্যেই আনন্দের ধ্যান মিশেছে। তিনি অ-রম্য হলেও তিনি যে আনন্দস্বরূপ, সে-কথা মানতে বাধা কিসের? সেই বিশ্বাসে পৌঁছলেই হৃদয়ে এই গান উঠতে পারে—

> হোলো তব যাত্রা সারা,
> মোছো মোছো অশ্রুধারা
> লজ্জা ভয় গেল ঝরি ঘুচিল রে অভিমান।

প্রেম, সৌন্দর্য, কল্যাণ, আনন্দ ইত্যাদি ধারণার বিস্তার এবং ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে, নানা উপমার সাহায্যে, রবীন্দ্রনাথ এই 'রাজা' নাটকে যে-সব কথা বলেছেন, সৌন্দর্য সম্পর্কে লেখা তাঁর একটি প্রবন্ধের মধ্যেও অনুরূপ কোনো কোনো কথা শোনা গেছে। যেমন তাঁর 'সৌন্দর্যবোধ' প্রবন্ধটি।

'রাজা' নাটকে বাইরের রূপতৃষ্ণার তাড়নাতেই সুদর্শনার সামঞ্জস্য-চেতনা বিচলিত হয়েছে। তার আত্মাভিমান এতো বড়ো হয়ে উঠেছে যে, তাতে প্রেমের নিবেদনের সত্য সে হারিয়ে ফেলেছে। এই নাটকে তিনি সেই কথাই বলেছেন। এ রূপক বটে,—কিন্তু 'রূপক' মানে 'অলীক' নয় মোটেই।

'রূপক' মানে 'অলীক' বা 'অস্তিত্বহীন' কোনো ব্যাপারের ইশারা নয়। না, কোনো রকম ঝাপসা-ভাব বা অস্পষ্টতাও নয়। রবীন্দ্র-নাথের কাছে এ-সব চিন্তা অতিশয় সত্য—অর্থাৎ বাস্তব বলেই বোধ হোতো। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের পনেরোই নভেম্বরের এক চিঠিতে দীনবন্ধু অ্যাণ্ডরুজকে তিনি সে-কথা জানিয়েছিলেন।* 'রক্তকরবীর' (প্রথম প্রকাশ ১৩৩৩) ভূমিকায় তিনি বলেছিলেন—'এই নাটকটি সত্যমূলক। এর ঘটনাটি কোথাও ঘটেছে কি না ঐতিহাসিকের 'পরে তার প্রমাণ সংগ্রহের ভার দিলে পাঠকদের বঞ্চিত হতে হবে। এইটুকু বললেই যথেষ্ট যে, কবির জ্ঞানবিশ্বাসমতে

*রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

Critics and detectives are naturally suspicious. They scent allegories and bombs where there are no such abominations. It is difficult to convince them of our innocence.

With regard to the criticism of my play, The king of the Dark Chamber that you mention in your letter, the human soul has its inner drama, which is just the same as anything else that concerns Man, and Sudarsana is no more an abstraction than Lady Macbeth, who might be described as an allegory representing the criminal ambition in man's nature.'

এটি সম্পূর্ণ সত্য।' তাঁর এই ভূমিকার ভঙ্গি কিছুটা কৌতুক-মিশ্রিত বটে, —তবে এ-কথা খুবই সোজাসুজি ভাবে তিনি বলেছেন যে,—'এ নাটকটি একেবারেই পৌরাণিক কালের নয়, একে রূপকও বলা যায় না।' যক্ষপুরীর রাজার ডাকনাম মকররাজ। রাজমহলের বাইরের দেয়ালে আছে এক জালের জানলা। সেই জালের আড়াল থেকে রাজা তাঁর ইচ্ছামত পরিমাণে মানুষের সঙ্গে দেখা-শোনা করেন। এখানে প্রধানতঃ দুই পক্ষ—এক পক্ষে আছেন রাজা,—রাজার সর্দার দল, মোড়ল, কেনারাম গোঁসাই ইত্যাদি,—অন্যপক্ষে নন্দিনী, বিশু, রঞ্জন।

১৯২৬ সালের ডিসেম্বর মাসে 'রক্তকরবী' যখন প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়, তার প্রায় সাড়ে তিন বছর আগে, বাংলা ১৩৩০ সালের গ্রীষ্মকালে শিলঙ্-বাসের সময়ে বইখানি প্রথম লেখা হয়। তখন এ-নাটকের নাম ছিল 'যক্ষপুরী'। তারপর সে-নাম কেটে নতুন নাম রাখা হয় 'নন্দিনী'। পাণ্ডুলিপি অবস্থাতেই এই রদবদল ঘটেছিল, অতঃপর ১৩৩১ এর আশ্বিন মাসে 'প্রবাসীতে' রক্তকরবী নামেই সংশোধিত লেখাটির প্রথম প্রকাশ ঘটে, এবং সে ঘটনার আরো দু'বছর পরে ১৩৩৩ সালে তা গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়।

প্রথম সংস্করণের প্রস্তাবনাটি ছিল ১৩৩১ সালে লেখা এক 'অভিভাষণ'। ১৩৩২ এর বৈশাখ সংখ্যার 'প্রবাসী'তে সেটি ছাপা হয়েছিল।

'রক্তকরবী' সম্বন্ধে 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের নিজের যে মন্তব্য ছাপা হয়, পরে—১৯২৫ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর সংখ্যায় ইংরেজি বিশ্বভারতী ত্রৈমাসিকে সেটি পুনর্মুদ্রিত হয়। তাতে তিনি যা বলেছিলেন, ১৩৩২ সালের বৈশাখের 'প্রবাসী'তে 'রক্তকরবী'র রূপকত্ব সম্বন্ধে প্রায় সেই কথাই জানিয়েছিলেন। তাঁর সে-কথাগুলিও এখানে তুলে দেওয়া গেল:

> হঠাৎ মনে হ'তে পারে, রামায়ণটা রূপক কথা। বিশেষত যখন দেখি রাম রাবণ দুই নামের দুই বিপরীত অর্থ। রাম হ'ল আরাম, শান্তি; রাবণ হ'ল চীৎকার অশান্তি। একটিতে নবাঙ্কুরের মাধুর্য, পল্লবের মর্মর; আর একটিতে সান-বাঁধানো রাস্তার উপর দিয়ে দৈত্যরথের বীভৎস শৃঙ্গধ্বনি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও রামায়ণ রূপক নয়। আমার রক্তকরবীর পালাটিও রূপকনাট্য নয়।'

তিনি বিশেষভাবে বলেছেন—'এইটি মনে রাখুন, রক্তকরবীর সমস্ত পালাটি নন্দিনী বলে একটি মানবীর ছবি।' 'আমার ধর্ম' প্রবন্ধে তিনি তাঁর 'রাজা' নাটক সম্বন্ধে বলে গেছেন:

> "রাজা" নাটকে সুদর্শনা আপন অরূপ রাজাকে দেখতে চাইলে, রূপের মোহে মুগ্ধ হয়ে ভুলে রাজার গলায় দিলে মালা—তারপরে সেই ভুলের মধ্যে দিয়ে পাপের মধ্যে দিয়ে যে অগ্নিদাহ

ঘটালে, যে বিষম যুদ্ধ বাধিয়ে দিলে তা অন্তরে বাহিরে যে ঘোর অশান্তি জাগিয়ে তুললে তাতেই তো তাকে সত্য মিলনে পৌঁছিয়ে দিলে। প্রলয়ের মধ্য দিয়ে সৃষ্টির পথ। তাই উপনিষদে আছে তিনি তাপের দ্বারা তপ্ত হয়ে এই সমস্ত কিছু সৃষ্টি করলেন। আমাদের আত্মা যা-কিছু সৃষ্টি করেছে তাতে পদে পদে ব্যথা। কিন্তু তাকে যদি ব্যথাই বলি তবে শেষ কথা বলা হল না, সেই ব্যথাতেই সৌন্দর্য, তাতেই আনন্দ।'

আবার 'অরূপরতন'-এর ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন:

'সুদর্শনা রাজাকে বাহিরে খুঁজিয়াছিল, যেখানে বস্তুকে চোখে দেখা যায়, হাতে ছোঁওয়া যায়, ভাণ্ডারে সঞ্চয় করা যায়, যেখানে ধনজনখ্যাতি, সেইখানে সে বরমাল্য পাঠাইয়াছিল। বুদ্ধির অভিমানে সে নিশ্চয়ই স্থির করিয়াছিল যে, বুদ্ধির জোরে সে বাহিরেই জীবনের সার্থকতা লাভ করিবে। তাহার সঙ্গিনী সুরঙ্গমা তাহাকে নিষেধ করিয়াছিল। বলিয়াছিল, অন্তরের নিভৃত কক্ষে যেখানে প্রভু স্বয়ং আসিয়া আহ্বান করেন সেখানে তাহাকে চিনিয়া লইতে ভুল হইবে না; নহিলে যাহারা মায়ার দ্বারা চোখ ভোলায় তাহাদিগকে রাজা বলিয়া ভুল হইবে। সুদর্শনা এ কথা মানিল না। সে সুবর্ণের রূপ দেখিয়া তাহার কাছে মনে মনে আত্ম-সমর্পণ করিল। তখন কেমন করিয়া তাহার চারিদিকে আগুন লাগিল, অন্তরের রাজাকে ছাড়িতেই কেমন করিয়া তাহাকে লইয়া বাহিরের নানা মিথ্যা-রাজার দল লড়াই বাধিয়া গেল—সেই অগ্নিদাহের ভিতর দিয়া কেমন করিয়া দুঃখের আঘাতে তাহার অভিমান ক্ষয় হইল এবং অবশেষে কেমন করিয়া হার মানিয়া প্রাসাদ ছাড়িয়া পথে দাঁড়াইয়া তবে সে তাহার সেই প্রভুর সঙ্গলাভ করিল, সে-প্রভু কোনো বিশেষ রূপে বিশেষ স্থানে বিশেষ দ্রব্যে নাই, যে-প্রভু সকল দেশে সকল কালে; আপন অন্তরের আনন্দরসে যাঁহাকে উপলব্ধি করা যায়—এ নাটকে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।'

অতঃপর তাঁর আর একখানি নাটকের কথা স্মরণ যোগ্য। 'তাসের দেশ' (প্রথম সংস্করণ ভাদ্র ১৩৪০) নাটিকার শুরুতেই একটি গানের 'ভূমিকা' চোখে পড়ে। রাজপুত্র আর সদাগর পুত্র—এই দুটি মাত্র চরিত্র সেখানে। গানটিও প্রসিদ্ধ—

হারে রে রে রে রে
আমায় ছেড়ে দে রে দে রে,
যেমন ছাড়া বনের পাখি মনের আনন্দে রে॥
ঘন শ্রাবণ ধারা
যেমন বাঁধন হারা,
বাদল বাতাস যেমন ডাকাত, আকাশ লুটে ফেরে॥

হারে রে রে রে রে
আমায় রাখবে ধরে কে রে,
দাবানলের নাচন যেমন
সকল কানন ঘেরে।
বজ্র যেমন বেগে
গর্জে ঝড়ের মেঘে
অট্টহাস্যে সকল বিঘ্ন বাধার বক্ষ চেরে॥

তাঁর 'ডাকঘর' (প্রথম প্রকাশ ১৩১৮) নাটকেও এই ছুটির পিপাসাই সর্বাধিক কথা। সৌন্দর্য, সুখ, মুক্তি, কল্যাণ, আনন্দ—এইসব কথাই রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব কথা। তাঁর 'নিজস্ব' নাট্যশ্রেণী বললে যেসব নাটকের কথা মনে পড়ে, তাতে তিনি এইসব কথাই বলেছেন। অবিশ্যি 'চিরকুমার সভা' বা 'শেষরক্ষা'র মতন নাট্য-রচনা —সেও তাঁরই নিজের সৃষ্টি। কিন্তু সে আলাদা কথা।

নাট্য-রচনার ক্ষেত্রেও কাছাকাছি বা একই সময়ে তাঁর কলমে কতো যে বিপরীতধর্মী রচনা দেখা দিয়েছে, সে-কথা আজ সকলেরই জানা কথা। তাঁর মনের গহনে এইসব বিপরীত ঢেউয়ের ওঠা-পড়া যে কী ভাবে সম্ভব হোতো, সে অবিশ্যি অবান্তর কথা। সৃষ্টির রহস্য সৃষ্টিকর্তা নিজেও কি পুরোপুরি জানেন? ১২৯৮ সালের ভাদ্র মাসে রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা' নাট্যকাব্য লেখা হয়। তার ঠিক এক বছর পরে তাঁর 'গোড়ায় গলদ' প্রহসনের রচনাকাল—১২৯৯ সালের ভাদ্র মাসে! ছিন্নপত্রে বোলপুর থেকে লেখা ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের,—১২৯৯ সাল ১৬ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের চিঠিতে—তিনি লিখেছিলেন,—'ছোটো ছোটো কবিতা-গুলো আপ্‌না আপ্‌নি এসে প'ড়বে ব'লে আর নাটকে হাত দিতে পারছিনে। নইলে দুটো তিনটে ভাবী নাটকের উমেদার মাঝে মাঝে দরজা ঠেলাঠেলি ক'রচে। শীতকাল ছাড়া বোধ হয় সেগুলোতে হাত দেওয়া হয়ে উঠবে না। চিত্রাঙ্গদা ছাড়া আমার আর সব নাটকই শীতকালে লেখা। সে সময়ে গীতি-কাব্যের আবেগ অনেকটা ঠাণ্ডা হ'য়ে আসে—অনেকটা ধীরে সুস্থে নাটক লেখা যায়।'

সেই চিঠিতেই তিনি শিল্পের ক্ষেত্রে স্বাধীনতার আনন্দের কথা তুলেছিলেন। 'তাসের দেশ', 'ডাকঘর', রক্তকরবী' ইত্যাদি নাট্য-রচনাতে যে মুক্তি-পিপাসার কথা আছে, কবিতার কথা বলতে বলতে 'আর্ট'-এর অত্যাবশ্যক শর্ত হিসেবেই সেই মুক্তির আবশ্যিকতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেন—'আর্টের একটা প্রধান আনন্দ হচ্ছে স্বাধীনতার আনন্দাবেশে আপনাকে অনেক দূরে নিয়ে যাওয়া যায় তারপরে আবার এই ভবকারাগারের মধ্যে ফিরে এসেও অনেকক্ষণ কানের মধ্যে একটা ঝঙ্কার, মনের মধ্যে একটা স্ফূর্তি লেগে থাকে।' তাঁর নাটকে তাই কবিতার আমেজ অপরিহার্যরূপেই মিশে থাকতে দেখা যায়। তিনি যে প্রধানতঃ কবি-ই, সে-পরিচয় তিনি অস্বীকার করেন নি কোথাও,—না, এ ক্ষেত্রেও নয়।

বিস্তৃতভাবে তাঁর সব নাটক আলোচনা করতে হ'লে বড়ো জায়গা দরকার। এখানে তাঁর বিশেষ একখানি নাটক—যাকে 'নাটিকা' বলাই সঙ্গত,—সেই ধরনের রচনা 'মালিনী' সম্বন্ধে এই সূত্রে কয়েকটি কথা বলা যেতে পারে।

প্রথমে কাহিনীটির ধারা মিলিয়ে দেখা যাক।

'মালিনী'র প্রথম দৃশ্যে রাজান্তঃপুর। সেখানে কাশ্যর্প প্রবর্তিত নবধর্মে দীক্ষিতা রাজকন্যার মনে সংসারত্যাগের দৃঢ় সংকল্প জেগে উঠেছে। আর একই সময়ে রাজ্যের প্রজারা রাজকন্যার স্বীকৃত সেই 'নবধর্মে'র প্রতি বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। 'মালিনী'র প্রথম দৃশ্যের শেষ দিকে সেনাপতির মুখে—তাই তাদের দাবি শোনা যায় রাজকন্যার নির্বাসন—

মহারাজ; বিদ্রোহী হয়েছে প্রজাগণ
ব্রাহ্মণ বচনে। তারা চায় নির্বাসন
রাজকুমারীর।

কিন্তু রানী কন্যার এই নির্বাসন কোনো মতেই স্বীকার করতে পারছেন না। মহারাজকে তিনি রাজকন্যার অলৌকিক সত্তার পরিচয়-প্রসঙ্গে বলেছেন—

এ কন্যা মানবী নহে, এ কোন্ দেবতা
এসেছে তোমার ঘরে।

কিন্তু মায়ের কোনো অনুরোধই রাজকন্যা মালিনীকে তার সংকল্পচ্যুত করতে পারেনি। সংকল্প সাধনের আনন্দে প্রজাগণের আকাঙ্ক্ষিত এই নির্বাসনই রাজকন্যা কামনা করে। 'মালিনী' নাট্যের প্রথম দৃশ্যে মালিনীর জননী রাজ-মহিষী তাঁর কন্যার ধর্মপ্রেরণার উল্লেখ করে তাঁর নিজের সংশয়ের কথা-ও জানিয়েছেন:

কিন্তু মাগো, এযে তব
সৃষ্টিছাড়া বেদছাড়া ধর্ম অভিনব
আজিকার গড়া।

তিনি জানেন—

রমণীর
ধর্ম থাকে বক্ষে কোলে চিরদিন স্থির
পতিপুত্ররূপে।

রাজা এসে বলেছেন—

কন্যা, ক্ষান্ত হও এবে
কিছুদিন-তরে, উপরে আসিছে নেবে
ঝটিকার মেঘ।

কিন্তু মালিনী তার সংকল্পে অটুট। সকলের স্নেহপাশ মোচন করে সে তার অন্তর্যামীর ইঙ্গিত অনুসরণ করেই চলতে চায়। তার এই ত্যাগের সংকল্প

শুনে মহিষী কাতর হয়েছেন এবং মহিষী আর মালিনী চলে যাবার ঠিক পর মুহূর্তে সেনাপতি এসে প্রবেশ করেছেন। তারই কাছে খবর পাওয়া গেছে যে, প্রজারা-রাজকুমারীর নির্বাসন চায়।

এই প্রথম দৃশ্যেই নাটকীয় সংঘর্ষের স্পষ্ট উল্লেখ আছে,—আবার এই দৃশ্যেই —মালিনীর প্রথম উক্তিতেই মালিনীকে যখন বলতে শোনা গেছে—

'ভগবন্ রুদ্ধ আমি, নাহি হেরি চোখে;
সন্ধ্যায় মুদ্রিত দল পদ্মের কোরকে
আবদ্ধ ভ্রমরী'

—তখন কবি-হৃদয়ের উপমা-রূপক-উদ্ভাবনার সামর্থ্য আর তাঁর অন্যান্য প্রকার বাচনিক ঐশ্বর্যের স্বতঃ স্ফূর্ততাতেও সন্দেহ থাকবে কেন?

তারপর দ্বিতীয় দৃশ্য। মন্দির-প্রাঙ্গণে ব্রাহ্মণেরা রয়েছেন। এই দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখা যায় যে, একমাত্র সুপ্রিয় ছাড়া সমস্ত ব্রাহ্মণমণ্ডলী রাজকন্যার নির্বাসনে একমত। কিন্তু যুক্তিবাদী সুপ্রিয়ের মতে—

ধর্ম? মহাশয়,
মূঢ়ে উপদেশ দেহো ধর্ম কারে কয়।
ধর্ম নির্দোষীর নির্বাসন?

অথবা

শুধু দল বেঁধে সবে
সত্যের মীমাংসা হবে, শুধু উচ্চরবে?
যুক্তি কিছু নহে?

সুপ্রিয়ের এই বিদ্রোহী মতবাদের জবাবে ব্রাহ্মণেরা বলেছে—'দূর করে দাও সুপ্রিয়েরে'। এবং সুপ্রিয় তাতে সম্মতি জানিয়ে বলেছে—

যে শাস্ত্রের অনুগামী
এ ব্রাহ্মণ, সে শাস্ত্র কোথাও লেখে নাই
শক্তি যার ধর্ম তার।

মালিনীর সমর্থনে সুপ্রিয় বলেছে—

ভেবে দেখো মনে
মিথ্যারে যে সত্য বলি করেনি প্রচার—
সেও বলে সত্য ধর্ম, দয়া ধর্ম তার;
সর্বজীবে প্রেম—সর্ব ধর্মে সেই সার।

কিন্তু ক্ষেমংকরের যুক্তিজাল সত্যকে শুধু আচ্ছন্ন-ই করেছে। আর, সেই জালে ধরা দিয়েছে সুপ্রিয়। ঠিক এই সময় উগ্রসেনের মুখে রাজসৈন্যের বিদ্রোহের খবর পৌঁছেচে।—

হয়েছে চঞ্চল
ব্রাহ্মণের বাক্য শুনে রাজসৈন্যদল
আজি বাঁধ ভাঙে-ভাঙে।

এই সংবাদে চঞ্চল হয়েছে ব্রাহ্মণমণ্ডলী। তারা সোমাচার্যের মাধ্যমে স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রলয়শক্তি সিদ্ধিদাত্রী জগদ্ধাত্রীকে আহ্বান জানিয়েছে—

সংহারের বেশে সাজি
এখনি দাঁড়াও সর্বসম্মুখেতে আসি
মুক্তকেশে খড়্গহস্তে অট্টহাস হাসি
পাষণ্ডদলনী।

এ নাটিকায়—একেবারে প্রথম দৃশ্য থেকেই বাক্‌পটুতার বিবিধ উদাহরণ দেখা গেছে। অবিশ্যি প্রশ্ন করা যেতে পারে যে—রবীন্দ্রনাথের কোন্ নাটকেই বা তা' না ঘটেছে? হাঁ, সে-কথাও ঠিকই। সেই সাধারণ সত্য মনে রেখেও এখানকার বিশেষ ঐশ্বর্যের কথা বলা দরকার। মালিনী, সুপ্রিয়, রাজা, ক্ষেমংকর —সকলেই বাক্‌দক্ষ। তবে, দ্বিতীয় দৃশ্যের আলোচ্য উক্তিতে—ক্ষেমংকরের হাত থেকে এখানকার নেতৃত্ব যেন সোমাচার্যের অধিকারে চলে গেছে।

আর সেই মুহূর্তেই মালিনীর আবির্ভাব ঘটেছে। নরকন্যার সাজে সজ্জিতা এই অপরূপ দেবীর আবির্ভাবে তারা (ব্রাহ্মণমণ্ডলী) অভিভূত হয়ে পড়েছে। কিন্তু মালিনী তখন নিজের পরিচয় দিয়ে বলেছে—

আসিয়াছি নির্বাসনে,
তোমরা ডেকেছ বলে ওগো বিপ্রগণ।

রাজকন্যার এই অভাবনীয় কার্যকলাপে সেই ক্ষুব্ধ বিপ্রদল তাদের বহু-আকাঙ্ক্ষিত কামনা ভুলে গিয়ে রাজকন্যাকে আবার রাজদ্বারে ফেরাতে চলেছে—

চলো সবে
বিপ্রগণ, জননীরে জয়জয়কারে
রেখে আসি রাজগৃহে।

'ম্লানবস্ত্রে, নরকন্যারূপে'—রাজকন্যার এই প্রবেশ কিঞ্চিৎ অতিনাটকীয় বটে,—সোমাচার্যের অভিভূত ভাবটাও একটু বেশি মাত্রায় নাটকীয়। সকলেই

হঠাৎ মালিনীর ভক্ত হয়ে উঠেছেন। কিন্তু রাজকুমারীর এই অসাধারণ ব্যবহারে মোহাচ্ছন্ন হয়নি একমাত্র ক্ষেমংকর। সে তার সংকল্পে অটুট। তাই সুপ্রিয়ের আচ্ছন্ন চেতনাকে জাগ্রত করবার অভিপ্রায়ে ক্ষেমংকর বলেছে—

দূর হোক, মোহ দূর হোক, কোথা যাও
হে সুপ্রিয়।

দ্বিতীয় দৃশ্যে—মালিনীর সম্বন্ধে সোমাচার্য, চারুদত্ত, দেবদত্ত ইত্যাদি সকলে যখন প্রায় একবাক্যে বলেছে—'এসো, এসো মা জননী,—শত-চিত্ত-শতদলে দাঁড়াও, অমনি করুণা-মাখানো মুখে—তখন মালিনী নিজে যে স্বগতোক্তিটি শুনিয়েছে, তার সঙ্গে 'প্রভাত সঙ্গীত'-এর 'হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি'র মিল অনুভব করতে বাধা কোথায়? সে যেন নাট্য-সংঘাতের এলাকা থেকে হঠাৎ কবিতার প্রগাঢ় আস্বাদনের দিকে,—গভীর এক ভাব উপলব্ধির দিকে এগিয়ে যাওয়া। মালিনী বলেছে—

আজি মোর মনে হয়
অমৃতের পাত্র যেন আমার হৃদয়—
যেন সে মিটাতে পারে এ বিশ্বের ক্ষুধা,
যেন সে ঢালিতে পারে সান্ত্বনার সুধা
যত দুঃখ যেথা আছে সকলের পরে
অনন্ত প্রবাহে।

এবং এই উচ্ছ্বাসের ঝোঁকেই সে বলতে পেরেছে—

'কী বৃহৎ লোকালয়, কী শান্ত আকাশ—
এক জ্যোৎস্না বিস্তারিয়া সমস্ত জগৎ
কে নিল কুড়ায়ে বক্ষে—ওই রাজপথ,
ওই গৃহশ্রেণী, ওই উদার মন্দির—
স্তব্ধচ্ছায়া তরুরাজি—দূরে নদীতীর,
বাজিছে পূজার ঘণ্টা—আশ্চর্য পুলকে
পুরিছে আমার অঙ্গ, জল আসে চোখে।'

ক্ষেমংকরের অসাধারণ যুক্তিতর্কের কাছে শেষ পর্যন্ত সুপ্রিয়কে নিজের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিতে হয়েছে—

কভু নহে, কভু নহে। নিদ্রাহীন চোখে
দাঁড়াইব পার্শ্বে তব।

সুপ্রিয়ের কাছ থেকে আনুকূল্যের এই প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে।

সুপ্রিয়ের এই আত্মসমর্পণে ক্ষেমংকর অপরিসীম উৎসাহ লাভ করেছে। বিদেশী সৈন্যের সাহায্যে রাজকন্যার এই নব-প্রতিষ্ঠিত ধর্মের বিনাশ-কামনায়, সুপ্রিয়ের কাছে সে দেশান্তরে যাবার প্রস্তাব করেছে। কিন্তু যাবার প্রাক্‌কালে সে যেন সুপ্রিয়কে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারছে না বলে মনে হয়। আশঙ্কাতুর হৃদয়ে তাই সে বলেছে—

দেখো সখে,
তুমিও ভুলোনা শেষে নূতন কুহকে,
ছেড়ো না আমায়। মনে রেখো
প্রবাসী বন্ধুরে।

তারপর তৃতীয় দৃশ্য।

এই দৃশ্যে অন্তঃপুরে কন্যার বিরহে রাজা আর রানী উভয়কেই অত্যন্ত শোকাতুর হয়ে পড়তে দেখা যায়। এতক্ষণ যে রাজা বলেছে—

দিব তারে নির্বাসন, পুরাব প্রার্থনা—
সাধিব কর্তব্য মোর। মনে করিওনা
বৃদ্ধ আমি মোহমুগ্ধ, অন্তর দুর্বল,
রাজধর্ম তুচ্ছ করি ফেলি অশ্রুজল।

অপত্যস্নেহে সেই রাজাকেই আবার বলতে শোনা গেছে—

প্রতিজ্ঞা করিনু আমি ফিরাইব কোলে
কোলের কন্যারে মোর। রাজ্যে ধিক থাক্।
ধিক্ ধর্মহীন রাজনীতি। ডাক্, ডাক্
সৈন্যদল।

ঠিক এই মুহূর্তে প্রজাপুঞ্জের জয়জয়কারের সঙ্গে আবির্ভূত হয়েছে মালিনী। প্রজাপুঞ্জের এই উচ্ছ্বসিত আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়েছেন স্বয়ং রাজা, আর, মালিনী। রাজাও তখন প্রজাদের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করেছেন—

সেই মত উচ্ছ্বসিত জন পারাবার,
মাঝে তুমি লোকলক্ষ্মী মাতা।

আর মালিনীও সে মুহূর্তে অনুভব করেছে—

দেহ নাই মোর, বাধা নাই,
আমি যেন এ বিশ্বের প্রাণ।

রানী নিজেও তাঁর কন্যার সে মত সমর্থন করেছেন। কিন্তু এক অজানা আশঙ্কায় তাঁর হৃদয় চঞ্চল হয়ে উঠেছে। প্রজাদের তরফ থেকে মালিনীর সংবর্ধনা এই

তৃতীয় দৃশ্যের শেষে যেন এক চূড়ান্ত অবস্থায় পৌঁছেচে। সকলে একবাক্যে বলেছে—'মোরা আজি ধন্য সবে—ধন্য আজি কাশী'। তবু এই তৃতীয় দৃশ্যের শেষ উক্তিতেই মহিষী তাঁর কন্যার সম্বন্ধে তাঁর মাতৃমনের আশঙ্কার কথা বলতে বাধ্য হয়েছেন। কন্যার অকল্যাণ-সম্ভাবনা অনুমান করেছেন তিনি। 'নবধর্ম' সম্বন্ধে অবহিত থেকে সর্ববিধ মত্ততার বিরুদ্ধে মনকে শান্ত রাখবার অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি। এবং—

মনোমত বর দেখে
খেলা ভেঙে যোগ্য কণ্ঠে দিক বরমালা—
দূর হবে নবধর্ম জুড়াইবে জ্বালা।

এই আশা প্রকাশিত হবার পরে দেখা দিয়েছে চতুর্থ দৃশ্য। এই চতুর্থ দৃশ্যের প্রথমাংশেই দেখা যায়—মালিনীর নব-প্রতিষ্ঠিত ধর্মে সুপ্রিয় একান্তভাবে নিজেকে সমর্পণ করেছে। তাই সুপ্রিয় বলেছে—

যে পথে লইয়া যাবে, জীবন আমার
সাথে যাবে সব তর্ক করি পরিহার
নীরব ছায়ার মতো দীপবর্তিকার।

সুপ্রিয়ের এই আত্মসমর্পণে রাজকন্যাও যেন কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছে। তাই সে নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করেছে এবং সুপ্রিয়ের সাহায্য চেয়ে বলেছে—

সহধর্মতরণীর বালিকা কাণ্ডারী
নাহি জানি কোথা যেতে হবে। মনে হয়
বড়ো একাকিনী আমি, সহস্র সুধায়,
বৃহৎ সংসার, অসংখ্য জটিল পথ......
তুমি মহাজ্ঞানী
হবে কি সহায় মোর?

এবং এরই পূর্ণ সম্মতি উচ্চারিত হয়েছে সুপ্রিয়ের এই উক্তিতে—

প্রস্তুত রাখিব নিত্য
এ ক্ষুদ্র জীবন।

এইভাবে উভয়ে উভয়কে গ্রহণ এবং সমর্পণ করেছে এবং তারই ফলে উভয়ের মধ্যে অলক্ষ্যে জমে উঠেছে নিবিড় এক ভালবাসার বন্ধন। মালিনীর কাছে এই পূর্ণ সমর্পণের আবেগেই সুপ্রিয় নিজের আত্মকাহিনী ব্যক্ত করেছে। ক্ষেমংকরের অকৃত্রিম স্নেহে কীভাবে সে বর্ধিত হয়েছে, কীভাবে শতবাধা-বিঘ্ন, ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে অচল অটল ক্ষেমংকর তারই বিশ্বস্ত অনুচর রয়েছে, তাও ব্যক্ত করেছে। আর ব্যক্ত করেছে—কী ভাবে সে রাজার কাছে

ক্ষেমংকরের গোপন চক্রান্ত জানিয়ে কবে এই বন্ধুত্বের নির্মম প্রতিদান বা পরিচয় দিয়েছে। নিজের এই আচরণে সুপ্রিয়ের মনে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ঝড় বয়ে গেছে। সুপ্রিয়ের এই চরম উত্তেজনার মুহূর্তে রাজার প্রবেশ ঘটেছে,—এবং ক্ষেমংকরের চক্রান্ত ব্যর্থ ক'রে তাকে বন্দী ক'রতে পারায় সুপ্রিয়কে বারংবার পুরস্কৃত করবার প্রস্তাবে সুপ্রিয়ের মানসিক সংঘাত আরো প্রবল হয়ে উঠেছে। সুপ্রিয় বলেছে :

কিছু নহে, কিছু নহে, খাব ভিক্ষা করে
দ্বারে দ্বারে।

সুপ্রিয়ের এই মানসিক অবস্থা উপলব্ধি করতে পেরেছে মালিনী। তাই সে পিতাকে বলেছে—'কী করেছ বলো পিতা বন্দীর বিচার ?' আর তখনই মালিনীর সে প্রশ্নের এই উত্তর এসেছে—'প্রাণদণ্ড হবে তার।' রাজার এই উত্তরে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে সুপ্রিয়। ক্ষুব্ধ সুপ্রিয়কে তুষ্ট করবার অভিপ্রায়ে রাজকন্যা রাজার কাছে ক্ষেমংকরের জীবন প্রার্থনা করেছে। রাজা এই প্রস্তাবে সম্মতও হয়েছেন। অধিকন্তু এ-ছাড়া তিনি আরও মূল্যবান কোনো সামগ্রী সুপ্রিয়কে দান করতে সম্মত হয়েছেন। কিন্তু রাজা তখনো সুপ্রিয় আর মালিনীর সেই গোপন অন্তরঙ্গ সম্পর্ক বুঝতে পারেন নি। তবে, মালিনী যে বালিকা বয়সের সীমা অতিক্রম করে যৌবনে পদার্পণ করেছে, রাজার তা দৃষ্টি এড়ায় নি—

বুঝিলাম মনে
আমাদের কন্যাটুকু বুঝি এতদিনে
বিকশি উঠিল।

এ তাঁর স্বগতোক্তি! অতঃপর আবার ঘটনা দেখা দেয়। এই সময় প্রতিহারী এসে বন্দী ক্ষেমংকরের আগমন-বার্তা জানায়। রাজার আদেশে বন্দীকে রাজ-সমীপে উপস্থিত করা হ'লে রাজা তাকে পরীক্ষা করবার অভিপ্রায়ে তার প্রাণদণ্ড রহিত ক'রতে চেয়েছেন। কিন্তু নির্ভীক, স্বাধীনচেতা ক্ষেমংকর বলেছে—

পুনর্বার
তুলিয়া লইতে হবে কর্তব্যের ভার—
যে পথে চলিতেছিনু আবার সে পথে
যেতে হবে।

রাজা তখন ক্ষেমংকরকে প্রাণের মমতা ত্যাগ করে মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হতে বলেছেন, আর শেষবারের মতন তাকে কিছু প্রার্থনা চাইতেও আদেশ

এই বেলা লহো তবে মাগি
প্রার্থনা যা কিছু থাকে।

রাজার এই প্রস্তাবে ক্ষেমংকর শেষবারের মতন বন্ধু সুপ্রিয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রতে চেয়েছে। রাজা তাতে সম্মত। কিন্তু আবার এক অজানা আশঙ্কায় মালিনীর প্রাণ কেঁদে উঠেছে। তাই সে পিতাকে বলেছে :

হৃদয় কাঁপিছে বুকে
কী যেন পরমাশক্তি আছে ওই মুখে
বজ্রসম ভয়ংকর। রক্ষা করো পিতঃ,
আনিও না সুপ্রিয়েরে।

তাকে নির্ভাবনার আশ্বাস দিয়ে রাজা কিন্তু সুপ্রিয়কে আনবার আদেশ দিয়েছেন। সুপ্রিয় এসেছে। ক্ষেমংকর সুপ্রিয়কে তার বন্ধুত্বের সকল বন্ধন ভুলে সোজাসুজি তার এই কাজের কৈফিয়ৎ দিতে বলেছে। তখন সুপ্রিয় বলেছে—

সব ছেড়ে রাখিয়াছি তাহারি বিশ্বাস,
প্রাণমনে ধর্ম সে আমার।

কিন্তু সুপ্রিয়ের এই 'ধর্ম' যে রাজকন্যার প্রতি আকর্ষণ ব্যতীত আর কিছুই নয়, ক্ষেমংকর তা স্পষ্টই ব্যক্ত করেছে। আর সুপ্রিয় বলেছে—

সত্য বুঝিয়াছ মনে।
মোর ধর্ম অবতীর্ণ দীন মর্ত্যলোকে
ওই নারী মূর্তি ধরি।

কিন্তু ক্ষেমংকরের নিরন্তর ব্যঙ্গের আঘাতে সুপ্রিয়ের সকল যুক্তিই বিপর্যস্ত হয়েছে। সুপ্রিয়ের মত পরধর্মসহিষ্ণুতা নেই ক্ষেমংকরের। তাই সে বলেছে— হে সুপ্রিয়, প্রেম এত সর্বপ্রেমী নয়। নবধর্মের সর্বব্যাপী উদারতার গুণে ক্ষেমংকরের সব অপমান সুপ্রিয় সহ্য করেছে। এমন কি সে বন্ধুর বিশ্বাস-ঘাতকতার অপরাধে এখন হাসিমুখে মৃত্যুদণ্ডও গ্রহণ ক'রতে স্বীকৃত। সুপ্রিয়ের এই উক্তি ক্ষেমংকরের মনঃপুত হয়েছে। মৃত্যুর পারাবারে বন্ধুত্বের এই মিলন কামনা করেই সুপ্রিয়কে ক্ষেমংকর আহ্বান করেছে—

যেথায় অনন্তকাল বিচ্ছেদ না হবে।
লহ তবে বন্ধু হস্তে করুণ বিচার—
এই লহো।

এই উক্তির পরেই বন্ধুর মস্তকে দুই হাতের শিকল দিয়ে সজোরে

ক্ষেমংকরের গোপন চক্রান্ত জানিয়ে কবে এই বন্ধুত্বের নির্মম প্রতিদান বা পরিচয় দিয়েছে। নিজের এই আচরণে সুপ্রিয়ের মনে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ঝড় বয়ে গেছে। সুপ্রিয়ের এই চরম উত্তেজনার মুহূর্তে রাজার প্রবেশ ঘটেছে,—এবং ক্ষেমংকরের চক্রান্ত ব্যর্থ ক'রে তাকে বন্দী ক'রতে পারায় সুপ্রিয়কে বারংবার পুরস্কৃত করবার প্রস্তাবে সুপ্রিয়ের মানসিক সংঘাত আরো প্রবল হয়ে উঠেছে। সুপ্রিয় বলেছে :

কিছু নহে, কিছু নহে, খাব ভিক্ষা করে
দ্বারে দ্বারে।

সুপ্রিয়ের এই মানসিক অবস্থা উপলব্ধি করতে পেরেছে মালিনী। তাই সে পিতাকে বলেছে—'কী করেছ বলো পিতা বন্দীর বিচার?' আর তখনই মালিনীর সে প্রশ্নের এই উত্তর এসেছে—'প্রাণদণ্ড হবে তার।' রাজার এই উত্তরে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে সুপ্রিয়। ক্ষুব্ধ সুপ্রিয়কে তুষ্ট করবার অভিপ্রায়ে রাজকন্যা রাজার কাছে ক্ষেমংকরের জীবন প্রার্থনা করেছে। রাজা এই প্রস্তাবে সম্মতও হয়েছেন। অধিকন্তু এ-ছাড়া তিনি আরও মূল্যবান কোনো সামগ্রী সুপ্রিয়কে দান করতে সম্মত হয়েছেন। কিন্তু রাজা তখনো সুপ্রিয় আর মালিনীর সেই গোপন অন্তরঙ্গ সম্পর্ক বুঝতে পারেন নি। তবে, মালিনী যে বালিকা বয়সের সীমা অতিক্রম করে যৌবনে পদার্পণ করেছে, রাজার তা দৃষ্টি এড়ায় নি—

বুঝিলাম মনে
আমাদের কন্যাটুকু বুঝি এতদিনে
বিকশি উঠিল।

এ তাঁর স্বগতোক্তি! অতঃপর আবার ঘটনা দেখা দেয়। এই সময় প্রতিহারী এসে বন্দী ক্ষেমংকরের আগমন-বার্তা জানায়। রাজার আদেশে বন্দীকে রাজ-সমীপে উপস্থিত করা হ'লে রাজা তাকে পরীক্ষা করবার অভিপ্রায়ে তার প্রাণদণ্ড রহিত ক'রতে চেয়েছেন। কিন্তু নির্ভীক, স্বাধীনচেতা ক্ষেমংকর বলেছে—

পুনর্বার
তুলিয়া লইতে হবে কর্তব্যের ভার—
যে পথে চলিতেছিনু আবার সে পথে
যেতে হবে।

রাজা তখন ক্ষেমংকরকে প্রাণের মমতা ত্যাগ করে মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হতে বলেছেন, আর শেষবারের মতন তাকে কিছু প্রার্থনা চাইতেও আদেশ করেছেন—

এই বেলা লহো তবে মাগি
প্রার্থনা যা কিছু থাকে।

রাজার এই প্রস্তাবে ক্ষেমংকর শেষবারের মতন বন্ধু সুপ্রিয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রতে চেয়েছে। রাজা তাতে সম্মত। কিন্তু আবার এক অজানা আশঙ্কায় মালিনীর প্রাণ কেঁদে উঠেছে। তাই সে পিতাকে বলেছে :

হৃদয় কাঁপিছে বুকে
কী যেন পরমাশক্তি আছে ওই মুখে
বজ্রসম ভয়ংকর। রক্ষা করো পিতঃ,
আনিও না সুপ্রিয়েরে।

তাকে নির্ভাবনার আশ্বাস দিয়ে রাজা কিন্তু সুপ্রিয়কে আনবার আদেশ দিয়েছেন। সুপ্রিয় এসেছে। ক্ষেমংকর সুপ্রিয়কে তার বন্ধুত্বের সকল বন্ধন ভুলে সোজাসুজি তার এই কাজের কৈফিয়ৎ দিতে বলেছে। তখন সুপ্রিয় বলেছে—

সব ছেড়ে রাখিয়াছি তাহারি বিশ্বাস,
প্রাণমনে ধর্ম সে আমার।

কিন্তু সুপ্রিয়ের এই 'ধর্ম' যে রাজকন্যার প্রতি আকর্ষণ ব্যতীত আর কিছুই নয়, ক্ষেমংকর তা স্পষ্টই ব্যক্ত করেছে। আর সুপ্রিয় বলেছে—

সত্য বুঝিয়াছ মনে।
মোর ধর্ম অবতীর্ণ দীন মর্ত্যলোকে
ওই নারী মূর্তি ধরি।

কিন্তু ক্ষেমংকরের নিরন্তর ব্যঙ্গের আঘাতে সুপ্রিয়ের সকল যুক্তিই বিপর্যস্ত হয়েছে। সুপ্রিয়ের মত পরধর্মসহিষ্ণুতা নেই ক্ষেমংকরের। তাই সে বলেছে—হে সুপ্রিয়, প্রেম এত সর্বপ্রেমী নয়। নবধর্মের সর্বব্যাপী উদারতার গুণে ক্ষেমংকরের সব অপমান সুপ্রিয় সহ্য করেছে। এমন কি সে বন্ধুর বিশ্বাস-ঘাতকতার অপরাধে এখন হাসিমুখে মৃত্যুদণ্ডও গ্রহণ ক'রতে স্বীকৃত। সুপ্রিয়ের এই উক্তি ক্ষেমংকরের মনঃপুত হয়েছে। মৃত্যুর পারাবারে বন্ধুত্বের এই মিলন কামনা করেই সুপ্রিয়কে ক্ষেমংকর আহ্বান করেছে—

যেথায় অনন্তকাল বিচ্ছেদ না হবে।
লহ তবে বন্ধু হস্তে করুণ বিচার—
এই লহো।

এই উক্তির পরেই বন্ধুর মস্তকে দুই হাতের শিকল দিয়ে সজোরে

আঘাত করে তাকে ভূমিসাৎ করে দেয় ক্ষেমংকর,—আর, সেই সঙ্গে রাজাকে শীঘ্র তার প্রাণদণ্ড প্রদান ক'রতে আদেশ করে।

'মালিনী'র তো কাহিনী এইটুকুই। 'চিত্রাঙ্গদা' আর 'গোড়ায় গলদ'-এর পরবর্তী হলেও 'মালিনী' সেই একই সময়ের রচনা। সেই 'সাধনা' পর্বে রবীন্দ্র-নাথের লেখাতে কবিতা আর নাটকের অন্যোন্য সংস্পর্শের নমুনা এখানে দেখা গেল। সৌন্দর্য, প্রেম, কল্যাণ, মুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর জীবনের নানা পর্বে তিনি ভেবে গেছেন। সেইসব ভাবনা তাঁর কবিতায় যেমন, নাটকেও তেমনি প্রতিফলিত হয়েছে। 'মালিনী'তে গ্রীক-প্রভাব কতোদূর খুঁজে পাওয়া যেতে পারে, সেটা অনুসন্ধানের বিষয় বটে,—কিন্তু তার গুরুত্ব তবু খুব বেশি নয়। কিন্তু তিনি নিজে ঐ যে তাঁর ভূমিকায় বলে গেছেন—'মনের একটা সত্যকার বিস্ময়ের আলোড়ন ওর মধ্যে দেখা দিয়েছে',—সেটা কিছুতেই ভোলা চলে না। রবীন্দ্র-মানসে মঙ্গলের বোধ বলতে যা বোঝায়, 'মালিনী'তে তাই-ই উচ্চারিত হয়েছে। যা মঙ্গল, তাই সুন্দর। যা সুন্দর, তাই তো মঙ্গল।

অন্য কথা তোলবার আগে এখানে একবার রবীন্দ্রনাথের সেই সৌন্দর্য-ধারণার কথাটা ভেবে দেখা যাক।

'সৌন্দর্যবোধ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গতঃ ব্রহ্মচর্য পালনের কথা বলেছেন। জীবনকে সুন্দর করে তুলতে হলে নিয়মের সংযম মেনে চলা দরকার। সেক্ষেত্রে রসের জন্যেই নীরসতা স্বীকার করে নিতে হয়। কিন্তু লক্ষ্যের দিকে মন না রেখে নিয়মকেই যাঁরা চরম লক্ষ্য বলে মনে করেন, তাঁদের সেই নিয়মলোলু-পতাকে তিনি বলেছেন-জড়ত্বের লক্ষণ। নিবৃত্তি সাধনারও বাড়াবাড়ি ভাল নয়। সেরকম বাড়াবাড়ি এক প্রচণ্ড প্রবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। পূর্ণতা লাভের দিকে লক্ষ্য রেখে সংযম-চর্চাকে তাই তিনি সংযত করতে বলেছেন।

জৈব বৃত্তির মধ্য দিয়ে যে অনিবার্য প্রয়োজনবোধ অনুভব করা যায়, সৌন্দর্য সে রকম প্রয়োজনের জিনিস নয়। রবীন্দ্রনাথ সুস্পস্টভাবে বলেছেন যে, প্রয়োজনের সম্বন্ধে আমাদের দৈন্য, আমাদের দাসত্ব। আনন্দের সম্বন্ধেই আমাদের যথার্থ মুক্তি। এই প্রয়োজন-প্রয়োজনাতীত বিভেদের কথাসূত্রে তিনি সুদৃশ্য, সৌরভময়, সুপক্ক ফলের কথা বলেছেন। সেরকম 'ফলে' আমাদের ক্ষুধারও নিবৃত্তি ঘটে এবং তাতে আমাদের মনও আনন্দিত হয়। ক্ষুধার রূঢ়তাকে সৌন্দর্য এইভাবে আবৃত করে রাখে,—শোভন করে দেয়। মানুষের মনে জৈব ক্ষুধাকে এইভাবে সংযত ক'রেই সৌন্দর্য নিজের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করছে।

সৌন্দর্যের মর্মস্থানে প্রবেশ করতে হলে স্তব্ধভাবে নিবিষ্ট হতে হয়। এক-পরায়ণা সতী স্ত্রী-ই যথার্থ প্রেম উপলব্ধি করতে পারেন। লোলুপ ভোগীর পক্ষে সে আস্বাদন সম্ভব নয়। উতঙ্কের কাহিনীতে এই ব্যাপারেরই সমর্থন পাওয়া যায়।

অতঃপর রবীন্দ্রনাথ শাস্ত্রকর্তার বাণী স্মরণ করেছেন।—'সুখার্থী সংযতো ভবেৎ'।

কিন্তু যাঁরা কলাকুশল,গুণী তাঁদের জীবনেও অসংযমের বহু দৃষ্টান্ত দেখা যায়, অথচ তাঁরাও সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছেন। জীবনের সে-সত্য স্বীকার করে নিয়ে তিনি বলেছেন সে,—'কলাবান গুণীরা যেখানে বস্তুতঃ গুণী সেখানে তাঁহারা তপস্বী।' সংসারে অপরিণত শক্তির সঙ্গে অসংযত চরিত্রের একত্র সমাবেশ অসম্ভব নয়। কিন্তু যথার্থ পরিণত সৌন্দর্যবোধ আর প্রবৃত্তির বিক্ষোভ কখনই একসঙ্গে থাকতে পারে না।

বিশ্বামিত্রের জগৎ যেমন বিধাতার বিরুদ্ধে অহংকারী তপস্বীর দম্ভের সৃষ্টি,—নদীর ঘূর্ণি যেমন স্রোতের প্রতিকূল আঘাতজনিত বিক্ষোভ,—মাতালের বৈঠক যেমন জগৎ-সংসারের অসঙ্গত সমাবেশ,—মানুষের মনের প্রবৃত্তির বাড়াবাড়িও সেইরকম উন্মত্ততা, সামঞ্জস্যহীনতা এবং অসঙ্গতি।

বর্বরের বোধ আড়ম্বর-প্রিয়। আড়ম্বরের মোহ উত্তীর্ণ হবার জন্যে মনের যে উত্তরণ-শক্তির প্রয়োজন,—শিক্ষা এবং সংস্কৃতির উচ্চতর স্তরেই সে-শক্তির বিকাশ সম্ভব। সমুচিত সাদৃশ্যের সাহায্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর এ-মন্তব্যও ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, রাজার মহিমা কেবল বসন-ভূষণের ঐশ্বর্যেই আশ্রিত নয়, সে মহিমা মন দিয়ে অনুভব করতে হয়। তাই শিল্পে যথার্থ গুণের পরিচয় সামঞ্জস্য রক্ষাতেই নিহিত।

তিনি আরো, বলেছেন যে, আমাদের মনের বড়ো অংশ যাতে অধিকার করে, সেইরকম দেখাতেই আমরা বেশি তৃপ্তি পাই। যাকে আমরা মঙ্গল বলি তাতে আমাদের প্রয়োজন ত মেটেই, তাছাড়া এক অনির্বচনীয় সামঞ্জস্যবোধে তা আমাদের মুগ্ধ করে।

সেই সামঞ্জস্যের কথা তাঁর গানে, কবিতায়, নাটকে,—তাঁর বিবিধ গদ্য নিবন্ধে নানাভাবে বলা হয়েছে। তাঁর নাটকেও সেই সামঞ্জস্য চেতনার অভিব্যক্তি ঘটেছে। সে বিষয়ে বিশদ আলোচনা না হোক্ সংক্ষেপে স্মরণ করবার জন্যেও 'বনফুল' থেকে শুরু করে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে—এই বিশ বছরের

মধ্যে লেখা তাঁর রচনাবলীর তালিকা—বিশেষতঃ নাট্য রচনাবলীর তালিকা দরকার। এখানে সেই আংশিক তালিকাটি দেওয়া হোলোঃ

বনফুল—

তাঁর প্রথম কাব্য-পুস্তক; ১২৮৬ সালে গুপ্ত-প্রেস থেকে ছাপা হয়ে প্রকাশিত হয়। এ একখানি আখ্যায়িকামূলক কাব্য। আট সর্গে সমাপ্ত। 'জ্ঞানাঙ্কুর' মাসিক পত্রে ১২৮২ সালে প্রথমে প্রকাশিত হয়। কিন্তু এ-রচনা লেখা হয়েছিল আরো অনেকদিন আগে। একথাও বলা হয়েছে যে, এই বইখানি কবির তের-চোদ্দ বছর বয়সের লেখা।

কবিকাহিনী—

তাঁর এই খণ্ডকাব্য ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা ১২৮৪ সালের প্রথম বর্ষের 'ভারতী' পত্রিকায় পৌষ মাসের সংখ্যা থেকে প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে চৈত্র সংখ্যায় সমাপ্ত হয়।

রুদ্রচণ্ড—

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা ১২৮৮ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে 'রুদ্রচণ্ড' নাটিকা প্রকাশিত হয়। এই নাটিকাখানিকে বরং তাঁর একখানি কাব্য বলাই সংগত,—চোদ্দ সর্গে, আটশ' লাইনে এ-গ্রন্থ সম্পূর্ণ। কবির প্রথম বিলেত যাত্রার পূর্বে এই নাটিকা রচিত হয়েছিল বলে অনুমিত হয়।

ভগ্নতরী—

বিলেত যাত্রার আগে রবীন্দ্রনাথ যে গাথা ও কাব্যোপন্যাস লিখেছিলেন, বিলেতেও সে ধারা চলছিল। টার্কি সহরে বাসকালে তিনি 'ভগ্নতরী' নামে একটি গাথা রচনা করেন; সে সম্বন্ধে তিনি তাঁর 'জীবনস্মৃতিতে' বেশ বিস্তৃতভাবেই বলেছেন।

ভগ্নহৃদয়—

বিলেতে থাকবার সময়েই রবীন্দ্রনাথ 'ভগ্নহৃদয়' নামে একখানি কাব্যনাটিকা আরম্ভ করেন। বাংলা ১২৮৭ সালের 'ভারতী' পত্রিকায় কার্তিক থেকে মাঘ সংখ্যায় ছাপা হয়। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে—বাংলা ১২৮৮ সালে এ-কাব্য বই হিসেবে প্রকাশিত হয়। এই নাট্যকাব্য রচনার সময়ে রবীন্দ্রনাথের বয়স ছিল উনিশ বছর। এটি সর্বসমেত চৌত্রিশ সর্গে বিভক্ত।

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী—

একুশটি পদ আছে। ১২৮৪ সালের 'ভারতী' পত্রিকায় ছাপা আরম্ভ। ১২৮৪ থেকে ১২৮৮ সালের মধ্যে,—এবং ১২৯০ সালের 'ভারতী'তে 'ভানুসিংহের পদাবলী' ছাপা হয়। বইয়ের আকারে এইসব রচনা প্রকাশিত হয় ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে।

বাল্মীকি-প্রতিভা—

গীতিনাট্য। বিলেত থেকে দেশে ফেরবার পরে, বাংলা ১২৮৭ সালে লেখা হয়। এই বইয়ের উৎপত্তি সম্বন্ধে কবি স্বয়ং তাঁর জীবনস্মৃতি তে লিখেছেন যে, তাঁদের বাড়িতে কবি

মূরের লেখা সচিত্র একখানি Irish Melodies বই ছিল। তাতে একটি বীণা আঁকা ছিল। সেই ছবি দেখে কবির ইচ্ছা হয় যে, তিনি আইরিশ সুর শিখে নিয়ে দেশকে সেই সুর শোনাবেন। [দ্রষ্টব্য : জীবনস্মৃতি পৃঃ ১৫০—১৫৬]।

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে, বাংলা ১২৮৭ সালের ফাল্গুনে কবির গৃহে বিদ্বজ্জনসমাগমের অধিবেশন উপলক্ষে বাল্মীকি-প্রতিভা রচিত এবং অভিনীত হয়। কবি নিজে বাল্মীকি এবং তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রতিভা দেবী সরস্বতী সেজেছিলেন। 'বাল্মীকি-প্রতিভা' নামের মধ্যে সেই ইতিহাসটুকু আছে। 'বাল্মীকি-প্রতিভা'তে অক্ষয়কুমার চৌধুরীর কয়েকটি গান আছে, এবং এর দুটি গানে বিহারীলাল চক্রবর্তী মহাশয়ের 'সারদামঙ্গল' কাব্যের ভাষাও অল্প পরিমাণে এসে পড়েছে।

কালমৃগয়া—

নাটিকা। বোধ হয় 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র পরে রচিত হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে এটিকে 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র পূর্ববর্তী লেখা বলেছেন।

সন্ধ্যাসঙ্গীত—

প্রথম প্রকাশ : ১৮৮২ সালের ৫ই জুলাই,—১২৮৯ সালের আষাঢ়।

প্রভাতসঙ্গীত—

প্রথম প্রকাশ : ১২৯০ সাল, ইংরেজি ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ।

ছবি ও গান—

প্রথম প্রকাশ ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ, বাংলা—১২৯০ ফাল্গুন।

প্রকৃতির প্রতিশোধ—

প্রথম প্রকাশ ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ ২৯এ এপ্রিল, বাংলা—১২৯১ সাল। এটিও নাট্যকাব্য।

নলিনী—

'প্রকতির প্রতিশোধ'-এর পরে ১৮৮৪ তেই—১০ইমে তারিখে প্রকাশিত হয়।

কড়ি ও কোমল—

প্রথম প্রকাশ—১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ, বাংলা ১২৯৩ সাল।

মায়ার খেলা—

প্রথম প্রকাশ—১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দ। গীতিনাট্য। শ্রীযুক্ত পি কে রায়ের সহধর্মিণী সরলা রায়ের অনুরোধে এ নাট্য রচিত হয়। ১২৯৫ সালের ১৩ই, ১৪ই, ১৫ই পৌষ সখি-সমিতির মহিলা-শিল্প-মেলায় বা মহিলা-শিক্ষা-মেলায় অভিনয় উপলক্ষে এই বই

ছাপা হয় এবং যাঁর অনুরোধে এ বই লেখা হয়, তাঁকেই উৎসর্গ করা হয়। এটিকে গীতমুখ্য নাটক বলা হয়েছে।

মানসী—

১২৯৪-১২৯৭ সালের মধ্যে লেখা। এই কবিতা-সংগ্রহের প্রথম প্রকাশ ১২৯৭ পৌষ।

রাজা ও রানী—

১২৯৬ সালে প্রথম প্রকাশ। এও নাট্যকাব্য। ১৩৩৬ সালে 'রাজা ও রানী'র এই গল্পাংশ 'তপতী' নাটকে নতুন করে পরিবেষিত হয়।

বিসর্জন—

এ নাটকখানি রবীন্দ্রনাথের উনত্রিশ-ত্রিশ বছর বয়সে, বাংলা ১২৯৮ সালে (১৮৯০—৯১ খ্রীষ্টাব্দে) লেখা হয়।

চিত্রাঙ্গদা—

এ রচনা ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের কোনো-এক তারিখ থেকে অক্টোবর মাসের কোনো এক তারিখের মধ্যে লেখা হয়। এই 'চিত্রাঙ্গদা' নাটক তাঁর উড়িষ্যা ভ্রমণের সময়ে লেখা। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। অনেকদিন পরে ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে কবি এটিকে নৃত্যনাট্যের রূপ দিয়েছিলেন।

গোড়ায় গলদ—

প্রহসন। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত।

সোনার তরী—

১২৯৮ সালের ফাল্গুন থেকে ১৩০০ সালের অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যে যে সব কবিতা লেখা হয়েছিল, সেগুলি একত্র করে এ-বইয়ে সন্নিবেশিত হয়। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে (বাংলা ১৩০০ সাল) প্রকাশিত।

বিদায় অভিশাপ—

এও তাঁর কাব্য-নাটিকা। রচনার সময় ১২৯৯ সাল অথবা,—১৩০০ সালের ২৬শে শ্রাবণ। ১৩০০শ সালের মাঘ মাসের 'সাধনা' পত্রিকায় এ-লেখা প্রথম প্রকাশিত হয়। ১০ই মে, ১৯১২—তারিখে পৃথক গ্রন্থাকারে 'বিদায় অভিশাপ' নাট্যকাব্য প্রকাশিত হয়।

নদী—

অতি ছোটো আয়তনের একখানি কাব্য। ২২-এ মাঘ, ১৩০২ সালে কবির ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিণয়-দিনে এটি উপহার প্রদত্ত হয়।

চিত্রা—

কবিতা-সংগ্রহ ১৩০০শ সালের মাঘ মাস থেকে ১৩০২ সালের ২৩-এ ফাল্গুনের মধ্যে লেখা।

মালিনী—

সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্যগ্রন্থাবলীতে [১৫ই আশ্বিন ১৩০৩] 'মালিনী' প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে পৃথক পুস্তকাকারে দেখা দেয়।

বৈকুণ্ঠের খাতা—

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে—অর্থাৎ ১৩০৩ সালের চৈত্র মাসে তাঁর এই প্রহসন প্রকাশিত হয়।

কাহিনী—

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে,—১৩০৬, ২৪-এ ফাল্গুন এই নাট্যকাব্য ও কবিতা-সংগ্রহ ছাপা হয়।

এরপর তাঁর রচনাবলীর ধারা এগিয়েছে আরো বিচিত্র বিষয়, বিভিন্ন রীতি এবং সমুচিত অশেষ মনোভঙ্গির মধ্য দিয়ে। কিন্তু সে-তালিকা আপাততঃ স্থগিত রাখা যেতে পারে। 'চিত্রা' প্রকাশের সময়ে সাহিত্য-ক্ষেত্রে তিনি যে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি ছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই।

১৮৮১ থেকে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের অন্তর্ভুক্ত তাঁর রচনাবলীর যে তালিকা এখানে দেওয়া হোলো, তাতেই তাঁর 'বাল্মীকি প্রতিভা', 'রুদ্রচণ্ড', 'কালমৃগয়া', 'প্রকৃতির প্রতিশোধ', 'নলিনী', মায়ার খেলা', 'রাজা ও রানী', বিসর্জন', 'চিত্রাঙ্গদা' (কাব্য ও নৃত্যনাট্য), 'গোড়ায় গলদ', 'বিদায় অভিশাপ', 'মালিনী', 'বৈকুণ্ঠের খাতা' এবং 'কাহিনী'—নাট্যলক্ষণে চিহ্নিত এই ক'খানি বইয়ের নাম দেখা যাচ্ছে। আর এও ঠিক যে, 'গোড়ায় গলদ' বা 'বৈকুণ্ঠের খাতা' যে-জাতের নাটক, এই তালিকার অন্যগুলি সে-জাতের নয়। সে-সব লেখাকে কাব্যনাট্য, নাট্যকাব্য,—কখনো বা গীতিনাট্য বলা হয়েছে। তবে তিনি যে কেবল দু'চারখানি মাত্র প্রহসন লিখেছিলেন,-আর বাকি সবই কাব্যনাট্য লিখে গেছেন, তা নয়। 'বালক' পত্রিকায় এবং 'ভারতী'তে ১২৯২ থেকে ১২৯৪ সালের মধ্যে তাঁর অনেকগুলি (১২৯২ সালে ন'টি,—১২৯৩ সালে তিনটি এবং ১২৯৪ সালে একটি—মোট এই তেরটি) কৌতুকনাটিকা ছাপা হয়। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে—ডিসেম্বর মাসে,—তাঁর 'ব্যঙ্গকৌতুক' প্রকাশিত হয়। তাতেও কিছু নাট্যরচনা ছাপা হয়েছিল। তাঁর 'চিরকুমার সভা' (১৩০৭-৮ সালে 'ভারতী'তে প্রকাশিত), 'শারদোৎসব,'—এবং বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের বালকদের অভিনয়ের জন্যে লেখা তাঁর 'মুকুট' (১২৯২ সাল)—তিনখানি বইয়েরই প্রথম

প্রকাশকাল ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দ। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর 'বৌঠাকুরাণীর হাট'-এর নাট্যরূপ 'প্রায়শ্চিত্ত' বেরিয়েছিল। তারপর ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে বেরিয়েছে 'রাজা' নাটক,—১৯১২-তে 'ডাকঘর' এবং 'অচলায়তন',—১৯১৬-তে 'ফাল্গুনী',—১৯১৮তে 'অচলায়তন'-এর অভিনয়যোগ্য সংস্করণ 'গুরু',—১৯২০-তে 'রাজা' নাটকের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ 'অরূপরতন',—১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে 'শারদোৎসবের' অভিনয়যোগ্য সংস্করণ 'ঋণশোধ',—১৯২২-এ 'মুক্তধারা'—১৯২৩-এ তাঁর গীতিনাট্য 'বসন্ত'—এবং ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে 'গৃহপ্রবেশ' নাটিকা। তাঁর নাট্যরচনাবলীর প্রবাহে ১৯২৬ সাল একটি স্মরণীয় বছর! আগের বছরে যেমন তাঁর একটি গল্পের নাট্যরূপ 'গৃহপ্রবেশ' বেরিয়েছিল,—১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে তেমনি 'কর্মফল' গল্পের নাট্যরূপ 'শোধবোধ' বের হয়। 'কর্মফল' অবিশ্যি অনেক আগেকার লেখা (২২শে ডিসেম্বর ১৯০৩)। 'গৃহপ্রবেশ'-এর মূল গল্প 'শেষের রাত্রি'ও আগেকার রচনা (১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দ)। সে যাই হোক্, ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দেই তাঁর 'নটীর পূজা', 'ঋতু-উৎসব' (নাট্য-সংগ্রহ) এবং 'রক্তকরবী' বই হিসেবে প্রকাশিত হয়। এইভাবে,—তাঁর কলমে বিচিত্র নাট্য রচনার যেন আর অন্ত ছিলনা! নাটকের পথ ধরে তিনি হাসির দিকটাও দেখিয়েছেন, কান্নার দিকটাও দেখিয়েছেন।

নিজের মনের কাব্যাবেগ-প্রবণতা সম্বন্ধে তিনি খুবই সজাগ ছিলেন। গদ্য, পদ্য, নাটক—সব ক্ষেত্রেই তিনি নিজের লেখা বার বার সংশোধন করেছেন। শিল্পী হিসেবে সে তাঁর গভীর অতৃপ্তিবোধেরই নিদর্শন। তাঁর কলমেই 'অচলায়তন' কেটে 'গুরু' হয়েছে,—'রাজা ও রানী' কেটে 'তপতী' (১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে) হয়েছে। শেষ দিকে 'নৃত্যনাট্যের' মধ্য দিয়ে তিনি অন্যতর কোনো পথ খুঁজছিলেন। শেষ দিকের গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্যই হোক্ আর প্রথম দিকের কাব্যনাট্যই হোক্,—অথবা তাঁর প্রতীক-নাটকগুলির কথাই ধরা যাক্—সব ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথের নাটক যেন প্রধানতঃ কাব্য, গৌণতঃ নাটক। তাঁর প্রতীক-নাটকগুলিতে সংঘাত নয়,—সংঘাতের কাব্যাবেগই আসল কথা। বিসর্জন বা মালিনী অবিশ্যি প্রতীক-নাটক নয়। কিন্তু সে-সব ক্ষেত্রেও এই একই লক্ষণ চোখে পড়ে। বাইরের সংঘাত আছে কি নেই, সেটাই যে একমাত্র প্রশ্ন, তা নয়,—আরো প্রশ্ন এই যে—তাঁর নাটকে ঘাত-প্রতিঘাত সবই যেন বাঁশি হয়ে বেজে ওঠে,—আর, আমরা ভাবতে বাধ্য হই যে—সে বাজনা 'বনমাঝে কি মনমাঝে'? বাইরে না ভেতরে?

'কাব্যনাট্য' কথাটাই একরকম অন্বয়ের ইশারা। যেখানে কবিতাও আছে, নাটকেরও মিশ্রণ ঘটেছে—সেই রকম রচনাকেই বলা হয় 'কাব্যনাট্য'। আবার,

নাটকের প্রাধান্য মেনে নিয়ে কবিতার মিশ্রণ যেখানে স্বীকৃত, তারই নাম 'নাট্যকাব্য'।

এ-ধরনের লেখার প্রকৃতি নাটক-ঘেঁষা হলেও লেখকরা ছন্দের ওপর নির্ভর করেন বলে এই শ্রেণী-নামের সঙ্গে 'কাব্য'-অংশটুকু জড়িত থেকেই যায়। এবং কবিত্বের কথা উহ্য রাখলে নাটকের প্রধান প্রধান লক্ষণ বলতে যা বোঝায়, —নাট্যকাব্যে সেই সব লক্ষণও সুস্পষ্ট।

নাটকই হোক্, আর, গল্প-উপন্যাসেই হোক্—সাহিত্যের আসরে কবিতার আয়ুই যে সর্বাধিক, সে-কথা মানতেই হয়। আমাদের আদি ও অকৃত্রিম,— ইন্দ্রিয়-বেদনাময়,—সনাতন শরীরী সত্তা যেটি,—তারই সুখ-দুঃখের ঢেউ থেকে যায় প্রত্যেক যুগের কবিতায়। নাট্যকাব্যে ঘাত-প্রতিঘাত বা সংঘাত-সংঘর্ষের কাহিনী কিছু পরিমাণে থাকে বটে,—তবে তারও বিশেষ স্থায়িত্ব নির্ভর করে সেই ঢেউয়ের অকৃত্রিমতার ওপরে,—অর্থাৎ সেই হৃদয়াবেগের সততাতে আর তীব্রতাতে। অর্থাৎ কবিতাকে বাহন হিসেবে পেয়ে এ-ক্ষেত্রে নাটক যেন সুদূরগামী হয়ে ওঠে।

প্রত্যেক যুগেই সাহিত্যের পুরোনো রীতি, পুরোনো কায়দা-কানুন, পুরোনো রুচি ইত্যাদি বদ্‌লে যাচ্ছে। জীবনে আজকের কথা কাল থাকে না,—কালকের রঙ পরশু ম্লান হয়ে যায়। কিন্তু তবু সবই কি শেষ হয়ে যায়? কিছুই কি থাকে না? আমাদের পরিচয়ের যে-অংশটা সাময়িক, সেটাই পুরোনো হতে পারে, —সেটাই সময়ের প্রত্যক্ষ সীমানা। কিন্তু দু'চার পুরুষের সাময়িকতাকেও যা ছাড়িয়ে ওঠে,—দেশে-কালে ব্যক্ত হলেও যা দেশ-কালের অধীনস্থ নয় বলেই বিশ্বাস হয়, তাকেই আমরা আমাদের চিরন্তন সত্য বলে জানি। মানুষের অস্তিত্বের সেই সময়াতীত পরিচয় থেকে যায় তার কবিতায়। নাটকও পুরোনো হয়ে যায়,—গল্প-উপন্যাসও পড়া হলেই শেষ। কিন্তু সতিক্যার ভালো কবিতা যেন চিরকালের ঢেউ। কাব্যনাট্য আর নাট্যকাব্য—দুইয়ের মধ্যেই সেই ঢেউ ধরে বেঁচে থাকবার আয়োজন। রবীন্দ্রনাথের কলমে সেই আয়োজন সার্থক হয়ে উঠেছে।

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে 'রুদ্রচণ্ড' 'ভগ্নহৃদয়', 'কালমৃগয়া' এবং 'বাল্মীকি-প্রতিভা' —নাটক আর কবিতার মিশ্রণে রবীন্দ্রনাথের এই চারখানি রচনা প্রকাশিত হয়। 'বাল্মীকি-প্রতিভা' এবং 'কালমৃগয়া' যথাক্রমে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে এবং ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বিদ্বজ্জন সমাগম-সভার অধিবেশনের জন্যেই লেখা হয়। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে 'বাল্মীকি-প্রতিভা' নতুন করে লিখে প্রথমে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে,—তারপর স্টার থিয়েটরে যথারীতি

প্রবেশ-মূল্যের ব্যবস্থা করে অভিনয় করানো হয়। প্রভাতবাবু বলেছেন যে বোধহয় 'পাবলিক রঙ্গমঞ্চে কবির অভিনয়ও এই প্রথম এবং টিকিট বেচিয়া অর্থসংগ্রহও এই প্রথম।' তার তিন বছর পরে সখী-সমিতির মেলায় অভিনয়ের জন্যে রবীন্দ্রনাথ 'মায়ার খেলা' গীতি-নাট্য লিখে দিয়েছিলেন। সেটা ১২৯৫ সালের পৌষ মাসের কথা। 'বাল্মীকি-প্রতিভা' এবং 'কালমৃগয়া'র পরে একে একে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ', 'মায়ার খেলা', 'রাজা ও রানী', 'বিসর্জন' ইত্যাদি রচনার ধারা এগিয়ে গেছে। সে-কথা আগেই বলা হয়েছে। 'রাজা ও রানী', 'বিসর্জন', 'চিত্রাঙ্গদা'—এবং আরো কোনো কোনো নাট্যরচনায় তিনি একই কথা বলতে চেয়েছিলেন,—বলেছিলেন যে প্রেম যখন আত্মকেন্দ্রিক এবং ভোগপ্রধান, তখন তা অকল্যাণ। যাতে আমাদের কল্যাণ, সে তো কখনোই ভোগাত্মক নয়।

এই ধরনের গভীর, ব্যাপক, সম্প্রদায়াতিশায়ী জীবন-সত্যের উদ্ঘাটনেই নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ চোখে পড়ে। যেমন তাঁর অন্তর্মুখিতা, তেমনি তাঁর এই ব্যাপ্তি-চেতনা। রবীন্দ্রনাথের নাটকে তাঁর শিল্পিমনের এই দুটি বিশেষত্বই পাশাপাশি বিদ্যমান। 'অচলায়তন', 'রাজা', 'ডাকঘর', 'রক্তকরবী' প্রভৃতি নাটক তাঁর সেই গভীর, ব্যাপক জীবন-সত্যবোধেরই দর্পণ। তাঁর যে সত্যবোধ সম্বন্ধে এখানে বার বার 'ব্যাপক' বিশেষণটি ব্যবহার করা হোলো, সে-সত্যের আর একটি উদাহরণ দিতে হলে তাঁর শেষ পর্বের 'কালের যাত্রা'র কথা বলা যেতে পারে। শরৎচন্দ্রের সপ্তপঞ্চাশত্তম জন্মোৎসব উপলক্ষে ১৩৩৯ (১৯৩২ খ্রীঃ) সালের ভাদ্র মাসে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'কালের যাত্রা' নাটিকাটি তাঁরই নামে উৎসর্গ করেন। সে-নাটিকার মূল বিষয়টি তিনি নিজেই তাঁর এক-খানি চিঠিতে সংক্ষেপে জানিয়ে গেছেন। ১৩৩৯ সালের কার্তিক সংখ্যায় 'বিচিত্রা' থেকে তাঁর সেই চিঠির অংশ রবীন্দ্র-রচনাবলীর দ্বাবিংশ খণ্ডের গ্রন্থপরিচয় অংশে তুলে দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি রবীন্দ্রনাথ এইভাবে বর্ণনা করেছিলেন —'রথযাত্রার উৎসবে নরনারী সবাই হঠাৎ দেখতে পেলে মহাকালের রথ অচল। মানবসমাজের সকলের চেয়ে বড়ো দুর্গতি, কালের এই গতিহীনতা। মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধবন্ধন দেশে দেশে যুগে যুগে প্রসারিত, সেই বন্ধনই এই রথ টানবার রশি। সেই বন্ধনে অনেক গ্রন্থি পড়ে গিয়ে মানবসম্বন্ধ অসত্য ও অসমান হয়ে গেছে, তাই চলছে না রথ। এই সম্বন্ধের অসত্য এতকাল যাদের বিশেষভাবে পীড়িত করেছে, অবমানিত করেছে, মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে, আজ মহাকাল তাদেরই আহ্বান করেছেন তাঁর রথের বাহনরূপে; তাদের অসম্মান ঘুচলে তবেই সম্বন্ধের অসাম্য দূর হয়ে রথ সম্মুখের দিকে চলবে।'

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথ

অমিয় রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সঙ্গীত রচনা বিশেষভাবে পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে উচ্চাঙ্গ রাগ সঙ্গীতের প্রতি তাঁর আসক্তি কত প্রবল ছিল। এ কথা বললে বোধকরি অত্যুক্তি হবেনা যে বাঙ্গলা দেশে তিনি সুরকার হিসেবে যে শ্রেষ্ঠ মর্যাদা পেয়েছেন, তাঁর রচিত গানগুলি যে দেশের শ্রেষ্ঠ সুরসম্পদ বলে স্বীকৃত হয়েছে তার মূলে রয়েছে রাগ সঙ্গীতে তাঁর জ্ঞান ও ব্যুৎপত্তি। বাল্যকাল থেকে তিনি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের পরিবেশে সঙ্গীতে যে শিক্ষা ও জ্ঞান লাভ করেছিলেন তা উত্তর জীবনে তাঁর মৌলিক সুররচনাবলীকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করেছিল। রাগসঙ্গীতের একটি সর্বজনীন ও শাশ্বত আবেদন আছে; দক্ষ সুরকার যদি রাগের আধারে গানগুলিকে বিশেষ নিপুণতার সঙ্গে সুরে রূপায়িত করেন, তাহলে তাঁর রচনার মধ্যে সর্বজনীন ও দীর্ঘকালীন আবেদন থেকে যায়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সুররচনার একটি বিশেষ ক্ষমতা ছিল—তাঁর প্রতিভা ছিল সৃষ্টিধর্মী—সনাতনরূপকে সৃজনী শক্তির অপূর্ব ক্ষমতায় নতুনভাবে উপ-স্থাপিত করায় তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। তাই তাঁর গানগুলি শ্রোতার হৃদয়ে চিরন্তন আবেদন রেখে দিয়েছে।

উপস্থিত প্রবন্ধে আমাদের আলোচ্য বিষয় তাঁর রচিত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত। তাঁর উচ্চাঙ্গের গানগুলিকে প্রধানতঃ দুভাগে ভাগ করা যায়—এক যেগুলির সুর মূলহিন্দী ধ্রুপদ, খেয়াল ও টপ্পা থেকে নেওয়া হয়েছে আর এক যেগুলি ধ্রুপদ, খেয়াল ও টপ্পা অঙ্গের তাঁর নিজস্ব রচনা। প্রথম পর্যায়ের গানগুলিতে হিন্দী ধ্রুপদ, খেয়াল ও টপ্পার মৌলিক সুরকে তিনি যথাযথ বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন। এই গানগুলির সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। হিন্দী ধ্রুপদ, খেয়াল থেকে সুর আহরণ করে বাঙ্গলা গানে আরোপ করার প্রেরণা বোধকরি তাঁর অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাজ থেকে পেয়েছিলেন। তাঁদের রচিত অনেক গান আছে যেগুলির সুর ধ্রুপদ, খেয়াল থেকে নেওয়া। ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে বাঙ্গলাদেশের তৎকালীন সঙ্গীতসাধকদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হয়—প্রথম যুগে যদুভট্ট, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী এবং পরবর্তী যুগে অম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, শ্যাম-সুন্দর মিশ্র, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট সঙ্গীতবিদ্‌দের। রবীন্দ্রনাথ ধ্রুপদ খেয়াল প্রভৃতি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সম্বন্ধে সম্যক

পরিচয় লাভ করেন ঐ সমস্ত সঙ্গীতবিদ্‌দের সংস্পর্শে এসে। তাঁদের কাছ থেকে ধ্রুপদ ও খেয়ালের প্রাচীন রচনাগুলি শুনে তিনি এতই আকৃষ্ট হয়েছিলেন যে বাঙ্গলা ভাষাতেও তাঁর ধ্রুপদ ও খেয়াল রচনার আগ্রহ বেড়ে যায়। ভারতীয় সঙ্গীতের অমূল্য সম্পদ ধ্রুপদ গানকে মাতৃভাষার মধ্যে উপলব্ধি করার একান্ত বাসনা তাঁর জাগে তাই তিনি সুরসৃষ্টির প্রথম জীবন থেকে বাঙ্গলা ভাষায় ধ্রুপদ প্রভৃতি উচ্চাঙ্গ গান রচনায় মনোনিবেশ করেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সুনিপুণ রচনায় উচ্চাঙ্গের গানগুলিতে ভাষা ও সুরের এক অপূর্ব সমন্বয় সাধন করেছেন। প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে মূল হিন্দী ধ্রুপদ ও খেয়াল গানের অনুসরণে যে গানগুলি তিনি রচনা করেছেন সেগুলির মধ্যে তাঁর রচনা বৈশিষ্ট্য কি পরিমাণে পাওয়া যায়? কারণ সুরের দিক থেকে কোনো অভিনবত্ব নেই যেখানে, শুধু ভাষার পরিবর্তন যেখানে ঘটেছে, সেখানে সুরকারের কৃতিত্ব কতটুকু? এর উত্তরে বলতে হয় যে ধ্রুপদ ও খেয়ালের গানগুলি ভারী চালের—এই গানগুলিকে অন্যভাষায় রূপান্তরিত করতে গেলে সুররচনার বিশেষ প্রতিভা ও ক্ষমতার প্রয়োজন। কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের ওপর এই ধরণের গানে সুর সংযোজনার সার্থকতা নির্ভর করে—(এক) রাগের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়, (দুই) মূল গানের রচনার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি অর্থাৎ সুরের বিভিন্ন ভঙ্গিমা ও কারুকার্যের প্রতি এবং গানের অন্তর্নিহিত ভাবের প্রতি বিশেষ ধ্যান সর্বোপরি উপযুক্ত বাণী সংযোজনা। কবিগুরুর রাগসঙ্গীতের উপর যে যথেষ্ট অধিকার ছিল তা এই সমস্ত সুররচনা থেকে সহজেই বোঝা যায়। রাগের ব্যাকরণটি যেমন তিনি জানতেন তেমন রাগের রসটিও বুঝতেন। নিয়ম ভেদে বিভিন্ন রাগের গড়নটি যেমন পাল্টে যায় তেমনি তার রসেরও পরিবর্তন ঘটে। সুতরাং রাগের রূপ ও ভাবটি যুগ্মভাবে না বুঝতে পারলে ধ্রুপদ রচনা সার্থক হয়না। কারণ ধ্রুপদ গানে রাগের আধারই সবচেয়ে বড়। সুরের যা কিছু বিন্যাস তা রাগের সৌন্দর্য বর্দ্ধনের জন্যে এবং রাগকে রঙ্গে রসে পরিস্ফুট করার জন্যে। কবিগুরু উচ্চাঙ্গ রাগ সঙ্গীতের ওপর বহু সুর রচনা করেছেন এবং রাগগুলির উপর তাঁর গভীর অধিকার ছিল বলেই তিনি অতি সহজেই সুররচনা করতে পেরেছিলেন সর্বোপরি তাঁর সুররচনার মধ্যে রাগরূপ অতি স্পষ্টভাবে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

এ তো গেল রাগরূপের কথা—গান সম্বন্ধে বলার বিষয় হল যে রাগ অবলম্বনে রচিত হলেও প্রত্যেকটি গানের সুররূপ বিভিন্ন রকমের হয়। মূল রাগের যেমন একটি বিশেষ সৌন্দর্য আছে তেমন সেই রাগের বিভিন্ন গানের মধ্যে বিভিন্ন সৌন্দর্য পরিস্ফুট হয়। অন্য ভাষায় মূল গানের সার্থক রূপায়নের জন্যে প্রয়োজন হয় সেই গানের বৈশিষ্টটিকে উপলব্ধি করা। রবীন্দ্রনাথ প্রত্যেকটি

গানের সৌন্দর্য এবং বিভিন্ন খুঁটিনাটি অতি সহজেই এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যে বুঝে নিতে পারতেন বলেই এত বিচিত্র গানকে বাঙ্গলা ভাষায় সুন্দরভাবে রূপদান করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

পূর্বেই বলা হয়েছে এই শ্রেণীর গান রচনার তিনটি দিক্ আছে—রাগ, সুর ও ভাষা। রাগ ও সুরের পর কবিগুরুর ভাষা সংযোজনা সম্বন্ধে কিছু আলোচনার প্রয়োজন আছে। প্রকৃত সুরকার তিনি, যিনি সুরের সঙ্গে বাণীকে সুন্দরভাবে যোজনা করতে পারেন। রবীন্দ্রনাথের গানের কাব্যাংশ গভীর ভাব ব্যঞ্জনায় যে মূর্ত হয়ে আছে এ কথা বলা বোধকরি বাহুল্যমাত্র। তাঁর সঙ্গীতের যে একটি বিশিষ্ট আবেদন আছে তা শুধু সুরের রচনা সৌন্দর্যের জন্য নয় কাব্যাংশের ভাব সমৃদ্ধির জন্য। কাব্যে ভাবের দিক ছাড়াও আর একটি দিক আছে—সেটি হচ্ছে শব্দচয়ন। সঙ্গীতে এর একটি বিশেষ গুরুত্ব আছে। সুরকারের musical sense বা সুরবোধের পরিচয় শুধুমাত্র স্বর-সংযোজনার মধ্যে থাকেনা বাণী সংযোজনার মধ্যেও পাওয়া যায়। একই অর্থ বিভিন্ন শব্দে প্রকাশ করা যায় কিন্তু কোন্ শব্দটি শ্রুতিমধুর এবং কোন্গুলি সুরের বিশেষ pattern বা নক্সাকে পরিস্ফুট করতে পারে তার বিচার দক্ষ সুরকারই পারেন। রবীন্দ্রনাথের রচিত ধ্রুপদ, খেয়াল গানগুলির মধ্যে এই দিকটিও বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। গানগুলি নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায়, হিন্দী গানের কথার সঙ্গে অনেক জায়গায় মিল রয়েছে এবং সে মিল বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে শব্দগত। কারণ রবীন্দ্রনাথের কবিমানসের সার্থকতা স্বকীয়ভাব সৃষ্টির মধ্যে, অনুকরণের মধ্যে নয়—তাই গানগুলি তিনি নিজস্ব ভাব অবলম্বনে রচনা করে সুরের সাদৃশ্য ও সঙ্গতি রক্ষার জন্য অনেক জায়গায় প্রায় একই ধরনের শব্দ ব্যবহার করেছেন; যেমন—"আজি বহিছে বসন্ত পবন সুমন্দ তোমারি সুগন্ধ হে"—এই গানটি যদুভট্টের "আজু বহত সুগন্ধ পবন সুমন্দ মধুর বসন্তমেঁ"—বাহার রাগের এই ধ্রুপদটির সুর অবলম্বনে রচিত। অর্থের দিক থেকে প্রথম পংক্তিটির মিল থাকলেও বাকী অংশের সঙ্গে যথেষ্ট প্রভেদ রয়েছে—অর্থাৎ ভাষাগত অনুবাদ না করে কবি জায়গা বিশেষে শব্দসাদৃশ্য বজায় রেখেছেন। আশাবরি রাগের একটি হিন্দী খেয়াল "তু আ চরণ কমলপর" এই গানটির অনুসরণে তিনি রচনা করেছেন "তব অমল পরশ রস" গানটি। গান দুটির ভাবের দিক থেকে কোনো মিল না থাকলেও বাণীর দিক থেকে যে বেশ সুন্দর সাদৃশ্য আছে তা শেষ পংক্তিটি উল্লেখ করলে বোঝা যাবে। হিন্দী গানে আছে—"কোন ধ্যান তুআ ভক্তি চাহত হৈ শ্রী আনন্দ কিশোর"; আনন্দ কিশোর হলেন বেতিয়া ঘরানার বিখ্যাত প্রাচীন গায়ক ও রচয়িতা। কবিগুরু এরই সঙ্গে মিলিয়ে শেষ অংশটি রচনা করেছেন "জ্ঞান ধ্যান তব ভক্তি অমৃত তব

শ্রী আনন্দ জাগাই।" এই ধরনের মিল আমরা অনেক গানের মধ্যে পাই যেমন সিন্ধু রাগের একটি গান "মুরলী ধুনি সুনি এরি মাঈ যমুনা তীর" এর সঙ্গে কবিগুরুর "চরণধ্বনি শুনি তব নাথ জীবন তীরে, আড়ানা রাগের একটি খেয়াল "সুন্দর লাগোরি হৈ" এর সঙ্গে "মন্দিরে মম কে আসিলে হে", নট-মল্লারের খেয়াল "মোরি নঈ লগন লাগীরে"র সঙ্গে "মোরে বারে বারে ফিরালে" ছায়ানটের একটি খেয়াল "এ সখি অব কৈসে করু"র সঙ্গে "হে সখা মম হৃদয়ে রহো" ইত্যাদি। সুরের সঙ্গে বাণীর এই সুন্দর সঙ্গতি ঘটিয়ে কবি তাঁর সূক্ষ্ম শিল্পবোধের পরিচয় দিয়েছেন।

অনেক সময় দেখা যায় সুরকে ভাষান্তরিত করলে রসক্ষুণ্ণ হয়—অর্থাৎ গানের প্রাণটি যেন কোথায় হারিয়ে যায়—কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গানে কোথাও একথা মনে হয়না। মূল হিন্দী গান থেকে সুর গ্রহণ করা হলেও গানগুলির ভাব আমাদের মনে গভীর ভাবে রেখাপাত করে। তবে মূল হিন্দী গান থেকে আমরা যে রস আস্বাদন করি ঠিক তা না পেলেও যে রসটি আমরা পাই সেটিও বড় মধুর। হিন্দী গানে আমরা রসের যে ভিন্ন আস্বাদ পাই তার কারণ হিন্দী ভাষার উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য। যেমন জয়দেবের পদাবলী আবৃত্তি এবং চণ্ডীদাসের পদাবলীর আবৃত্তি উচ্চারণ পার্থক্যে শ্রবণইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে দুরকমের উপলব্ধি হয়, এও কতকটা সেই রকমের। সঙ্গীত শ্রব্যশিল্প সুতরাং ধ্বনির প্রভেদ ঘটলে রসেরও প্রভেদ ঘটে। তাই উচ্চারণ পার্থক্যে হিন্দী গানের ওজন একটু ভারী হবেই এবং এর বলিষ্ঠতা ও গাম্ভীর্য বেশী পরিমাণে শ্রুতি গোচর হবে আবার বাঙ্গলা গান একটু নরম বলেই তার শ্রুতি মধুরতা বেশী হবে। যাই হোক একথা সহজেই বলা যায় কবিগুরুর উচ্চাঙ্গের গানগুলি ভাষান্তরিত হয়েও রসোত্তীর্ণ হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলবার আছে। হিন্দী ভাঙ্গা গানগুলির মধ্যে এমন কয়েকটি গান আছে যেগুলি মূল হিন্দী গানের সুরের হুবহু অনুসরণ নয়, জায়গা বিশেষে সুরের কিছু পরিবর্তন আছে। এই পরিবর্তন মনে হয় কবির ইচ্ছাকৃত। কারণ তাঁর মন ছিল সৃষ্টি-ধর্মী তাই মাঝে মাঝে বাঁধাধরা প্রাচীন রীতি ভেঙে নতুন কিছু করার আবেগ তিনি চিরদিনই অনুভব করেছেন, সেই-জন্যে কোনো কোনো গানে সুরের মধ্যে কিছু নতুনত্ব এনেছেন।

সুররচনায় তিনি যে কত দক্ষ ও তৎপর ছিলেন সে সম্বন্ধে সঙ্গীতবিদ্ শ্রী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে কিছু জানতে পারা যায়। সুদীর্ঘকাল তিনি রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছ থেকে বহু ধ্রুপদ, খেয়াল ও টপ্পা শুনে বাঙ্গলায় রূপান্তরিত করেন। তিনি বলেন—"কবিগুরু আমায় পর পর কয়েকটি গান শোনাতে ফরমাস করতেন, আমি গানগুলি পরের

পর গেয়ে যেতাম। সেগুলির মধ্যে যেটি তাঁর ভাল লাগতো সেটি আর দু একবার শুনতে চাইতেন। ব্যস, আর গাইবার দরকার হ'ত না। তারপর সেটির একটি স্বরলিপি করে দিতে বলতেন, পরে সেই স্বরলিপির উপর কথা বসিয়ে দিতেন। এই ভাবে অতি তৎপরতার সঙ্গে তিনি গান রচনা করতেন।''

রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব রচনা কিছু আছে যেগুলি ধ্রুপদ ও খেয়াল অঙ্গের আবার এমন অনেক আছে যেগুলি ধ্রুপদ ও খেয়াল অঙ্গের না হলেও উচ্চাংগ পর্যায়ের। এই সমস্ত মৌলিক রচনায় তিনি কতকগুলি গানে রাগের বিশুদ্ধ রূপকে রক্ষা করেছেন যেমন বাহারের ''একি হরষ হেরি কাননে'' —গানটি সম্পূর্ণ খেয়াল অঙ্গের, বিভাসের একটি দ্রুত চৌতাল আছে, কতকটা খাণ্ডার-বাণীর মত—''ওঠো ওঠোরে বিফলে''। কতকগুলি গান আছে যেগুলি হিন্দী-গান থেকে idea নিয়ে নিজস্ব ভঙ্গিতে রচনা করেছেন। এইসব গানের কোথাও কোথাও হিন্দী গানের সঙ্গে কিছু মিল পাওয়া যায়। যেমন—রামকেলীর খেয়াল—''দাও হে হৃদয় ভরে দাও'', ভৈরবের ''তুমি আপনি জাগাও মোরে'' খাম্বাজের ধামার ''ডাকিছ্ কে তুমি'' ইত্যাদি। গানগুলিকে মৌলিক রচনার পর্যায়ে অনায়াসে ফেলা যায়। তাঁর মৌলিক রচনার এমন অনেক গান আছে যেগুলি কোনো বিশেষ রাগের আশ্রয়ে রচিত হলেও এগুলির মধ্যে রাগ বহির্ভূত স্বর প্রয়োগ রয়েছে। এই সমস্ত গানে কবি রাগের চেয়ে সুররচনার দিকেই বেশী দৃষ্টি দিয়েছেন। রাগকে রচনার আধার হিসেবে ব্যবহার করে সুরের বৈচিত্র্য সাধন করেছেন ; যেমন ''ভয় হতে তব অভয় মাঝে''—গানটি বেহাগ রাগ অবলম্বনে রচনা করে একটি বিশেষ ভঙ্গি নিয়ে কোমল নিষাদের প্রয়োগ করেছেন। রাগরূপের ক্ষতি হলেও সৌন্দর্য বেড়ে গিয়েছে। দেখা যায় বেহাগ রাগের অনেক গানে কোমল নিষাদের প্রয়োগ করেছেন। বোধহয় বেহাগের সঙ্গে কোমল নিষাদের মিশ্রণটি তাঁকে বেশ আনন্দ দিত। বিহঙ্গড়া রাগে কোমল নিষাদের প্রয়োগ আছে কিন্তু তাঁর প্রয়োগ সম্পূর্ণ অন্য রকমের। কবিগুরুর উচ্চাঙ্গের গানে যেমন এই স্বরটির প্রয়োগ দেখা যায় তেমনি বেহাগ রাগ অবলম্বনে অনেক লঘু সঙ্গীতেও এই স্বরটির ব্যবহার পাওয়া যায় ; যেমন—''এ পথে আমি যে গেছি বার বার'' ''দীপ নিভে গেছে মম'' ইত্যাদি। ''ভয় হতে তব অভয় মাঝে'' গানটি মিশ্র বেহাগে রচিত হলেও ধ্রুপদী ভাবটি এর মধ্যে সম্পূর্ণ রয়ে গেছে। কবিগুরুর নিজস্ব রচনার অনেক গানে লক্ষ্য করবার বিষয় হ'ল যে রাগের শুদ্ধতা হয়ত বজায় নেই, তিনি ইচ্ছা-কৃত ভাবেই রাগের নিয়ম ভেঙ্গে নতুন সুর যোজনা করেছেন কিন্তু তাতে গানের গাম্ভীর্য কিছু কমেনি। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা প্রভৃতি গান এক একটি বিশেষ গীতিরূপ। রাগ অবলম্বনে গড়ে উঠলেও এগুলির গঠন ভঙ্গিমা

ও ঢঙের দিক থেকে প্রত্যেকটিই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ধ্রুপদের বৈশিষ্ট্য রাগের বিশুদ্ধ রূপায়ণে, সুরের সাবলীল গতিতে, গুরুওজনের শব্দ প্রয়োগে এবং ভাবের উদাত্ত গাম্ভীর্যে পরিস্ফুট হয়। ধ্রুপদ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যে স্পষ্ট ধারণা ছিল তা বোঝা যায় বিশেষতঃ এই কারণেই যে রাগের সুনিবিড় বন্ধন থেকে মুক্ত করেও তিনি এই গানগুলিকে খাঁটি ধ্রুপদ করে তুলতে পেরেছিলেন। অর্থাৎ সুর ও ভাষার সুদৃঢ় গ্রন্থনার মধ্যে ধ্রুপদের সরস ও গম্ভীর ভাবটি রূপায়িত করতে পেরেছিলেন। বেহাগ রাগের আরো একটি গান "কে যায় অমৃতধামযাত্রী"—এই গানটিতে কোমল নিষাদের প্রয়োগ থাকা সত্ত্বেও ধ্রুপদী ভাবটি অক্ষুন্ন রয়েছে।

বিভিন্ন রাগ অবলম্বনে তাঁর আরো কতগুলি রচনা আছে, যেগুলি ধ্রুপদ বা খেয়াল অঙ্গের না হলেও গান হিসেবে সেগুলির আবেদন গভীর ও উচ্চাঙ্গের। তাঁর সুর-রচনা কত উন্নত স্তরের ছিল এই গানগুলির মধ্যে দিয়ে বেশ বোঝা যায়, যেমন কাফি রাগের ওপর "তারো তারো হরি দীনজনে", "প্রতিদিন আমি হে জীবন স্বামী" ইত্যাদি।

প্রচলিত সমস্ত রাগের উপরই রবীন্দ্রনাথ সুর সংযোজনা করেছেন। তবে কয়েকটি রাগের ওপর তাঁর বিশেষ আসক্তি ছিল বলে মনে হয় কারণ সেগুলির ওপর তাঁর রচনা বেশী হয়েছে যেমন ভৈরব অঙ্গের কয়েকটি রাগ—ভৈরব, রামকেলী, যোগিয়া, কলিঙ্গড়া প্রভৃতি, ভৈরবী, ইমন বা ইমন কল্যাণ, কেদারা, দেশ, কাফি, বাহার এবং বেহাগ। মনে হয় তাঁর সবচেয়ে বেশী রচনা বেহাগ রাগের ওপর। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে রাগের ভাণ্ডার বিরাট। বহু বিচিত্র রাগের সন্ধান পাওয়া যায় এবং প্রত্যেকটি রাগই সুন্দর ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তবুও কয়েকটি রাগের ওপর গায়ক বা সুরকারের বিশেষ আকর্ষণ থাকে। এই আকর্ষণ গায়কের সম্পূর্ণ নিজস্ব অনুভূতির ব্যাপার। গায়কের মনের গঠন বা ধাতের সঙ্গে রাগগুলির যোগাযোগ আছে। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও অনুরূপ প্রবণতা দেখা যায়। তিনি যে রাগগুলি বেশী পছন্দ করতেন সেগুলির সঙ্গে তাঁর যেন অন্তরের যোগ ছিল। তাঁর প্রিয় রাগগুলি নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যাবে যে রাগগুলির প্রত্যেকটি ভাব মধুর। এই মধুর ভাবযুক্ত রাগগুলির মধ্যে কতগুলির প্রকৃতি কোমল এবং কতগুলির প্রকৃতি তীব্র। যেমন যোগিয়া, কলিঙ্গড়া, ভৈরবী, কাফি, খাম্বাজ কোমল প্রকৃতির এবং ইমন ও বেহাগের প্রকৃতি তীব্রতা-যুক্ত। কোমল এবং ঈষৎ তীব্র-মধুর রাগগুলি সূক্ষ্ম শিল্পসৃষ্টির সহায়ক বলেই তিনি রাগগুলির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর রচিত লঘু সঙ্গীতের মধ্যেও যে স্বরসমন্বয়ের পরিচয় পাওয়া যায় সেগুলির বেশীর ভাগই এ জাতীয়। গুরু-গম্ভীর রাগ রবীন্দ্রনাথ পছন্দ করতেন না। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাশয় বলেন যে তিনি দরবারী কানাড়া ও মালকৌশে সুর সংযোজনা করতে চাইতেন না এবং এই দুটি রাগে কোনো গান রচনা করেন নি। হয়ত তাঁর রসবোধের সঙ্গে রাগ দুটির অন্তর্নিহিত ভাবের সামঞ্জস্য ছিলনা তাই। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন গীতি কবি—তাঁর সূক্ষ্মসৌন্দর্য চেতনা দরবারী কানাড়া ও মালকৌশের মহাকাব্যীয় গাম্ভীর্যের বিপরীত ধর্মী হওয়াই স্বাভাবিক। কানাড়ার আধারে কয়েকটি গান রচনা করেছেন বটে যেমন "বিদায় করেছো যারে", "ঘোরা রজনী এ মোহ ঘনঘটা" নায়কী কানাড়াতে "সুধাসাগরতীরে" ইত্যাদি কিন্তু শুদ্ধ দরবারী কানাড়াতে কোনো গান রচনা করেন নি। "বিদায় করেছো যারে "গানটির রচনার প্রতি লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে দরবারী কানাড়ার রূপ নিয়ে সুরু হলেও "কিসের ছলে" এই জায়গায় শুদ্ধ গান্ধারের আরোপে গানটি দরবারী কানাড়া থেকে দূরে সরে গিয়েছে। স্বরের এই বিশেষ প্রয়োগের মধ্যে রচনার বৈচিত্র্য এসেছে বটে কিন্তু গাম্ভীর্য কমে গেছে। ঠিক এই রকম শুদ্ধ গান্ধারের মিশ্রণ হয়েছে "ঘোরা রজনী" গানটিতে এবং স্থায়ীতে তবুও দরবারীর হাল্কা প্রলেপ আছে কিন্তু অন্তারায় তার লেশমাত্র স্পর্শ নেই। "সুধা সাগরতীরে" গানটি নায়কী কানাড়ায় রচিত। নায়কী কানাড়া রাগটি দরবারী কানাড়ার একটি অংশ নিয়ে গড়ে উঠেছে, এবং এর মধ্যে দরবারীর গাম্ভীর্য যে নেই একথা বলা বাহুল্য মাত্র। কবিগুরুর আর একটি গান আছে "আনন্দ ধারা বহিছে ভুবনে", গানটি মালকৌশের আধারে রচিত—কিন্তু কোমল ঋষভ ও তীব্র মধ্যমের প্রয়োগে মালকৌশ থেকে গানটি পৃথক হয়ে তো গেছেই উপরন্তু গানের মধ্যে কিঞ্চিৎ হাল্কা ও নরম আমেজ এসে গেছে। কিন্তু এ ব্যাপারে কেউ যদি ভাবেন কবিগুরুর হয়ত রাগ দুটির সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা ছিলনা তাহলে সম্পূর্ণ ভুল হবে। তিনি ইচ্ছে করেই এই মিশ্রণ ঘটিয়েছেন, তাঁর কথা ও ভাবের সঙ্গে রাগ দুটির পূর্ণ-সঙ্গতি ঘটবেনা বলেই পছন্দমত গান দুটিকে সাজিয়েছেন। উত্তর জীবনে তাঁর মৌলিক রচনার মধ্যে রাগসঙ্গীতের প্রচুর প্রভাব পড়েছে। যে রাগগুলি নিয়ে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত রচনা করতে বেশী ভালবাসতেন সে রাগগুলির আধারে বহু লঘু সঙ্গীত রচনা করেছেন। এই রাগগুলির মধ্যে বেহাগ রাগের কথাই প্রথমে বলতে হয়। তাঁর নিজস্ব লঘু চাপের গানেও খাঁটি বেহাগের সন্ধান পাওয়া যায় যেমন "তোমার ভুবন জোড়া আসন খানি," "আজি বিজন ঘরে নিশীথ রাতে আসবে যদি শূন্য হাতে।" ভৈরবীর ওপর তাঁর অনেক গান আছে "অনেক পাওয়া মাঝে মাঝে," "আমার হৃদয় তোমার আপন হাতের দোলে দোলাও," "যৌবন সরসী নীরে" "আমি চঞ্চল হে আমি সুদূরের পিয়াসী", ভৈরবের আধারে অনেক গান আছে "আমার জীবন পাত্র", "হাওয়া লাগে গানের পালে", কলিঙ্গড়ায় "ঘরেতে ভ্রমর এল গুণগুণিয়ে", ইমনের ওপর

"দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে", "কী পাইনি তার হিসাব মিলাতে", খাম্বাজের ওপর "মোর স্বপন তরী কে তুই নেয়ে", বাগেশ্রীর ওপর "যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙ্গল ঝড়ে", দিনান্তের গানে ভীমপলশ্রীও মূলতানের মিশ্রন রচনা করেছেন "দিন যদি হোলো অবসান", মেঘ ও বর্ষার বর্ণনায় মেঘ রাগের আশ্রয়ে রচনা করেছেন "হৃদয়ে মন্দ্রিল ডমুরু গুরু গুরু।" তাঁর লঘু কালের গানগুলি অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে রাগসঙ্গীতের প্রভাব কি পরিমাণে এগুলির ওপর পড়েছে। আজকাল লঘু সঙ্গীত বলতে অনেক কিছুকেই বোঝায় আধুনিক বাঙ্গলা গান, হিন্দী গীত, এমন কি সিনেমা সঙ্গীত পর্যন্ত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের লঘু-সঙ্গীত এই সমস্ত গানের অনেক উর্দ্ধে। লঘুসঙ্গীত যে কত সমৃদ্ধিশালী হতে পারে তা তাঁর গানগুলি নিয়ে আলোচনা করলেই বোঝা যায়। শুধু যে ভাষা তাঁর গানগুলিকে সমৃদ্ধি দান করেছে তা নয় সুররচনার মধ্যেও একটি উন্নত রূপ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ সুরের মধ্যে কোথাও চটুল বা খেলো ভাব দেননি। জনসাধারণের মন ভোলাবার জন্য সুরের গ্রন্থিকে শিথিল করেননি, একটি বিশেষ মান or standard বজায় রেখে তিনি সুররচনা করেছেন। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের যেমন একটি মান আছে, সমৃদ্ধ লঘু সঙ্গীতেরও একটি বিশেষ মান আছে। সে মানের অবনতি ঘটলে তার অভিজাত্য নষ্ট হয়ে যায়। যেমন বিশুদ্ধ ভজন গান—লঘু সঙ্গীত হলেও এর মধ্যে একটি কৌলীন্য খুঁজে পাওয়া যায়, তেমনি রবীন্দ্রনাথের লঘু সঙ্গীত, লঘুরূপ ও ক্ষুদ্র-আয়তনের মধ্যে প্রকাশ পেলেও এক একটি আভিজাত্য আছে। রবীন্দ্রনাথের লঘু সঙ্গীতের এই যে সমৃদ্ধি এর মূলে রয়েছে রাগসঙ্গীতের অপরিমেয় প্রভাব। তাঁর মৌলিক রচনা সৌন্দর্যের সঙ্গে রাগসঙ্গীতের অপূর্ব সমন্বয়ে গানগুলি মূল্যবান হয়ে উঠেছে।

ধ্রুপদ ও খেয়ালের পর কবিগুরুর রচিত টপ্পা গান সম্বন্ধে আলোচনা করার প্রয়োজন আছে। টপ্পা, ঠুংরী প্রভৃতি গান খাঁটি উচ্চাঙ্গের পর্যায়ে না ফেলা হলেও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের একটি লঘু সংস্করণ বলে মানা হয়। সূক্ষ্ম কারুকার্য এবং রঙ্গিন-প্রলেপ এ দুটি গানের মধ্যে বেশী পরিমানে থাকে। টপ্পার কাজ ঠুংরীর চেয়ে কিছুটা মোটা ধরণের এবং ঠুংরীর মত এতটা রঙ্গিন নয় এবং যে আবেগময়তা বা মেজাজ ঠুংরীর মধ্যে দেখা যায় সেটি টপ্পার মধ্যে পাওয়া যায় না। তবুও টপ্পার একটি বিশেষ মর্যাদা আছে আর সেটি বোধকরি ঠুংরীর চেয়েও বেশী। বাঙ্গলা দেশে টপ্পা গানের যথেষ্ট সমাদর বা কদর আছে। ইদানীং টপ্পার ঢেউ কিছুটা কমে গেলেও এককালে বিশেষ আগ্রহ সহকারে এ গানের রস গ্রহণ করা হ'ত। প্রাচীন বাঙ্গলার বহু গানে তাই টপ্পার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। হয়ত বাঙ্গালীর কণ্ঠে টপ্পার তান এবং গায়কীতে টপ্পার ভাবটি সহজে

ফুটে উঠতো বলে এ গানের এত প্রচার ঘটেছিল। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকেও টপ্পা গানের রসাল ভাব ও style বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল এবং তিনি বুঝেছিলেন বাঙ্গলার শ্রোতারা সহজে এ গানকে গ্রহণ করতে পারবে তাই তিনি টপ্পা অঙ্গের গান রচনার প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

হিন্দী টপ্পা ভেঙ্গে কবি কিছু বাঙ্গলা টপ্পা রচনা করেন যেমন "বে পরিজা তাওে" থেকে "কে বসিলে আজি", "মিয়াঁ ব মানুলে" থেকে "হৃদয় বাসনা পূর্ণ হল", "ও মিয়াঁ ব জানুওয়ালে" থেকে "এ পরবাসে রবে কে হায়" ইত্যাদি। হিন্দী টপ্পার অনুসরণে এগুলির রচনাও বড় সরস ও মধুর। খাঁটি টপ্পা চালে অথবা টপ্পার প্রভাবে রচিত তাঁর নিজস্ব অনেক গান আছে যেগুলির রূপায়ণ অতি মনোগ্রাহী। "আজি যে রজনী যায়"—এটি ভৈরবীর ওপর একটি সুন্দর টপ্পা। খাম্বাজের "ও গান আর গাসনে", ঝিঁঝিঁটের "কিছুই তো হোলোনা" প্রভৃতি গানেও টপ্পার যথেষ্ট প্রভাব বিদ্যমান। বেহাগের ওপর একটি গান আছে "তারে দেহো গো আনি"—এই গানটি প্রাচীন বাঙ্গলা গানের মত টপ্পা মিশ্রিত একটি বিশেষ চালে রচিত। গানটি শুনে মনে হয় যেন উচ্চাঙ্গের প্রাচীন বাঙ্গলা গানের প্রভাব পড়েছে। আজকের দিনে অধিকাংশ শিল্পীদের দেখা যায় রবীন্দ্র সঙ্গীতের আসরে প্রথমে টপ্পা চালের বা টপ্পা ঢং মিশ্রিত গানগুলি পরিবেশন করতে। এই গানগুলি গাইবার আগ্রহ শিল্পীদের মধ্যে বেড়ে গিয়েছে। গানগুলি গভীর ভাবোদ্দীপক বলেই এর আকর্ষণ বেড়ে গিয়েছে রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রকৃত রসপিপাসুদের মধ্যে। এই টপ্পা ঢঙ্গের গানগুলির মধ্যে আবার অনেকগুলি গান আছে যেগুলিকে অনেকে ঢালা গান বলে আখ্যা দিচ্ছেন। গানগুলি খাঁটি টপ্পায় না হলেও টপ্পার তানের সঙ্গে মীড়ের সহযোগে গাওয়া হয়। মীড় এবং টুকরো টপ্পার তান থাকায় গানগুলির মধ্যে একটি উণ্ণত রূপ প্রকটিত হয়ে উঠছে। এ গানগুলিও দুরকমের—এক রাগসঙ্গীত ঘেঁষা যেমন—কাফি ও কানাড়ার মিশ্রনে "মেঘের পরে মেঘ জমেছে", কাফি ও পিলুর মিশ্রনে "হৃদয় আমার প্রকাশ হল" আর এক কীর্তন বা folk ঘেঁষা অর্থাৎ বাঙ্গলার পল্লী আবেদন মিশ্রিত যেমন "তবু মনে রেখো", "রূপে তোমায় ভোলাব না" ইত্যাদি। ঢঙ্গের দিক থেকে এ-গানগুলির মধ্যে নতুনত্ব পাওয়া যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় গানগুলি শিল্পীরা বিনা তাল সহযোগে পরিবেশন করেছেন। এ সম্বন্ধে কিছু বলার প্রয়োজন আছে। তাল বিহীনভাবে কেন গাওয়া হয়? হয়ত শিল্পীরা বলবেন তালের বন্ধনে গানগুলিকে সাজানো যায় না কিম্বা তালের বন্ধনে আবেগ পরিস্ফুট হয়না। গানের মধ্যে ভাব বা আবেগ যখন গভীর হয়ে ওঠে তখন অনেক সময় ছন্দ শিথিল হয়ে পড়ে একথা সত্য কিন্তু ছন্দ লোপ পেয়ে যায় একথা তো বলা যায় না। এ সবক্ষেত্রে তালের

নিয়মিত ঝোঁক হয়ত থাকেনা কিন্তু ভেতরে ভেতরে একটি গতি থেকে যায়। ছন্দের প্রাধান্য কমে গেলেও ছন্দ যে আছে এ কথা অস্বীকার করা উচিৎ নয়। তাছাড়া তালবিহীনভাবে গাইলে গানের বন্ধনটি এতই শিথিল হয়ে পড়ে যে অনেক সময় আরম্ভটি সুন্দর হলেও সমগ্রভাবে গানের উজ্জ্বল্য কমে যায়। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে শাস্ত্রীয় রীতি অনুসারে সুপ্রাচীন কাল থেকে নিবদ্ধ ও অনিবদ্ধ পর্যায়ে দুরকমের গানের প্রচলন চলে আসছে। অর্থাৎ এক তালযুক্ত আর এক তালহীন গান। শাস্ত্রে আলাপকেই অনিবদ্ধ বা তালহীন গানের পর্যায়ে ফেলা হয়েছে, এবং সেই রীতি অদ্যাবধি চলে আসছে কিন্তু পদযুক্ত গানকে কখনও অনিবদ্ধের পর্যায়ে ফেলা হয়নি। আলাপের পদ বা ভাষা থাকেনা কতগুলি অর্থহীন ধ্বনি "অ ন, তে, রে, নে, রি, নুন্" প্রভৃতি সহযোগে গাওয়া হয় বলে (অবশ্য এই শব্দগুলি অনন্ত হরি ওঁ এই কথার অপভ্রংশরূপ বলে অনেকে মনে করেন) এবং সুরের কোনো নির্দিষ্ট বন্ধন থাকেনা বলে তাকে অনিবন্ধের পর্যায়ে ফেলা হয়েছে। কিন্তু গানের ক্ষেত্রে অর্থযুক্ত ভাষা থাকে বলে এবং সুরের একটি বাঁধা ছক থাকে বলে তাকে নিবন্ধের পর্যায়ে ফেলা হয় অর্থাৎ তাল সহযোগে গাওয়া হয়। এই নিবন্ধ গানের মধ্যে কতগুলি গানে শুধু সুরেরই বাঁধা ছক থাকেনা তালেরও একটি নির্দিষ্ট বন্ধন থাকে আবার কতগুলি আছে যেগুলির মধ্যে তালে কোনো বাঁধাবাঁধির নিয়ম নেই যেমন বিলম্বিত চালের খেয়াল গান, প্রাচীন বাঙ্গলা গান বা যৎ তালের ঠুংরী বা টপ্পা গান। এই সব গানে তালের বন্ধন শিথিল তা সত্ত্বেও তালেই গাওয়া হয়। লয়, মাত্রা ও ছন্দ ভেদে তালও বিবিধ প্রকারের এবং এ ধরনের গানের সঙ্গে খাপ খেতে পারে এমন বহু তালের প্রচলন আছে। তাই মনে হয় এই জাতীয় অন্যান্য গান যেমন তালসহযোগে গাওয়া হয় রবীন্দ্রনাথের ঢালা গানগুলিও তাল সহযোগে গাওয়ার রীতি প্রচলিত করা দরকার। তালহীনভাবে গান গাইলে একটি বিরাট ত্রুটী থেকে যায়। প্রথম কয়েকটি কথা প্রথম পংক্তির পর এবং স্থায়ী, অন্তরা ও আভোগের পর যখন বারে বারে ঘুরে আবৃত্তি করা হয় তখন তার মধ্যে "সোমে"র ব্যবস্থা না থাকলে গানটি মোটেই জমেনা, কেমন যেন এলোমেলো এবং খাপছাড়া বলে মনে হয়। তাই মনে হয় শিল্পীদের এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। তালের বন্ধন নেই বলে কোনো ছন্দ নেই বা তাল ছাড়াই গানগুলি গাওয়া উচিৎ—এমন মনে করা সঙ্গত নয়। এই ধরণের গানকে অনেকটা গদ্য কবিতার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। গদ্য কবিতার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। গদ্য কবিতায় ছন্দের যেমন সুনির্দিষ্ট নিয়ম বা বন্ধন না থাকলেও ভেতরে ভেতরে একটি ছন্দ তা, অনিয়মিতভাবে হলেও থেকে যায়, তেমনি এই জাতীয় গানেও যে ছন্দ থাকে তাকে আমরা

অস্বীকার করতে পারিনা। সুতরাং গানগুলি তাল সহযোগে গাওয়া যুক্তিযুক্ত, এবং তাল সহযোগে গীত হলে গানগুলির মাধুর্য আরো বৃদ্ধি পাবে।

পরিশেষে কবিগুরুর ধ্রুপদ ও খেয়াল গানগুলির গায়ন পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করতে ইচ্ছা পোষণ করি। গানের পরিপূর্ণ সার্থকতা শুধু সুর-সংযোজনার মধ্যে থাকেনা, গায়কীর ওপরও নির্ভরশীল। সুর ও গায়কীরসুন্দর সমন্বয়ে গানের সৌন্দর্য পরিস্ফুট হয়। রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন ধরণের গান রচনা করেছেন, ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, অন্যান্য উচ্চাঙ্গের গান, লঘুচালের গান, কীর্তন বাউল প্রভৃতি। শিল্পীদের কণ্ঠে প্রত্যেকটি গানের গীতি বৈশিষ্ট্য যাতে পরিস্ফুট হয় সেদিকে যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। অধিকাংশ সময় দেখা যায় ধ্রুপদই হোক, আর খেয়ালই হোক বা টপ্পাই হোক কিম্বা লঘুসঙ্গীত হোক সব গানই যেন একরম লাগে শিল্পীদের কণ্ঠে। প্রত্যেকটি গানের যে বিশেষ বিশেষ গায়কী আছে সেটি অনেকেই বিস্মৃত হন। তাঁরা ভাবেন ধ্রুপদকে ধ্রুপদের মত করে, খেয়ালকে খেয়ালের মত করে গাইলে রাবীন্দ্রিক ভাবটি চাপা পড়ে যাবে। কিন্তু কথা হচ্ছে যেটিকে রাবীন্দ্রিক ভাব বলা হচ্ছে সেটি কবিগুরুর লঘুসঙ্গীতের মধ্যে গড়ে ওঠা একটি বিশেষ শৈলী বা style এবং এই শৈলীটি বিভিন্ন শিল্পীদের মধ্যে রূপ লাভ করেছে। পূর্বে লঘুসঙ্গীতের চলন ছিল বেশী তাই লঘু-সঙ্গীতের বেশী চর্চার ফলে এর মধ্যে একটি style গড়ে ওঠে। এখন সেই style টিকে যদি বলা হয় সমগ্র রবীন্দ্রসঙ্গীতের মূলভাব তাহলে বোধকরি ভুল বলা হবে। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের উচ্চাঙ্গ গানের প্রচার ও অনুশীলন বর্তমানে বেড়েছে, সুতরাং আমাদের অতি সতর্কভাবে এবং বুঝেসুঝে ঐ গানের গায়কী প্রতিষ্ঠা করা দরকার। ধ্রুপদের একটি নিজস্ব ঢং আছে, খেয়ালেরও একটি নিজস্ব ঢং আছে। সেই ঢংটিকে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করে এবং বাণীর বিশুদ্ধতা পরিপূর্ণভাবে বজায় রেখে গানগুলি পরিবেশন করা দরকার। গান শুনে যেন মনে হয় ধ্রুপদ গান হচ্ছে, বা খেয়াল গান হচ্ছে বা টপ্পা গান হচ্ছে। তা নাহলে যতই বড় তালের গান হোক এবং ভাষা গুরুগম্ভীর হোক গায়কী ভুল হলে ধ্রুপদী ভাব নষ্ট হয়ে যাবে। খেয়ালের একটি বিশেষ চাল আছে, গানের মধ্যে সেই চালটি প্রকাশ না পেলে তা কখনই খেয়াল হবেনা ; বিশেষ করে খেয়ালের কথা ধ্রুপদের মত গুরুগম্ভীর নয় এবং গানগুলি অত ভারী তালের নয় সেক্ষেত্রে ঢং বা style টি বজায় না থাকলে লঘু সঙ্গীত বলে মনে হতে পারে। সুতরাং এ বিষয়ে শিল্পীদের মনো-যোগ দেওয়া কর্তব্য। এ সম্পর্কে আরো একটি কথা বলার প্রয়োজন আছে। খেয়াল বলতে শুধু চার লাইনের গানকেই বোঝায় না খেয়ালের মধ্যে আছে তান ও বিস্তার অর্থাৎ সুরের বিবিধ বিন্যাস। অমুক শিল্পী খেয়াল গান গেয়ে শোনালেন,

তার মানে এই নয় যে তিনি শুধু চার লাইনের গান শোনালেন। তাঁকে চার লাইন গানের অতিরিক্ত আরো কিছু করতে হয়েছে। সেই আরো কিছু করার প্রয়োজন আছে রবীন্দ্রনাথের খেয়াল গানে। তবে একথা বলিনা অনেক কিছু করতে গিয়ে গানের ভাব নষ্ট করা হোক্ বা কথার সৌন্দর্য নষ্ট করা হোক্। যতটুকু না করলে খেয়ালের খাঁটি রূপটি পরিস্ফুট হয়না ততটুকু করা একান্তই প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের গান কথার দাম যে আছে তা সবাই মানেন কিন্তু সে কথার ভাব বজায় রেখে যদি নাতিদীর্ঘ সুর বিস্তার করা যায় এবং তানের প্রয়োগ করা যায় তাতে ক্ষতি কি? বরং তাতে খেয়ালের মৌলিক রূপটি আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। আজকাল যেমন রাগপ্রধান সঙ্গীতে ছোট-খাট বিস্তার ও তান করা হয় এবং সেই বিস্তার ও তান কথার শুদ্ধতা বজায় রেখেই করা হয় আর তাতে গানটি আরো অনেক সুন্দর হয়ে ওঠে। স্বর্গতা ইন্দিরা দেবী তান প্রয়োগের পক্ষপাতী ছিলেন। "গল্পভারতী"তে একবার এ নিয়ে অনেকদিন ধরে আলোচনা চলে, সেসময় ইন্দিরাদেবী তানপ্রয়োগের পক্ষে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন। আমার পিতা সঙ্গীতাচার্য সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণীর একটি ঘরোয়া আলোচনা হয়। ইন্দিরা দেবী-চৌধুরাণী বলেন কথা ছাড়াও সুরের যখন একটি বিশেষ আবেদন আছে তখন তাকে উপেক্ষা করা শিল্পীমনের পরিচায়ক নয়। সুতরাং তানের প্রয়োগতা যদি সুন্দর হয় তাহলে তা করাই যুক্তিযুক্ত। তিনি বলেন রবীন্দ্রনাথ গোঁসাইজীর গান (রাধিকা প্রসাদ গোস্বামী) শুনতে বড় ভালবাসতেন। তাঁর কণ্ঠে "স্বপন যদি ভাঙ্গিলে" এবং "বিমল আনন্দে জাগরে" এই গান দুখানি রেকর্ডে বেরুনোর পর রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই বাজিয়ে বাজিয়ে শুনতেন। গান দুখানি সম্পূর্ণ খেয়ালের চালে গাওয়া এবং তানের প্রয়োগও আছে এর মধ্যে—কিন্তু তার জন্যে রবীন্দ্র-নাথ কখনও বলেননি রাধিকা গোস্বামী তাঁর গানে steam roller চালিয়েছেন উপরন্তু গান দুখানি তাঁর কাছে একান্ত প্রিয় হয়ে উঠেছিল।

সুতরাং এক একটি গানের যে বিশেষ বিশেষ গায়ন পদ্ধতি ও রীতি প্রচলিত আছে সেগুলিকে যথাসম্ভব আয়ত্ত করলে গানগুলির সার্থক রূপায়ণ সম্ভব হয়। রবীন্দ্রনাথ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত অবলম্বনে বহু গান রচনা করেছেন এবং সে গানগুলির সুন্দর পরিবেশন নির্ভর করেছে ভবিষ্যৎ শিল্পীদের ওপর।

বর্তমান যুগের বিশিষ্ট সঙ্গীতবিদ্ শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যিনি উচ্চাঙ্গ রবীন্দ্র সঙ্গীতকে জনপ্রিয় করতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন তাঁর গায়কীর মধ্যেও এই উদার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। ধ্রুপদ ও খেয়ালের রীতি বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুরণে এবং খেয়ালে সীমায়িত সুর বিন্যাস ও তান প্রয়োগের তিনি একান্ত পক্ষপাতী।

রম্য রচনা ও রবীন্দ্রনাথ

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

জীবনে লঘু-গুরুর পার্থক্য যেমন স্বীকার করা হয়, সাহিত্যেও অনেকটা তাই করা হয়। লঘু সাহিত্য বলতে সচরাচর আমরা বুঝি সাহিত্যের এমন কয়েকটি অঙ্গ বা বিষয়—যার মধ্যে ভাবনার খোরাক নেই অথবা থাকলেও খুব কম। পড়বার সময় একটা প্রীতিকর অনুভূতি পাওয়া যায় মাত্র কিন্তু পাঠান্তে মনের ওপর তেমন কোনও দাগ পড়েনা। কিছু-কিছু গল্প উপন্যাস এবং যাকে বলা যায় চুট্‌কি লেখা—এই পর্যায়ে পড়ে বটে। তাদের মধ্যে চিন্তা-বস্তু, শিক্ষণীয় বিষয় বিশেষ কিছু নেই। কিন্তু যা মনকে ভাবিয়ে তোলে, হৃদয়কে নাড়া দেয়, সাময়িক আবেদনের অতিরিক্ত একটা প্রভাব রেখে যায়, তা লঘু সাহিত্য নয়। প্রকৃত সাহিত্য-লক্ষণাক্রান্ত ও সাহিত্য-গুণ-বিশিষ্ট রচনা—এই হল প্রচলিত ও স্বীকৃত ধারণা।

প্রবন্ধের বেলাতেও এই ধরণের প্রভেদ মেনে নেওয়া হয়। প্রবন্ধ-সাহিত্য হ'ল সেই শ্রেণীর সাহিত্য যার মধ্যে শুধু স্তর-বিভাগই নেই, আছে রসভেদ। অর্থাৎ একটি বিষয়গত, অপরটি হৃদয়গত রসের আস্বাদ। তাই প্রবন্ধ বা নিবন্ধ হতে পারে তত্ত্বপ্রধান আবার রসপ্রধান। যেখানে তথ্যকে বহন করা, ব্যাখ্যা করাই মূল উদ্দেশ্য, সেখানে প্রবন্ধ হয়ে ওঠে যুক্তিবাদী মননশীল তথ্যসাহিত্য। তবে তথ্যমূলক প্রবন্ধকেও অকারণ পাণ্ডিত্যে কণ্টকিত না ক'রে সুপাঠ্য ও সরস করা যায়, যদি থাকে সামঞ্জস্য-বোধ, ভাব ও ভাষার প্রসাদ। আর যে প্রবন্ধ শুধুই সংবাদ পরিবেশন করে না, নিজস্ব আবেগ ও সরসতায় অপর হৃদয়কে সংক্রামিত করে, পাঠকচিত্তের সঙ্গে একটি সূক্ষ্ম-গভীর বন্ধন স্থাপনা করে, সেটাই হল রস-প্রবন্ধ। এ জাতীয় রচনাকে ব্যক্তিগত প্রবন্ধ, লঘু প্রবন্ধ বলা হয়ে থাকে। লঘু প্রবন্ধ মানেই 'চিন্তালেশ-হীন' খানিকটা তরল বাচালতা নয়। তার মধ্যেও অনেক কিছু ভাবনার বিষয় এবং ভালো জিনিস থাকতে পারে এবং থাকেও। ওর বহিরঙ্গ অর্থাৎ চালটাই লঘু; বিষয়বস্তুর গুরুত্ব নেই—এ কথা বলা চলে না। বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথ ব্যঙ্গ-কৌতুকের হাল্কা ভঙ্গীতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই আলোচনা করেছেন রস-সাহিত্যের এই মাধ্যমে। ফলে রস-চেতনার ভিতর দিয়ে চিন্তনীয় বস্তু আরও সহজ ও পরিষ্কার রূপ নিতে পেরেছে।

একে এক রকম সাহিত্যিক স্বগতোক্তি বা ছাপা অক্ষরে নিভৃত সামাজিক আলাপ বলা চলে। এর মধ্যে আছে মনের ও কল্পনার অন্বয়। এর জন্য চাই

এমন একটি ভাষা ও মেজাজ, যার ঘটকতায় নিজের কথা ও ভাবনা অপরের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়। যা থেকে সমাজের সূত্রপাত, তাই থেকেই সাহিত্যের সৃষ্টি। প্রয়োজন-সাহিত্যের মারফৎ সাহিত্যের একরকম বিবর্তন, কল্পনা-সাহিত্যের মাধ্যমে আর এক ধরণের রস-সাহিত্যের বিকাশ। যেখানে মনের অন্বয়, সেখানে সাহিত্য হল প্রণয়জ সৃষ্টি। বিশেষ করে রস-সাহিত্য। অতএব লঘু প্রবন্ধ যদি সেই রস গ্রহণ ও বিতরণ করে, তা হলে প্রবন্ধ হিসাবে তা সার্থক। তার সাহিত্যিক অস্তিত্বও অনস্বীকার্য্য।

বর্তমানে এই জাতীয় সাহিত্যকে 'রম্যরচনা' নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। বাক্যটি অনেক রসিক পাঠকের মনঃপূত নয়। যেন এ রচনার একমাত্র গুণ রম্যতা, অথবা ঐ একটি গুণেই অন্যান্য সাহিত্য-রচনা থেকে স্বতন্ত্র ও ভিন্ন-ধর্মী। সাহিত্য অর্থাৎ সাহিত্যপদবাচ্য রচনা মাত্রেই রম্য। যে রচনায় রমণীয়তার চিহ্ন নেই তা কোনো দিনই প্রকৃত সাহিত্য বলে গ্রাহ্য হয় নি। আবার খুব হাল আমলে যে ধরনের হাল্কা পাঁচমিশেলি ছিবলেমিতে পরিপূর্ণ লেখা বাজারে চালু হয়েছে, তাকে রম্য রচনা বলে চিহ্নিত করা হলেও, তা প্রকৃত পক্ষে রম্য নয়। Belles Lettres বাক্যটির যে প্রতিশব্দ এখন ব্যবহার করা হয়, তার প্রকৃত অর্থ এবং উৎকৃষ্ট নমুনা বিদেশী সাহিত্যে প্রচুর আছে। এক কালে Every man's Library সিরিজে Belles Lettres বলে একটি স্বতন্ত্র বিভাগে যে সব রচনা প্রকাশিত হত, তা উঁচু দরের সাহিত্য ছিল—যেমন ড্রাইডেনের বলিষ্ঠ গদ্য রচনা, হ্যাজলিট কোলরিজ ল্যাম ডি কুইন্সি প্রভৃতি বড় লেখকদের সমালোচনা প্রবন্ধ ডায়েরি ইত্যাদি। এ সব রচনায় মননের যথেষ্ট পরিচয় আবার প্রকাশ-ভঙ্গিমায় রস-সঞ্চার, কোনোটারই অভাব নেই। অতএব রম্য রচনার যে অর্থ বাংলা সাহিত্যের প্রকাশনায় আজকাল প্রচলিত হয়েছে, তার বাজার-চাহিদা যে কারণেই হোক ক্রম-বর্ধমান হলেও, স্থায়ী সাহিত্যিক মূল্য তার খুবই কম।

সে যাই হোক্, লঘু প্রবন্ধের মর্মে একটি সঙ্গীত-ধর্ম রয়েছে। তা নানাভাবে ও ভঙ্গীতে রস পরিবেশন করে তৃপ্তি দিতে পারে। তাই লঘু প্রবন্ধের জন্য একটা নিখুঁত মাপকাঠি তৈরী করা, তার প্রকাশ-পদ্ধতির মধ্যে বিশেষ কোনও রীতিবদ্ধ নীতিসূত্র সন্ধান করা সঙ্গত হবে না। কেননা, সাহিত্যের এই অঙ্গটিকে একটা নির্দিষ্ট 'ফর্মুলা'র মধ্যে বেঁধে ফেলা চলে না। রসান্বিত এক লঘু ব্যঞ্জনাময় রচনা কখন ও কি ভাবে সাহিত্য-ধর্মে রূপায়িত হচ্ছে, তা ঠিক দেখানো যায় না। উভয়ের অলক্ষিত সীমারেখা সুস্পষ্ট নয়।

তবে মোটের ওপর বলা চলে, কি থাকলে পড়া সার্থক হয়, মন ভরে ওঠে আর কিসের অভাবে অতৃপ্ত মন পীড়িত বোধ করে। যেমন বলা যেতে পারে;

রসনিবন্ধের মধ্যে একটা ভাবের পরম্পরা, একটা যুক্তির শৃঙ্খলা থাকবে, তা সে সমর্থনযোগ্য বাস্তবই হোক অথবা কাল্পনিক মনগড়াই হোক। ভাবনা যতই বিস্তৃত, প্রক্ষিপ্ত বা সঞ্চারী হোক, সকল কথার পিছনে যেন একটা মূল ধারা থাকে। এই সব প্রবন্ধ তত্ত্বসর্বস্ব হয় না। শুধু নানামুখী চিন্তার সূক্ষ্ম জাল-বুননের ভিতর থেকে দেখা যায় লেখক-মনের প্রসন্ন নির্মুক্তি। স্মৃতি-রসের বিন্যাসে, প্রয়োজন ও প্রসঙ্গ অনুযায়ী লঘু-গুরু ভাষার যথাযথ ব্যবহারে ধরা যায় জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা ও মমত্ব। থাকে নিজেকে প্রকাশ করবার দায়িত্ব সম্পন্ন ইচ্ছা আর অনতিরঞ্জিত শিল্প-কৌশলের সুপ্রয়োগ। এক কথায় উপলব্ধির ব্যক্তিত্বধর্মী প্রকাশ। তবে এ ধরণের রচনায় লেখকের অবাধ স্বাধীনতা আছে, এ ধারণা ভুল। যেখানে আতিশয্য ও পুনরুক্তির যথেষ্ট আশঙ্কা ও সম্ভাবনা, সেখানে সংযত না হলে তাল কেটে যায়। মনে হয় রগিকতা দীপ্তিহীন, বক্তব্য কষ্ট-কল্পিত। অভিজ্ঞতা উপলব্ধি যখন নিঃশেষিত-প্রায়, প্রিয়বচন তখন ক্লান্তিকর বাগ্‌বাহুল্য। 'আমিত্বে'র খোঁচা যেখানে উগ্র, সেখানে আত্মপ্রকাশ আত্মম্ভরিতার নামান্তর। তখনই রস-জ্ঞানের সমাধি। কোনও কোনও ক্ষেত্রে বেশি অন্তরঙ্গ বাক্যপ্রয়োগে গ্রাম্যতা বা স্থূলতার স্পর্শ এসে যেতে পারে। লেখকের একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থাকা দরকার এবং সে দৃষ্টি কিছুটা তির্যক হলে পাঠকের কৌতুক আরও জেগে ওঠে। কিন্তু অতি-বিরূপ বিদ্রূপ সুরুচির পরিচয় নয়, আর চোখ সর্বদাই বাঁকা হয়ে থাকলে, সেটা আর সরস কটাক্ষ নয়, কটু দৃষ্টি। কথার খেলা ও শাণিত দীপ্তি রচনার ধার আনে, এ কথা ঠিক। কিন্তু বীরবলী ঢঙকে অনুকরণ করে যদি শুধুই কথায় পালিশ দেওয়া যায়, তা হলে সেটা চপল মুদ্রাদোষ ছাড়া আর কিছুই নয়।

লঘু প্রবন্ধের এই চরিত্র-বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে, কেননা এ সম্পর্কে সাধারণ ধারণা কেমন যেন ধোঁয়াটে। এই জাতীয় প্রবন্ধে যা খুশি তাই বলা যায়, অনেক কিছুই ঢুকিয়ে দেওয়া চলে, এই রকম একটা বিশ্বাস জন্মেছে। এ বিশ্বাসের হেতুটা কি? বোধ হয় এই। যে বিশিষ্ট অর্থে রম্যরচনা শব্দটি ব্যবহার করছি আজকাল, তা গল্প উপন্যাস, কবিতা নিবন্ধ নয় অথচ সকলেরই কিছু কিছু রস এর মধ্যে সিঞ্চিত আছে এবং মুখ্যতঃ এর উদ্দেশ্য হচ্ছে পাঠকের চিত্ত-বিনোদন। এ ধারণা আংশিক সত্য। কিন্তু গদ্যে লেখা বলেই লেখাটা খুব সহজ জগাখিচুড়ি নয়। এর মধ্যে কাব্যের আবেগ, তত্ত্বের ভাবুকতা থাকতে পারে। কাহিনী না থাকলেও গল্পের গতি বা আকর্ষণ থাকতে কোনও বাধা নেই। যুক্তি-প্রমাণের বাহুল্য নেই অথচ পাঠকের বুদ্ধি-চেতনাকে চমকিত জাগ্রত করতে পারে। তা হলে দেখা যাচ্ছে সাহিত্য-কর্মের বিভিন্ন রূপগুলির কোনও না কোনও বৈশিষ্ট্য এর মধ্যে বর্তমান।

লঘু প্রবন্ধের মধ্যে একটা ব্যক্তিগত সুর আছে, এমন কি বলা যায়, ব্যক্তিগত সুরই হল তার ভিত্তি। গদ্যে রস-রচনার সগোত্র বলেই ব্যক্তিগত প্রবন্ধ, ইংরেজিতে যাকে 'ফেমিলিয়র' বা 'পার্সোনাল' প্রবন্ধ বলে থাকি, একটি অন্তরঙ্গতার আমেজ আনে। কখনো ঘরোয়া, কখনো বৈঠকী, কখনো নিজের মনের সঙ্গেই আলাপ। এর মধ্যে লেখক হয় দু চারটি তীক্ষ্ণ সংহত মন্তব্য করে ভাব থেকে ভাবান্তরে চলে যান। তখন লেখক—পাঠকের মধ্যে সূক্ষ্ম সহ-যোগিতা শুরু হয়, শেষ হয় উষ্ণ কর-মর্দনে। আবার কখনও বা কথকতার চাল। লেখক একটি তুচ্ছ বা নিতান্ত সাধারণ বিষয় অবলম্বন করে কথা বলতে বলতে পাঠকের সঙ্গে একই পথে এগিয়ে চলেন। আর পাঠকও কখনও বিস্মৃত, কখনও পুলকিত, কখনও হাস্যরসে উচ্ছল, কখনও বা বেদনাবোধে গম্ভীর হয়ে লেখকের সঙ্গে পা ফেলে চলেন। লঘু প্রবন্ধের এই দু-রকম স্টাইল বা প্রকাশ-ভঙ্গী থাকতে পারে। কিন্তু যে রকমই লেখার রীতি হোক না কেন, একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য মিলবে। সেটা হল সহজ সাবলীল গতি, ইংরেজিতে থাকে বলা যায় 'রিদ্‌ম্'। এবং সে গতির মৃদু ছন্দ সৃষ্টি হয় মনের আনন্দ-বৃত্তি, সুকুমার সমবেদনা কার লঘু কৌতুক থেকে।

লঘু বা রস--প্রবন্ধের প্রাণ হল 'মূড', যার কাছাকাছি প্রতিশব্দ হল মেজাজ, আমেজ। এই মেজাজ বা আমেজের জারক রসে উজ্জীবিত হয়েই আলোচনা পরিণত হয় সৃষ্টিধর্মী জল্পনায়। শুধু প্রবন্ধের যে আলোচনা, তা বিষয় বস্তুর মধ্যেই আবদ্ধ, নিবদ্ধ। কিন্তু পার্সোনাল রচনায় সে আলোচনা, তা বক্তব্যকে এক নিপুণ কলাকৌশলে, মনের ও হৃদয়ের উজ্জ্বল স্পর্শে সুরসিত করে' উপ-স্থাপিত করে।· এ হল লেখকের নিজস্ব মনের রূপ, ভাবনার সম্পদ্। এ রচনায় কথা আছে, কথার মানে আছে, গঠন আছে, বলার ভঙ্গী আছে। কিন্তু বাক্য অর্থ ভঙ্গী রূপ সব কিছুর ওপরে যেটা প্রকাশ পাচ্ছে, সেটা হল লেখকের ব্যক্তি-সত্তা। সেই সত্তার রূপটি পাঠক দেখতে পায়, আপনার আত্মায় তার স্পর্শ পায় বলেই, পাঠকের কাছে লঘু রসপ্রবন্ধের বিশেষ আকর্ষণ। সাহিত্যের আসরে তার একটি নিজস্ব আসন স্বীকৃত হয়েছে, এই আকর্ষণের জোরেই।

যে 'মূড' বা মেজাজের আওতায় এই সব খেয়ালী রচনার জন্ম হয়, সেই খেয়ালকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে চাই রসবোধ এবং জীবনের উপভোগ। মুখ ভারী করে এ রসরচনা লেখা যায় না, পড়লেও আনন্দ পাওয়া যায় না। কোনও তথ্যকে প্রতিপন্ন করার জন্য লেখক এখানে ব্যগ্র নন। তিনি শুধু ব্যক্তিগত ভাবনা-জল্পনাকে মনের মতন সাজিয়ে পাঠকের সামনে তুলে ধরছেন। সেই পরিবেশনই তাঁর দৃষ্টি, রসজ্ঞান, সহানুভূতি, সৃষ্টির আনন্দ এবং কৃতিত্ব। এক কথায় তাঁর ব্যক্তিত্বের উন্মোচন। তাঁর লেখায় তেমন কোনও উদ্দেশ্য নেই,

জুলুম তো নেই-ই। লঘু-সঞ্চারী শারদ মেঘের মতই তাঁর চিন্তা ক্ষণে ক্ষণে রূপ ও রঙ বদলায় এবং তার প্রতিচ্ছবি ফেলে যায় পাঠকের মনের পটে।

'পালামৌর পর' রচনাটিতে সঞ্জীবচন্দ্র বোধ হয় এই কথাটিই বলে গেছেন :

"সচরাচর পটে কেবল রূপ অঙ্কিত হয়, কিন্তু যে পটের কথা বলিতেছি, তাহাতেও গন্ধ স্পর্শ সকলই থাকে। ইহা বুঝাইবার নহে........কোনো পটের বন্ধনী কি, তাহা নির্ণয় করা অতি কঠিন; যিনি তাহা করিতে পারেন, তিনি কবি। তিনিই কেবল একটি কথা বলিয়া পটের সকল অংশ দেখাইতে পারেন, রূপ গন্ধ স্পর্শ সকল অনুভব করাইতে পারেন........"

এই ক'টি লাইনে সঞ্জীবচন্দ্র রস-সাহিত্যের, তথা ব্যক্তিগত প্রবন্ধের, অন্তর-সুরটি অতি পরিচ্ছন্নভাবে প্রকাশ করেছেন। প্রবন্ধের সঙ্গে ব্যক্তিগত প্রবন্ধের আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে কিন্তু প্রকৃতিগত পার্থক্য অনেক। আবার কবিতার সঙ্গে আকারে তার অমিল, কিন্তু সুরে যথেষ্ট মিল। ব্যক্তিগত প্রবন্ধে একটা মূল বক্তব্য আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু বক্তব্যের চেয়ে বলার সানন্দ ভঙ্গীটাই যেন রসসৃষ্টি করে বেশি। শুধু প্রবন্ধে যুক্তি আর তথ্যকে সাজানোর চেষ্টাটাই বড় এবং আসল কথা। কিন্তু যে প্রবন্ধের আসল পরিচয় রসের প্রেরণা, সেখানে যুক্তি-সঙ্গতি কিছু বজায় রেখে লেখককে হালকা মেঘের মতই আলোর ছায়ায়, উদ্ভাসিত হাসিতে আকস্মিক বর্ষণে ভেসে যেতে হয়। লেখকের লেখার গতি আর পাঠকের মনের গতি সেখানে এক হয়, পরস্পরের সরস স্পর্শ তখন ব্যক্তিগত প্রবন্ধকে সার্থক করে তোলে। কেননা, নিজের মনকে অবাধ-মুক্ত করার চমৎকার পথ হচ্ছে ঐ রসপ্রবন্ধ। সেই পথে, চলতি মানুষ, ক্ষণিকের দৃশ্য, ভেসে-আসা ভাবনা, একটি বড় সত্যের একটু আভাস, বহু-বিচিত্র জীবনের কয়েকটি অভিজ্ঞতা—সব কিছুই এসে পড়ে।

অবশ্য কবিতা, নাটক, প্রবন্ধের যে অভিজাত ঐতিহ্য, লঘু প্রবন্ধের তা নেই। সে দিক থেকে ব্যক্তিগত প্রবন্ধ হয়তো একটু প্লীবিয়ান। কিছুকাল আগে সে ছিল দুঃস্থা অন্তঃপুরিকা। কিন্তু ঐতিহ্য বড় না হলেও, এর ঐশ্বর্য কম নয়। বিষয়বস্তুর এত বৈচিত্র্য সাহিত্যের অন্য কোনও ফর্মে বোধ হয় পাওয়া যাবে না। এবং সেই সঙ্গে প্রকাশের ভঙ্গিমাও। বহুরূপীর মতই 'ব্যক্তিক' প্রবন্ধ রঙ বদলায়। কখনো বা সারবান বা তার সামিল, কখনো প্রায়—নিখুঁত ছোট গল্পের রেখাচিত্র। কখনো তা আত্মজীবনীর একটি টুক্‌রো, কখনো নির্জন অন্তরঙ্গ আলাপ, কখনো বা লীলায়িত শুদ্ধ প্রলাপ। কোনও রচনায় শাণিত ব্যঙ্গ এবং বক্রোক্তি, কোথাও বা মৃদু বিলাপের, লঘু কৌতুকের কোমল উত্তাপ। এর বিষয়-বস্তু যা খুশি তাই হতে পারে—ভগবান থেকে লাটিম, বিশ্বসৃষ্টি থেকে দেশলাই ধার করা, অভিসার থেকে নিদ্রাহীনতা, বাড়ীর

উঠোন, লোহার সিন্দুক থেকে চৌবাচ্চা, শোবার ঘর আর গোরুর গাড়ী ; ক্লাইব স্ট্রীট, হাটবাজার থেকে খোকার খেলনা আর মধুমালার দেশ ; মুখ-চেনা থেকে পর-নিন্দা ; ভ্রমণ কাহিনীর ভূমিকা থেকে দেশী-বিদেশী শহরের কথা—কিছুই বাদ যায় না।

বস্তুতঃ পৃথিবীতে এমন কোনও খাঁটি ও নকল জিনিস নেই, যাকে লেখক তাঁর রচনার উপজীব্য হিসাবে ব্যবহার করতে না পারেন। জীবনের তুচ্ছাতি-তুচ্ছ ঘটনা, চকিতে দেখা একটা নগণ্য খণ্ডচিত্র, একটি বিরল মুহূর্তের খাম-খেয়াল এ জাতীয় সাহিত্যের খোরাক হতে বাধা পায় না।

এই প্রসঙ্গে লঘু প্রবন্ধে রস-সৃষ্টির কয়েকটি অন্তরায় উল্লেখ করা দরকার। প্রথমতঃ, এখানে জোর করে হাসানো বা চমক-লাগানোর রীতি মানায় না। একটা কথা বলতে হবে বলেই, তাকে প্রাণপণে ভালো করে বলতে গিয়ে শ্লেষে আর মোচড়ে গলদ্‌ঘর্ম হয়ে ওঠা আর্টের পরিচয় নয়। তেমনি আবার একটা সূক্ষ্ম মন্তব্যকে টেনে বুনে সাজাতে গেলে, সেটা হয় শুধুই আলোচনা। তাতে বক্তব্যটা বিশদ বা পরিস্ফুট হয় বটে, কিন্তু রসের অপমৃত্যু ঘটে। ব্যক্তিক প্রবন্ধে একটা মোটা কথা অবশ্যই থাকে, কিন্তু কণ্টকিত থীসিস নেই। পারম্পর্য থাকুক্, কিন্তু অকাট্য যুক্তির ধারাবাহিকতার প্রয়োজন নেই। কারণ চেষ্টাকৃত ফল লাভের ইচ্ছাটা বলিষ্ঠ হয়ে উঠলে রচনার সাবলীলতা নষ্ট হয়ে যায়। বক্তব্য আর বলার ভঙ্গী—এ দুয়ের শুভ মিলনই রসপ্রবন্ধের সার্থকতা। বলার ধরণটা অনাবশ্যক রকমের উগ্র হলে স্পর্শকাতর পাঠকের মনে বিরক্তি আসা স্বাভাবিক। তেমনি একই কথাকে অকারণ টেনে যাওয়াও নিরর্থক। বলার ভঙ্গী বেশি মাত্রায় উগ্র হলে সেটা বোঝায় লেখকের স্পর্ধা ও অভিমান।

দ্বিতীয়তঃ, ব্যক্তিগত প্রবন্ধে ব্যক্তিত্বেরই বিকাশ ও প্রকাশ, কিন্তু স্থূল প্রকাশ নয়। এখানে পাঠক এসেছে দুদণ্ড মুখোমুখি সহজ আলাপের আশায়, লেখকের হুম্‌কি বা বুদ্ধির কসরতের পরিচয় পেতে আসেনি। তাই 'ব্যক্তিক' প্রবন্ধ ব্যক্তিগত হয়েও নিতান্ত ব্যক্তিগত হওয়া মানায় না। লেখকের ব্যক্তিত্ব থাকবে খানিকটা প্রচ্ছন্ন নায়িকার মতন যার শারীরিক উপস্থিতি আমরা আভাসে টের পাই কিংবা কোনও এক গভীর অন্তরঙ্গ মুহূর্তে সহসা উদ্‌ঘাটিত হতে দেখি। আর্টকে মুখর করে তোলা এ জাতীয় প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। অভিজ্ঞতার কূজনে, সঞ্চারী দৃষ্টির বৈচিত্র্য-গানে আর্টিস্টের মনের প্রকাশই তার মুখ্য ধর্ম। তৃতীয়তঃ, লঘুতার ধর্মই হল ছন্দোপতনের ভয়। এ সব প্রবন্ধে সামঞ্জস্য জ্ঞান—যার আর এক নাম 'সেন্স অব্ হিউমার'—না থাকলে লঘুত্বের মনোহারিত্ব, মিষ্ট স্পর্শটুকু উড়ে যায়। লেখকের মাত্রাজ্ঞান থাকা দরকার, তিনি জানবেন কোথায় ভারসাম্যের ব্যাঘাত ঘটছে, কোথায় থামতে হবে। অবান্তর কথা—

যাকে বলা হয় ধান ভানতে শিবের গীত, আর উগ্র আত্ম-বিজ্ঞাপন এ দুটো জিনিস না থাকলেই রসপ্রবন্ধ জমে ভালো।

বলা বাহুল্য, লঘু প্রবন্ধের স্বরূপ বর্ণনায় বাংলা সাহিত্যে তার স্থান ও চরিত্রের কথা আমরা ভুলিনি। ইংরেজিতে আর বাংলা সাহিত্যে লঘু প্রবন্ধের আদর্শ বা উদ্দেশ্য এমন কিছু পৃথক নয়। আঠারো উনিশ শতকে ইংরেজি সাহিত্যে ডায়েরি, স্মৃতিচিত্র, ভ্রমণ চিত্র জাতীয় রচনার মধ্য দিয়ে লঘু প্রবন্ধ একটা বিশেষ রূপ নিয়েছিল। তারপর সাময়িক পত্রিকার মারফৎ তার দ্রুত বিকাশ, অবশেষে সাংবাদিকতার উর্ধ্বে সাহিত্যের বাতায়নপথে লঘুধর্মী রচনার মৃদু আলো এসে পড়ল বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় ঐ উনিশ শতকেই। তাই ঋণ স্বীকারের খাতিরে ইংরেজি সাহিত্যের নজির দেখানো অপ্রাসঙ্গিক হবে না। হলক্রফ্ট, হেডন, হ্যাজলিট—প্রমুখ লেখকদের পর ল্যাম্ব-এর অননুকরণীয় প্রতিভা লঘু প্রবন্ধের মধ্যে আপনার সার্থকতা খুঁজে পেল। তিনিই সর্বপ্রথম খেয়ালী রচনাকে ইংরেজি সাহিত্যে জাতে তুললেন, তাকে এমন একটি নূতন রূপসজ্জা দিলেন যার জৌলুস আজও কমেনি। তারপর এলেন ল্যে হাণ্ট, স্টীভনসন। বিংশ শতকে আরো অনেক সাহিত্যিক এই নতুন ফর্মেরদিকে ঝুঁকলেন এবং লঘু প্রবন্ধকে নানা ভাবে রসোত্তীর্ণ করলেন। চেষ্ট্যরটন ও বেলক, ল্যুকস ও বীয়রবম, গার্ডিনার ও জেরোম কে জেরোম, রবার্ট লিন্ড ও প্রিস্টলি—এদের হাতে 'ব্যক্তিক' প্রবন্ধ উঠল আর্টের পর্যায়ে। মোট কথা, ব্যক্তিগত প্রবন্ধ হয়ে উঠেছে ইংরেজি সাহিত্যের একটি পরিপুষ্ট পাখা। সেখানে বিভিন্ন লেখকের ভিন্নমুখী প্রতিভা সাহিত্যের এই 'সিণ্ডারেলা' কে ভাব-সম্পদে কলাকৌশলে সুসমৃদ্ধ করেছে।

বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র থেকেই ব্যক্তিগত লঘু প্রবন্ধের পুরোপুরি আত্মপ্রকাশ। অবশ্য এর সূচনা আরও আগে। কালীপ্রসন্ন সিংহের 'দুর্গোৎসব' প্রস্তাবে লঘু নিবন্ধের আভাস পাওয়া যায়। আর বিদ্যাসাগরও যে সব্যসাচীর মতন গুরুগম্ভীর রচনা ছাড়া লঘু রসরচনায় হাত দিয়েছিলেন, তার প্রমাণ 'ব্রজবিলাস'-এর বিজ্ঞাপন। এ রচনাটির সুর লঘু প্রবন্ধেরই সুর। সঞ্জীব-চন্দ্রের কলমে যে সরস রম্যতা ছিল, তার কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। যে সৌখীন মন ও খেয়াল থাকলে প্রকৃত রম্যরচনার সৃষ্টি সম্ভব হয়, সঞ্জীব চন্দ্রের তা ছিল। তাঁর সমকালীন লেখকরা, এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও সে কথা স্বীকার করেছেন। সযত্ন প্রয়োগ ও উদ্যমী নিষ্ঠা থাকলে, তিনি বাংলা সাহিত্যে অনেক কিছুই দিয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু তাঁর চাকরি-জীবনের মতই সাহিত্যিক জীবনও অকালে ফুরিয়ে যায়। নইলে 'পালামৌ'র মতন সুন্দর কুশলী রচনার পরও আমরা কিছু পেতুম।

তারপর বঙ্কিমের লেখনীতেই পরিস্ফুট হ'ল ব্যক্তিগত প্রবন্ধ ও রসরচনার প্রথম অভিনয় রূপ। স্টাইলের দিক থেকে বিচার করলে বলতে হয়, বঙ্কিমের হাতে এ জাতীয় রস-পরিবেশনের রীতি প্রায় ত্রুটিহীন। এবং হাস্য ও কৌতুক-জ্ঞানের অতি উজ্জ্বল নিদর্শন হ'ল 'কমলাকান্তের দপ্তর'। বঙ্কিমচন্দ্রের মতন প্রবল ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন, সংযত লেখকই এমন এক বাউণ্ডুলে, বিজ্ঞ আফিংখোর চরিত্র সৃষ্টি করতে পারেন। অবশ্য কমলাকান্তের মুখ দিয়েই বঙ্কিমের সচেতন মনের কথা প্রকাশ পেয়েছে, সমাজ ও জীবন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা ও সমালোচনা হাসি ও বিলাপের রসে সিক্ত হয়ে ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু 'কমলাকান্তের দপ্তর' ছদ্মবেশী রচনা হলেও, একে ব্যক্তিগত প্রবন্ধচিত্রের একটি সূত্রবদ্ধ সমষ্টি বলতে আপত্তি নেই। মনে হয় বাংলা সাহিত্যে কমলাকান্তের দপ্তরের মতন সুখ-দুঃখ ও লঘু-গুরু মেশানো এমন বিচিত্র রসোৎসারী রম্য রচনা নেই বললেই হয়। 'আমার দুর্গোৎসব', 'একা', 'বুড়া বয়সের কথা'—এ গুলি যে কোনও রস-রস-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নমুনা বলে স্বীকৃতি পাওয়ার যোগ্য। এ ছাড়া 'লোক-রহস্য', বিশেষ করে 'বাবু'র মতন কয়েকটি প্রবন্ধ তো পুরোপুরি রম্য রচনা।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথও একদা এই ধরনের লেখায় হাত পাকিয়েছেন। 'সোনায় সোহাগা' আর 'মুখ-চেনা', এ দুটি নিবন্ধই তার এ দুটি নিবন্ধই তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। তবে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশায়ের 'তৈল' প্রবন্ধটি ছাড়া উল্লেখযোগ্য রচনা তেমন বেশি নজরে পড়েনা ,এই যুগে। ইন্দ্রনাথ বা 'পঞ্চানন্দ' রসিক ও রহস্যপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন, নিঃসন্দেহ। কিন্তু রক্ষণশীল সমাজের মুখপাত্র হতে গিয়ে তাঁর রচনা অনেক স্থলেই উপদেশ ও উদ্দেশ্যমূলক। তবু মধ্যে মধ্যে তাঁর রঙ্গরস তৃপ্তির স্পর্শ এনে দেয়—যেমন এই উক্তিতে,

"স্ত্রীলোক চেতন নহে, অচেতন নহে, উদ্ভিদ নহে, তিন প্রকারের পদার্থের কোন পদার্থই নহে। স্ত্রীলোক, অপদার্থ।"

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর রচনা-ভঙ্গী অবশ্য বঙ্কিমানুসারী কিন্তু তাঁর লেখার একটি নিজস্ব প্রসাদগুণ আছে। 'কেল' প্রবন্ধটির মতন এমন সূচ্যগ্র অথচ রসার্দ্র আলোচনা আমাদের সাহিত্যে বড় বেশি নেই।

তারপর এলেন রবীন্দ্রনাথ। যেমন সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগে, তেমনই এ জাতীয় প্রবন্ধের বিপুল সম্ভাবনা তিনিই প্রথম দেখালেন এবং বহুলাংশে পূরণ করলেন। তাঁর হাতে প্রবন্ধ-সাহিত্য এত বিভিন্ন ও বিচিত্র রূপ পেয়েছে যে অল্প পরিসরে তার সন্তোষজনক আলোচনা সম্ভব নয়। তবু

ওরই মধ্যে তাঁর রচনার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে রম্য সাহিত্যের আদর্শ রূপনির্ণয় করা যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের লেখনীর গুণে লঘু প্রবন্ধ কখনও হয়েছে কবিত্বময় কথিকা-বিশেষ, কখনও একটি তুচ্ছ এবং আপাত-সামান্য বিষয়কে কেন্দ্র করে কল্পনার সঞ্চারী শোভা, কখনও বা চিন্তনীয় গুরু কথার অতি সরস বুদ্ধি-দীপ্ত বিশ্লেষণ। শেষোক্ত পর্যায়ের রচনা বোধ হয় Belles Lettres এর ত্রুটিবিরল উদাহরণ। এ ছাড়া, প্রাচীন সাহিত্য ও আধুনিক সাহিত্যের ওপর রবীন্দ্রনাথের যে সব আলোচনা, তাদের ইম্প্রেশ্যনিস্টিক সমালোচনা বলে সরিয়ে দিলে চলবে না। আমার নিজের ধারণা যে এগুলির জাত আলাদা এবং প্রকৃত ও প্রকৃষ্ট অর্থেই রম্য রচনা। যে রসদৃষ্টি থাকলে দেশ-কাল-পাত্রের ব্যবধান লঙ্ঘন করে' অপর সাহিত্যে অনুপ্রবেশ করা যায়, কাব্যপ্রাণ সহমর্মিতায় সেই সাহিত্যের বিষয়বস্তুকে অবলীলায় এমন ভাবে, এমন নতুন ব্যাখ্যানে প্রতিষ্ঠিত করা যায়—যাতে পাঠকের মন অভূতপূর্ব রসে সিক্ত স্নাত ও অভিষিক্ত হয়ে ওঠে, তা হলে সেই দৃষ্টিবান রুচিবান রচনাকে কেন উৎকৃষ্ট Belles Lettres বলা চলবে না, জানিনা। বিদেশী সাহিত্যে সমালোচনা-জাতীয় প্রবন্ধ-সাহিত্যকে 'রম্য-রচনা'র অন্তর্ভুক্ত করায় কোনও আপত্তি ওঠে নি।

রবীন্দ্রনাথের ঐ তিন শ্রেণীর রচনার মধ্যে প্রথমোক্ত রচনার সব চেয়ে ভালো নমুনা 'লিপিকা'। এর মধ্যে বহু গদ্য-কবিতার অঙ্কুর রয়েছে, পরবর্তী কালে কবি যা নিয়ে পরীক্ষার অন্ত রাখেন নি। কিন্তু মুক্ত-ছন্দ কবিতার পূর্বাভাস ছাড়াও এ জাতীয় রচনার আর একটি গুণ বা চরিত্র আছে, যাকে বলা যায় নিছক রম্যতা। 'মেঘদূত', 'পায়ে চলার পথ', 'বাঁশি' এবং বিশেষ করে 'সন্ধ্যা ও প্রভাত'—এই সব অনবদ্য-সুন্দর কথিকাদের কি আখ্যা দেওয়া যায়? বহিরঙ্গে গদ্য আর অন্তরঙ্গে লিরিক উর্ধ্বমুখীর কল্পনার চূড়ে বসে আছে নিটোল মুক্তার মতো। বিচ্ছুরিত কিন্তু সংহত জ্যোতিতে যে বিশিষ্ট রচনার অন্তিম শোভা, তাকে নিশ্চয়ই রম্য রচনার প্রথম শ্রেণীতে উপস্থাপিত করা যাবে।

দ্বিতীয় পর্যায়ের রচনার উদাহরণের জন্য পড়তে হবে 'লোকসাহিত্য' ও 'বিচিত্র প্রবন্ধ'। 'ছেলে ভুলানো ছড়া'র মতো রসায়িত প্রবন্ধ পড়াও একটা সৌভাগ্য। স্মৃতি এবং অনুষঙ্গ—এই দুটি জিনিসকে কল্পনার কৌতুকে ও অপরূপ চিত্রকল্পে যে ভাবে পরিবেশন করা হয়েছে, তাতে মনে হয়, কবি যদি তাঁর ব্যাখ্যা ও টীকার সঙ্গে ছবি সংযোজন করে দিতেন, তা হলে কি আশ্চর্য সম্পদ হতে পারত লোকসাহিত্যের এই লঘু নিবন্ধটি। এই

প্রসঙ্গে স্টীভনসন ও ডী লা মেয়্যর-এর এই জাতীয় রচনার কথা স্বতই মনে পড়ছে। ল্যাম্-এর ভাষায় একে বলা চলে ' perfect whimsy '।

'বিচিত্র প্রবন্ধে'র মধ্যে 'কেকাধ্বনি', 'পাগল' ও 'নববর্ষা'—এই প্রবন্ধ-গুলির রম্যতা যেমন এক ধরনের; 'মন', 'কৌতুকহাস্য' এবং 'কৌতুক-হাস্যের মাত্রা' তেমনি আর এক ধরনের রচনা। তবে প্রতিটি রচনাই নূতনত্বে মণ্ডিত ও সৃষ্টিধর্মী। তৃতীয় পর্যায়-ভুক্ত 'পঞ্চভূত' অনুচ্ছেদের এই প্রবন্ধ-গুলির তুলনা নেই। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ 'ছিন্নপত্র' ছাড়া অন্যত্র কোথাও এর চেয়ে রম্য রচনা আমাদের দিয়ে যান নি। বুদ্ধি ও ভাবনার সঞ্চয়কে কত অনায়াসে রম্য রীতিতে পরিবেশন করা যায়, একা 'পঞ্চভূত'ই তার জাজ্বল্য প্রমাণ। এই লঘু প্রবন্ধগুলিতে যে তত্ত্ব-বিচার ও যুক্তি আছে, তাকে বিশ্লেষণের শুষ্ক আকার না দিয়ে সরস কল্পনায় সঞ্জীবিত করা হয়েছে এমন এক মনোরম ভঙ্গীতে, যে পড়তে পড়তে মনে হয় বুদ্ধি আর কল্পনার এই সূক্ষ্ম ও রঙীন জাল-বুননকে কি বলব—weaving crochets of fancy? 'কেকাধ্বনি' ও 'নববর্ষা'র শেষ প্যারাগ্রাফ দুটি বারবার পড়লে বোঝা যাবে, শিল্পীর হাতে কল্পনার তুলি কি ভাবে রং লাগায়, ছবিকে পরিস্ফুট করে তোলে। আর 'কৌতুক' এবং 'কৌতুকহাস্যের মাত্রা' এই দুটি প্রবন্ধের শেষ পঙক্তি দুটি প্রমাণ করে, বিশ্লেষণ-ক্রিয়াটা কত সরস হতে পারে যদি মাত্রাজ্ঞান থাকে। এখানে হিউমার-সম্পর্কে কবির বক্তব্য অর্থাৎ নিয়মভঙ্গ-জনিত অনতিগভীর আঘাত এবং অসঙ্গতির বিশুদ্ধ নূতনত্বে কৌতুকের জন্ম—এ তত্ত্বটি যেমন খাঁটি, সেই বক্তব্যকে সাজানোর ভঙ্গিমাও তেমনি ঐ বিশুদ্ধ কৌতুকেরই অতি-মার্জিত অনুশীলন বললে অত্যুক্তি হবে না।

আমার মনে হয় যিনি সত্যিকারের কবি, একমাত্র তাঁরই হাতে গদ্য রচনা রম্য হয়ে ওঠে। কেননা তাঁরই হাতে কল্পনা ও খেয়াল, ইম্যাজিনেশ্যন ও ফ্যান্সি, দুটোই মূর্ত ও জীবন্ত হতে পারে। বিষয়কে অবলম্বন করে বিষয়ের ঊর্ধ্বে ওঠা, মায়াবী মনকে সৃজনের অবকাশ দেওয়া, নিরাশ্রয় ছিন্নবিচ্ছিন্ন প্রতিবিম্ব প্রতিধ্বনিগুলিকে এক বিচিত্র ভাবনার ঐক্যে রূপদান করা—এ সব কাজ কবি কিংবা অস্ফুট কবিই করতে পারেন। একটি বিশিষ্ট মুহূর্তে যেমন একটি ভাব বা 'মুডের' উৎপত্তি, একটি উৎকৃষ্ট খেয়ালী রচনার জন্ম-বৃত্তান্তও তেমনি অহেতুক ও আকস্মিক। তারপর কেমন করে প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে পৌঁছে মনের লঘু কলগুঞ্জন, অবচেতন মানসাকাশের স্বপ্নরেণুজাল—সব মিলে এক আশ্চর্য বর্ণময় ঘন মেঘ রচনা করে, সেই প্রত্যক্ষ প্রক্রিয়াটি লক্ষ্য করা যাবে 'সূর্যাস্ত', 'শীতের সকাল', 'গ্রাম্য সাহিত্য', 'শুকতারা', 'সন্ধ্যা', 'দার্জিলিঙ যাত্রা' প্রভৃতি 'ছিন্নপত্রে'র অপরূপ খণ্ডচিত্রগুলিতে।

কতো লঘু-গুরু রসনিষিক্ত গল্প-প্রবন্ধের বীজ ছড়ানো আছে ‘গ্রামের মেয়ে’ ‘পোষ্ট মাষ্টার’, ‘মেঘ ও রৌদ্র’ প্রভৃতি ছিন্নপত্রের টুক্‌রো ছবির মধ্যে’, রবীন্দ্র-সাহিত্য-রসিক পাঠক সে কথা ভালো করেই জানেন।

যে বিশেষ ‘মুডে’ একটি নিটোল চিত্রল গীতি-কবিতা লেখা যায়, অনেকটা সেই ধরণের খেয়ালী প্রেরণায় একটি ভালো লঘু প্রবন্ধ জন্মলাভ করে। প্রমাণ ‘মন’-নামক কৌতুক-কল্পনায় দ্যুতিমান রচনাটি। নিরতীত বিস্মৃতিময় জড়-নীরব প্রকৃতির পরমসহিষ্ণু সুখী অবস্থার কথা মনে করে কীটস্‌ যখন পরিবর্তনজনিত মানুষের গভীর, অপ্রকাশ্য মর্মবেদনা নিয়ে কবিতা লেখেন—

'In a drear-nighted December
Too happy happy tree !
Thy branches ne'er remember
Their green felicity.
. . . .
To know the change and feel it
When there's none to heal it,
Nor numbéd sense to steal it
Was never said in rhyme.'

রবীন্দ্রনাথ তখন সেই লিরিকের মূডেই অথচ বিপরীত কৌশলে আতা গাছের মধ্যে ‘এক ফোঁটা মন’ ফেলিয়া দিলে কি মজা হয়, তারই সরস মধুর চিত্র আঁকেন ‘পঞ্চভূতে’ :

“তবে চিন্তায় উহার চিক্কণ সবুজ পাতাগুলি ভূর্জ্জপত্রের মতো পাণ্ডুবর্ণ হইয়া উঠে এবং গুড়ি হইতে প্রশাখা পর্য্যন্ত বৃদ্ধের ললাটের মতো কুঞ্চিত হইয়া আসে........এই সমস্ত কাণ্ড। গেল বেচারার ফুল ফোটানো, রসশস্যপূর্ণ আতাফল পাকানো।......অবশেষে একদিন হঠাৎ অন্তর্বেদনায় গুঁড়ি হইতে অগ্রশাখা পর্য্যন্ত বিদীর্ণ হইয়া বাহির হয়, একটা সাময়িক পত্রের প্রবন্ধ, একটা সমালোচনা, অরণ্যসমাজ সম্বন্ধে একটা অসাময়িক তত্ত্বোপদেশ। তাহার মধ্যে না থাকে সেই পল্লবমর্ম্মর, না থাকে সেই ছায়া, না থাকে সর্ব্বাঙ্গব্যাপ্ত সরস সম্পূর্ণতা। ......ভাগ্যে গাছেদের মধ্যে চিন্তাশীলতা নাই......কদলী বলে না, আমি সর্ব্বাপেক্ষা অল্পমূল্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ পত্র প্রচার করি, এবং কচু তাহার প্রতিযোগিতা করিয়া তদপেক্ষা সুলভ মূল্যে তদপেক্ষা বৃহৎ পত্রের প্রচার করে না।”

যে নৈরাশ্যবোধে এক কবির অন্তঃকরণ ব্যথিত হয়, আর এক খেয়ালে সেই অভাব-বোধে অন্য এক কবির হৃদয় কৌতুকে উদ্দীপিত হয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই বলি :

“স্থূল কথাটা এই যে, অসঙ্গতির তার অল্পে অল্পে চড়াইতে চড়াইতে বিস্ময় ক্রমে হাস্যে এবং হাস্য ক্রমে অশ্রুজলে পরিণত হইতে থাকে।”

এর পর কিসের মিলনে, কোন্ সামঞ্জস্য-জ্ঞানে রচনা রসিত হয়, প্রকৃত রম্য সাহিত্য হয়, তা বলা নিষ্প্রয়োজন। চেস্টার্টন যখন বিছানায় শুয়ে শুয়ে ঘরের ছাদে লম্বা রঙীন খড়ি দিয়ে ছবি আঁকার স্বপ্ন দেখেন কিংবা বেলক্ যখন পাখাওয়ালা এক ঘোড়ার মালিকের সঙ্গে শক্ত মাটিতে দাঁড়িয়ে কথা বলেন, তখন এই কৌতুক-বিস্ময়ই আমাদের মনকে পূর্ণ করে তোলে। একেই বলে খেয়ালী রচনা। এখানে সাধারণ ঘটনার মধ্যেই অসাধারণত্বের বীজ রয়েছে। এখানে টাইম-টেব্‌ল আর ড্যাচ গেজেটের নীরস পাতাও রম্য সাহিত্য হয়ে ওঠে, যদি লেখকের কলমে থাকে যাদু আর পাঠকের মন হয় উন্মুখ।

রবীন্দ্রনাথের পর তাঁর সুযোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র ও তাঁরই হাতে তৈরী বলেন্দ্র-নাথের কথা সর্বাগ্রে মনে পড়ে। বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধে ছিল নানাবিধ আলোচ্য বিষয়। কিন্তু ওরই মধ্যে স্মৃতি ও কল্পনামূলক আর চিত্রধর্মী প্রবন্ধগুলি খাঁটি বলেন্দ্রী সুরে বাঁধা। তাঁর রচনাভঙ্গীটি ছিল বিশেষ ভাবেই নিজস্ব এবং সে ভঙ্গীর চর্চায় ও যথাযথ বিকাশে তাঁর ব্যক্তিগত সাধনা ও পিতৃব্যের নজর ছিল যথেষ্ট। তাই 'গৃহকোণ', 'শুভ উৎসব', 'যাত্রা', 'বোলতা ও মধ্যাহ্ন' আর 'নিমন্ত্রণ সভা' এতো সুন্দর ও সরস। 'বিধেয়' ও 'সমস্ত' পদের ব্যবহার হয়তো একটু বেশি পরিমাণে ছিল তাঁর ভাষায়। কিন্তু সূক্ষ্ম সৌন্দর্য-দৃষ্টিতে, রসঘন বর্ণনাশক্তিতে এবং সুদূর ভাসমান স্মৃতিকে স্পষ্টতর রূপ দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করার আশ্চর্য ক্ষমতায় বলেন্দ্রনাথের কৃতিত্ব রবীন্দ্রনাথের পরেই। প্রবন্ধ-সাহিত্যে বলেন্দ্রনাথের বিশিষ্ট দান হল এই উজ্জ্বল-মধুর ব্যক্তিগত স্পর্শের কোমল উত্তাপ এবং তাকে বহন ও সঞ্চার করার মতো উপযুক্ত ভাষা।

শরৎ কুমারী চৌধুরানী, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ও ললিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনো কোনো রচনায় এই অন্তরঙ্গ সুর ও প্রকাশভঙ্গীর ভালো নমুনা পাওয়া যায়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের পর সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য লেখক হচ্ছেন প্রমথ চৌধুরী। সম্পূর্ণ স্বকীয় বীরবলী ঢঙে লেখা তাঁর প্রবন্ধ বাংলা সাহিত্যকে অভিনব শ্রীতে মণ্ডিত করেছে। লঘু-গুরু রসের তিনি ব্যক্তি-স্বতন্ত্র স্রষ্টা। মননের দীপ্তি আর অনুভূতিকে কি ভাবে জোড় লাগানো যায় হাল্‌কা প্রবন্ধে, তার একটি উৎকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর 'বর্ষা' প্রবন্ধটিতে। 'সবুজ পত্র' গোষ্ঠির আর দু'জন লেখকের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। শ্রদ্ধেয় অতুল গুপ্তের 'নদীপথে' এক শ্রেণীর উৎকৃষ্ট রম্যরচনা, যেমন আর এক জাতের ব্যক্তিগত প্রবন্ধের পথ-প্রদর্শক হল ধূর্জটিপ্রসাদের 'মশারি', 'স্টোভ' এবং 'বৈঠকখানা।'

আধুনিক কালে অর্থাৎ গত বিশ পঁচিশ বছর ধরে সাহিত্যের এই বিশেষ অঙ্গটির দিকে অনেক শক্তিশালী লেখক নজর দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এখনও লিখছেন, তাই তাঁদের দান স্বীকার করেই ক্ষান্ত হওয়া উচিত, যেহেতু যথার্থ সাহিত্যবিচারের সময় এখনও অনাগত। শুধু এইটুকু বললেই হবে, লঘু প্রবন্ধ রচনায় বুদ্ধদেব বসু একটি নতুন পথ খুলে দিয়েছিলেন যার মধ্যে কিশোর কালের বিস্ময় ও যৌবনের উন্মুখ মন ঐশ্বর্যবান ভাষায় আত্মপ্রকাশ করেছিল। তারপর তির্যক-বাগ্‌বিদগ্ধ জ্যোতির্ময় রায়, বলেন্দ্রনাথের উত্তর-সাধক নবেন্দু বসু, কবি অজিত দত্ত, পরিমল রায়, ইন্দ্রজিৎ স্মিতোজ্জ্বল রুচিসম্মত পন্থায় লঘু প্রবন্ধের শ্রীবৃদ্ধি করেন। অন্নদাশঙ্করও 'পথে প্রবাসে' এবং কোনো কোনো প্রবন্ধে তাঁর নিজস্ব ভাষা ও ভঙ্গীতে প্রকৃত রম্য রচনার সৃষ্টি করেছেন। আরো অনেকে রম্য রচনা লিখেছেন, যেমন মুজতবা আলি ও রঞ্জন এবং তাঁদের অনুগমন করে অপেক্ষাকৃত একাধিক তরুণ লেখক।

কিন্তু সাম্প্রতিক 'রম্য রচনায়' প্রবন্ধ-চরিত্র ঘুচে গিয়ে একটা পাঁচমিশেলী জিনিসের চেহারা পাওয়া যাচ্ছে, যাতে গল্প, কেচ্ছা ও ফাজলামোর অবাঞ্ছনীয় মিশ্রণে একটা চটকদার মুখরোচক পদার্থের আমদানি হয়েছে। ফর্মের দিকে নজর চলে যাচ্ছে, পরিবেশনের পরিচ্ছন্নতা এবং জাগ্রত মনের পরিচয়ও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। যেটা লঘু রসপ্রবন্ধের প্রধান আকর্ষণ অর্থাৎ লেখকের মন ও খেয়াল এবং ব্যক্তিত্বের প্রকাশ, সেটার অভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কাঁধে হাত দিয়ে গায়ে-পড়া অন্তরঙ্গতা কিংবা চোস্ত জবান ঠিক সাহিত্যপদবাচ্য হয়না। মূল সূত্র হচ্ছে সংযত ঘনিষ্ঠতা—বিষয়ের সঙ্গে ভাষার, উভয়ের সঙ্গে লেখকের আর লেখকের সঙ্গে বুদ্ধিমান ও রসগ্রাহী পাঠকের।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যবিস্তারের আদর্শ

উমা দেবী

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যাদর্শ প্রধানভাবে চারটি গ্রন্থে গভীর ভাবে ও ব্যাপক রূপে আলোচনা করেছেন। তাঁর আধুনিক সাহিত্য, প্রাচীন সাহিত্য ও সাহিত্য —এই তিনটি গ্রন্থ ১৩১৪ সালে প্রথম প্রকাশিত, যদিও গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধগুলির রচনাকাল তার পূর্বেও নানা সময়ের। একমাত্র সাহিত্যের পথে গ্রন্থটিই বহু পরে ১৩৪৩ সালে অর্থাৎ প্রায় তিরিশ বছর পরে প্রকাশিত হয়। এই শেষোক্ত গ্রন্থটির প্রবন্ধগুলির কোনোটিই ১৩২১ সালের পূর্বে রচিত হয়নি। এই গ্রন্থগুলিতে তিনি সাহিত্য সম্বন্ধে যা উপলব্ধি করেছেন এবং চিন্তা করেছেন তা নিজস্ব ভঙ্গীতে প্রকাশ করেছেন। তাঁর সাহিত্য সম্বন্ধে চিন্তাধারায় ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রের চরম উপলব্ধিটিকেই লক্ষ্য করা যায়—সেটি হচ্ছে রসের উপলব্ধি। সাহিত্যের পথের ভূমিকায় তিনি অলংকার শাস্ত্রকে 'রসসাহিত্যের রহস্য' বলেই উল্লেখ করেছেন। ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রে রসকে 'ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর' ব'লে রসোপলব্ধিকে ব্রহ্মোপলব্ধির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। সেই তুলনার তাৎপর্যটিও রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ ক'রে তাঁর ঐক্য তত্ত্ব উপস্থাপিত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে সূত্রমূলক ভাবে বিচার করলে একথা স্বচ্ছন্দেই বলা যায় যে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যাদর্শ ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রের রসাদর্শের অনুরূপ যদিও এই সূত্রাকারে নিহিত তত্ত্বকে তিনি যে ব্যাখ্যা-রূপ দান করেছেন তাতে সূত্রগুলির মধ্যে কোনো কোনোটির অস্পষ্ট সংযোগ স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে এবং একটি উপলব্ধির সমগ্রতার মধ্যে তাঁর সাহিত্যাদর্শটি জীবন্ত হ'য়ে উঠেছে—প্রত্যক্ষরূপ ধারণ করেছে। প্রাচীন সাহিত্যে যদিও তিনি প্রাচীন কাব্যগুলির অর্থাৎ সংস্কৃত কাব্যগুলির সম্বন্ধেই আলোচনা করেছেন এবং আধুনিক সাহিত্যে বাংলা সাহিত্যের কবি ও ঔপন্যাসিকদের সম্বন্ধেই করেছেন—তবু এই সমস্ত আলোচনার মূলে তাঁর একটি সাহিত্যিক বিচার পদ্ধতিকে আমরা স্পষ্টতই উপলব্ধি করি। ১৩১৪ থেকে সুরু করে ১৩৪৩ পর্যন্ত নানা সময়ে নানা বিষয়ে নানা সমালোচনার মধ্যেও তাঁর বিচারপদ্ধতির মানদণ্ডের একটি আশ্চর্য দৃঢ়তা উপলব্ধি করা যায়। সুতরাং তাঁর সাহিত্যাদর্শের ভূমিকা হিসাবে এই বিচারপদ্ধতি সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা প্রয়োজন।

॥ সাহিত্যের বিচার ॥

কবি সৃষ্টি করেন কিন্তু তাঁকেও নূতন ক'রে সৃষ্টি করেন সমালোচক। তাই গ্রহকে ঘিরে চন্দ্রমালার মতন কবিকে ঘিরে বিরাজ করেন সমালোচক। সমালোচকের কাজ সমালোচনা করা অর্থাৎ লেখকের মনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। এই কাজ অনেক সময় ব্যবসাদারি ভঙ্গিতেও হ'য়ে থাকে কিন্তু সেটা সমালোচনার বিশুদ্ধ প্রাণের নিয়ম নয়। যে আবেগের প্রেরণায় কবি সৃষ্টি করেন সেই আবেগটুকু পাঠকচিত্তে সঞ্চারিত করে দেওয়াই সমালোচকের কাজ। সাহিত্যের কোন লক্ষণ উপস্থিত আছে বা কোন লক্ষণ উপস্থিত নেই—এটি নিয়ে বাজারদর কষাকষি রসিকের কাজ নয়। যা আছে তাতেই সমগ্ররূপটি কি ভাবে কতখানি ফুটে উঠেছে তাই হচ্ছে রসিকের বিচার। এইজন্য সমালোচক যাঁরা সমালোচনার ট াঁকশালের বাঁধাই বুলির চকচকে পয়সাকে চিনে রেখেছেন তাঁরা খনির আনকোরা সোনাকে পিতল বলে ভুল করতে পারেন, রত্নকে মনে করতে পারেন কাচ। কারণ যা পরিচিত তারই লক্ষণগুলিকে তাঁরা চিনে রেখেছেন, অপরিচিতের নবীন প্রাণের কাঁচা সোনাকে তাঁরা দেখেছেন কোথায়! তাই তাঁদের সমালোচনায় দেখা যায় রুচিরই দাপট যা আক্রোশ বা উত্তেজনার অগ্নিকাণ্ড সচরাচর করেই থাকে—যেমন গোঁড়া যাঁরা ধর্মশাস্ত্রের বিধিবিধানকে পালিত হ'তে না দেখলে রেগে অস্থির হন। তাই সাহিত্যের বিচার শক্তি দীর্ঘকালের রসচেতনার ফল স্বরূপেই আমরা পেয়ে থাকি। তারই অভাবে রুচির মিল হোলো না দেখে অনেকে দাক্ষিণ্য ও সৌজন্যের অভাব দেখিয়ে থাকেন। তাঁরা লেখককে গালাগালি দেন এবং অকরুণ মন্তব্যে লেখকের সামাজিক সত্তাকেও দশের চোখে হাস্যাস্পদ ক'রে তুলতে চেষ্টা করেন। রুচির এই অদাক্ষিণ্য ও অক্ষমতাকে লক্ষ্য করে তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

> "বদলের হাওয়া বইল বলেই যে নিন্দের হাওয়া তুলতে হবে, তার কোনো কারণ নেই। পুরাতন আশ্রয়ের মধ্যে সৌন্দর্যের অভাব আছে, যে অকৃতজ্ঞ অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে সেই কথা বলবার উপলক্ষ খোঁজে তার মন সঙ্কীর্ণ, তার মন রূঢ়।"
>
> —পঞ্চাশোর্ধ্বম্—সাহিত্যের পথে।

বাস্তবিকই সাহিত্যবিচারের গোড়ার সর্ত এই যে রুচিকে বর্জন করতে হবে। সাহিত্যরসাস্বাদনের পক্ষে যা অনিবার্য ও অবশ্যস্বীকার্য সেই "তন্ময়ীভবনযোগ্যতা" সম্ভবই হয় না যদি রুচির খাঁড়া ঝুলিয়ে রাখি কবি ও পাঠকের মধ্যে—তথা কবিকৃতি ও পাঠকচিত্তের মধ্যে। কেননা রুচি অত্যন্ত উপরের বস্তু। আমাদের হৃদয়ের মাটিতে তার শিকড় গভীরের পথে অভিসার করে

না—সামান্য শিক্ষায় আকর্ষণেই তাকে উপড়ে ফেলে দেওয়া যায়। তাই সাহিত্যের বিচার রুচির চোরাবালির উপর স্থাপন ক'রে সাহিত্যের রসাস্বাদন সম্ভবপর হয় না। প্রাচীন সাহিত্যে রামায়ণ প্রবন্ধেও রুচির প্রসঙ্গে এই কথাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"বিদেশী যে সমালোচক বলিয়াছেন যে রামায়ণে চরিত্রবর্ণনা অতিপ্রাকৃত হইয়াছে তাঁহাকে এই কথা বলিব যে প্রকৃতি-ভেদে একের কাছে যাহা অতিপ্রাকৃত অন্যের কাছে তাহাই প্রাকৃত। ভারতবর্ষ রামায়ণের মধ্যে অতিপ্রাকৃতের আতিশয্য দেখে নাই।"

—রামায়ণ—প্রাচীন সাহিত্য।

কোন্‌টি বাস্তব বা অবাস্তব তার বিচার নির্ভর করবে না ভাবসংস্কারহীন চিত্তের উপর। রুচি দিয়ে বিচার করলে একই বস্তু বিভিন্ন মনের কাছে বিভিন্ন মূল্য পেয়ে থাকে। তাই সাহিত্য বিচার করতে গেলে চাই আপন সত্তার গভীরে ডুবে যাওয়া—যাতে ক'রে সম্ভব হ'তে পারে কাব্যের সত্তার সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দেওয়া।

কথাটা আর একটু পরিস্কার হওয়া প্রয়োজন।

সাহিত্যের দুটি অংশ আছে—রসের অংশ আর ভাবের অংশ। যদিও সাহিত্যকৃতিতে এই দুটি অংশকে পৃথক করা যায় না তবু শব্দের বিকল্পবৃত্তিকে আশ্রয় ক'রে ধ'রে নেওয়া যাক যে এই দুটি অংশ পৃথক। এখন কথা হচ্ছে আমাদের সাহিত্যবিচার কোন অংশকে নিয়ে। এর উত্তর—ভাবের অংশ নিয়ে। এই ভাবের অংশের বৈচিত্র্য ও রসব্যঞ্জনার শক্তির উপরই সাহিত্যের উৎকর্ষ নির্ভর করে। তেমনি এই ভাবাংশের সঙ্গে একাত্ম হ'তে পারলেই সাহিত্যের রসাস্বাদন সম্ভব হয়—রসের বিচারও সম্ভব হয়। কেন না সাহিত্য-বিচার সমগ্রতার বিচার, খণ্ডের বিচার নয়। রুচির জালে মনকে আবৃত রাখলে রসের বিচার সম্ভব নয়। তাই রবীন্দ্রনাথ বলছেন—

"এক কালের মধুলোভী যদি অন্য কাল হইতে মধুসংগ্রহ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে নিজ কালের প্রাঙ্গণের মধ্যে বসিয়া বসিয়া তিনি তাহা পাইবেন না, অন্যকালের মধ্যে তাঁহাকে প্রবেশ করিতে হইবে।"

—কাদম্বরীচিত্র—প্রাচীন সাহিত্য।

সাহিত্যবিচারের দ্বিতীয় সূত্র হচ্ছে এই—যেন শ্রেণীর কুহেলিকায় ব্যক্তি না হয় অদৃশ্য'। এটি সাহিত্যরচয়িতার পক্ষেও যেমন সত্য সাহিত্যরসভোক্তার পক্ষেও তেমনি সত্য। প্রতিটি বস্তুই —তা সে মানবই হোক বা প্রকৃতিই হোক —ব্যক্ত হয়েই স্পষ্ট। এই ব্যক্ত হবার অর্থ স্পষ্ট হ'য়ে ওঠা। আপন সীমা-স্বর্গের ইন্দ্র হ'য়ে ওঠে প্রতিটি বস্তু আপন ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্যে। সাহিত্যের যে

কোনো চরিত্রই হোক না কোন—নগণ্য থেকে মহান পর্যন্ত—সমস্তই প্রকাশের মধ্য দিয়েই চরিতার্থ। অথচ এই ব্যক্তিরূপটির সাহিত্যমূল্য নির্ণয় করা সহজ নয়। কারণ একে কোনো শ্রেণীর মধ্যে ফেলতে পারিনা।

একদা সাহিত্যে চরিত্রসৃষ্টিতে ছিল আদর্শবাদ। তখন সমস্ত বস্তুই আদর্শের অগ্নিদীপ্তিতে জ্যোতির্ময় হ'য়ে জ্বলত। তখন সমস্ত রাজাই ছিলেন—চতুরুদধিমালামেখলায়া ভুবো ভর্তা" এবং সমস্ত সুন্দরীই ছিলেন—"তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরৌষ্ঠী"। তখন এমন দীঘি ছিল না যাতে ছিল না পদ্ম, এমন পদ্ম ছিল না যাতে ছিল না ভ্রমর এবং এমন ভ্রমর ছিল না যা ছিল না গুঞ্জনরত। সমস্ত মুখই হার মানাতো কমল ও চন্দ্রকে আর সমস্ত কমল ও চন্দ্রই ছিল বিকশিত ও উজ্জ্বল। এক কথায় ব্যক্তি ছিল নগণ্য এবং তাকে উপলক্ষ্য করে ভাবের মহিমা আত্মবিস্তার করত। কিন্তু ক্রমশ এলো সাহিত্যে চরিত্রের অভিব্যক্তি, সার্থক হ'লো আপন স্বাতন্ত্র্যে বস্তু তার ব্যক্তি বা প্রকাশকে লাভ ক'রে। সাহিত্যবিচারে এই ব্যক্তির রূপটি সমগ্রভাবে ধরে দেওয়া সহজ নয় অথচ কোনো একটি শ্রেণীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ক'রে ফেলতে পারলে তাকে ব্যাখ্যা করা সহজ হয়। এইজন্য অর্থাৎ পন্থটি সহজ বলেই সাহিত্যবিচারে একে অনাদর করা হয়নি যদিও সাহিত্যবিচারের সাধু পন্থা এটি নয়। রবীন্দ্রনাথ এই কথাই বলছেন তাঁর সাহিত্যবিচার প্রবন্ধে—

> "আমাদের দেশ জাতমানার দেশ। মানুষের পরিচয়ের চেয়ে জাতের পরিচয়ে আমাদের চোখ পড়ে বেশি। আমরা বড়োলোক বলি যার বড়ো পদ, বড়োমানুষ বলি যার অনেক টাকা আমরা জাতের চাপ, শ্রেণীর চাপ দীর্ঘকাল ধরে পিঠের উপর সহ্য করেছি; ব্যক্তিগত মানুষ পংক্তিপূজক সমাজের তাড়ানায় আমাদের দেশে চিরদিন সংকুচিত। বাঁধা রীতির বন্ধন আমাদের দেশে সর্বত্রই।......সেই জন্যেই দেখি, আমাদের দেশের সাহিত্যবিচারে ব্যক্তির পরিচয় বাদ দিয়ে শ্রেণীর পরিচয়ের দিকেই ঝোঁক দেওয়া হয়।"
>
> —সাহিত্যের পথে।

সাহিত্যবিচারের আর একটি বড় অন্তরায় জাত্যভিমান। ওটি ইউরোপীয়, এটি ভারতীয় অতএব ভারতীয় সাহিত্যে বিদেশীয় প্রভাব পড়ায় তার জাতির কৌলীন্যে লেগেছে কলঙ্কের ছাপ—এমন ধরণের কথাও সাহিত্যবিচারে পাওয়া যায়। অথচ কত দুর্বল এই যুক্তি; মানুষের মনে মানুষের প্রভাব পড়বেই। শুধু তাই নয়—সেই প্রভাবে সাড়া দেওয়াটাই সজীবতার লক্ষণ। সাড়া না পেলেই বুঝি মানুষটা মনের দিক দিয়ে মরেছে। আত্মাভিমানে মত্ত হ'য়ে হৃদয়ের মুক্ত বাতায়নগুলি বন্ধ ক'রে দিয়ে যদি জাতরক্ষার দিকে দৃষ্টি দিই তাহলে প্রাণপুরুষকে আর রক্ষা করা হয় না। এটা শুচি বায়ুর লক্ষণ। শুধু সাহিত্যে নয়—চিত্রে ও সঙ্গীতেও এই একই শুচিবায়ুর লক্ষণ অনেকের মধ্যে দেখা যায়।

বিদেশী প্রভাব যদি অযোগ্য না হয় তাহলে স্বীকার করার ক্ষমতাটা গৌরবের। তাই রবীন্দ্রনাথ বলছেন—

নীল নদীর তীর থেকে বর্ষার মেঘ উঠে আসে। কিন্তু, যথাসময়ে সে হয় ভারতেরই বর্ষা। তাতে ভারতের ময়ূর যদি নেচে ওঠে তবে কোনো শুচিবায়ুগ্রস্ত স্বাদেশিক যেন তাঁকে ভর্ৎসনা না করেন; যদি সে না নাচত তবেই বুঝতুম, ময়ূরটা মরেছে বুঝি। এমন মরুভূমি আছে যে সেই মেঘকে তিরস্কার করে আপন সীমানা থেকে বার করে দিয়েছে। সে মরু থাক আপন বিশুদ্ধ শুচিতা নিয়ে একেবারে শুভ্র আকারে। তার উপরে রসের বিধাতা শাপ দিয়ে রেখেছেন, সে কোনোদিন প্রাণবান্ হয়ে উঠবেনা। বাংলা দেশেই এমন মন্তব্য শুনতে হয়েছে যে দাশুরায়ের পাঁচালি শ্রেষ্ঠ যেহেতু তা বিশুদ্ধ স্বাদেশিক। এটা অন্ধ অভিমানের কথা।"

—সাহিত্যবিচার—সাহিত্যের পথে।

যে দানের মধ্যে আছে শাশ্বত সত্য সে তো বহিরঙ্গ দান নয় সে হচ্ছে অন্তরঙ্গ প্রাণায়ন—তার তাৎপর্য অনুকরণে নয়—স্বীকারণে—এটা অবশ্যই স্বীকার্য।

"সাহিত্যবিচার কালে বিদেশী প্রভাব বা বিদেশী প্রকৃতির খোঁটা দিয়ে বর্ণাঙ্করতা বা ব্রাত্যতার তর্ক যেন না তোলা হয়"—ঐ প্রবন্ধেই বলেছেন রবীন্দ্রনাথ দৃঢ়তার সঙ্গে।

সাহিত্যবিচারের আর একটি বাধা প্রতিনিধি-প্রিয়তা। অর্থাৎ যে চরিত্রই স্বষ্টি হোক না কেন তা যথাযোগ্য প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন করেছে কিনা— এমন তর্ক অনেক সাহিত্যসমালোচক ক'রে থাকেন। যেমন যোগাযোগের কুমু নারীজাতির প্রতিনিধিত্ব করবার যোগ্যতা লাভ করেছে কিনা। বলা বাহুল্য এই ছোঁয়াচে মনোভঙ্গিটি সাহিত্যের আদর্শপ্রিয়তা থেকেই এসেছে। নায়ক-নায়িকার চরিত্র হ'লেই তাকে পুরুষজাতি বা নারীজাতির উৎকর্ষ বিধায়ক হ'তে হবেই—এমন একটা দাবী যেন তাঁরা করে থাকেন। এটিও ভ্রান্ত প্রথা। কেননা সাহিত্যে সমস্ত চরিত্রই অসাধারণ—অর্থাৎ তারা কোনো শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করবার জন্য স্বষ্ট হয়না এইজন্য সাহিত্যভোজের পংক্তিতে ভাঁড়ুদত্ত ও রামচন্দ্র একই স্থানে বসবার অধিকার পান কারণ ব্যক্তিত্বের মধ্যেই অর্থাৎ প্রকাশের স্পষ্টতার মধ্যেই সাহিত্যের সৌন্দর্য।

সাহিত্যে বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতিও অনেকের কাছে একটি প্রিয় পদ্ধতি। রবীন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করেছেন—কী সংগ্রহ করবার জন্য এই বিশ্লেষণ। যদি কেউ বলেন আলোচ্য সাহিত্যের উপাদান অংশগুলিকে বেছে আলাদা আলাদা করে সাজাবার জন্য—বুঝবার জন্য এই বিশ্লেষণের প্রয়োজন তাহ'লে আবার প্রশ্ন হ'তে পারে অঙ্গী থেকে অঙ্গগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে কি তাদের সৌন্দর্য-বিচার হয়। সৌন্দর্য বস্তুটিই যে সমগ্রতা। একটি চিত্রে যদি দশটি রঙ থাকে তাহ'লে সেই দশটি রঙকে আলাদা ক'রে চিনে নিতে পারলেই কি চিত্রের

সৌন্দর্য—যা সমগ্রতার মধ্য দিয়েই প্রকাশিত হয়েছে—ব্যক্তিকে লাভ করেছে—উপলব্ধি করা যাবে? নিশ্চয়ই তা যাবে না। তবে কেন এই বিশ্লেষণ—জিজ্ঞাসা করতে পারেন রসিক।

সাহিত্যের সমগ্রতার বিচারের দিক থেকে সত্যই এই বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই তার কারণ বিশ্লেষণের দ্বারা বস্তুর বহিরঙ্গ উপাদানকেই বোঝা যায়—তার অন্তরঙ্গ স্বরূপকে ধরা যায় না। তাছাড়া সব উপাদানকে আবিষ্কার করবারও প্রয়োজন নেই। কিছু গ্রহণ ও কিছু বর্জনের দ্বারা এবং কল্পনার সংযোগের দ্বারা সাহিত্যিক চরিত্রের যে সম্পূর্ণতার সাধন হয় তার পক্ষে প্রচ্ছন্নকে টেনে এনে প্রত্যক্ষরূপে উপস্থাপনা করবার প্রয়োজন নেই। রবীন্দ্রনাথ তাই বলছেন—

"বিশ্লেষণে হীরকে অঙ্গারে প্রভেদ নেই, সৃষ্টির ইন্দ্রজালে আছে। সন্দেশে কার্বন আছে, নাইট্রোজেন আছে কিন্তু সেই উপকরণের দ্বারা সন্দেশের চরম বিচার করতে গেলে বহুতর বিসদৃশ ও বিস্বাদ পদার্থের সঙ্গে তাকে এক শ্রেণীতে ফেলতে হয়; কিন্তু এতে করেই সন্দেশের চরম পরিচয় আচ্ছন্ন হয়। কার্বন ও নাইট্রোজেন উপাদানের মধ্যে ধরা পড়া সত্ত্বেও জোর ক'রে বলতে হবে যে সন্দেশ পচা মাংসের সঙ্গে একশ্রেণীভুক্ত হ'তে পারে না। কেন না উভয়ে উপাদানে এক কিন্তু প্রকাশে স্বতন্ত্র। চতুরলোক বলবে, প্রকাশটা চাতুরী; তার উত্তরে বলতে হবে, বিশ্বজগতটাই সেই চাতুরী।

—সাহিত্য বিচার—সাহিত্যের পথে।

মোট কথা সাহিত্যের বিচারে সাহিত্যিক বস্তুর বৈজ্ঞানিক বা মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ চলবে না। তবে রসভোগের প্রণালীটি বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। সাহিত্যিক বস্তু কিভাবে রসিকের রসচেতনার বিষয় হ'য়ে ওঠে সেটি বিশ্লেষণ করে দেখানো সম্ভব। ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রেও সাহিত্যিক বস্তুর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ আলঙ্কারিকেরা করেননি তবে রসচেতনার প্রণালীটি নিয়ে তাঁরা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করেছেন। কি প্রক্রিয়ায় বাইরের বস্তু অন্তরের বস্তু হ'য়ে ওঠে এবং অন্তরের বস্তু বিশ্বের বস্তু হ'য়ে ওঠে অর্থাৎ তাঁদের পরিভাষায় কিভাবে লৌকিক কারণ কার্য ও সহকারীভাব অলৌকিক বিভাব অনুভাব ও সঞ্চারী ভাব হ'য়ে হৃদয়ে সুপ্ত লৌকিক বাসনাকে অলৌকিক স্থায়ি-ভাব-রূপে উদ্বুদ্ধ করে তোলে এবং কি করে সেই উদ্বুদ্ধ স্থায়িভাব চিরন্তন রসরূপটিকে অভিব্যক্ত করে এই রসপ্রণালীটি নিয়ে গভীর আলোচনা—বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা দেখতে পাই ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রে। অবশ্য এ কথাও তাঁরা বলেছেন যে রস ও ভাবকে এভাবে বিচ্ছিন্ন করে প্রকৃত পক্ষে দেখা যায় না কারণ তারা অবিচ্ছেদ্যরূপেই অনুভূত হ'য়ে থাকে। তবু শব্দের বিকল্পবৃত্তিকে আশ্রয় করে তারা অভিন্ন অবস্থাতেও ভিন্নরূপে কল্পিত হয়ে পৃথক ভাবে উল্লেখ-যোগ্য হয়। কাব্যের কোনো উপাদানই বাইরে থেকে আক্ষিপ্ত নয়—অন্তরের

ভাবাবেগে সমস্তকেই সে অন্তর থেকে আহৃত করে রসসমুদ্রে বিলীন হয়। সুতরাং এই প্রক্রিয়াটি দেখানো যেতে পারে সাহিত্যবিচারে। ভারতীয় অলংকার-শাস্ত্রের সঙ্গে এই ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ এক মত।

এই উপলব্ধিটি একটি সুন্দর উপমা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলছেন—

ভোগ সম্বন্ধে তার রমণীয়তা ব্যাখ্যা করবার উপলক্ষ্যে বলা চলে যে, এই ফলে সর্ব প্রথমে যেটা মনকে টানে সে হচ্ছে ওর প্রাণের লাবণ্য ; এইখানে সন্দেশের চেয়ে তার শ্রেষ্ঠতা। আমের যে বর্ণমাধুরী তা জীব-বিধাতার প্রেরণায় আমের অন্তর থেকে উদ্ভাসিত, সমস্ত ফলটির সঙ্গে সে অবিচ্ছেদে এক। চোখ ভোলাবার জন্যে সন্দেশে জাফরান দিয়ে রঙ ফলানো যেতে পারে ; কিন্তু সেটা জড় পদার্থের বর্ণযোজন, প্রাণপদার্থের বর্ণ-উদ্ভাবনা নয়। তার সঙ্গে আমের আছে স্পর্শের সৌকুমার্য, সৌরভের সৌজন্য। তারপরে তার আচ্ছাদন উদ্‌ঘাটন করলে প্রকাশ পায় তার রসের অকৃপণতা। এই ভাবে আম সম্বন্ধে রসভোগের বিশেষত্বটিকে বুঝিয়ে বলাকে বলব আমের রস বিচার।

—সাহিত্য বিচার—সাহিত্যের পথে।

এখানে প্রাণের লাবণ্যটি হচ্ছে রসের পণ্য যা জীবনের ঘাটে ঘাটে দান-করছে স্বাস্থ্য সৌন্দর্য লাবণ্য। এখানে এমন বিচার করা চলবে না যে আমে যেহেতু প্রচুর ভোজ্যবস্তু আছে—আঁটির অংশ কম অতএব এটি বিশুদ্ধ ভারত-বর্ষীয় কেননা ত্যাগের জন্য ও নিজেকে করছে উৎসৃষ্ট। তুলনায় বীজবহুল র‍্যাস্‌প্‌বেরি গুস্‌বেরি খাঁটি পাশ্চাত্য কেননা পরের তুষ্টির আয়োজন ওরা কম রেখে নিজের প্রয়োজনকে—বংশবিস্তারকে—বড় ক'রে তুলেছে। অতএব আম হচ্ছে ভারতীয় সাত্ত্বিক প্রকৃতির এবং র‍্যাস্‌প্‌বেরি ইউরোপীয় রাজসিক প্রকৃতির। এ বিচার রসের বিচার নয়—এ হচ্ছে জাতির বিচার। সাহিত্য বিচারে এ পদ্ধতি অচল।

অতএব—

"সাহিত্যের বিচার হচ্ছে সাহিত্যের ব্যাখ্যা, সাহিত্যের বিশ্লেষণ নয়। এই ব্যাখ্যা মূলত সাহিত্য বিষয়ের ব্যক্তিকে নিয়ে, তার জাতিকুল নিয়ে নয়। অবশ্য সাহিত্যের ঐতিহাসিক বিচার কিম্বা তাত্ত্বিক বিচার হ'তে পারে। সেরকম বিচারে শাস্ত্রীয় প্রয়োজন থাকতে পারে কিন্তু তার সাহিত্যিক প্রয়োজন নেই।"

—সাহিত্য বিচার—সাহিত্যের পথে।

একমাত্র সহৃদয় ব্যক্তিই সমালোচক হ'তে পারেন—সত্যকারের অন্তর্দৃষ্টি যাঁর আছে। তিনি ব্যবসাদারি চালে কাব্যপাঠ করেন না, করেন রসিকের দৃষ্টিতে। এঁদেরই বিচারের প্রতিভা আছে—আছে অসামান্য শক্তি যা মুহূর্তেই

ক্ষণিকের মধ্যে শাশ্বতকে চিনে নিতে দেরী করে না। সাহিত্যের নিত্যত্ব বলতে যে রসবস্তু বোঝায়, যে ঐক্যের প্রকাশ বোঝায় যে সত্তার প্রকট প্রকাশ বোঝায় তাকে চিনে নিতে বিলম্ব তাঁদের ঘটে না ; তাই তৈরি করা পালিশ-করা কথায় বোঝাই দলের নৌকো তাঁদের হৃদয় ঘাটে ভিড়তে পায়না, সারস্বত-প্রাসাদের দেউড়িতে যে তর্জন-গর্জন, হাঁকডাক, ঘুষো-ঘুষির ব্যাপার চলে তাকে এঁরা এড়িয়ে চলেন, একটি বিনীত সৌজন্যের উদার দাক্ষিণ্যে অবারিত থাকে তাঁদের হৃদয়দ্বার। এক কথায় তাঁরা পোষাক চিনে রাখেন না—চিনতে পারেন মানুষকে, পানপাত্রের কারুকার্যটাই লক্ষ্য করেন না—লক্ষ্য করেন রসের পানীয়ের আতিথ্যকে, রুচির ধূলোয় হৃদয়কে অশুচি ক'রে রাখেন না অথচ প্রাণের দীপ্ত প্রকাশে গোলাপের সঙ্গে গোলাপের কাঁটাকেও আনন্দের অভিব্যক্তি ব'লে উপলব্ধি ক'রে চরিতার্থ হন।

এঁরাই সাহিত্যের যথার্থ বিচারক। এঁদের মনের ঔদার্য যা তৎ-সাময়িক ও তৎস্থানিক তাকেই শুধু গ্রহণ করে না—যা নিত্যকালের বস্তু এবং বিশেষকালের সম্মানচিহ্নে চিহ্নিত নয় তাকেও নিত্যকালের মর্যাদার আলোকে উদ্ভাসিত ক'রে দেখতে পারে। সাহিত্য যে শুধু বাস্তব বা শুধু কল্পনা নয়—দুইয়ের সমন্বয়ে একটি সুষম বস্তু যা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যও বটে, ইন্দ্রিয়াতীতও বটে সেটি এঁরা ভালো করেই জানেন।

এখন প্রশ্ন এই যে সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে যে বিচিত্র স্তর আমরা লক্ষ্য করি বিভিন্ন লেখকের লেখায় তার বিচার কি ভাবে হবে। সে কি উৎকর্ষ নিকর্ষের মানদণ্ডে মাপা হবে ? উৎকর্ষ নিকর্ষই বা নিরূপণ করবার পদ্ধতি কি ? রবীন্দ্রনাথ "সাহিত্য" নামক সমালোচনা গ্রন্থে এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

হৃদয় আপনাকে প্রকাশ করতে চায় ; এই প্রকাশের মধ্য দিয়েই জগতের সঙ্গে তার নিবিড় ঐক্য। বাইরের জগৎ অন্তরে এসে অন্তর্জগতে পরিণত হচ্ছে। তাকেই প্রকাশ করছেন কবি আপন হৃদয়ানুরঞ্জনে রঞ্জিত ভাষায়—ছন্দে অলঙ্কারে—হিল্লোলিত রসতরঙ্গে। এই রসই আনন্দ—এই রসই প্রেম। একমাত্র প্রেমের মধ্য দিয়েই মানুষ আপনাকে ঐক্যে স্থাপিত করতে পারে। সমস্ত প্রিয় বস্তু হৃদয়েরই বস্তু—বাইরের জগতে প্রিয় বা অপ্রিয় বলে কিছু নেই। প্রকাশের সত্য লাভের জন্যই মানুষ যেন সর্বস্ব পণ করে বসে আছে—কি জীবনে কি সাহিত্যে। জীবনেও এটি আমরা লক্ষ্য করি। ধনী আপন ধনের মহিমা প্রকাশের জন্য দেউলে হয়—সর্বস্ব ব্যয় করতেও কুণ্ঠিত হয় না, আতসবাজির মতন আপন তাপটুকু অজস্র স্ফুলিঙ্গদীপ্তিতে প্রকাশ ক'রে নিভে গিয়েও চরিতার্থতা অনুভব করে।

প্রেমিক তার প্রেমের মহিমা প্রকাশের জন্য প্রেমিকার গালের তিলটির জন্য সমরকন্দ বোখারা দান করতে এক মুহূর্ত দ্বিধা করে না। বর্বর সৈন্য লড়াই করতে যাবার সময় সর্বাঙ্গে রঙ চঙ মেখে চীৎকার শব্দে তাণ্ডব নৃত্যে নিজের হিংসার উদ্দামতাকেই প্রকাশ করে। প্রকাশ খুঁজে ফিরছে মানুষ সাহিত্যে, প্রকাশ খুঁজছে জগৎপ্রকৃতি বিবর্তনের মধ্য দিয়ে।

এমনি ভাবে হৃদয়ের ধনকে বাইরের ক'রে ও বাইরের ধনকে হৃদয়ের ক'রে মানুষ বিশ্বের সঙ্গে ঐক্যসাধন করছে। একবার সে নিজেকে বিস্তার করছে জগতের মধ্যে আরবার সে জগৎকে সিক্ত করছে আপন অন্তর রসে। জীবনের এই উপলব্ধিটিই সাহিত্যে প্রকাশিত হয়—প্রকাশিত হয় তার অনন্ত বৈচিত্র্যে, প্রকাশিত হয় তার গভীর সুষমায়। কবিকৃতিতে—তা সে যত ক্ষুদ্রই হোক জীবনের কোনো না কোনো রূপ ধরা পড়েই।

একটি তুলনা দেওয়া যাক।

জীবন একটি বিশাল যন্ত্রের মত। তার একটি স্বল্পতমস্থানব্যাপী 'স্ক্রু'-ও যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট না হ'লে যন্ত্র রইবে অনড়—অচল। যন্ত্রের অন্যান্য বড় বড় লৌহখণ্ডের অংশগুলিও ভেঙে পড়তে পারে অকস্মাৎ। যেমন এই যন্ত্রের ছোট বড় সমস্ত অংশই যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হয়েই যন্ত্রটিকে চালু রাখে, তেমনি জীবনেরও বিভিন্ন ক্ষেত্র-গুলি সম্মিলিত ভাবেই জীবনকে সম্পূর্ণ ও সুষমামণ্ডিত করে তোলে। এই জীবনের উর্দ্ধায়িত প্রতিফলন যে সাহিত্যে সেই সাহিত্য সম্বন্ধেও একথা সম্পূর্ণভাবেই প্রযোজ্য। কোনো সাহিত্যকৃতিই বড় নয় বা ছোট নয়। সমস্তই আনন্দের প্রকাশ। আনন্দের কোনো পরিমাণ নেই—আছে শুধু আস্বাদন।

অপরিমিত চিনিতে যে মিষ্টত্ব সেই মিষ্টত্ব এক দানা চিনিতেও আছে। স্বরূপত এক দানা চিনির সঙ্গে এক জাহাজ চিনির কোনো প্রভেদ নেই—স্বাদবৈচিত্র্যও নেই। সাহিত্যও তাই। সৃষ্টির যে আনন্দ—একটি ক্ষুদ্র তৃণপুষ্পে আপন সীমার মধ্যে প্রকাশের আনন্দে অসীম হ'য়ে উঠেছে—সেই আনন্দই জ্যোতির্ময় সূর্যের মধ্যেও প্রকট হয়েছে। সৃষ্টির লীলায় কোনো ভেদ নেই। যেমন অভিনয়ে একটি ছোট অংশের অভিনেতা ও বড় অংশের অভিনেতার মধ্যে ভূমিকাগত ক্ষুদ্রত্ব বা মহত্ব নিয়ে বিচার নেই—অভিনয়-পটুতার উপরেই গোটা নাটকটার রসাভিব্যক্তিত্বেই তাদের সার্থকতা—তেমনি সাহিত্যেও ক্ষুদ্র বিষয়বস্তু বা মহান বিষয়বস্তু নিয়ে বিভেদ হয়না—সীমার মধ্যে অসীমের আনন্দ প্রকাশেই তাদের সার্থকতা। সৃষ্টিলীলার আনন্দের জগতে সকলেই যে সমান মর্যাদার অধিকারী—এই কথা রবীন্দ্রনাথ একটি ছোট কবিতায় বলেছেন—

প্রাচীরের ছিদ্রে এক নামগোত্রহীন
ফুটিয়াছে ছোট ফুল অতিশয় দীন।
ধিক ধিক করে তারে কাননে সবাই
সূর্য উঠি বলে তারে ভাল আছ ভাই।

এখানেও প্রকাশের আনন্দেই যে ক্ষুদ্র কোমল পুষ্পটি ও বিরাট জ্যোতিঃ-পিণ্ড সূর্যের মধ্যে হ'য়ে ওঠার চরিতার্থতা—তাই কবি ছন্দোবদ্ধ করেছেন।

সুতরাং এই আনন্দকে প্রকাশ করবার বীণাযন্ত্র হচ্ছেন সাহিত্যিক। তিনি আপনাকে সমর্পণ করেছেন বিশ্বরসিকের হাতে—ভূমার হাতে। মানুষ তার হৃদয়প্রদীপটি তুলে ধরেছে—দেবালয়ের আরতির জন্য—প্রদীপটি মাটির বটে কিন্তু শিখা তার দিব্য; সাহিত্যের মধ্যে মানুষ তার জীবনের রাগিনী বাজিয়ে চলেছে নানা সুরে নানা তালে। সেই মহারাগিনীর বিচিত্র তান তো একজনের কাছ থেকে পাওয়া যাবে না। বিশ্বের ঐক্যতানে সকল কবিই উপস্থিত আছেন—সকলেরই তারে বাজছে এক একটি সুর—এক একটি তান। সব মিলিয়ে সম্পূর্ণ। তাই সাহিত্য-বিচারের সব চেয়ে বড় কথা এই ঐক্যতানের তাৎপর্যটি হৃদয়ঙ্গম করা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"সাহিত্যে বিশ্বমানবই আপনাকে প্রকাশ করিতেছে, তবে সাহিত্যের মধ্যে আমাদের যাহা দেখিবার তাহা দেখিতে পাইব।"

—বিশ্বসাহিত্য—সাহিত্য।

সাহিত্যিক মানব উপলক্ষ্য মাত্র—তাঁর মধ্য দিয়ে বিশ্বমানব আপনাকে প্রকাশ করছে; তাই সাহিত্যিককে হতে হবে নিরপেক্ষ; সে নিজের ভাবনায় সমস্ত মানুষের ভাব বহন করছে, নিজের লেখায় সমস্ত মানুষের বেদনা প্রকাশ করছে। সুতরাং সাহিত্য-বিচারেও দেখতে হবে কে কতখানি প্রকাশ করছে—এই মাত্র। এমনকি একজনের সাহিত্যকৃতির মধ্যেও লক্ষণীয় কখন কি ভাবে কতটা মানুষের বেদনা সত্তার সংবেদনায় পরিণাম-রমণীয়তা লাভ করেছে।

রবীন্দ্রনাথ একটি সুন্দর তুলনা দিয়ে স্পষ্ট করে বলেছেন—

"সাহিত্যকে এইভাবে দেখিতে হইবে যে বিশ্বমানব রাজমিস্ত্রি হইয়া এই মন্দিরটি গড়িয়া তুলিতেছেন; লেখকেরা নানা দেশ ও নানা কাল হইতে আসিয়া তাহার মজুরের কাজ করিতেছে। সমস্ত ইমারতের প্ল্যানটা কী, তাহা আমাদের কারও সামনে নাই বটে, কিন্তু যেটুকু ভুল হয়, সেটুকু বার বার ভাঙা পড়ে;—প্রত্যেক মরজুকে তাহার নিজের স্বাভাবিক ক্ষমতা খাটাইয়া নিজের রচনাটুকুকে সমগ্রের সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া সেই অদৃশ্য প্ল্যানের সঙ্গে মিলাইয়া যাইতে হয়; ইহাতেই তাহার ক্ষমতা প্রকাশ পায় এবং এইজন্যই তাহাকে সাধারণ মজুরের মতো কেহ সামান্য বেতন দেয় না, তাহাকে ওস্তাদের মতো সম্মান করিয়া থাকে।"

সুতরাং সাহিত্যবিচারের শেষ কথা তুলনায় আলোচনা—যাকে ইংরেজিতে বলে Comparative Literature এবং বাংলায় যার নাম রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন বিশ্বসাহিত্য।

সাহিত্যের মধ্যে লক্ষণীয় মানুষ কেমন ক'রে তার লক্ষ্যের কথাটি বলেছে—চেষ্টা তার কতখানি ফলবতী হয়েছে। মানুষের আত্মা প্রকাশের বিচিত্রমূর্তির মধ্যে কোন নিত্যরূপ দেখাতে চেয়েছে ; সে নিজেকে রোগী না ভোগী না যোগী কোন পরিচয়ে পরিচিত করবার জন্য আনন্দবোধ করছে এবং জগতের সঙ্গে তার আত্মীয়তা কতদূর সত্য হ'য়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথ বলছেন—

"ইহাই জানিবার জন্য এই সাহিত্যের জগতে প্রবেশ করিতে হইবে। ইহাকে কৃত্রিম রচনা বলিয়া জানিলে হইবে না ; ইহা একটি জগৎ ; ইহার তত্ত্ব আমাদের কোনো ব্যক্তিবিশেষের আয়ত্তাধীন নহে ; বস্তুজগতের মতো ইহার সৃষ্টি চলিয়াছেই ; অথচ সেই অসমাপ্ত সৃষ্টির অন্তরতম স্থানে একটি সমাপ্তির আদর্শ অচল হইয়া আছে।"

—বিশ্বসাহিত্য—সাহিত্য।

সাহিত্যে মানুষ আপনার বাস্তবসত্তাকে ভাবের সত্তায় পৌঁছে দিয়েছে। এই ভাবের জগৎ কতদূর পর্যন্ত সাহিত্যস্রষ্টা তথা সমস্ত মানবসমাজকে টেনে নিয়ে গেছে—সেটিও দ্রষ্টব্য। এ শুধু তথ্যস্থাপনের চাহিদা নয়—প্রাণের প্রকাশে মানুষ সাহিত্যকে চেয়েছে। তাই সাহিত্য একার নয়—সমস্ত মানুষের। সেই সমস্ত মানুষের প্রাণের আনন্দ-বেদনা কেমন ভাবে কতখানি প্রকাশ পেয়েছে সেই জানা অলস অবসরের কালক্ষেপন নয়—এ হচ্ছে আত্মার আকূতি।

তাই সাহিত্যবিচারের শেষ কথা রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্য গ্রন্থে বিশ্বসাহিত্য প্রবন্ধে ব'লে গেছেন—

"প্রত্যেক লেখকের রচনার মধ্যে একটি সমগ্রতাকে গ্রহণ করিব, এবং সেই সমগ্রতার মধ্যে সমস্ত মানুষের প্রকাশ চেষ্টার সম্বন্ধ দেখিব, এই সংকল্প স্থির করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।"

রবীন্দ্রনাথ ও কয়েকটি মন্ত্র

শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য

রবীন্দ্রনাথের কবিমানসের বিকাশে উপনিষদের মন্ত্ররাজির প্রভাব অতিশয় দূরপ্রসারী। একটি প্রসিদ্ধ ইংরেজী প্রবন্ধ—গ্রন্থের ভূমিকায় কবি নিজেই বলিয়াছেন—

" The writer has been brought up in a family where texts of the Upanishads are used in daily worship ; and he has had before him the example of his father, who lived his long life in the closest communion with God, while not neglecting his duties to the world, or allowing his keen interest in all human affairs to suffer any abatement. "১

উপনিষদের সহিত রবীন্দ্রমানসের সম্পর্ক এতই সুনিবিড় যে একটিকে বাদ দিয়া অপরটির বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করা একরূপ অসম্ভব বলিলেই চলে। প্রসিদ্ধ সমালোচক শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় তাঁহার এক প্রবন্ধে বলিয়াছেন—

"রবীন্দ্রনাথের মধ্যে , তাঁর চিত্তের ও চেতনার গড়নে তিনটি—কি চারটি—ধারা প্রবহমান ; এ কয়েকটি মিলে মিশে তাঁর কবিস্বভাবের, তাঁর সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য গড়ে দিয়েছে। ধারা কটি হল —প্রথম উপনিষদের ধারা ; দ্বিতীয়, বৈষ্ণব-ভাবের ধারা ; তৃতীয়, 'পেগান' (Pagan) অর্থাৎ বাহ্যিক ইন্দ্রিয়গত সৌন্দর্যভোগের ধারা ; আর চতুর্থ যোগ করা যেতে পারে, আধুনিক বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি বা যুক্তিবাদের ধারা।

"আমরা মনস্তাত্ত্বিকদের ভাষা ধার করে বলতে পারি ঔপনিষদ-ভাব রবীন্দ্রনাথের উর্দ্ধ্বতর বুদ্ধিকে ভাস্বর করেছে, সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা তাঁর নিম্নতর প্রাণ ও ইন্দ্রিয়কে অপরূপ মোহিনী শক্তিতে ভরে দিয়েছে। আর আধুনিক বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি বাহ্য মানসসত্তাকে, মস্তিষ্কের পরিধিকে পরিপূর্ণ করে সকলকে ঘিরে—অনেক সময়ে সূক্ষ্মভাবে—একটা ব্যাপক আবহাওয়া রচে দিয়েছে।"২

কিন্তু আমাদের মনে হয়, রবীন্দ্রপ্রতিভার একটিমাত্রই মূল ধারা—তাহা হইতেছে উপনিষদের ধারা, এবং অন্যান্য সকল ধারা, তাহাদের আপাত বিভিন্নতা সত্ত্বেও, সেই মূল ধারারই উপ-প্রবাহ বা শাখা মাত্র। কেননা, রবীন্দ্রনাথ যেভাবে ও যে দৃষ্টিতে উপনিষদের মন্ত্ররাজিকে অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাহার মধ্যে একটি অখণ্ড সমগ্রতার রূপ আছে। জ্ঞান, কর্ম্ম, প্রেম, ভক্তি, সৌন্দর্যসম্ভোগ, বিশ্ববোধ—মানব মনের যত কিছু বহুমুখী বিচিত্র বৃত্তি, সমস্তই উপনিষদের মন্ত্রের অক্ষয় উৎস হইতে আপন আপন চরিতার্থতালাভের উপাদান

সংগ্রহ করিয়া পরিপুষ্টিলাভ করিতে পারে। অন্ততঃ, রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে যে ইহাই ঘটিয়াছিল, তাহা প্রমাণ করা খুব দুরূহ নহে।

২।

যদিও প্রধান দশটি উপনিষদের শাশ্বত বাণীসমূহই নির্বিশেষে রবীন্দ্রজীবনে জ্ঞান, কর্ম, প্রেম ও ভক্তির অজস্র উল্লাসের অক্ষয় প্রেরণা জোগাইয়াছিল, তথাপি রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন ভাষণ ও লিখিত প্রবন্ধে উপনিষদের কয়েকটি মন্ত্রেরই প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই ঋষিবাণীগুলি যেন তাঁহার পরিপূর্ণ জীবন-সংগীতের কয়েকটি ধ্রুবপদের মত বারংবার আবর্ত্তিত হইয়া ফিরিয়াছে। এই-গুলিই যেন তাঁহার জীবন সাধনার সর্বপ্রধান অবলম্বনস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। আমরা এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় ঐরূপ কয়েকটি মন্ত্রের নির্দ্দেশমাত্র করিব।

৩। গায়ত্রী মন্ত্র ।।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'জীবন স্মৃতি'তে তাঁহার উপনয়নের সময় গায়ত্রীমন্ত্র জপের বিষয়ে বলিয়াছেন—

"নূতন ব্রাহ্মণ হওয়ার পরে গায়ত্রী মন্ত্রটা জপ করার দিকে খুব-একটা ঝোঁক পড়িল। আমি বিশেষ যত্নে একমনে ওই মন্ত্র জপ করিবার চেষ্টা করিতাম। মন্ত্রটা এমন নহে যে সে-বয়সে উহার তাৎপর্য্য আমি ঠিকভাবে গ্রহণ করিতে পারি। আমার বেশ মনে আছে, আমি 'ভূর্ভুবঃ স্বঃ' এই অংশকে অবলম্বন করিয়া মনটাকে খুব করিয়া প্রসারিত করিতে চেষ্টা করিতাম। কী বুঝিতাম, কী ভাবিতাম তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা কঠিন, কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, কথার মানে বোঝাটাই মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে বড়ো জিনিস নয়। শিক্ষার সকলের চেয়ে বড়ো অঙ্গটা—বুঝাইয়া দেওয়া নহে, মনের মধ্যে ঘা দেওয়া।......তাই বলিতেছিলাম, গায়ত্রী মন্ত্রের কোনো তাৎপর্য্য আমি সে-বয়সে যে বুঝিতাম তাহা নহে। কিন্তু মানুষের অন্তরের মধ্যে এমন কিছু একটা আছে, সম্পূর্ণ না বুঝিলেও যাহার চলে। তাই আমার একদিনের কথা মনে পড়ে।—আমাদের পড়িবার ঘরে শানবাঁধানো মেজের এককোণে বসিয়া গায়ত্রী জপ করিতে করিতে সহসা আমার দুই চোখ ভরিয়া কেবলই জল পড়িতে লাগিল। জল কেন পড়িতেছে তাহা আমি নিজে কিছুমাত্র বুঝিতে পারিলাম না। অতএব, কঠিন পরীক্ষকের হাতে পড়িলে আমি মূঢ়ের মতো এমন কোনো একটা কারণ বলিতাম গায়ত্রীমন্ত্রের সঙ্গে যাহার কোনোই যোগ নাই। আসল কথা, অন্তরের অন্তঃপুরে যে-কাজ চলিতেছে বুদ্ধির ক্ষেত্রে সকল সময়ে তাহার খবর আসিয়া পৌঁছায় না।"৩

পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথ গায়ত্রীমন্ত্রের গূঢ় তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। অধ্যাত্মজগতের সহিত বাহ্য জগতের, জড়ের সহিত চৈতন্যের তাদাত্ম্য প্রতিপাদন করাই যে এই আর্ষবাণীর উদ্দেশ্য তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ একটি ভাষণে বলিতেছেন—

"আমাদের ধ্যানের মন্ত্রে এক সীমায় রয়েছে ভূর্ভুবঃ স্বঃ, অন্য সীমায় রয়েছে আমাদের ধী, আমাদের চেতনা। মাঝখানে এই দুইকেই একে বেঁধে সেই বরণীয় দেবতা আছেন যিনি এক-দিকে ভূর্ভুবঃস্বঃকেও স্বষ্টি করছেন, আর একদিকে আমাদের ধী-শক্তিকেও প্রেরণ করছেন। কোনোটাকেই বাদ দিয়ে তিনি নেই। এই জন্যেই তিনি ওঁ।"৪

আবার—

"বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানবচিত্ত, এই দুইকে এক করে মিলিয়ে আছেন যিনি তাঁকে এই দুইয়েরই মধ্যে একরূপে জানবার যে ধ্যানমন্ত্র, সেই মন্ত্রটিকেই ভারতবর্ষ তার সমস্ত পবিত্র শাস্ত্রের সারমন্ত্র বলে বরণ করেছে। সেই মন্ত্রটিই গায়ত্রী : ওঁ ভূ র্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।"৫

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনেও এই গায়ত্রী মন্ত্রের প্রভাব ছিল গভীর। তাই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"যাঁরা মহর্ষির আত্মজীবনী পড়েছেন তাঁরা সকলেই জানেন, তিনি তাঁর দীক্ষার দিনে গায়ত্রী মন্ত্রকেই বিশেষ করে তাঁর উপাসনার মন্ত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর এই দীক্ষার মন্ত্রটিই শান্তিনিকেতনের আশ্রমকে আকার দান করেছে—..........."৬

৪। "ঈশা বাস্যমিদং সর্বম্—"॥

ঈশোপনিষদের এই প্রথম মন্ত্রটি মহর্ষির অধ্যাত্মজীবনের রুদ্ধদ্বার কিভাবে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছিল, তাহা আমরা মহর্ষির আত্মজীবনী পাঠ করিলে জানিতে পারি। জগতের অতি তুচ্ছতম পদার্থও যে ঈশ্বরের শাশ্বত সত্তার দ্বারা ওত-প্রোতভাবে আচ্ছন্ন, তাহা এই মন্ত্রটিতে অপূর্বভঙ্গীতে উদ্‌ঘোষিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথও তাঁহার জীবনের প্রতি মুহূর্তে এই মন্ত্রের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য্য নিরন্তর ধ্যান করিতেন এবং তাঁর জীবনকে ইহার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিতে প্রয়াস করিতেন। ১৩২১ বঙ্গাব্দের ৭ই পৌষের উৎসব উপলক্ষে একটি ভাষণে কবি বলিতেছেন—

"ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ ধনম্॥"

"যে পরম ইচ্ছায় সমস্ত জগৎ বিধৃত ও চালিত, যে পরম ইচ্ছায় সূর্য্য চন্দ্র তারা নিয়মিত, এবং আকাশের অনন্ত-আরতি দীপের কোনোদিন নির্বাণ নাই, সেই পরম ইচ্ছার দ্বারা সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড যে আচ্ছন্ন ইহা উপলব্ধি করো।" সব সম্পন্দিত তাঁহার ইচ্ছার কম্পনে, তাঁর আনন্দের বিদ্যুতে। সেই আনন্দকে দেখো। তিনি ত্যাগ করছেন তাই ভোগ করছি। তিনি ত্যাগ করছেন তাই জীবনের উৎস দশ দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। আনন্দের নদী শাখায় প্রশাখায় বয়ে যাচ্ছে, ঘরে ঘরে স্বামী-স্ত্রীর পবিত্র প্রীতিতে—পিতামাতার গভীর স্নেহে—মাধুর্য্যধারার অবসান নেই। অজস্র ধারায় সেই জীবন, সেই আনন্দ, সেই প্রেম প্রবাহিত ; ভোগ করো, আনন্দে ভোগ করো। আকাশের নীলিমায়, কাননের শ্যামলিমায়, জ্ঞানে প্রেমে আনন্দে—ভোগ করো, পরিপূর্ণ-রূপে ভোগ করো। মা গৃধঃ। মনের ভিতরে কোনো কলুষ, কোনো লোভ না আসুক। পাপের লোভের সকল বন্ধন মুক্ত হোক। এই তাঁর দীক্ষার মন্ত্র।"৭

কবির প্রাত্যহিক জীবনচর্য্যার গুপ্ত রহস্য যেন উদ্ধৃত মন্ত্রব্যাখ্যানের মধ্যে ব্যক্ত হইয়াছে।

৫। 'কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ।'

রবীন্দ্রনাথ যেমন কবি ছিলেন, সেইরূপ অনলস কর্মীও ছিলেন। কর্মযোগের পথেই যে জীবনকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে পারা যায়, ইহাই ছিল রবীন্দ্রনাথের দৃঢ় ধারণা ; এবং তাঁহার জীবনও সেই সত্যেরই নিঃসংশয় সাক্ষ্য বহন করিতেছে। উপনিষদের মন্ত্রের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার এই সত্য-উপলব্ধির প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইয়াছিলেন। 'কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ'—এই মন্ত্রটিও সেই সত্যের প্রকাশ মাত্র। এই মন্ত্রটির তাৎপর্য্য সম্পর্কে কবি এক জায়গায় বলিয়াছেন—

"উপনিষৎ বলেছেন : কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ। কর্ম করতে করতেই শত বৎসর বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করবে। যাঁরা আত্মার আনন্দকে প্রচুররূপে উপলব্ধি করেছেন এ হচ্ছে তাঁদেরই বাণী। যাঁরা আত্মাকে পরিপূর্ণ করে জেনেছেন তাঁরা কোনোদিন দুর্বল মুহ্যমানভাবে বলেন না, জীবন দুঃখময় এবং কর্ম কেবলই বন্ধন। দুর্বল ফুল যেমন বোঁটাকে আলগা করে ধরে এবং ফল ফলাবার পূর্বেই খসে যায় তাঁরা তেমন নন। জীবনকে তাঁরা খুব শক্ত করে ধরেন এবং বলেন, 'আমি ফল না ফলিয়ে কিছুতেই ছাড়ছিনে।' তাঁরা সংসারের মধ্যে, কর্মের মধ্যে, আনন্দে আপনাকে প্রবলভাবে প্রকাশ করবার জন্যে ইচ্ছে করেন। দুঃখতাপ তাঁদের অবসন্ন করে না, নিজের হৃদয়ের ভারে তাঁরা ধূলিশায়ী হয়ে পড়েন না। সুখদুঃখ সমস্তের মধ্য দিয়েই তাঁরা আত্মার মাহাত্ম্যকে উত্তরোত্তর উদ্‌ঘাটিত করে আপনাকে দেখেন এবং আপনাকে দেখিয়ে বিজয়ী বীরের মতো সংসারের ভিতর দিয়ে মাথা তুলে চলে যান।"৮

৬। প্রাণস্তুতি।

"প্রাণো মৃত্যুঃ প্রাণস্তক্মা। নমস্তে অস্তু আয়তে। নমো অস্তু পরায়তে। প্রাণে হ ভূতং ভব্যং চ। যদিদং কিঞ্চ প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্। প্রাণো হ সূর্য্যশ্চন্দ্রমাঃ। নমস্তে প্রাণ ক্রন্দায়। নমস্তে স্তনয়িত্নবে। নমস্তে প্রাণ বিদ্যুতে। নমস্তে প্রাণ বর্ষতে।।"

উদ্ধৃত মন্ত্র-সম্পর্কে জগতে নীরন্ধ্র নিরবচ্ছিন্ন বিচিত্র প্রাণ-প্রবাহের যে আবাহন ঋষিকণ্ঠ হইতে ধ্বনিত হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথ তাহার দ্বারা মোহিত হইয়াছিলেন। সর্বত্রই প্রাণের স্ফূর্তি।—

"প্রাণ, প্রাণ, প্রাণ, সমস্ত প্রাণময়—কোথাও তার রন্ধ্র নেই, অন্ত নেই। এমনতরো অখণ্ড অনবচ্ছিন্ন উপলব্ধির মধ্যে তোমার যে সাধকেরা একদিন বাস করেছেন তাঁরা এই ভারতবর্ষেই বাস করেছেন, তাঁরা এই ভারতবর্ষেই বিচরণ করেছেন।"৯

রবীন্দ্রনাথের কবিদৃষ্টিও প্রাচীন ভারতের ঋষিগণের উদার দর্শনের সম গোত্রীয় ছিল ; তাই পরিদৃশ্যমান নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তির নিত্য বিবর্তনের বিচিত্র লীলা তিনিও সমান আবেগ ও উল্লাসের সহিত উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন।

৭। যো দেবোৎগ্নৌ যোৎপ্সু
যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু
তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ।।

পরম চৈতন্যের বিশ্বব্যাপক সত্তা, যাহা উদ্ধৃত মন্ত্রটিতে উদ্‌ঘোষিত হইয়াছে, তাহা রবীন্দ্রনাথের কবিমানসকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের নিকট তাই মন্ত্রটির আকর্ষণ এত বেশী ছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার একটি ভাষণে উল্লিখিত মন্ত্রটির যে-ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা হইতেই বুঝা যায় তিনি কি গভীরভাবে এই মন্ত্রের তাৎপর্য্য অনুধ্যান করিয়াছিলেন–

"পূর্ব ছত্রে আছে, যিনি অগ্নিতে, জলে, যিনি বিশ্বভুবনে প্রবিষ্ট হয়ে আছেন—তার পরে আছে, যিনি ওষধিতে, বনস্পতিতে, তাঁকে বারবার নমস্কার করি।

"হঠাৎ মনে হতে পারে, প্রথম ছত্রেই কথাটা নিঃশেষিত হয়ে গেছে। তিনি বিশ্বভুবনেই আছেন, তবে কেন শেষের দিকে কথাটাকে এত ছোটো করে ওষধি-বনস্পতির নাম করা হল ?

"বস্তুত, মানুষের কাছে এইটেই শেষের কথা। ঈশ্বর বিশ্বভুবনে আছেন, একথা বলা শক্ত নয় এবং আমরা অনায়াসেই বলে থাকি। একথা বলতে গেলে আমাদের উপলব্ধিকে অত্যন্ত সত্য করে তোলার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু, তার পরেও যে ঋষি বলেছেন 'তিনি এই ওষধিতে এই বনস্পতিতে আছেন' সে ঋষি মন্ত্রদ্রষ্টা। মন্ত্রকে তিনি মননের দ্বারা পাননি, দর্শনের দ্বারা পেয়েছেন। তিনি তাঁর তপোবনের তরুলতার মধ্যে কেমন পরিপূর্ণ চেতনভাবে ছিলেন—তিনি যে নদীর জলে স্নান করতেন সে স্নান কী পবিত্র স্নান, কী সত্য স্নান—তিনি যে ফল ভক্ষণ করেছিলেন তাদের স্বাদের মধ্যে কী অমৃতের স্বাদ দিল—তাঁর চক্ষে প্রভাতের সূর্যোদয় কী গভীর গম্ভীর, কী অপরূপ প্রাণময় চৈতন্যময়—সেকথা মনে করলে হৃদয় পুলকিত হয়।

"তিনি বিশ্বভুবনে আছেন এ কথা বলে তাঁকে সহজে বিদায় করে দিলে চল্‌বে না। কবে বলতে পারব তিনি এই ওষধিতে আছেন, এই বনস্পতিতে আছেন ?"১০

কবিচিত্তের এই আকূতি যে অপরিতৃপ্ত থাকে নাই, তিনি যে সত্যই সেই প্রাচীন ঋষিগণের ন্যায় অদ্বিতীয় মহান্‌ দেব, সর্বব্যাপক আত্মচৈতন্য বা

পরব্রহ্মের বিশ্বব্যাপক সত্তা আপনার অনুভূতির দ্বারা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা কবির নিম্নোদ্ধৃত পত্রাংশটি হইতে নিঃসংশয়রূপে প্রমাণিত হইতেছে—

"আমার প্রাণের মধ্যে গাছের প্রাণের গূঢ় স্মৃতি আছে, আজ মানুষ হইয়াছি বলিয়াই এ কথা কবুল করিতে পারিতেছি। শুধু গাছ কেন, সমস্ত জড়জগতের স্মৃতি আমার মধ্যে নিহিত আছে। বিশ্বের সমস্ত স্পন্দন আমার সর্বাঙ্গে আত্মীয়তার পুলক সঞ্চার করিতেছে—আমার প্রাণের মধ্যে তরুলতার বহু যুগের মূক আনন্দ আজ ভাষা পাইয়াছে—নহিলে আজ গাছে গাছে যখন আমের মুকুলের উচ্ছ্বাস একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে তখন আমি কোন্ নিমন্ত্রণে বসন্ত-উৎসবের আয়োজন করিতে যাই। আমার মধ্যে একটা বিপুল আনন্দ আছে, যেন এই জলস্থল গাছপালা পশুপক্ষীর আনন্দ—সে আপনি আমাকে কবুল করিতে দিবেন না কেন ?......আমি সূর্য চন্দ্র নক্ষত্র এবং মাটি পাথর জল সমস্তের সঙ্গে একসঙ্গে আছি এই কথাটা এক এক শুভ মুহূর্তে যখন আমার মনের মধ্যে স্পষ্ট সুরে বাজে তখন একটা বিপুল অস্তিত্বের নিবিড় হর্ষে আমার দেহ মন পুলকিত হইয়া উঠে। ইহা আমার কবিত্ব নহে, ইহা আমার স্বভাব। এই স্বভাব হইতেই আমি কবিতা লিখিয়াছি, গান লিখিয়াছি, গল্প লিখিয়াছি। অতএব ইহাকে গোপন করিবেন না। ইহাকে লইয়া আমি লেশমাত্র লজ্জাবোধ করি না। আমি মানুষ, এইজন্যই আমি ধূলামাটি জল গাছপালা পশুপক্ষী সমস্তই—ইহাই আমার গৌরব—আমার চেতনায় জগতের ইতিহাস দীব্যমান হইয়া উঠিয়াছে—আমার সত্তায় জড় ও জীবের সমস্ত সত্তা সম্পূর্ণ হইয়াছে।......"১১

উপনিষদের ঋষিকণ্ঠ নিঃসৃত বাণীর সহিত কবির এই আত্মোপলব্ধির কি নিবিড় ঐক্য ! সত্যই, "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি।"

৮। মৈত্রেয়ীর প্রার্থনা : 'যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্।'

বৃহদারণ্যক উপনিষদের অন্তর্গত যাজ্ঞবল্ক্য পত্নী মৈত্রেয়ীর করুণ প্রার্থনা মন্ত্রটি রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তে এক অনাস্বাদিতপূর্ব করুণ-মধুর অনুভূতির সঞ্চার করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

"যাহার দ্বারা আমি অমৃতত্ব লাভ করিতে না পারিব, তাহার দ্বারা আমার কি প্রয়োজন। আমি তাহা লইয়া কি করিব ?"

মৈত্রেয়ীর এই প্রার্থনাটিকে লক্ষ্য করিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"উপনিষদে সমস্ত পুরুষ ঋষিদের জ্ঞানগম্ভীর বাণীর মধ্যে একটিমাত্র স্ত্রীকণ্ঠের এই একটিমাত্র ব্যাকুল বাক্য ধ্বনিত হয়ে উঠেছে এবং সে ধ্বনি বিলীন হয়ে যায়নি। সেই ধ্বনি তাঁদের মেঘমন্দ্র শান্ত স্বরের মাঝখানে অপূর্ব একটি অশ্রুপূর্ণ মাধুর্য্য জাগ্রত করে রেখেছে। মানুষের মধ্যে যে পুরুষ আছে উপনিষদে নানা দিকে নানাভাবে আমরা তারই সাক্ষাৎ পেয়েছিলুম। এমন সময়ে হঠাৎ এক প্রান্তে দেখা গেল মানুষের মধ্যে যে নারী রয়েছেন তিনিও সৌন্দর্য্য বিকীর্ণ করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।"১২

রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তও সর্বদাই সেই অমৃতের স্পর্শ, সেই ভূমার উপলব্ধির

সন্ধানে নিরন্তর ব্যাপৃত ছিল। কোনও ক্ষুদ্র স্বার্থ, কোনও ক্ষুদ্র লাভ তাঁহাকে প্রলোভিত করিতে পারে নাই—

"গভীরের স্পর্শ চেয়ে ফিরিয়াছি, তার বেশি কিছু
হয়নি সঞ্চয় করা। অধরার গেছি পিছু পিছু।"১৩

রবীন্দ্রনাথের সাধনার ইহাই মূল কথা। এই অমৃতত্ব স্পৃহা যে একমাত্র প্রেমের মধ্যেই সার্থক হইয়া উঠিতে পারে, তাহাও রবীন্দ্রনাথ অনুপম ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন—

"মৃত্যুর মধ্যে এই অমৃতের স্পর্শ আমরা কোন্‌খানে পাই? যেখানে আমাদের প্রেম আছে। এই প্রেমেই আমরা অনন্তের স্বাদ পাই। প্রেমই সীমার মধ্যে অসীমতার ছায়া ফেলে পুরাতনকে নবীন করে রাখে, মৃত্যুকে কিছুতেই স্বীকার করে না।......এই প্রেমকেই যখন পরিপূর্ণরূপে পাবার জন্যে আমাদের অন্তরাত্মার সত্য আকাঙ্খা আবিষ্কার করি তখন আমরা সমস্ত উপকরণকে অনায়াসেই ঠেলে দিয়ে বলতে পারি: যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্।

"মৈত্রেয়ীর এই সরল কান্নাটি যে প্রার্থনারূপ ধারণ করে জাগ্রত হয়ে উঠেছিল তেমন আশ্চর্য্য পরিপূর্ণ প্রার্থনা কি জগতে আর কখনও শোনা গিয়েছে? সমস্ত মানবহৃদয়ের এই একান্ত প্রার্থনাটি এই রমণীর ব্যাকুল কণ্ঠে চিরন্তন কালের জন্যে বাণীলাভ করেছে। এই প্রার্থনাই আমাদের প্রত্যেকের একমাত্র প্রার্থনা, এবং এই প্রার্থনাই বিশ্বমানবের বিরাট-ইতিহাসে যুগে যুগান্তরে উচ্চারিত হয়ে আসছে।"১৪

রবীন্দ্রনাথের মানবপ্রেম, বিশ্বপ্রেম, সর্ববিধ সংকীর্ণতার প্রতি বিমুখতা মৈত্রেয়ীর এই প্রার্থনাবাণীর সহিত গভীর একাত্মতাসূত্রে গ্রথিত; ইহা তাঁহার জীবনসাধনার অঙ্গ, কোনও খ্যাতিলিপ্সার দ্বারা প্রণোদিত নহে।

৯। 'রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বাऽনন্দী ভবতি।'

রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মকে আনন্দস্বরূপ বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন; এবং যেহেতু রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে ব্রহ্ম কেবল বুদ্ধিগ্রাহ্য একটি এব্‌স্‌ট্র্যাক্‌ট্‌ তত্ত্বমাত্র নহে, এই নিয়ত পরিবর্তনশীল বিচিত্র বিশ্বসৃষ্টির মধ্য দিয়াই ব্রহ্ম আপন "স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া" ও আনন্দকে প্রকাশ করিয়া চলিতেছেন, সেইজন্য রবীন্দ্রনাথ বিশ্বপ্রকৃতির আনন্দরসসমুদ্রে আপনাকে নিমগ্ন করিয়া রাখিতে পারিয়াছিলেন, প্রকৃতির অফুরন্ত রসসমুদ্র ও আনন্দ মহাপ্লাবনের সঞ্জীবনীধারায় অবগাহন করিয়া আপন কবিপ্রকৃতিকে চিরসঞ্জীবিত করিতে পারিয়াছিলেন; তাই রবীন্দ্রনাথের কাব্য সেই ব্রহ্মানন্দের উৎসার-স্বরূপ। "কি আনন্দ, কি আনন্দ, কি আনন্দ", "জগতে আনন্দ যজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ"—ইহাই ছিল মহাকবির উচ্ছ্বসিত জীবন-সংগীত। উপনিষদের ঋষিকবিগণও ব্রহ্মের এই আনন্দস্বরূপ দ্বিধাহীন কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন—"রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী

ভবতি”—তৈত্তিরীয় উপনিষদের এই প্রসিদ্ধ মন্ত্রবর্ণটিতে। কবি, শিল্পী, জ্ঞানী, কর্মী, ভক্ত—প্রত্যেকেই সেই পরিপূর্ণ আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মের আনন্দের কণামাত্র তাঁহাদের কাব্যের মাধ্যমে, শিল্পের মাধ্যমে, জ্ঞান সাধনার ভিতর দিয়া, নিরন্তর কর্মযোগের মধ্য দিয়া, ভক্তি ও প্রেমের সাহায্যে প্রকাশ করিয়া চলিতেছেন—“এতস্যৈবানন্দস্য মাত্রামুপজীবন্তি।” সেইজন্য রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে আমাদের কোনও প্রকার কর্মই বন্ধনস্বরূপ হইতে পারে না, যদি সেই কর্মের মধ্য দিয়া আমরা সেই ব্রহ্মের আনন্দাংশকে প্রকাশ করিতে পারি—

" And joy is everywhere ; it is in the earth's green covering of grass ; in the blue serenity of the sky ; in the reckless exuberance of spring ; in the severe abstinence of grey winter ; in the living flesh that animates our bodily frame ; in the perfect poise of the human figure, noble and upright ; in living ; in the exercise of all our powers ; in the acquisition of knowledge ; in fighting evils ; in dying for gains we never can share. "১৫

রবীন্দ্রনাথের এই জীবন-দর্শনের সহিত উপনিষদের ঋষিগণের সেই উচ্ছ্বসিত আনন্দ-বন্দনার কি গভীর সাজাত্য—“কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।”

১০। চরৈবেতি। চরৈবেতি।।

রবীন্দ্রনাথের সাধনা ছিল নিত্য অগ্রগতির সাধনা, চলার সাধনা। তাঁহার ব্রহ্ম পরিবর্ত্তনশীল প্রকৃতির মধ্য দিয়াই নিয়ত বিবর্ত্তমান, একটি স্বতন্ত্র স্থিতিশীল অপরিণামী তত্ত্বমাত্র নহে। তাই রবীন্দ্রনাথের জীবনে কত বিচিত্র সাধনার সমাবেশ ; কোনও এক জায়গায় আসিয়া কবি থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়েন নাই। তাঁহার জীবনরস ‘লক্ষ্যশূন্য’ বেগে নিরুদ্দেশের অভিসারে যাত্রা করিয়াছে, গৃহী হইবার বাসনা তাঁহার নাই।—

> গৃহী কহে, “নিদারুণ ত্বরা দেখে মোর ডর লাগে,
> কোথা যেতে হবে বলো।” রথী কহে, “যেতে হবে আগে।”
> “কোন্‌খানে” শুধাইল। রথী কহে, “কোনোখানে নহে,
> শুধু আগে।” “কোন্ তীর্থে, কোন্ সে মন্দিরে” গৃহীকহে।
> “কোথাও না, শুধু আগে” “কোন্ বন্ধু-সাথে হবে দেখা।”
> “কারো সাথে নহে, যাব সব-আগে আমি মাত্র একা।”১৬

রবীন্দ্র-সাধনার ইহা এক অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য। যেখানেই তিনি অন্ধ কুসংস্কারের জড়তা দেখিয়াছেন, তুচ্ছ অর্থহীন আচারের অচলায়তন যখনই

তাঁহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে, সেইখানেই সেইক্ষণেই তিনি নির্মম আঘাত করিয়াছেন, অচলায়তনকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করিবার জন্য উদাত্ত আহ্বান শুনাইয়াছেন, অগ্রগতির বাণী তাঁহার কবিকণ্ঠ হইতে উগ্ররবে উদ্‌ঘোষিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের এই দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত 'ঐতরেয়-ব্রাহ্মণের' নঃশেপোপাখ্যানের অন্তর্গত গানগুলির অতি নিবিড় ঐক্য রহিয়াছে। তাই কবির নিকট এই গানগুলি অমূল্য রত্নরূপে প্রতিভাত হইয়াছিল।—

"নানা শ্রান্তায় শ্রীরস্তীতি রোহিত শুশ্রুম।
পাপো নৃষদ্‌বরো জন ইন্দ্র ইচ্চরত: সখা ।। চরৈবেতি ।।
পুষ্পিণ্যৌ চরতো জঙ্ঘে ভূষতুরাত্মা ফলেগ্রহিঃ।
শেরেহস্য সর্বে পাপ্মান: শ্রমেণ পপ্রথে হতশ্চরৈবেতি ।।
আস্তে ভগ আসীনস্যোর্ধ্বতিষ্ঠতি তিষ্ঠত:।
শেতে নিপদ্যমানস্য চরাতি চরতো ভগশ্চরৈবেতি ।।
কলিঃ শয়ানো ভবতি সঞ্জিহানস্তু দ্বাপরঃ।
উত্তিষ্ঠংস্ত্রেতা ভবতি কৃতং সম্পদ্যতে চরংশ্চরেবেতি ।।
চরন্ বৈ মধু বিন্দতি চরন্ স্বাদুমুদুম্বরম্।
সূর্য্যস্য পশ্য শ্রেমাণং যো ন তন্দ্রয়তে চরংশ্চরৈবেতি ।।"১৭

এই প্রসঙ্গে একজন প্রখ্যাত রবীন্দ্রসমালোচকের নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্যটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য—

"Tagore's restlessness, struggling for a better scheme of things, deep longing for an endless journey in the pursuit of the great unknown—all this is ascribed to Tagore's intimate acquaintance with European thought of the 19th Century. It is not necessarily a symbol of Western influence on Tagore's mind, because the hymn of "Onward March" in *Aitareya Brahmana* shows that Indian thought and philosophy never stood for a stagnant order. Tagore's rebellious mind drank deep in the philosophy of movement, preached especially in *Aitareya Brahmana*...................".

"...............The call of the eternal, this dynamic urge,—all this gave shape to Tagore's thought and philosophy. He had never known rest ; he had not advocated rest. That was why he had built up no cult of his own. He has moved on and on, without rest. This being the keynote of Tagore's thought, he is of the company of those spiritual rebels of ancient India".১৮

১১। ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি
ন চেদিহাবেদীদ্ মহতী বিনষ্টিঃ।
ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরা:
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি ।।

রবীন্দ্রনাথ কবি—ইহাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ পরিচয়। তাঁহার ধর্মও কবির ধর্ম।— "My religion is essentially a poet's religion" ইহা কবিরই স্বকণ্ঠ বিনিঃসৃত স্বীকারোক্তি।১৯ অতএব তাঁহার পক্ষে ঐহিক বাহ্য জগতের অস্তিত্বকে মায়া বলিয়া, স্বপ্ন বলিয়া, অলীক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া অসম্ভব ছিল, ইহা তাঁহার স্বভাব-বহির্ভূত। তিনি এই জগতের প্রত্যেক পদার্থকে, ইহার অনন্ত বৈচিত্র্যকে, ইহার আপাত-বিরোধ ও বৈষম্যকে মানিয়া লইয়াছিলেন ; কেননা ; প্রতিটি পদার্থের মধ্যেই তিনি পরম সত্য, আনন্দস্বরূপ, বিশ্বের একমাত্র নিধানভূত ব্রহ্মেরই লীলা অনুভব করিতেন। সীমার সহিত অসীমের, কর্মের সহিত মুক্তির, ঐক্যের সহিত বৈচিত্র্যের কোনও বিরোধ তাঁহার দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয় নাই—সমস্তই তাঁহার দৃষ্টিতে মধুময়, কেননা সমস্তই ব্রহ্মের ছায়া,—'যস্য চ্ছায়া অমৃতং যস্য মৃত্যুঃ'—অমৃতও যাঁর ছায়া, মৃত্যুও যাঁর ছায়া। অতএব ব্রহ্মের মধ্যে সকল বিরোধের সমন্বয়, কেননা ব্রহ্ম অখণ্ড, অদ্বিতীয়। এই ব্রহ্মবোধ যাঁদের ঘটিয়াছে, যিনি আনন্দের মধ্য দিয়া এই বিশ্ব-প্রকৃতির বিচিত্র লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহার নিকট ইহ-জগৎই মুক্তির লীলাক্ষেত্র—"আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।" ইহ জগতের প্রতি অশ্রদ্ধা নয়, ঐহিক সর্ববিধ বিষয়ের প্রতি আত্যন্তিক আনন্দময় শ্রদ্ধাপূর্ণ স্বীকৃতি, ইহাই ছিল রবীন্দ্রনাথের কবিধর্ম। উপনিষদের ঋষিগণেরও ইহাই বাণী, উদ্ধৃত মন্ত্রে তাহাই ধ্বনিত হইয়াছে।

"এঁকে যদি জানা গেল তবেই সত্য হওয়া গেল, এঁকে যদি না জানা গেল তবেই মহাবিনাশ। ভূতে ভূতে সকলের মধ্যেই তাঁকে চিন্তা করে ধীরেরা অমৃতত্ব লাভ করেন।"২০

বিশ্ববোধের উদ্বোধনেই উপনিষদের মন্ত্ররাজির তাৎপর্য্য। রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববোধও তাই উদার গম্ভীর মন্ত্রের মধ্যে আপন অনুভূতির সমর্থন লাভ করিয়া সকল বাধাকে নির্ভয়ে অতিক্রম করিতে পারিয়াছিল—

"ভারতবর্ষের এই মহৎ সাধনার উত্তরাধিকার যা আমরা লাভ করেছি তাকে আমরা অন্য দেশের শিক্ষা ও দৃষ্টান্তে ছোটো করে মিথ্যা করে তুলতে পারব না। এই মহৎ সত্যটিকেই নানা দিক দিয়ে উজ্জ্বল করে তোলবার ভার আমাদের দেশের উপরেই আছে। আমাদের দেশে এই তপস্যাটিকেই বড়ো রকম করে সার্থক করবার দিন আজ আমাদের এসেছে। জিগীষা নয়, জিঘাংসা নয়, প্রভুত্ব নয়, প্রবলতা নয়—বর্ণের সঙ্গে বর্ণের, ধর্মের সঙ্গে ধর্মের, সমাজের সঙ্গে সমাজের, স্বদেশের সঙ্গে বিদেশের ভেদ বিরোধ বিচ্ছেদ নয়—ছোটোবড়ো আত্মপর সকলের মধ্যেই উদারভাবে প্রবেশের যে সাধনা সেই সাধনাকেই আমরা আনন্দের সঙ্গে বরণ করব। আজ আমাদের দেশে কত বিভিন্ন জাতি, কত ভিন্ন ধর্ম, কত ভিন্ন সম্প্রদায় তা কে গণনা করবে? এখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের কথায় কথায় পদে পদে যে ভেদ। এবং আহারে বিহারে সর্ব বিষয়েই মানুষের প্রতি মানুষের ব্যবহারে যে নিষ্ঠুর অবজ্ঞা ও ঘৃণা প্রকাশ পায় জগতের অন্য কোথাও আর তার তুলনা পাওয়া যায় না। এতে করে আমরা হারাচ্ছি তাঁকে যিনি সকলকে

নিয়েই এক হয়ে আছেন, যিনি তাঁর প্রকাশকে বিচিত্র করেছেন কিন্তু বিরুদ্ধ করেন নি। তাঁকে হারানো মানেই হচ্ছে মঙ্গলকে হারানো, শক্তিকে হারানো, সামঞ্জস্যকে হারানো এবং সত্যকে হারানো।"২১

উপনিষদের মন্ত্ররাজি কিভাবে কবিচিত্তকে প্রভাবিত করিয়াছিল, তাহারই কয়েকটিমাত্র নিদর্শন এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে সংকলিত কবিরার চেষ্টা করা হইল। উপনিষদ্ যে রবীন্দ্রনাথের নিকট কেবল মননের বিষয় ছিল না, উপনিষদের ভাবধারা যে তাঁহার জীবনের অস্থি-মজ্জার সহিত অবিচ্ছেদ্য ভাবে মিশ্রিত হইয়া গিয়া তাঁহার মর্ত্ত্যজীবনের বিচিত্রমুখী সাধনার মূলে অক্ষয় প্রেরণার উৎসরূপে সতত বিরাজমান ছিল, এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করিতে আর আমাদের বিলম্ব হওয়া উচিত নয়॥

॥ টিপ্পনী ॥

১। দ্র° *Sādhanā :* Author's Preface, p. vii.
২। দ্র° নলিনীকান্ত গুপ্ত : রবীন্দ্রনাথ, পৃঃ ৯৭ ('রবীন্দ্রপ্রতিভার ধারা' শীর্ষক প্রবন্ধ)।
৩। জীবন-স্মৃতি : 'পিতৃদেব' শীর্ষক অধ্যায় দ্রষ্টব্য।
৪। দ্র° শান্তিনিকেতন ('ওঁ'), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩২৩। (২ খণ্ডে পরিবর্জিত ও পরিবর্ধিত। সংস্করণ আলোচ্য।) তুলনীয় : "প্রণবব্যাহৃতিভ্যাঞ্চ গায়ত্র্যা ত্রিতয়েন চ।
উপাস্যং পরমং ব্রহ্ম আত্মা যত্র প্রতিষ্ঠিতঃ॥"—যাজ্ঞবল্ক্য।

উদ্ধৃত যাজ্ঞবল্ক্য বচনের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল গায়ত্রী মন্ত্রের তাৎপর্য্য যে-ভাবে বিবৃত করিয়াছেন তাহা সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য :

"Now the প্রণব means Brahma the first cause, the source of the Cosmos, corresponding to God the Father ;........... the ব্যাহৃতি means the manifestation of ব্রহ্ম as pervading the Cosmos ভূ ভুর্বঃ স্ব : .... and the Gāyatrī expresses ব্রহ্ম as the light of light in our souls, our inspiration and impulse to all that is good, even unto Salvation,—corresponding to the Holy Ghost. "—*Comparative Studies in Vaishnavism and Christianity* (1899), pp. 85-86.

৫। ঐ ('ভক্ত'), ২য় খণ্ড. পৃ. ৪।
৬। ঐ ২য় খণ্ড. পৃ. ৪।
৭। ঐ ২য় খণ্ড. পৃ. ৪১৬ ('দীক্ষার দিন')
৮। শান্তিনিকেতন, ('কর্মযোগ'), ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৭২।
৯। ঐ, ('বিশ্ববোধ'), ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫০।
১০। ঐ, ('বিশ্বব্যাপী') ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৭৬-৭৭।
১১। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়কে লিখিত কবির পত্রাংশ। দ্র° 'ছিন্নপত্র'. পৃঃ ২৮৯-৯১ (১৩৬৭ সংস্করণ)।

১২। শান্তিনিকেতন. ('প্রার্থনা'), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪১।
১৩। দ্র° পরিশেষ: 'প্রণাম'।
১৪। শান্তিনিকেতন ('প্রার্থনা), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৩।
১৫। দ্র° *Sadhana*, p. 116 ('Realisation in Love').
তু° "......ভাঙো ভাঙো, উচ্চ করো ভগ্নস্তূপ
জীর্ণতার অন্তরালে জানি মোর আনন্দস্বরূপ
রয়েছে উজ্জ্বল হয়ে। সুধা তারে দিয়েছিল আনি
প্রতিদিন চতুর্দিকে রসপূর্ণ আকাশের বাণী,
প্রত্যুত্তরে নানাছন্দে গেয়েছে সে 'ভালো বাসিয়াছি।'
সেই ভালোবাসা মোরে তুলেছে স্বর্গের কাছাকাছি
ছাড়ায়ে তোমার অধিকার।........"—সেঁজুতি: 'জন্মদিন'।
১৬। দ্র° পরিশেষ: [সংযোজন]: 'লক্ষ্যশূন্য'।
১৭। দ্র° ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৩৩শ অধ্যায়, ৩য় খণ্ড।
১৮। দ্র° Dr. Sachin Sen M.A., Ph.D.: *The Political Thought of Tagore* (1947), pp. 13-14.
১৯। দ্র° *The Religion of an Artist.*
২০। শান্তিনিকেতন ('বিশ্ববোধ'), ২য় খণ্ড. পৃঃ ৪৩।
২১। ঐ. ২য় খণ্ড. পৃঃ ৪৪।

নৈবেদ্য ও প্রান্তিক

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

কবিস্বভাবকে কোলরিজ প্রজাপতির সঙ্গে তুলনা ক'রে বলেছিলেন: 'The poetic psyche in its process to full dcvelopment, undergoes as many changes as its Greek name-sake, the butterfly'। কথাটি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অপরূপ মিলে যায়। পরিবর্তন-পরম্পরার মধ্য দিয়ে বিবর্তনের কবি রবীন্দ্রনাথ। কথাটাকে আরো একটু বিশদ করতে গেলে বলতে হয়, তিনি পরিণামী অভিব্যক্তিবাদ বা teleological evolution-এর কবি। ক্রমশগোচর একটি পরিণতির দিকে তিনি নিরন্তর ধাবনতার রোমাঞ্চে এগিয়ে গেছেন। এবং, সেই কারণে, পরিবর্তিত হবার ঝুঁকিওতাঁকে বারম্বার নিতে হয়েছে।

রবীন্দ্র-স্বভাবে বিবর্তনের এই আগ্রহ এত তীব্র এত স্রোতগ যে কখনো-কখনো তাঁর পরিবর্তন প্রায় অবিশ্বাস্য ব'লে বোধ হয়। সন্ধ্যাসংগীত-প্রভাত সংগীত, সোনার তরী—চিত্রা, খেয়া-গীতাঞ্জলি—পরস্পরের সম্পূরক এই সব যুগ্ম গ্রন্থের পাঠকও নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, যে-পরিবর্তন প্রথমে মাত্রাগত হিসেবে দেখা দিয়েছিলেন, তা কেমন চরিত্রগত হয়ে উঠেছে।

রচনাকালের ব্যবধান যেখানে দুস্তর, এমন ক্ষেত্রে এই চরিত্রগত পরিবর্তন দেখলে প্রশ্ন জাগতে পারে, একাধিক পর্যায়ে রচিত ঐ বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থের লেখক একই রবীন্দ্রনাথ কিনা। নৈবেদ্য এবং প্রান্তিককে এই প্রশ্নের প্রেক্ষনীতে দেখা যেতে পারে।

আলেক্জান্দ্রানা টলস্টয়কে লেখা একটি পত্রমালার কথা মনে রেখে টলস্টয় বলেছিলেন: 'এই চিঠিগুলি আমার আত্মজীবনী।' এই পত্রপ্রবাহে শুধু ব্যক্তিগত ঘটনার স্মৃতিসাক্ষ্য নেই, সেই সঙ্গে, কিম্বা তাকে ছাপিয়েও আছে টলস্টয়ের মতামত, ধ্যানধারণা। প্রসঙ্গত একথা বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের সমস্ত রচনাই আত্মজীবনীমূলক। আত্মজীবনী শব্দটির প্রচলিত অভিধা সম্প্রসারিত ক'রে যদি 'নিজস্ব জীবন-জিজ্ঞাসা' বলা চলে, তবে মেনে নিতে হয়, রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন ধ'রেই আত্মবিবরণী জ্ঞাপন করেছেন। নৈবেদ্যের রচনাগুলি বিশেষভাবেই, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'আত্মজৈবনিক'। সমসাময়িকপৃথিবী এবং নিজেকে তিনি নৈবেদ্যের কবিতাগুচ্ছে একই নিশ্বাসে ব্যক্ত করেছেন।

নৈবেদ্য-কালীন বিশ্বাবর্তের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিতে গিয়ে একজন লেখক

বলেছেন : 'এই সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংরেজরা বুয়রদের দেশ আক্রমণ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত ; চীনদেশের উপরেও য়ুরোপীয় সপ্তরথীদের আক্রমণ ও লাঞ্ছনা চলিতেছে।'(১) বস্তুত, নৈবেদ্যের অনেকগুলি কবিতায় এই ক্ষতবিক্ষত সময়ের অভিমন্যুর অন্তর্জ্বালা, বিবৃত হয়েছে। ৬৪, ৬৫ ও ৬৬ সংখ্যক তিনটি চতুর্দশপদী পর-পর প'ড়ে গেলেই একথা বুঝতে বিলম্ব হয়না, রবীন্দ্রনাথ নিজের জন্য কোনো আত্মসংবৃত প্রার্থনাকে স্বতন্ত্র ক'রে রাখেন নি, জনহীন কোনো দেবালয়ে আরতিদীপ জ্বালতে চাননি। পাশাপাশি, ৮৫, ৮৬ ও ৮৭ সংখ্যক তিনটি চতুর্দশপদী একসঙ্গে পাঠ করলেই আমরা বুঝতে পারি, রবীন্দ্রনাথ মূলত ব্যক্তিজীবন অথবা অন্তর্জীবনের কোনো দারুণ দুরূহ ট্র্যাজেডি থেকেও নিষ্ক্রমণ খুঁজছিলেন। 'দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টি, অতি দীর্ঘকাল, হে ইন্দ্র হৃদয়ে মম' অথবা 'আমার এ মানসের কানন কাঙাল শীর্ণ শুষ্ক বাহু মেলি বহু দীর্ঘকাল আছে ক্রুদ্ধ উর্ধ্বপানে চাহি'—ইত্যাদি পংক্তিকে আনন্দসর্বস্ব কবির উচ্চারণরূপে না দেখলেও অন্যায় হয়না।

রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রকৃতির চূড়ান্ত সংকটপর্ব সেই সব সময়েই প্রকট যখন সভ্যতার সংকট এবং তাঁর কবিচিত্তের সংক্ষোভ একটি অভিন্ন বৃন্তে বিধৃত এবং বেপমান হতে পেরেছে। ঈওলিয়ান বীণার মতোই তাঁর অন্তরতন্ত্রী বহির্জগতের বাতাসে কেঁদে উঠেছে। শেলি বা হুগোর রোমান্টিকতায় সমাজ ও সভ্যতার সঙ্গে শুভবুদ্ধির সাহায্যে যুক্ত হবার যে-অভীপ্সা,(২) তার অনুরূপ প্রবণতা রবীন্দ্রনাথে অত্যন্ত স্পষ্ট। সে-দিক দিয়ে দেখলে, নৈবেদ্যও যুগসংক্রান্তি এবং ব্যক্তি-স্বাশ্রয়ী জীবন-সমস্যার কাব্যমীমাংসা। নৈবেদ্য, অন্ত্য-বিশ্লেষণে, মিলনান্ত ভক্তিরসের কাব্যগ্রন্থ। এ-মিলন ঈশ্বরের সঙ্গে ভক্তের, পিতার সঙ্গে পুত্রের। এই মিলনের পটভূমি চিরন্তন ভারতবর্ষ, এ-মিলন বৈতালিক নরনারীবৃন্দের সম্মুখে প্রকাশ্য মিলন।

মাঘের সূর্য যখন উত্তরায়ণে, প্রান্তিক সেই মুহূর্তের রচনা। রচনার প্রাক্কালে তাঁর আকস্মিক সংজ্ঞাশূন্যতা এবং অসুস্থতায় সংবাদ সবার জানা। প্রাসঙ্গিক পর্যালোচনায় রবীন্দ্রনাথ নিজেই এই বিপর্যয়ের কথা বলেছেন :—

'কিছুকাল পূর্বে আমি মৃত্যুগুহা থেকে জীবনলোকে ফিরে এসেছি। যে মূলধন নিয়ে সংসারে এসেছিলাম, কর্মপরিচালনার জন্য শরীর মনের যে শক্তি আবশ্যক তা যেন আজ পূর্ণ পরিমাণে সেই, অনেকটা তার লুপ্ত হয়েছে অতলস্পর্শে......এখন যদি ইন্দ্রিয়শক্তি ক্লান্ত হয়ে থাকে তবে অধ্যাত্মলোক বাকি আছে ; আমাদের যে-শক্তি ক্ষুধাতৃষ্ণার দিকে আসক্তির দিকে আমাদের

---

(১) রবীন্দ্রজীবনী (২য় খণ্ড, পৃঃ ১৫)—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

(২) এই সূত্রে J. M. Cohen এর Poetry of This Age (পৃঃ ১২) বইখানি দেখা যেতে পারে।

গুহাবাসী পশুটাকে তাড়না করে তা যদি মান হয় তবে অন্তরের দিক থেকে মনুষ্যত্বের সিংহদ্বার খোলা সহজ হবে।'(৩)

কথাগুলি শুনে প্রথম অলিঘাতে চম্‌কে উঠতে হয়। কার কাছ থেকে শুনছি? সাবলীল, শীলভদ্র বিশ্বাসের কবি রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে? প্রান্তিকের কবি, প্রকৃত প্রস্তাবে, নৈবেদ্যের কবির অন্য মেরুতে দাঁড়িয়ে এই কথাগুলি বলেছেন। নৈবেদ্যের সর্বশেষ অর্থাৎ শততম কবিতার সর্বশেষ দুটি পংক্তিতে উতল উত্তাল মাত্রাবৃত্তে কবি বলেছেন:—

শত বিশ্বাস ভেঙে যদি যায় প্রাণে
এক বিশ্বাসে রহে যেন মন লাগিয়া।

পক্ষান্তরে, প্রান্তিকের কবিতাবলীতে শত বিশ্বাসের সঙ্গে এক বিশ্বাসের দ্বন্দ্ব।

প্রান্তিক-পর্বের পৃথিবীও উত্তেজিত। রবীন্দ্র-জীবনীকার এর যথাযথ বর্ণনা দিয়েছেন: 'গত বৎসর হইতে জাপান চীন আক্রমণ করিতেছে; শাংহাই, নানকিং প্রভৃতি মহানগরী অচিরকালের মধ্যে তাহাদের করায়ত্ত হইবার মতো হইয়াছে।'(৪) প্রান্তিকের একাধিক কবিতায় অরুন্তুদ এই কালান্তরের সন্তাপ সঞ্চিত আছে। এবং নৈবেদ্যের কবিতায় শুভার্থী কবির যে ভাবিকথকসুলভ আশঙ্কা আছে, তা প্রান্তিকে আরো গভীর। শুধু যে গভীরতর, তাই নয়। কবি এখানে আদর্শচ্যুত শতাব্দীর প্রতি ক্ষমাহীন, অনপমেয় অভিসম্পাত উচ্চারণ করেছেন। এবং এর ভাষায় মঞ্জরীর মসৃণতা নেই, ক্ষুভিত কণ্ঠনাদ যেন ত্রৈস্বর্য-বিন্যাসের বিধিনিষেধ ভুলে শুধু উদাত্ত, উত্তোলিত।

কিন্তু প্রান্তিকের মূল প্রস্বর ব্যক্তিগত, একথা বললে অন্যায় হবেনা। প্রান্তিকের কবিও পারিপার্শ্বিক পরিবেশের দুঃখে স্পর্শচেতন, এমন কি, প্রহরীর মতো উৎকণ্ঠিত। কিন্তু প্রান্তিকের অধিকাংশ কবিতায় যে-হলাহল উৎক্ষিপ্ত হয়েছে, তা কবির ব্যক্তিহৃদয়ের। বস্তুত, আয়ুপ্রান্তের রচিত এই সব কবিতায় যে-দেবাসুরের সমর লক্ষ্য করি তা ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথের কোনো কাব্যে দেখা যায় নি। বলাকার 'যে-মুহূর্তে পূর্ণ তুমি সে-মুহূর্তে কিছু তব নাই' এবং প্রান্তিকের 'বিরচিতে হবে নূতন জীবনচ্ছবি শূন্য দিগন্তের ভূমিকায়'—এই দুই শূন্যতা এক নয়। প্রথমোক্ত শূন্যতা শিল্পী-সাধকের অমিশ্র নিষ্কলুষ, নিরঞ্জন ও সাত্ত্বিক; শেষোক্ত শূন্যতা শিল্পী ও সাধকের বিচ্ছেদের অন্তর্বর্তীকালীন গরলসিন্দুর, তমিস্র একটি অভাববোধ।

---

(৩) নববর্ষ ১৩৪৫ জ্যৈষ্ঠ। রবীন্দ্র জীবনী (৪র্থ খণ্ড পৃঃ ৯৮) গ্রন্থে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় কবিপ্রদত্ত ভাষণ থেকে উদ্‌ধৃত করেছেন।

(৪) রবীন্দ্রজীবনী (৪র্থ খণ্ড পৃঃ ৯৭)

একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে, প্রান্তিকের কবিতাগুলিতে ঈশ্বরের কোনো ভূমিকা নেই, ভারতবর্ষের কোনো পটভূমিকা নেই। 'আমি তো সাধক নই, আমি গুরু নই আমি কবি'—পরিশেষের 'পান্থ' কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের এই অঙ্গীকার আছে। বিবিক্ত কবিসত্তার এই দর্প এবং পীতাভ দ্যুতি প্রান্তিকের প্রত্যঙ্গে বিচ্ছুরিত। তাই, 'লব আমি চরমের কবিত্বমর্যাদা জীবনের রঙ্গভূমে, এরি লাগি সেধেছিনু তান'—এই উক্তিটির মধ্যে কবি-সাধকের সেই অদ্বৈতসমাধা আর পাওয়া যাবেনা যা উনবিংশ শতাব্দীর কাব্যরুচিকে ঘিরে ছিল; বরং এখানে বিংশ শতাব্দীর আধুনিক রবীন্দ্রনাথের বিনিঃশেষ শিল্পবীক্ষাটিকেই নিরীক্ষণ করি।

সুতীব্র একটি একাকিত্বের দায়িত্ব ও আস্বাদ প্রান্তিকের স্তোত্রগুলিতে দেখতে পাই। 'অকস্মাৎ মহা-একা ডাক দিল একাকীরে প্রলয়তোরণচূড়া হতে'—এই শোচনীয়তার সূত্র ধ'রে কবি এখানে একটি সৃষ্টিধর্মী একাকিত্বের—যার অপর নাম শিল্পীর দায়িত্ব—মধ্যে আশ্রয় খুঁজেছেন। কিন্তু এই বিজন চেতনা-ও দ্বিখণ্ডিত। 'বনবানীর' রচনাবলী-সংস্করণের ভূমিকায় নিজের কাছ থেকে পালিয়ে যাবার যে-অস্থির আকুলতা, প্রান্তিকের কোনো-কোনো কবিতায় তা আরো প্রগাঢ়:

> একী অকৃতজ্ঞতার বৈরাগ্যপ্রলাপ ক্ষণে ক্ষণে,
> বিকারের রোগীসম অকস্মাৎ ছুটে যেতে চাওয়া
> আপনার আবেষ্টন হতে।
>
> —৭ সংখ্যক কবিতা

উদ্ধৃত অংশের তৃতীয় চরণে এসে হঠাৎ পংক্তিখণ্ডন ক'রে তারপরের উদ্বৃত্ত পংক্তিতে 'ধন্য এ জীবন মোর'—একথা বলার মধ্যে যতোই সুস্থ সুঠাম জীবন-যাপনের নাটকীয় ঘোষণা থাকুক না কেন, তা থেকে প্রমাণ হয় না যে কবিস্বরূপ এখানে বহির্জীবনের সঙ্গে হৃত আত্মীয়তা পুনরুদ্ধারে বৃত হয়েছেন। সপ্তম এবং অষ্টম কবিতায় রঙ্গমঞ্চ এবং সাজঘরের চিত্রকল্প নির্বিকল্প সার্থকতার সঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে। শিল্পীর জীবনে যে-প্রাতিভাসিক শিল্পের সাহায্যে হারানো জীবনের ক্ষয়ক্ষতিপূরণ হতে পারে, এই কথাটিকে বোঝাতে গিয়েও বীথিকার 'নাট্যশেষ' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ রঙ্গমঞ্চের চিত্রকল্প প্রয়োগ ক'রে বলেছেন:

> সেদিন আজিকে ছবি হৃদয়ের অজন্তা গুহাতে
> অন্ধকার ভিত্তিপটে; ঐক্য তার বিশ্বশিল্প-সাথে।

কিন্তু এই মিলান্ত্য পংক্তিদ্বয়ের মধ্যে শিল্পের অভিযোজনজনিত যে-সান্ত্বনা আছে, প্রান্তিকে—সহজের মধ্যে ফিরে-ফিরে আসার ঘোষণা সত্ত্বেও—তা নেই।

সাজঘরের মধ্যে পরিত্যক্ত অভিনেতার যে-শোচনা ও দিক্‌শূন্যতা, এখানে তারি পরিচয় মূর্ত হয়ে আছে। অবচেতনার দ্বারা আক্রান্ত এই নিঃসঙ্গতা থেকে যে-Mysticism চেহারা নিলো তাকে শিল্পীর মরমিয়াবাদ বলা যায়। তা ঐশী বশ্যতাস্বীকারে আপ্লুত নয়, আত্মসান্নিধ্যের অস্বস্তিকর বাস্তবতায় দীপ্যমান। 'বোল অবোল মধ্য হৈ সোই'—কবীর আবিষ্কার করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ 'আলো-আঁধারের সন্ধিস্থলে' একজন অক্ষরপুরুষকে এখানে উন্মোচিত করেছেন যিনি তাঁর শিল্পী-সত্তারই অন্তর, প্রতিমূর্তি। গীতাঞ্জলির কবিতায় যে-রূপাতীত আনন্দময়-কে দেখতে পাই, তিনি শুভ্র। পক্ষান্তরে, প্রান্তিকে—

এক কৃষ্ণ অরূপতা নামে বিশ্ববৈচিত্র্যের 'পরে
স্থলে জলে। ছায়া হয়ে, বিন্দু হয়ে মিলে যায় দেহ
অন্তহীন তমিস্রায়।

—নবম কবিতা

এর পরেই যদিও 'দেখি তারে যে-পুরুষ তোমার আমার মাঝে এক', একথাটি প্রত্যয়দৃপ্ত স্বরে উচ্চারিত হয়েছে, তবু বিশ্বধাতার সঙ্গে লীন হওয়া অথবা তাঁর পদপ্রান্তে জীবনের বিকীর্ণ সূত্রগুলিকে গুটিয়ে আনার কোনো প্রয়াস বা প্রযত্ন নেই। এই Mysticism-এ প্রতীতির পাশাপাশি অনাস্থা, আলোর পাশাপাশি অন্ধকারের স্থান আছে। তাই প্রান্তিকের ভাষায় স্ফটিকনির্মল হওয়া সত্ত্বেও আত্মগত শিল্পীর মন থেকে আপাত-অসংলগ্ন, অস্পষ্ট স্তোভপুঞ্জ উৎসারিত হয়ে চলেছে। আলো-অন্ধকারের অধীশ্বর, যাঁর সিংহাসন অন্ধকারের মধ্যে পরিব্যাপ্ত, এমন একটি বিশ্বস্টার দিকে তাকিয়ে Charles wesley সাক্ষ্য সামগাথা রচনা করেছিলেন:

All praise to him who dwells in bliss,
Who made both day and night ;
Whose throne is darkness in the abyss
Of uncreated light.

প্রান্তিকে এই সন্দিক্ষণের ঈশ্বরকে হোমার্ঘ্য দেওয়া হয়েছে। সে-ঈশ্বর কবি নিজে।

নৈবেদ্যের ২২ থেকে ৯৯—এই আটাত্তরটি কবিতায় একটি সনেট-লহরী বা sonnet-sequence প্রবাহিত। স্তবক-স্থাপনার,কিম্বা পংক্তি বিন্যাসে বৈচিত্র্য আছে যথেষ্ট। কখনো আরোহকে চার কিম্বা, ছটি পংক্তিতে নিবদ্ধ ক'রেছেন, কখনো একটি বিচ্ছিন্ন পংক্তি কি দ্বিপদীকে শিরোনামার মতো ক'রে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। আবার, যুক্তিসোপান কিম্বা আত্মপ্রশ্নের স্তরে-স্তরে পংক্তিকে টুকরো ক'রে নিশ্চিত সমর্পণের সিদ্ধান্তের দিকে এগিয়ে যাওয়ার একাধিক দৃষ্টান্তও বিরল নয়। প্রান্তিকের আঠারোটি কবিতাই তানপ্রধান

ছন্দোবন্ধের কাঠামোয় দীর্ঘ পয়ারে বিন্যস্ত। কিন্তু এগুলিকে কি সনেট বলবো ?

সনেটের সম্ভাব্য উৎস 'Son' শব্দটিতে ত্রুবাদুর্স কবিতার একরকম গীতিবন্ধ বোঝাতো। ইতালিয় ভাষায় ওর আকার হলো sonnetts এবং অর্থ দাঁড়ালো বিশেষ একরকম কাব্যরূপ। এই কাব্যরূপ প্রবহমান একটি লোক-কাব্যধারা থেকে ক্রমে-ক্রমে আকারিত হয়ে উঠেছিল। প্রথমে আটটি দ্বিপদী-প্রতিম পদ্যের একটি strambotto এবং পরে ছ'টি পদ্যের আরেকটি (ab ab ab ab / cd cd cd'—এই ছিলো তার ঠাট) পরে দ্বিতীয় স্ত্রম্বত্তো'র মধ্যে ছটি স্পষ্ট ভাগ দেখা দিলো এবং দেখাদেখি প্রথম স্ত্রম্বত্তোও রূপভেদে উপনীত হলো।(৫) বস্তুত, সনেটের জন্মবৃত্ত এখানে অবতারণা করা বর্তমান প্রবন্ধকারের উদ্দেশ্য নয়। এটুকুই এখানে বক্তব্য, সনেট তার উৎসে এবং গতি-পরিণতি সজীব একটি রূপবন্ধ। এই রূপবন্ধ প্রতিভাবান্ কবিদের হাতে অসংখ্য বৈচিত্র্যের উপলক্ষ হয়েছে এবং চৌদ্দটি চরণ তার আপাত-লক্ষণ, অন্তরঙ্গ আত্মা নয়।

প্রান্তিকের কবি, মনে হয়, সচেতন ভাবেই সনেট সম্বন্ধে গৃহীত ধারণাটিকে অস্বীকার করেছেন। প্রান্তিকের প্রথম কবিতাটি কি মিলটনের মতো আরোহ-অবরোহের ভেদরেখালোপী দুটি চতুর্দশপদীর সমন্বয় ? (৩, ৫, ১৪ ও ১৬ সংখ্যক সনেটগুলি তো গড়নের দিক থেকে স্পষ্টতই মিল্‌টন-সন্নিভ।) দ্বিতীয় কবিতাটি কেন একটিমাত্র অষ্টকেই সীমাবদ্ধ, সমাপ্ত ?—একটি অষ্টক যোজিত হলে ওর মধ্যে কি একটি বিস্তৃতিগুণ উৎপন্ন হতো না ? এই সব প্রশ্ন প্রান্তিক পড়বার সময় পাঠককে জাগরূক রাখে। সৃজনের আগ্নেয় মুহূর্তে সনেটের প্রথানুগত আধার fluid form বা দ্রবীভূত রূপকল্পে পরিণত হয়েছে, এই উত্তরটিই পাঠকের বিবিধ প্রশ্নের নিরসন করে। তাই, প্রান্তিকের যেসব কবিতা সনেটশরীরী নয় সেগুলিও স্পর্শত সনেটের লক্ষণান্বিত।

উপকরণ এবং রূপের বহিরঙ্গ সাদৃশ্য সত্ত্বেও নৈবেদ্য এক্ প্রান্তিক পরস্পর-সদৃশ নয়। প্রথম কাব্যের কবি ততটা আধুনিক নন যতটা আধুনিকতা শেষোক্ত সংকলনের রচয়িতার অন্তর্নিহিত। সে-আধুনিকতাও নিছক কালগত নয়, ভাবগত। এবং একই লেখকের ব্যক্তি প্রকৃতির দুই পর্বের মধ্যে যে-পার্থক্য, তার চেয়েও অপার উপত্যকা এ-দুটি গ্রন্থের মধ্যে উদ্যত। এক ও অনেক রবীন্দ্রনাথ। নৈবেদ্য ও প্রান্তিক কি একই কবির লেখা ?

---

(৫) H. J. Chaytor-এর The Troubadours of Dante বইটিতে সনেটসংক্রান্ত তথ্য মিল,ব।

রবীন্দ্র প্রতিভার স্বরূপ

অশোকবিজয় রাহা

।। কবিপুরুষ ।।

রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ; শুধু এ-যুগের নয় সর্বকালের মহত্তম কবিদের একজন। বাল্মীকি ও বেদব্যাসকে বাদ দিলে ভারতবর্ষের আর দু'জন বিশ্ববরেণ্য কবির নাম করা যায়ঃ কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ। দু'জনের মাঝখানে বহু শতাব্দীর ব্যবধান।

শুধু কবি হিসাবেই রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে এক পরম বিস্ময়। সেই সঙ্গে তাঁর বহুমুখী প্রতিভার কথা ভাবলে স্তম্ভিত হতে হয়। ষাট বছরেরও উর্ধ্বকাল ধ'রে [১]অজস্র ধারায় উৎসারিত তাঁর বিচিত্র সৃষ্টিপ্রবাহকে এক আশ্চর্য নৈসর্গিক ঘটনা ব'লে মনে হয়। এদিক থেকে আমাদের দেশে তাঁর সত্যি তুলনা নেই। কেউ কেউ পাশ্চাত্য কবি গ্যয়টের সঙ্গে এ-বিষয়ে তাঁর সাদৃশ্যের ইঙ্গিত করেছেন। সে-তুলনা সর্বাংশে সার্থক হবে এমন দাবি তাঁরাও নিশ্চয়ই করবেন না।

কবিতা, নাটক, উপন্যাস, ছোটো ও বড়ো-গল্প, কথিকা, প্রবন্ধ, আত্ম-কাহিনী, রম্যরচনা, চিঠিপত্র, ডায়েরি—বাণীসাধনার কত বিভিন্ন ক্ষেত্রে রবীন্দ্র-নাথ তাঁর অবিস্মরনীয় দান রেখে গেছেন। এদের বেশির ভাগেরই আবার কত শাখা-প্রশাখা। এক কাব্যেরই কত 'প্রকার ভেদ'। দৃশ্যকাব্য বা নাটকের কথা বাদ দিয়ে শুধু কবিতার কথাই ধরা যাকঃ গীতিকবিতা ও গান, কথা ও কাহিনী-কবিতা, নাট্যকবিতা, কণিকা-কবিতা, শিশু-কবিতা, ছড়া ও উদ্ভট খেয়ালি কবিতা, গদ্য কবিতা প্রভৃতি বহু বিভিন্ন শ্রেণীর রচনা তাঁর কাব্য-ভাণ্ডারকে নানাদিক থেকে সমৃদ্ধ করেছে। এদেরও অনেকগুলিকেই আবার নানা উপবিভাগে ফেলা যায়। অথচ কেবল প্রকারবৈচিত্র্য ও সংখ্যাবহুলতাই সব কথা নয়। ভাবসৌন্দর্য ও শিল্পনৈপুণ্যের দিক থেকেও তাঁর বেশির ভাগ কবিতাই অসাধারণ। গানগুলির তো কথাই নেই। এ হল শুধু কবিতার দিক। এ ছাড়া রয়েছে কত বিভিন্ন শ্রেণীর, বিভিন্ন ধরনের নাটক-নাটিকা। রবীন্দ্র-রচনাবলীতে প্রকাশিত তাঁর নানা শ্রেণীর নাট্যগ্রন্থের মোট সংখ্যা তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলির প্রায় কাছাকাছি এসে দাঁড়ায়। [২]এদের বেশির ভাগই বিশিষ্ট শিল্পসৌন্দর্যে সমুজ্জ্বল, কয়েকখানি তো একেবারে তুলনাহীন। বাণীসাধনারও

অন্যান্য ক্ষেত্রেও তাঁর রচনার প্রাচুর্য ও উৎকর্ষ কম বিস্ময়কর নয়। ভাব-কল্পনার এত ঐশ্বর্য, প্রকাশভঙ্গির এত বৈচিত্র্য, কবিকর্মের এত নৈপুণ্য, এবং সর্বোপরি এই বিপুলবিস্তৃত সৃষ্টিধারার এমন অবিরাম অগ্রগতি কোনো একক কবির সাধনায় এভাবে সম্ভব হতে পারে, চোখে না দেখলে তা বিশ্বাস হত না।

কিন্তু কেবল বাণীসাধনার কথাই বলছি কেন? যে-'দেবী'র সাধনায় তাঁর বহুমুখী সারস্বতপ্রতিভা 'সার্থক ফল' হয়েছে, তিনি শুধু 'বাগ্‌দেবী' নন, 'বীণা হাতে বীণাপাণি'। তাঁর বীণার 'বিশ্বপ্লাবিনী রাগিণী' নিত্যকাল 'অমৃত-উৎস ধারায় প্রবাহিত আবার সেই সঙ্গে তিনি সর্বকলার অধিষ্ঠাত্রী। তাই সুরের জগতেও রবীন্দ্রনাথের দান এত বিচিত্র। কম হলেও দু'হাজার [৩]রবীন্দ্রসংগীত সুরের ইন্দ্রজালে আমাদের চারদিকে এক স্বপ্নময় মায়ালোক রচনা করেছে। তাতে প্রাচীন উচ্চাঙ্গ-সংগীত থেকে দেশজ লোকসংগীত পর্যন্ত ভারতীয় সংগীতের বহু রাগ রাগিনী ও সুর, রূপরীতি ও ঢঙ, এক নূতন শিল্পরূপায়ণ লাভ করেছে। তাছাড়া তাঁর কয়েকটি গানে পাশ্চাত্য সুরের প্রভাবও লক্ষণীয়। [৪]তাঁর শত শত গানে একাধিক রাগিণী বা সুরের অপূর্ব সমন্বয়ে একক সম্পূর্ণ নূতন 'রীতি'র জন্ম হয়েছে। আসল কথা তাঁর কবিতার মতো তাঁর সংগীতও 'সৃষ্টির প্রবাহ'।[৫] তাঁর সংগীতের মিশ্র-অমিশ্র সব সুরই এই প্রাণময় প্রবাহের তরঙ্গলীলা। এ-কথাও মনে রাখতে হবে যে, রবীন্দ্রসংগীত শুধু সুরশিল্প নয়, আশ্চর্য কবিতা। রবীন্দ্রসংগীতের সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গানের প্রতিটি পদের ছোটো-ছোটো অংশেও কথা এবং সুরের সার্থক ভাবসংগতি। বাণী ও সুরের যুগ্ম-সাধনায় সিদ্ধ না হলে অতি মহৎ কবির পক্ষেও এ-ধরনের গান রচনা করা সম্ভব নয়।

এই প্রসঙ্গে আরো কয়েকটি কথা ব'লে রাখা প্রয়োজন। তাঁর গানে যেমন কবিতা ও সংগীতের যৌগিক মিশ্রণ ঘটেছে, তাঁর গীতিনাট্যে তেমনি এ-দুটির সঙ্গে দৃশ্যকাব্যের গুণ এসে মিলেছে, এবং নৃত্যনাট্যে এই সবগুলির সঙ্গে আবার নৃত্য এসে যুক্ত হয়েছে। কাব্য সংগীত ও নৃত্য—এই তিনটি প্রধান শিল্পকলার যৌগিক সমন্বয়ে গঠিত তাঁর নৃত্যনাট্যগুলি শিল্পৈশ্বর্যে অসাধারণ। এই সঙ্গে তাঁর স্বকণ্ঠের অতুলনীয় আবৃত্তি ও গান, আশ্চর্য অভিনয়-নৈপুণ্য এবং স্বরচিত নাটক-প্রযোজনায় অসামান্য কৃতিত্বের কথাও স্বভাবতই মনে আসে। শেষ জীবনে এল চিত্রকলা। তাঁর 'হৃদয়ের অজন্তা গুহায়' হঠাৎ যেন 'আকার-ফোয়ারার মুখ' খুলে গেল—বেরিয়ে এল এক রূপময় বিচিত্র জগৎ। তার কোথাও মৃত্যুর ধূসরতা, কোথাও রহস্যের অস্পষ্টতা, কোথাও স্বপ্নের ঝিকিমিকি। আবার হঠাৎ কখন 'রঙের ঝড়' উঠেছে জেগে, 'রঙের

সঙ্গে রঙের ঠেলাঠেলি', 'সূর্যাস্তের ক্ষণিক সমারোহে' ছেয়ে গিয়েছে তাঁর সৃষ্টির আকাশ। সবশুদ্ধ আড়াই হাজারেরও বেশি ছবি এঁকেছেন তিনি এবং এদের বেশির ভাগ 'দশ-বারো বছরে'র মধ্যেই আঁকা। ৬অর্থাৎ এক কথায়, বাণী-লোক, সুরলোক ও নৃত্যালোকের মতো, শেষ জীবনে চিত্রলোকেও তাঁর অধিকার বিস্তৃত হল। রবীন্দ্রনাথের শিল্পপ্রতিভার পূর্ণ স্বরূপটি ভাবতে গেলে তাঁর বিচিত্র সৃষ্টিপ্রবাহের এত বিভিন্ন ধারার কথা মনে একসঙ্গে ভিড় ক'রে আসে যে এর পরে আর কথা চলে না। মনে হয় তিনি যেন সত্যিই কোন্ গন্ধর্ব-লোকের পুরুষ —বিচিত্র 'শিল্প-আত্মার' ঘনীভূত মূর্তি—আমাদের রসবোধ ও সৌন্দর্যচেতনাকে এক মহত্তর রম্যলোকে পৌঁছে দেবার জন্যই যেন তাঁর আবির্ভাব।

কথাগুলি প্রায় এক নিশ্বাসেই বলা হল। তবু রবীন্দ্রকাব্যের শিল্পরূপের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের শিল্পপ্রতিভার সমগ্র রূপের মোটামুটি একটি আভাস প্রথমেই মনে আনা প্রয়োজন। কেননা গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখতে পাই, এই বিচিত্র শিল্পধারার কেন্দ্রগত সত্তাটি রবীন্দ্রনাথের 'কবি-পুরুষ', এবং স্বরূপলক্ষণ বিচারে তিনি মুখ্যত 'গীতিকবি'। শুধু তাই নয়, গীতি-কবির সহজাত হৃদয়ধর্ম নিয়ে তিনি একদিকে যেমন ঐ বিচিত্র শিল্পভূমিতে স্বচ্ছন্দবিহার করেছেন, অন্যদিকে তেমনি তাঁর কাব্যের শিল্পরূপের মধ্যেও ঐ বিভিন্ন শিল্পধারার বিশিষ্ট গুণগুলি পরোক্ষভাবে আকর্ষণ ক'রে এনেছেন। এই দুয়ে মিলে আমাদের চোখে রবীন্দ্রপ্রতিভার স্বরূপকে আরো স্পষ্ট ক'রে তুলবে ব'লে আমরা এখানে খুব সাধারণভাবে পর পর দুটি দিকেরই আলোচনা করছি। তবে মনে রাখতে হবে, আলোচনার সুবিধার জন্যই এদের যথাক্রমে 'প্রথম' ও 'দ্বিতীয়' ব'লে চিহ্নিত করা হচ্ছে, নইলে সত্যি বলতে, রবীন্দ্রমানসে এদের কোনো বাঁধাধরা অনুক্রম নেই। বরং অনেক সময় এরা একসঙ্গেই বর্তমান। গোড়ায় 'প্রথম' দিক নিয়েই শুরু করা যাক।

॥ কবির বিভিন্ন শিল্পলোক-বিহার ॥

রবীন্দ্রনাথের বেশির ভাগ কবিতাই গীতিকবিতা এবং এদের একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যাই গান। সত্যি বলতে, গানই হচ্ছে তাঁর গীতিকাব্য-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দান। এরা তাঁর হৃদয়ের সূক্ষ্মতম অনুভূতির বাহন। অল্প

কয়েকটিকে বাদ দিলে তাঁর প্রায় সবগুলি গানই বাণীবিরল। তাদের প্রত্যেকটি ছোটো ছোটো কথার আশ্চর্য ইঙ্গিতময়তা আমাদের বিস্মিত করে। অনুরূপ সুরের যাদুস্পর্শে এদের আবেদন আমাদের অনুভূতিতে আরো গভীর ও নিবিড় হয়ে আসে। কথা ও সুরের একাত্মতায় তাঁর বেশির ভাগ গানেই কবিতা ও সংগীতের প্রাণধর্মী ঐক্য স্থাপিত হয়ে গীতিকবিতার গীতিগুণটি আরো বহুগুণিত হচ্ছে। গীতিকবিতা ও গান তাঁর লিরিক প্রতিভার স্বক্ষেত্র ব'লে এখানে এ-বিষয়ে আর বেশি কিছু বলছি নে। তবে একটি কথা : তাঁর গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যগুলিকে বাণীরচনার দিক থেকে 'সংলাপের সূত্রে গাঁথা গানের মালা' বলতে পারি। আর অভিনয়ের দিক থেকে, গীতিনাট্যের আঙ্গিক চেষ্টাগুলি যেমন কথা ও সুরের ভাবের সঙ্গে অন্বিত হচ্ছে, নৃত্যনাট্যের নৃত্যভঙ্গিগুলিও ঠিক তাই; এরাও যৌগিক-শিল্প-সূত্রে কথা ও সুরের অন্তর্নিহিত ভাবরূপকেই বাইরে রূপায়িত করছে। এই-জন্যই গীতি ও নৃত্য-নাট্যে এই বিভিন্ন শিল্পের ঐকতানের মধ্যে দিয়ে এক বৈচিত্র্যময় লিরিক-স্বাদ আস্বাদিত হয়।

রবীন্দ্রনাথের নাট্যকবিতাগুলির বিশেষ উৎকর্ষ তাদের লিরিক গুণ। নাট্যকবিতার ক্ষেত্রে এক হিসাবে তাঁর প্রথম জীবনের সংলাপধর্মী রচনা 'ভগ্নহৃদয়' থেকেই এর সূত্রপাত। বহু পাত্রপাত্রীর সংলাপ-সজ্জিত চৌত্রিশ-সর্গ-ব্যাপী এই দীর্ঘ ছন্দোবদ্ধ রচনাটিকে পাছে কেউ নাটক ব'লে ভুল করেন, তাই ভূমিকায় কবি নিজেই পাঠককে সতর্ক ক'রে দিয়েছেন এবং বইয়ের শিরোনামার নীচে এর পরিচয় নির্দেশ করেছেন "গীতিকাব্য"। অথচ তাঁর অনেক নাটকের ,মতো এর নানা স্থানে বহু আলাদা গান ছড়িয়ে আছে, অন্তত এদের চোদ্দটি গান তো গীতবিতানেই পাচ্ছি। আমি যা বলতে যাচ্ছি তা এই যে, 'ভগ্নহৃদয়ে'র মতো ঠিক ততটা না হলেও তাঁর প্রত্যেক নাট্যকবিতার মধ্যেই অনেকখানি গীতিকাব্যগুণ অনুস্যূত হয়ে আছে। তাঁর 'বিদায়-অভিশাপে'র লিরিক-স্বাদের তুলনা কোথায়? বাণী-নাট্য 'চিত্রাঙ্গদা'র তো কথাই নেই, তবে অনেকে একে নাটকের কোঠায় রাখতে চান ব'লে এখানে আপাতত এর কথা আনছিনে। কিন্তু কাহিনী'র নাট্যকবিতাগুলির লিরিক গুণকে অস্বীকার করবে? 'রচনাবলী'তে 'বিদায়-অভিশাপ' আর কাহিনীর নাট্যকবিতাগুলি 'নাটক ও প্রহসন'-পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হলেও বহিরঙ্গ লক্ষণই যে এদের কথা নয় তার প্রমাণ পাচ্ছি 'সঞ্চয়িতা'য়। 'বিদায় অভিশাপ' এবং 'কাহিনী'র তিনটি নাট্যরচনা সেখানে 'কবিতা' হিসাবেই গৃহীত হয়েছে, এবং কবি 'নিজে' এদের 'সংকলন' করেছেন। 'তবে কবি-

তারও 'প্রকারভেদ' আছে। সেদিক থেকে এদের বৈশিষ্ট্য কেউ অস্বীকার করবে না। এদের শিল্পলক্ষণে এসেছে নাট্যরূপের আদল, শিল্পাস্বাদেও এসেছে নাট্যরসের আভাস,—কিন্তু কোনোটিই অবিমিশ্র নয়। ঐ নাট্যরূপের বানীদেহে রয়েছে গীতিকবিতার স্পন্দন, নাট্যরসের আস্বাদে পাচ্ছি গীতিকবিতার সৌরভ। আবার অনেক সময় এদের লিরিক গুণ নাট্যগুণকেও ছাড়িয়ে গেছে। 'বিদায়-অভিশাপে' কবি না-কি একবার সুর-সংযোজন করবার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন। এ-কথা সত্যি হলে তাতে বিস্ময়ের কিছুই নেই।

তাঁর কাহিনী-কবিতা সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। এই প্রসঙ্গে 'কথা ও কাহিনী'র নাম প্রথমেই মনে আসে। এ-বইয়ের রচনাগুলি তন্নিষ্ঠ হলেও বাগর্থের মনোহারিত্বে, অলংকারের লাবণ্য-সুষমায় ও ছন্দতরঙ্গিত বাণীসংগীতে এদের লিরিক স্বাদ বিশেষভাবে উপভোগ্য। 'অভিসার' 'পূজারিণী' 'সামান্য ক্ষতি' প্রভৃতি কবিতা এর সার্থক দৃষ্টান্ত। 'অভিসার'কে তো একেবারে খাঁটি লিরিক বলতে ইচ্ছে করে। ছন্দোবৈশিষ্ট্যের দিক থেকে 'গানভঙ্গ' 'মস্তক বিক্রয়' 'বন্দী বীর' প্রভৃতি কবিতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথম দুটির কথা তো বলাই বাহুল্য: সরল কলামাত্রিক বা মাত্রাবৃত্ত ছন্দোরীতির সাত মাত্রার পর্ববিন্যাসকে রবীন্দ্রনাথের ছন্দসাধনার একটি বিশিষ্ট পরীক্ষা বলতে পারি। রবীন্দ্রকাব্যেও এর দৃষ্টান্ত সুলভ নয়। আমি বলছিলাম, শুধু 'কথা ও কাহিনী' নয়, তাঁর অন্য বইয়ের কাহিনী-কবিতাও প্রথমে 'কবিতা' তারপরে 'কাহিনী';—আর সে-কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার লিরিক গুণ। পদ্যছন্দের রচনার তো কথাই নেই, এমন-কি গদ্যছন্দে লেখা 'লিপিকা' 'পুনশ্চ' প্রভৃতির কাহিনী-কবিতা সম্বন্ধেও এ-কথা প্রযোজ্য। তাদের ছন্দস্পন্দময় আশ্চর্য গদ্যরচনা থেকে সব সময়ই একটি সূক্ষ্ম লিরিক সুর উত্থিত হচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথের বানীনাট্যগুলিতেও তাঁর গীতিকাব্যপ্রতিভার দান অসামান্য। গীতিকবি রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে তাঁর ঋতুনাট্য ও প্রতীকনাট্যগুলির কথা তো ভাবতেই পারিনে। তাছাড়া তাঁর নাটকগুলির জাত বিভাগ করতে চাইলেও তারা কি সব সময় সে-অনুশাসন মেনে চলে? 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটক থেকে ধনঞ্জয় বৈরাগী কোন্ অদৃশ্যপথে ছুটে এসেছে 'মুক্তধারা'য়। এখানে এসেও সে যে-সব গান গেয়ে বেড়াচ্ছে তাদের প্রায় অর্ধেকই সে গেয়ে এসেছে 'প্রায়শ্চিত্তে' এবং তাদের উপলক্ষ্যগুলিও কী ক'রে যেন অনেক

ক্ষেত্রেই মিলে যাচ্ছে। অথচ 'মুক্তধারা' নাটক তো একেবারে জাত আলাদা। ধনঞ্জয় বৈরাগী এক বিশেষ ধরনের লিরিক চরিত্র, এবং তার মতো সব সময় 'সুরের পাগলা' না হলেও তারই সমগোত্রের চরিত্র 'শারদোৎসব'-'ঋণশোধ'-'রাজা'-'অরূপরতনে'র ঠাকুরদা', কিংবা 'ফাল্গুনী'র বাউল। 'রক্ত করবী'র বিশুকেও এই সঙ্গে মনে রাখতে হয়। 'ফাল্গুনী'র 'সূচনা'-অংশে তো 'কবি'ই একটি প্রধান চরিত্র, তেমনি 'ঋণ-শোধে'ও শেখর-কবিকে দেখতে পাচ্ছি, এবং 'রথযাত্রা'-'কালের যাত্রা'তেও 'কবি'র দেখা পাই। 'বসন্ত' এবং 'শেষ বর্ষণ'কে অবশ্য বাণীনাট্য বলব না, তবে দুটিতেই প্রধান স্থান নিয়েছে 'কবি', যদিও 'শেষবর্ষণে' সে তার নামটি পাল্‌টে হয়েছে 'নটরাজ'। কিন্তু শুধু বৈরাগী-ফকির-বাউল-ঠাকুরদা নয়, এমন-কি শুধু 'কবি'ও নয়, তাঁর বেশির ভাগ নাটকেই বহু-সংখ্যক চরিত্র 'লিরিক টাইপ'-এর। তাদের মধ্যে অনেকগুলিই আবার কেন্দ্রগত প্রধান চরিত্র। বানীনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা'র প্রধান চরিত্রের তো কথাই নেই, সমস্ত নাটকখানিই একটি উৎকৃষ্ট লিরিক। প্রমথ চৌধুরী যথার্থই বলেছেন, 'চিত্রাঙ্গদা একটি স্বপ্ন মাত্র, মানবমনের একটি অনিন্দ্যসুন্দর জাগ্রত স্বপ্ন।......অনঙ্গ-আশ্রম হচ্ছে একটি কল্পলোক, যেমন মেঘদূতের অলকা ও কুমারসম্ভবের শৈল-আশ্রম একটি কল্পলোক মাত্র।' [১০]টমসনও বলেছেন, ' It is ...... a lyrical feast কিন্তু যাক সে-কথা। লিরিক চরিত্রের আলোচনায় 'ডাকঘরে'র অমল, এবং 'নটীর পূজা'র শ্রীমতীকেও মনে রাখতে হয়। 'রক্তকরবী'র 'সমস্ত পালাটি'ই তো রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'নন্দিনী ব'লে, একটি মানবীর ছবি'। নন্দিনী গান একটিও গায়নি, কিন্তু তার প্রতিটি কথাই গান। অধ্যাপক সত্যই বলেছে, 'ও হল সুর-বাঁধা তম্বুরা'। কণ্ঠে তার প্রাণঝর্ণার কলতান, চোখে তার প্রাণের তর-লোচ্ছল হাসি—সে নিজেই একটি আশ্চর্য লিরিক। যক্ষপুরীর নিষ্প্রাণ, অনড় যন্ত্রনিয়মের পাষাণ কঠিন বাধাকে ভেঙেচুরে ভাসিয়ে দেবার জন্যই নন্দিনীর, প্রাণঝর্ণার এমন দুর্বার গতিবেগ। তেমনি অন্যদিক থেকে আবার সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের নাটকের আরেকটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র বাঁশরি। 'ধারালো বিদ্যুল্লতার মতো' উজ্জ্বল একটি মেয়ে। তবু একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায়, তার নামটির মতো তার চরিত্রেও আগাগোড়া একটি লিরিক গুণ ফুটে উঠেছে, যদিও তা 'শ্রুতিকাব্যে'র নয়, 'দীপ্তিকাব্যে'র। তার ঝলমলে সংলাপের প্রতিটি কথার ঝিলিক যেন নাটকটিতে কেবলি 'চকিত চমক' সৃষ্টি করছে।

কিন্তু চরিত্রের প্রসঙ্গ আর নয়। এবার অন্যদিক থেকে দেখা যাক।

রবীন্দ্রনাথের বাণীনাট্যের লিরিক গুণের আরো একটি দিক হচ্ছে তাঁর বেশির ভাগ বাণীনাটকে গানের প্রাচুর্য ,। বলা বাহুল্য, গানগুলি শোভা-বৃদ্ধির জন্য আসে নি, নাটকীয় প্রয়োজনেই এসেছে। সাধারণ নাটকের গতিবেগ বেড়ে চলে বাইরের দিকে—ঘটনা প্রবাহের ঘাতসংঘাত ও দ্রুততায় ; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গানবহুল নাটকগুলিতে গতিবেগ বাড়ছে অন্তরের দিকে —বিচিত্র ভাবব্যঞ্জনায় ও অনুভূতির নিবিড়তায়। 'ফাল্গুনী'তে যেমন 'এক-একটি অঙ্কের দরজা খোলা হচ্ছে' 'গানের চাবি দিয়ে', [১৪]এবং প্রতিটি অঙ্কের ভিতরেও বইছে অফুরন্ত 'সুরের হাওয়া', ঠিক আক্ষরিক অর্থে না হলেও, তাঁর অনেকগুলি বাণীনাটক সম্বন্ধে এ-কথা সত্য। 'চিরকুমার সভা'র মতো নাটকেও চৌত্রিশটি গান। যদিও গানের প্রাচুর্যই নাটকের লিরিকগুণের একমাত্র পরিচয় নয়, তবু তাঁর নাটকের ক্ষেত্রে এ-কথা মনে না এনে পারি নে। তবে গান বেশিই থাক আর কম-ই থাক, কিংবা একেবারে না-ই থাক, রচনা ছন্দোবদ্ধ হোক আর না-ই হোক, তাঁর অনেকগুলি উৎকৃষ্ট বাণীনাটকই আগাগোড়া লিরিক সৌন্দর্যে মণ্ডিত। 'ফাল্গুনী'র মতো তাঁর বহু নাটক সম্বন্ধেই বলা চলে, এ-সব জিনিস বাঁশির মতো, 'বোঝবার জন্যে হয় নি', হয়েছে 'বাজবার জন্যে।' বাণীনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা' ও 'ডাক-ঘরে' একটিও গান নেই তবু এরা আগাগোড়াই গান, আগাগোড়াই লিরিক সুরে ভরা। 'চিত্রাঙ্গদা' তবু ছন্দোবদ্ধ রচনা, 'ডাকঘর' তাও নয়।

রবীন্দ্রনাথের গল্প-উপন্যাস-কথিকা-প্রবন্ধ -আত্মকাহিনী-রম্যরচনা-চিঠি-পত্র-ডয়েরি প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর লিরিক কবিমানসের যোগ বাইরে সর্বত্র সমান স্পষ্ট নয় হলেও ভিতরে-ভিতরে সব সময়ই রক্ষিত হচ্ছে। তাঁর আশ্চর্যভাবে নিখুঁত গদ্য রচনাগুলিতে শব্দচয়ন, শব্দবিন্যাস, বাণীভঙ্গি, বাক্যের গতি ও যতির সমন্বয় ও সংগতিসুষমা থেকে শুরু ক'রে ভাব-কল্পনা ও বিষয়বস্তুর প্রকাশ ও উপস্থাপনরীতি পর্যন্ত সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করলে এ-কথার যথার্থ্য উপলব্ধি করা যাবে। ভাষার প্রসাধননৈপুণ্য ও রীতির চারুতার কথা বাদ দিলেও তাঁর প্রবন্ধগুলিতে সত্য যত-না যুক্তিপ্রমাণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার চেয়ে ঢের বেশি 'উপমা' 'রূপক' প্রকৃতি কাব্যালংকারের সাহায্যে 'ফুলের মতো' ফুটে উঠেছে। কিন্তু এ-আলোচনার ক্ষেত্র এখানে নিতান্তই সীমিত, তবু কয়েকটি কথা প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন :

রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ' জাতীয় গল্প, কিংবা 'শেষের কবিতা' জাতীয় উপন্যাসকে তো এক-এক সময় লিরিক বলতেই ইচ্ছে করে।

তাছাড়া তাঁর সব গল্প-উপন্যাস সম্বন্ধেই এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, কি বর্ণনাভঙ্গিতে, কি সংলাপ-সংযোজনায় যেখানেই রচনার উৎকর্ষ সব চেয়ে বেশি প্রকাশ পেয়েছে সেখানেই ভাবে ও ভাষায় লিরিক চমৎকারিত্ব এসেছে। নিসর্গপ্রকৃতি যে তাঁর গল্প-উপন্যাসে এতখানি স্থান অধিকার করেছে তারও একটি বড়ো কারণই হচ্ছে এই। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের জীবনকে মিলিয়ে দেখা তাঁর কবিদৃষ্টির একটি বিশেষ মৌলিক ভঙ্গি, এবং সে-দৃষ্টি কবিতার ক্ষেত্র থেকে তাঁর কথাসাহিত্যেও প্রসারিত। তাঁর বর্ণোজ্জ্বল কবিতাগুলির সঙ্গে 'ঘরে-বাইরে'র ভাষা, কিংবা গদ্যকবিতাগুলির সঙ্গে 'দুই বোন' 'মালঞ্চে'র ভাষা তুলনা করলেও এক আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। তাঁর প্রথম জীবনের কবিতা থেকে শুরু ক'রে শেষ জীবনের গদ্য কবিতা পর্যন্ত কাব্যক্ষেত্রে যত বিভিন্ন ধরণের ভাব, ভাবুকতা ও মনোভঙ্গির সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে, তাঁর বিচিত্র গল্প-উপন্যাসের বহু চরিত্রের মানসপ্রকৃতিতে তাদের অনেকগুলির আভাস নানাভাবে ফুটে উঠেছে। 'মহুয়া'র 'নাম্নী' কবিতায় 'শামলী', 'কাজলী' থেকে 'নন্দিনী' 'উষসী' পর্যন্ত 'নায়িকা'র যে সপ্তদশ 'প্রকারভেদে'র বর্ণনা পাই, তাঁর কথাসাহিত্যের নানা স্থানে, নানা পরিবেশে তাদের অনেকের সঙ্গেই আমাদের দেখা হয়েছে। এমন যে গোরা, তাকেও একটি বিশেষ অর্থে বলিষ্ঠ কাব্যপুরুষ-ই বলব; গোরা উপন্যাসখানিতে যেমন মহাকাব্যের বিশালতা আছে, গোরার কেন্দ্রচরিত্রটিতেও তেমনি মহাকাব্যের নায়কোচিত অনেকগুলি গুণই বর্তমান, এবং মহাকাব্যের নায়কের মতো তারও কতকগুলি আশ্চর্য 'লিরিক্যাল মুহূর্ত' আছে যা নইলে সে কিছুতেই এতখানি সত্য ও জীবন্ত হয়ে উঠত না। কিন্তু এ-প্রসঙ্গ আপাতত থাক। তাঁর 'লিপিকা'র কথিকাগুলির সঙ্গে তাঁর কথা-কবিতা-গুচ্ছের বিশেষ ক'রে সোনার তরীর রূপকথামূলক কবিতাগুলির সাদৃশ্য লক্ষণীয়, তাছাড়া লিপিকায় এরা যে-ভাবে পরিবেশিত হয়েছে তাতে এদেরই তো কবিতা বলতে ইচ্ছে করে।

কিন্তু প্রবন্ধসাহিত্যেও তাঁর কাব্যপ্রতিভার দান কম বিস্ময়কর নয়। কতকগুলি প্রবন্ধ তো রীতিমতো রম্যরচনা, এবং তাও প্রায় গীতিকবিতা হয়ে উঠেছে। 'পুষ্পাঞ্জলি' থেকে 'লিপিকা' পর্যন্ত এ-ধরনের বহু রচনার সাক্ষাৎ পাই। সাহিত্যসমালোচনা এবং গভীর চিন্তাগর্ভ প্রবন্ধগুলিতে গোড়ার দিকে বঙ্কিমের রীতি অনুসরণ করলেও শব্দচয়ন থেকে শুরু ক'রে বাক্যের ছন্দ এবং সামগ্রিক প্রকাশভঙ্গিতে তাঁর মৌলিকতার ছাপ সুস্পষ্ট। তাছাড়া তাঁর ভাব এবং দৃষ্টিভঙ্গি তো একেবারেই স্বতন্ত্র, এর উপর তাঁর কবিমানসের

বিশেষ প্রভাব পড়েছে। এখানে এ-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ নেই, শুধু সামান্য দুয়েকটি কথা বলছি : 'প্রাচীন সাহিত্যে'র 'মেঘদূত' আর 'মানসী'র 'মেঘদূতে' কবিত্বের পার্থক্য কোথায়? 'ভারতবর্ষের ইতিহাসে'র সঙ্গে 'ভারততীর্থে'র, এবং 'নববর্ষের ভাষণে'র সঙ্গে 'নববর্ষের গানে'র ভাবগত দূরত্ব কতটুকু? তাঁর বিভিন্ন ঋতুবিষয়ক প্রবন্ধগুলির সঙ্গে ঐ সব ঋতুর উপর লেখা কবিতাগুলির মিলতো অনেক সময়েই লক্ষ্য করা যায়। তাঁর ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক বহু প্রবন্ধের ভাববস্তুর সঙ্গে তাঁর অধ্যাত্ম ও দার্শনিক ভাব-সমৃদ্ধ কবিতার জগতে আমাদের পূর্বপরিচয় ঘটেছে, এবং পরেও প্রায় একই চেহারায় বারবারই দেখা হয়েছে। 'ছিন্নপত্রের' চিঠিগুলিকে কী বলব? 'সোনার তরী' থেকে 'চৈতালি' পর্যন্ত ছড়ানো অনেকগুলি কবিতাই তো এই চিঠিগুলির মধ্যে অবিকল দেখতে পাই।

রবীন্দ্রনাথের সমস্ত স্বষ্টির মধ্যে একমাত্র ছবিকেই সকল দিক থেকে এক আকস্মিক ব্যাপার ব'লে মনে হয়। তবে প্রকাশের আলোকে এদের আবির্ভাব আকস্মিক হলেও এরা সত্যি বাইরের আগন্তুক কি না, ভেবে দেখতে হয়। আমরা যে প্রথম দৃষ্টিতে তাঁর কবিতার সঙ্গে এদের মিল খুঁজে পাইনে তার একটা বড়ো কারণ এই যে, তাঁর কবিতা ও গানগুলির শিল্পদেহে সচরাচর আমরা যে চিক্কণ মসৃণতা, সূক্ষ্ম চারুতা, স্নিগ্ধ কমনীয়তা ও তরল স্বচ্ছতা দেখতে পাই, তাঁর ছবির জগতে তার অভাব বোধ করি। তার বদলে এদের মধ্যে আমরা রুক্ষ উষরতা, আদিম বলিষ্ঠতা, কঠিন কর্কশতা ও ধূসর বাষ্পান্ধতাই বেশি লক্ষ্য করি। বোধ করি এইজন্যই রবীন্দ্রনাথ নিজেও বলেছেন, তিনি কবিতায় যা ধরতে পারেন নি ছবিতে তাই ধরেছেন। তবে তাঁর এই উক্তিকে নজির ব'লে ধ'রে নিলে ভুল হবে। কেন-না তাঁর শত শত বিচিত্র ধরণের কবিতার সবগুলির নামও তাঁর মনে থাকবার কথা নয়, তাঁর অজস্র পঙ্‌ক্তিপ্রবাহে ছড়ানো অসংখ্য কল্পচিত্র তো দূরের কথা। তবে আমরাও যে তাঁর ছবিগুলিকে একেবারে জাত আলাদা মনে করি তার কারণ তাঁর যে-ধরণের কবিতায় এদের মিল সহজে পাবার কথা, সেগুলির কথা সব সময় আমাদের মনে আসে না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় সাধারণত 'শৃঙ্গার', 'করুণ', 'অদ্ভুত', 'শান্ত', 'বীর' ও 'হাস্য'— এই ছয়টি রস সবচেয়ে বেশি পরিবেশন করেছেন। 'ভয়ানক' ও 'রৌদ্র' সেই তুলনায় কম। 'বীভৎস' খুবই কম, যে-টুকু আছে তারও বেশির ভাগ 'ভয়ানকে'র 'অঙ্গরস' হয়ে আছে। কিন্তু তাঁর ছবিতে উপরের প্রথম ছয়টি রসের মধ্যে দুটি রস বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে—'অদ্ভুত' ও 'হাস্য'। শেষের

তিনটির মধ্যে প্রথম স্থান 'ভয়ানকে'র, তারপরে 'বীভৎস' ও 'রৌদ্রে'র। তবে শেষের দুটির সঙ্গে অনেক সময় 'ভয়ানক' এসে 'অঙ্গরস' হিসাবে যুক্ত হয়েছে। 'বীভৎসে'র ক্ষেত্রেই তা বেশি ঘটেছে। তাহলে মোটামুটিভাবে বলা যায়, 'অদ্ভুত', 'হাস্য' ও 'ভয়ানক' এই তিনটি রসই তাঁর ছবির জগতে সব চেয়ে বেশি স্থান জুড়েছে। এখন কথা হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের ছবি ও কবিতার মিল দেখতে হলে যে-সব রস তাঁর ছবিতে প্রাধান্য পেয়েছে সেই-বহু সব রসের কবিতায় সন্ধান করতে হবে। তাহলেই দেখতে পাব সেসব কবিতার পঙ্‌ক্তির সঙ্গে তাঁর অনেক ছবির ভাবগত কী আশ্চর্য মিল রয়েছে। এখানে সে-বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনার অবকাশ নেই। তবু সামান্য কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি :

'খাপছাড়া'র ছড়াগুলির বর্ণনার সঙ্গে তাদের পাশাপাশি মুদ্রিত ছবিগুলির যে-সাদৃশ্য লক্ষ্য করি, তাকে 'অবিকল' ছাড়া, আর কী বলব ? গদ্য-পদ্যে-মেশানো 'সে' বইয়ের ছবিগুলি সম্বন্ধেইও ঐ একই কথা। তবু এসব তো হল নিতান্তই আকারের মিল, বাইরের সাদৃশ্য। ভাবের দিক থেকে এর চেয়ে আরো গভীর মিলের কথা বলছি : তাঁর ধূসর-কালো, তামাটে, ঈষৎ পীত, গাঢ় লাল প্রভৃতি রঙের নানা সমবায়ে চিত্রিত ছবিগুলির বর্ণবিন্যাস লক্ষণীয়। নিসর্গচিত্রগুলির তো কথাই নেই। এদের রঙগুলিই যেন ছবি হয়ে উঠেছে। শুধু রঙের ভাষাতেই 'অদ্ভুত', 'করুণ', 'ভয়ানক' ও 'রৌদ্র' রসের কত বিচিত্র ব্যঞ্জনা। এদের সামনে দাঁড়ালে মনে হয় কোথাও 'অন্ধকারের হৃদয়-ফাটা আলোক জ্বলজ্বল', [১৬]আবার কোথাও 'চক্রে-পিষ্ট আঁধারের বক্ষ-ফাটা আলোর ক্রন্দন' [১৭]। কোনো ছবি 'বহুকাল পরে হঠাৎ যেন রে অমানিশা গেল কাটিয়া" [১৮]আবার কোনোটিতে 'ঝড়ের পুঞ্জিত মেঘে কালোয় ঢেকেছে আলো'[১৯]। তাঁর কোনো-কোনো ছবির বর্ণবিন্যাসে 'মেঘ-ছিন্ন রৌদ্ররাগে'র 'পিঙ্গল' আভায় সত্যিই মনে হয় 'দূর্বাসা হানিছে ক্রোধ রক্তচক্ষুকটাক্ষচ্ছটায়'[২০]। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর ছবিগুলিকে শিল্পের লাভাপ্রবাহের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাঁর এ-ধরনের ছবি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাঁর কাব্যলোকেও কোথাও-কোথাও এই 'অগ্নিগিরিনিস্থত গদগদ মুখর পঙ্কস্রোত' [২১]ব'হে যাচ্ছে। তাঁর এ-ধরনের ছবিতে রঙের রক্তিম আভা দেখে কখনো মনে হয়, 'কাদের মশালে আকাশের ভালে আগুন উঠেছে ফুটে' ? [২২] আবার কখনো আতঙ্ক হয়, 'ও কি কোনো অনাদি ক্ষুধার লেলিহ লোল জিহ্বা' ।[২৩] এই আভা রূপ পরিবর্তন ক'রে কোনো-কোনো ছবির বিশেষ পরিবেশে 'রক্ত আলোর মদে'র [২৪]মতো নেশা ধরিয়ে দিয়েছে, আবার মহুয়ার প্রচ্ছদপটে এই আভাই আরো কোমল হয়ে বনের আড়ালে 'রাঙা' আলোর একটি

'ঝিকিমিকি বেলা'র ২৫আভাস দিচ্ছে। মৃত্যুধূসরতা-মাখা তাঁর অনেকগুলি ছবিতে যেসব ধূম্রদেহ ভৌতিক মূর্তির সাক্ষাৎ পাই তাদের দেখে সত্যি মনে হয়, 'ধূম্রবরন, যেন দেহ তার গঠিত শ্মশানধূমে'। ২৬আবার রহস্যের বাষ্পে ঢাকা অস্পষ্ট ছবিগুলির মধ্যে অস্ফুট আকারপুঞ্জ দেখে যে-কোনো দর্শক স্বভাবতই বলতে পারেন :

> 'মনে হল মেঘ, মনে হল ফুল, মনে হল কিশলয়,
> ভালো ক'রে যেই দেখিবারে যাই, মনে হল কিছু নয়। ২৭

কিংবা যেখানে ঐ অস্ফুট আকারপুঞ্জ স্থূলতার একটুখানি আভাস আনবার চেষ্টা ক'রেও ঝাপসা কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে সেখানে অতি সংগত কারণেই মনে হতে পারে :

> দুইধারে একি প্রসাদের সারি, অথবা তরুর মূল,
> অথবা এ শুধু আকাশ জুড়িয়া আমারি মনের ভুল,। ২৮

অপ্রকাশের অন্ধকার ঠেলে খানিকটা বেরিয়ে-আসা এ-ধরনের স্বষ্টিগুলির আরো একটি ব্যঞ্জনা আছে। এরা যেন সন্ধ্যার ধূসরতায় আচ্ছন্ন অস্পষ্ট বিশ্ব-প্রকৃতিরই ছায়া, এখানে 'স্বষ্টি যেন স্বপ্নে চায় কথা কহিবারে ; কিন্তু 'বলিতে না পারে স্পষ্ট করি', তাই এদের বুক থেকেও যেন 'অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ অন্ধকারে উঠিছে গুমরি'। ২৯রাত আরো, বাড়লে, কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার আরো গভীর হলে, এরাই আবার ভয়ংকর হয়ে ওঠে। দেখা যায় :

> 'পুঞ্জ পুঞ্জ কালিমা গুহায় গর্তে সংলগ্ন
> মনে হয় নিশীথরাত্রের ছিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ।'

কিন্তু আর নয়। তাঁর কবিতা ও ছবির ভাবগত ঐক্যের এরকম অজস্র দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু আগেই বলেছি, এখানে এ প্রসঙ্গের বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ নেই। তবে রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র স্বষ্টিধারার কেন্দ্রগত কবিপুরুষকে আমরা যে তাঁর ছবির জগতেও দেখতে পাই এই কথাটি বোঝাবার জন্যই এখানে তাঁর কয়েকটি সমধর্মী ছবি ও কাব্যপঙ্‌ক্তির উল্লেখ করা গেল। *অন্যত্র 'রবীন্দ্রকাব্যের শিল্পরূপে'র আলোচনা-প্রসঙ্গে এ-বিষয়ে যথাসম্ভব বিশদভাবে বলেছি।

তাহলে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি বাণীলোক, সুরলোক, নৃত্যলোক ও চিত্রলোক—সর্বত্রই রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা বিচিত্রভাবে বিলসিত। বাইরের

---

*'রবীন্দ্র কাব্যের শিল্পরূপ' : হিরণকুমার বসু—স্মরণ—বক্তৃতামালা : কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় : ১৯৫৮

দিক থেকে এদের প্রত্যেকটির শিল্পভূমি স্বতন্ত্র, কিন্তু অন্তরের দিক থেকে এরা একটি নিগূঢ় ঐক্যসূত্রে গ্রথিত। এই ঐক্যসূত্রটি তাঁর কবিমানস, যা সূক্ষ্মভাবে তাঁর সকল সৃষ্টির মধ্যেই কাজ করছে। তাই সত্তর বছর বয়সে জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে তিনি বিশ্ববাসীর কাছে দ্বিধাহীণ মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন :

'....জীবনের ,এই দীর্ঘ চক্রপথ প্রদক্ষিণ করতে করতে বিদায়কালে আজ সেই চক্রকে সমগ্ররূপে যখন দেখতে পেলাম তখন একটা কথা বুঝতে পেরেছি যে, একটি মাত্র পরিচয় আমার আছে, সে আর কিছুই নয়, আমি কবি মাত্র।'

আবার তাঁর মধ্যেকার এই কবি যে মুখ্যত গীতিকবি তারও ইঙ্গিত করেছেন :

'....সেই এক শুভ্র জ্যোতি যখন বহুবিচিত্র হন, তখন তিনি নানা বর্ণের আলোক-রশ্মিতে আপনাকে বিচ্ছুরিত করেন, বিশ্বকে রঞ্জিত করেন, আমি সেই বিচিত্রের দূত।....'

এই 'বিচিত্রের দূতে'র যথার্থ ভূমিকাটিও সূত্রাকারে বলা হয়েছে :

'....বিচিত্রের লীলাকে অন্তরে গ্রহণ ক'রে তাকে বাইরে লীলায়িত করা —এই আমার কাজ।'

আর এই কাজ করতে গিয়েই তাঁর এত বিচিত্র সৃষ্টি ধারা। এ-সম্পর্কে তিনি অতি সহজভাবেই বলেছেন :

'......নাচি নাচাই, হাসি হাসাই, গান করি, ছবি আঁকি।'

কিন্তু এই ছোটো একটি কথাতে তিনি যে একসঙ্গে কতগুলি শিল্পভূমি পার হয়ে যাচ্ছেন সেদিকে খেয়ালই নেই। খেয়াল না-থাকবারই কথা। 'বিচিত্রের লীলাকে অন্তরে গ্রহণ' করতে গিয়ে গীতিকবির সহজ হৃদয়ধর্মের বশে তিনি একদিকে যেমন সেই লীলার সঙ্গে ভাবে একাত্ম হয়ে আছেন, তাকে আপন মানসরাগে রঞ্জিত ক'রে 'বাইরে লীলায়িত' করতে গিয়েও অন্যদিকে ঠিক তেমনি, ঐ একই হৃদয়ধর্ম-বশে, নিজের প্রকাশধারার সঙ্গে একেবারে ওতপ্রোত হয়ে আছেন। তাই জগতের সৃষ্টিবৈচিত্রের দিকে তাকিয়ে তিনি যেমন বলতে পারেন :

'হই যদি মাটি, হই যদি জল,
হই যদি তৃণ, হই ফুলফল,—'

নিজের সৃষ্টিধারার দিকে তাকিয়েও তেমনি বলতে পারেন :

'তাই তো আমি জানি,
আমি বাণীর সাথে বাণী,
আমি গানের সাথে গান—'

এবং সেই সঙ্গে স্বচ্ছন্দে যোগ করতে পারেন, তিনি নৃত্যের সঙ্গে নৃত্য, এবং চিত্রের সঙ্গে চিত্র। তাঁর সমস্ত জীবনব্যাপী সৃষ্টিধারার মধ্যে আপন কবিসত্তার হৃদয়-আলেখ্যটি দেখতে পেয়েই তিনি বলেছেন, তাঁর 'একটি মাত্র পরিচয়.... তিনি কবি....', তিনি 'বিচিত্রের দূত', হাতে তাঁর—

'নানা-বর্ণে-চিত্র-করা বিচিত্রের নর্মবাঁশি খানি।'

।। কাব্যে বিবিধ শিল্পের ব্যঞ্জনা ।।

কবির হাতে 'বিচিত্রের নর্মবাঁশি'ই বটে। কথাটি একাধিক অর্থে সার্থক। এই 'নর্মবাঁশি' এখানে তাঁর গীতিকবিতার প্রতীক। তাঁর বিভিন্ন শিল্পধারাগুলি যেমন তাঁর গীতিকাব্যপ্রতিভার উৎস থেকে উৎসারিত,—লক্ষ্য করলে দেখতে পাই, তাঁর বিচিত্র কবিতার বিভিন্ন শিল্পরূপের মধ্যেও তেমনি অন্যান্য শিল্পের বিশিষ্ট গুণগুলি নানাভাবে ব্যঞ্জিত হচ্ছে, এবং এদের বেশির ভাগই উৎকৃষ্ট গীতিকবিতা। অর্থাৎ তাঁর ঐ 'বাঁশি'টি নানা শিল্পলোকে গিয়ে যেমন আপন প্রাণের সুরটি বাজিয়ে এসেছে, নিজের নিরালা জগতে ব'সেও তেমনি নানা শিল্পলোকের সুর শোনাচ্ছে। এতে তাঁর কাব্যপ্রতিভার দুটি বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাচ্ছে : এক, বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রে আপন অধিকার বিস্তার, যে-সম্বন্ধে পূর্বের পরিচ্ছেদে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে ; আর দ্বিতীয় হল, বিভিন্ন শিল্পের গুণলক্ষণগুলি কবিতার শিল্পরূপের মধ্যে ব্যঞ্জনার সাহায্যে নানাভাবে ফুটিয়ে তোলা। এই পরিচ্ছেদে সূত্রাকারে তার একটুখানি আভাস দিচ্ছি।

কি শব্দের ঝংকারে, কি ভাবের ইঙ্গিতদ্যোতনায় রবীন্দ্রনাথের বেশির ভাগ কবিতাই সংগীতধর্মী। তাঁর শত শত গানের 'সুর' বাদ দিয়ে শুধু 'কথা'-অংশেরই সংগীতগুণ রয়েছে। এ-বিষয়ে পূর্বে একাধিক প্রবন্ধে আলোচনা করেছি। তবু এখানে সংক্ষেপে তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করছি :

রবীন্দ্রনাথের গানের বাণীসংগীতে যদি কেউ 'ধ্রুপদ গানে'র স্বাদ পেতে

চান, তাহলে তাঁকে 'মুক্তধারা'র 'ভৈরবপন্থীর গান'টি একবার পড়তে বলব :

জয় ভৈরব, জয় শংকর,......
তিমির-হৃদ্‌বিদারণ
জলদগ্নি নিদারুণ,
মরু-শ্মশান-সঞ্চর,
বজ্র ঘোষ-বাণী,
রুদ্র, শূলপাণি,
মৃত্যুসিন্ধু-সন্তর,........৩৫

কিংবা পড়তে বলব রুদ্রদেবতার সেই গান :

হে মহাদুঃখ, হে রুদ্র,
হে ভয়ংকর, ওহে শংকর, প্রলয়ংকর।
হোক জটানিঃসৃত অগ্নিভুজঙ্গম
দংশনজর্জর স্থাবর জঙ্গম,
ঘন ঘন ঝন ঝন ঝননন ঝননন
পিনাক টঙ্করো। ৩৬

এদের বাণীসংগীতে গুরুগম্ভীর শুদ্ধ রাগের আভাস ফুটে ওঠে,—এবং তা 'খেয়াল' নয় 'ধ্রুপদ'। শুধু গান কেন? তাঁর 'ভাষা ও ছন্দ' জাতীয় গম্ভীর সুরের কবিতা সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। এদের 'ছন্দ'ও ধীর-গম্ভীর এবং 'মেঘ-মন্দ্রিত',—আবৃত্তি করবার সময় মনে হয় যেন পাখোয়াজের বিলম্বিত তাল একেবারে হৃৎপিণ্ডে এসে বাজছে।

তাঁর কাব্যের বাণীসংগীতে 'খেয়াল গান' শুনতে হলে তো কবিতা বাছাই করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। একেবারে প্রথম থেকেই তিনি এতে সিদ্ধকণ্ঠ। তাঁর জীবনের প্রথম সংকল্পই হল :

আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল পারা। ৩৭

একেবারে শুরু থেকেই তিনি কণ্ঠে সুর নিয়ে বেরিয়েছেন :

হৃদয়ের কথা কহিয়া কহিয়া
গাহিয়া গাহিয়া গান। ৩৮

বিশ্বপথিক রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘজীবন বিশ্বের পথে কেবলি গান ক'রে ফিরেছেন—'রবি নব গান নব নব তান ছাড়ি'। নিজের কণ্ঠশুনে নিজেই মুগ্ধ হয়েছেন—

'আপন ললিত রাগিনী শুনিয়া আপনি অবশ মন'। কখনো-বা বিস্মিত হয়েছেন।

এ যে সংগীত কোথা হতে উঠে,
এ যে লাবণ্য কোথা হতে ফুটে,
এ যে ক্রন্দন কোথা হতে টুটে
অন্তর-বিদারণ। ৪০

তাঁর কণ্ঠে প্রতি মুহূর্তেই নূতন গান, নূতন রাগিনী জেগে উঠেছে :

নূতন ছন্দ অন্ধের প্রায়
ভরা আনন্দে ছুটে চলে যায়,
নূতন বেদনা জেগে ওঠে তায়
নূতন রাগিনীভরে। ৪০

বস্তুত রবীন্দ্রকাব্যের বাণীসংগীতে 'খেয়ালে'র ঐশ্বর্যের তুলনা নেই। সেখানে তাঁর বাগ্‌দেবী শুধু বীণাপাণি নন, 'বিচিত্ররূপিণী'। তাই তাঁর কবিতার লাবণ্য এমন অপরূপ, শব্দঝংকার এত মধুর এবং গতিভঙ্গি এত সুন্দর :

ছন্দে ছন্দে সুন্দর গতি
পাষাণ হৃদয় হরণে।
কোমল কণ্ঠে কুলু কুলু সুর,
ফুটে অবিরত তরল মধুর,
সদাশিঞ্জিত মানিক-নূপুর
বাঁধা চঞ্চল চরণে। ৪১

কিন্তু এই 'মানিক-নূপুরে'র 'শিঞ্জন' এবার আমাদের একেবারে 'ঠুংরি'র এলাকায় নিয়ে এসেছে। এবার তাহলে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় 'ঠুংরি'রই একটুখানি সূক্ষ্ম কারুকাজ শোনা যাক :—

নূপুর বেজে যায় রিনি রিনি,
আমার মন কয়, চিনি চিনি, ৪২

কিংবা—

শুনেছিনু যেন মৃদু রিনি রিনি
ক্ষীণ কটি ঘেরি বাজে কিঙ্কিনী, ৪৩

কিংবা—

ওই যে শবদ চিনি নূপুর রিনিকি ঝিনি,

কিংবা

অঙ্গে আঁচল সুনীল বরন ৪৪

কিংবা—

রুনুঝুনু রবে বাজে আভরণ, ৪৫

কিংবা—

ঝিল্লি ঝনকে ঝিনি ঝিনি ৪৬

কিংবা—

থামাও রিমিকি ঝিমিকি বরিষণ,—৪৭

এ-ধরনের অসংখ্য পঙ্‌ক্তিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় নিপুণ ওস্তাদের মতো 'ঠুংরি'র অতি সূক্ষ্ম কারুকাজ ক'রে গেছেন। তা ছাড়া—

আনো মৃদঙ্গ, মুরজ, মুরলী মধুর, ৪৮

কিংবা—

কুলুকুলু কলো নদীর স্রোতের মতো, ৪৯

কিংবা—

নূপুরে নূপুরে দ্রুত তালে তালে
নদী জলতলে বাজিল শিলা, ৫০

কিংবা—

বেণুবনে ঝিলিমিলি
পাতার ঝলক-ঝিকিমিকে,— ৫১

—এ ধরনের পঙ্‌ক্তির তুলনা কোথায় ?

রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গানের বিভিন্ন ছন্দোরীতি ও পর্বযতিকে আশ্রয় ক'রে নৃত্যের তাল-তরঙ্গের যে-আভাস ফুটে ওঠে,—বাণীর বিচিত্র ভঙ্গিতে তা নানাভাবে লীলায়িত। অবশ্য নিরূপিত মাত্রার পর্ববিন্যাসযুক্ত ছন্দোময় কবিতা-মাত্রেই তাল ও ঝোঁকের দিক থেকে খানিকটা নৃত্যগুণ থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু সকল কবি ছন্দসম্পদের ষড়ৈশ্বর্য নিয়ে আসেন না, সকলেই জয়দেব-বিদ্যাপতি-গোবিন্দদাস কিংবা ভারতচন্দ্র নন। বাংলা ত্রিবিধ ছন্দোরীতির নানা আয়তনের নানা ধরনের পর্ববিন্যাসে রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ মৌলিকতা ও কৃতিত্ব আমাদের বিস্মিত করে। সংস্কৃত মাত্রাবৃত্ত ছন্দকেও তিনি যথাযোগ্যভাবে কাজে লাগিয়েছেন। ভুললে চলবে না, তাঁরই প্রদর্শিত পথে, তাঁরই ছন্দঃসূত্র অনুসরণ ক'রে সত্যেন্দ্রনাথের যা-কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথই পথিকৃৎ। কিন্তু যা বলছিলাম। ভাবের অনুরূপ যথোচিত শব্দতরঙ্গ ও বাণী-

ভঙ্গিতে লীলায়িত হলেই নৃত্যের যথার্থ হিল্লোলটি কবিতার দেহসংগীতে দুলে দুলে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় এই ভাবানুরূপ শব্দধ্বনি, বাক্‌ভঙ্গি ও ছন্দস্পন্দনের অপূর্ব সমন্বয় ও সুসংগতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এদের সাহায্যে তিনি একই ছন্দোরীতির বিভিন্ন সমমাত্রিক পর্বে ভাবানুগ বিচিত্র নৃত্যচ্ছন্দের প্রতিস্পন্দন জাগিয়ে তুলেছেন। এ-বিষয়েও অন্যত্র বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছি। এখানে দুয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে এর শুধু একটুখানি আভাস দেওয়া যাচ্ছে। ধরা যাক নীচের তিনটি উদ্ধৃতি :

(আমার) ঘুর্ লে-গে-ছে / তা-ধিন্ তা-ধিন্/ ৫২

কিংবা—

/মা-ঠের বাঁ-শি / শু-নে শু-নে / আ-কাশ্ খু-শি / হ-ল/ ৫৩

কিংবা—

(হৃদয়ে) / ছি-লে জে-গে
(দেখি আজ) / শ-রৎ - মে-ঘে/ ৫৪

ছন্দোরীতির দিক থেকে এরা এক। প্রত্যেকটিই দলমাত্রিক বা স্বরবৃত্ত ; অতিপর্ব বাদ দিলে প্রত্যেকটির সব পর্বই চতুর্দল ও সমমত্রিক। কিন্তু তা হলেও নৃত্যভঙ্গি বা নাচের আদলের দিক থেকে এরা বিচিত্র। প্রথম উদ্ধৃতিতে অতিপর্ব বাদ দিয়েও রুদ্ধদলের সংখ্যা বেশি—অর্থাৎ তিন ; এবং তাদের ধ্বনিও ঘোষবৎ মহাপ্রাণবর্ণে প্রভাবে ঘাত-প্রধান—'ঘুর্' 'ধিন্' 'ধিন্'। তাছাড়া এখানে তাদের অবস্থানগুলিও লক্ষ্য করতে হয়। পঙ্‌ক্তির এই রুদ্ধদলগুলিতে তবলার ঠেকা ও নাচের ঠমক উচ্চারিত হতে বাধ্য। ফলে পঙ্‌ক্তিটির ভাবানুযায়ী, নাচের 'ঘুর্'টি এখানে সত্যিই লেগেছে—'তাধিন্ তাধিন্'। এবার দ্বিতীয় উদ্ধৃতিটি পরীক্ষা করা যাক। এতে রুদ্ধদল মাত্র দুটি : 'ঠের্' আর 'কাশ্' : এদের একটিতেও ঘোষবৎ ধ্বনি নেই। তাছাড়া প্রথমটিতে আছে কম্পিত ব্যঞ্জন 'র্', এবং দ্বিতীয়টিতে উষ্মব্যঞ্জন 'শ্'। কাজেই রুদ্ধদল হলেও এ-দুটি স্বভাবতই স্বল্প-উচ্চারিত। অবশ্য পঙ্‌ক্তির ভাবানুযায়ী এখানে এইটিই আশা করা যায় ; এতে কোনোরকম অতিরিক্ত ঝোঁক কিংবা ঠমকের স্থান নেই। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, বাঁশির মসৃণ সুরের ব্যঞ্জনা থেকে পঙ্‌ক্তিটির নাচের ভঙ্গিতেও অনুরূপ একটি কোমলতা, একটি কমনীয়তা এসেছে। তৃতীয় উদ্ধৃতিতে নাচের ঢঙ কিন্তু একেবারেই পালটে গেছে। অতিপর্ব বাদ দিলে এর

একটি মাত্র রুদ্ধদল হচ্ছে 'রৎ',—অর্থাৎ 'শরৎ' শব্দের অন্ত্যদল। এতেও ঘোষবৎ ধ্বনি নেই, কাজেই এ মোটেই আত্মঘোষণা করছেনা। কিন্তু এখানে আশ্চর্য এর জাদুশক্তি। অবশ্য কবির ভাবরূপায়ণের কৌশলেই এমনটি সম্ভব হয়েছে। 'দেখি আজ শরৎ-মেঘে' কথাটি যেই পড়া যায়, অমনি 'শরৎ' কথাটিতে এসে মনের মধ্যে কে যেন হঠাৎ চমকে ওঠে, তার নাচের গতি হঠাৎ থমকে যায়।

কিন্তু এ-ভাবে প্রত্যেকটি দৃষ্টান্তের বিশ্লেষণ করতে থাকলে এ-আলোচনা অল্প সময়ে শেষ করা যাবে না। তাই বিশ্লেষণের দিক বাদ দিয়ে অন্য ছন্দো-রীতির এমনি আরো কয়েকটি সমমাত্রক পর্বের পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করছি। আশা করি পাঠক এখন নিজেই তাদের লয় ও নৃত্যভঙ্গির তফাতটুকু বুঝতে পারবেন।

ধরা যাক সরল কলামাত্রিক বা মাত্রাবৃত্ত ছন্দ। এর চার মাত্রার পর্বের নীচের উদ্ধৃতিগুলি লক্ষ্য করা যাক :

রাশি রাশি / ভারা ভারা / ধান্-কাটা / হল সারা
ভরা নদী / ক্ষুর ধারা / খর-পর / শা ৫৫

কিংবা—

কাল্ ছিল / ডাল্ খালি / আজ্ ফুলে / যায়্ ভ'রে
বল্ দেখি / তুই মালী, / হয়্ সে কে / মন্ ক'রে ৫৬

কিংবা—

ও গো বধূ / সুন্ দ রী / তুমি লহ / মঞ্ জরি /
পুলকিত / চম্ পায়্ / লহ অভি / নন্ দন্ ৫৭

কিংবা—

(একদা) তুমি, প্রিয়ে, / আমারি এ / তরু মূলে /
(বসেছ) ফুল সাজে / সে কথা যে / গেছ ভুলে / ৫৮

সবগুলির একই ছন্দোরীতি, পর্বের মাত্রাসংখ্যাও সমান। অথচ প্রত্যেকটিতে নাচের ঠাট আলাদা : এদের লয় কিংবা ঝোঁক, চঙ কিংবা আদল, এক নয়। এ-ছন্দের ষাণ্মাত্রিক পর্বের বেলা, বৈচিত্র্য আরো বেশি। সামান্য কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি :

ছোটো নদী আপন খেয়ালে তর্‌তর্‌ ক'রে পালিয়ে যাচ্ছে :

(তাদের) তলে তলে নিরি / রিলি /
(নদী) হেসে চলে খিলি / খিলি / ৫৯

ঝরণা ছোটো-ছোটো ঢেউয়ের তালি দিয়ে সকলকে তার খুশির গান শোনাচ্ছে :

হেসে খল্‌ খল্‌ / গেয়ে কল্‌ কল্‌ /
তালে তালে দিব / তালি / ৬০

এবার আর ছোটো নদী কি ঝরনার চপল ঢেউ নয়, একেবারে 'সিন্ধুহিন্দোল :'

এযে অজাগর' / গরজে সাগর / ফুলিছে /
ফেন হিল্‌লোল' / কল কল্‌লোলে / দুলিছে / ৬১

আশ্চর্য, এও সেই ছয় মাত্রার পর্ব। অথচ এই একই মাপের পর্বে আবার শোনা যাচ্ছে :

করিলে চেষ্‌টা / কেষ্‌টা ছাড়া কি /
ভৃত্য় মেলে না / আর্‌ ৬২

এবং এই পর্বই হঠাৎ আবার 'দাদ্‌রা' তালে নেচে উঠেছে :

বেঠিক্‌ পথের্‌ / পথিক্‌ আমার্‌ /
অচিন্‌ সে জন্‌ / রে ৬৩

কিংবা নাচের ঢঙ পালটে আরেক নূতন রূপ নিয়েছে :

পথ্‌ বেঁধে দিল / বন্‌ ধন্‌' হীন্‌ / গ্রন্‌থি /
আম্‌রা দু'জনে / চল্‌তি হাওয়ার / পন্‌থী / ৬৪

বিশিষ্ট কলামাত্রিক বা যৌগিক অক্ষরবৃত্ত ছন্দেও যে ঠিক অনুরূপ ঘটনাই ঘটবে, এতে আর আশ্চর্য কী ?—

এক্‌ দিন্‌ / এই দেখা / হয়ে যাবে / শেষ্‌ ৬৫

কিংবা—

এ সুন্‌দর্‌ / অরণ্য়ের্‌ / পল্লবের্‌ / স্তরে / ৬৬

অথবা,

ঝুলনের্ / দোলা লাগে / ডালে ডালে / পাতায় পা /তায়্ ৬৭

কিংবা—

ছণ্‌দে ছন্‌দে / নাচি উঠে / সিন্‌ধু-মাঝে / তরঙ্‌গের দল্ ৬৮

—এদের প্রথম দু'টি চোদ্দ মাত্রার লঘু পয়ার, এবং শেষ দু'টি আঠারো মাত্রার মহাপয়ার বা দীর্ঘ পয়ার। একই বিশিষ্ট কলামাত্রিকের (যৌগিক অক্ষরবৃত্তের) সমমাত্রিক পর্বের রচনা হলেও, নৃত্যভঙ্গির দিক থেকে এদের প্রত্যেক জোড়ার প্রতিটির মধ্যেই যে এক-একটি স্বতন্ত্র ধরনের তরঙ্গ খেলে যাচ্ছে, আমাদের কানই তা বলে দিচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃত ছন্দের রচনা থেকেও এ-ধরনের বৈশিষ্ট্যের দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। তবে এ-প্রসঙ্গ এইখানেই শেষ করা যাক। সব শেষে কেবল একটি কথা বলব: কাব্যের বাণীশরীরে নাচের প্রতিস্পন্দন জাগাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ আরেক ধরনের পরীক্ষা করেছেন তাঁর নৃত্যনাট্যে। 'সুর' বাদ দিয়ে শুধু 'কথা'র দিক ভেবে দেখলেও এতে লক্ষ্য করবার অনেক-কিছু আছে। এ নিয়েও অন্যত্র আলোচনা করেছি, তবু এ-দিকটা একেবারে অনুল্লেখিত থাকবে ব'লে এখানে এর একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। ধরা যাক 'নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা'র কয়েকটি পঙ্‌ক্তি:

রৌদ্‌র হ- /তেছে অতি /তিখ্‌'নো * /
আঙিনা— /হয়্ নি যে /নিকোনো */
তোলা হল /না— জল্ /
পাড়া হল /না— ফল্ /
কখন্ বা /চুলো তুই /ধরাবি * /
কখন্ ছা- /গল্ তুই /চরাবি * /
ত্বরা কর্ /ত্বরা কর্ /ত্বরা কর্ /
জল্ তুলে /নিয়ে তুই /চল্ ঘর্ /
রাজ্ বাড়ি- /তে— ঐ /বাজে ঘণ্- /টা— ** /
ঢং ঢং /ঢং ** /ঢং ঢং /ঢং ** /
ঐ যে বে- /লা— বহে /যায়্ ** /

বলা বাহুল্য, শুধু 'কথা'র দিক থেকেই এই ছন্দোলিপিটি দাঁড় করানো গেল। এতে কতকগুলি বিশেষত্ব স্বভাবতই চোখে পড়ে। মোটামুটিভাবে সরল কলা-মাত্রিক বা বাংলা মাত্রাবৃত্তের আদল রক্ষিত হলেও এতে কোনো-কোনো স্থানে কয়েকটি মুক্তদল দু'মাত্রার ওজন পেয়েছে। তবে এদের প্রত্যেকটিতে গুরু স্বরধ্বনি রয়েছে। এগুলির ক্ষেত্রে সংস্কৃত ছন্দের নিয়ম আংশিকভাবে পালিত হয়েছে বলা যায়। এই বিশেষ দলগুলি হচ্ছে দ্বিতীয় ছত্রের প্রথম পর্বের 'আঙিনা' শব্দের 'না'; তৃতীয় ও চতুর্থ ছত্রের দ্বিতীয় পর্বের 'না'; নবম ছত্রের দ্বিতীয় পর্বের 'তে' আর চতুর্থ উনপর্বের 'টা'; এবং একাদশ ছত্রের দ্বিতীয় পর্বের 'লা'। এ ছাড়া দশম ছত্রের দ্বিতীয় পর্বে 'ঢং কথাটির শেষে দু'মাত্রার ফাঁকটুকুও লক্ষণীয়। তবে দশম ছত্রটি ভেঙে দুই ছত্র ক'রে নিলে, এই পর্বটিকে এদের প্রথম ছত্রের শেষ 'উনপর্ব' ধ'রে নেওয়া যায়। তাতে কবিতার সাধারণ নিয়মের সঙ্গে এই গরমিলটুকু মানিয়ে যাবে। যাক্,—এ-প্রসঙ্গ এইখানেই শেষ।

রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য কবিতা ও গান যে চিত্ররূপময়, একথা আগের পরি-চ্ছেদেই বলেছি। চিত্র ও চিত্রকল্পের এত ঐশ্বর্য আর কোন্ কবির রচনায় আছে জানিনে। 'কবিকাহিনী' 'বনফুল' থেকে 'শেষলেখা' পর্যন্ত তাঁর বিপুল-বিস্তৃত কাব্যজগৎ এক হিসাবে বাণীর এক বিচিত্রবৃহৎ চিত্রশালা। বিশেষ ক'রে 'পুনশ্চ' থেকে 'প্রান্তিক' পর্যন্ত, এবং তার পরে 'রোগশয্যায়' পর্যন্ত, তাঁর বহু কবিতায় তাঁর নিজের আঁকা তুলির ছবির বাণীপ্রতিরূপ ধরা পড়েছে। পূর্বের পরিচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথের ছবির আলোচনায় 'শিশুতীর্থ' থেকে যে পংক্তি-গুলি উদ্ধৃত করেছি, তা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এ-বিষয়েও অন্যত্র যথাসম্ভব বিশদ আলোচনা করেছি, তবে এখানেও শুধু একটুখানি ধরিয়ে দেবার জন্য কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করছি :

প্রথমে ধরা যাক আবার 'পুনশ্চ'ই : 'শিশুতীর্থ' বাদ দিয়ে যে-কোনো পাতা খুলছি :

দেওদার বনের দোলায়িত শাখায়
দক্ষিণ-সমুদ্রের হাওয়ার হাহাকার মূর্তি। ৭০

নিচে সেই ছায়ামূর্তির নৃত্য, বিরহের সেই ঊর্মি-দোলা। ৭১

মরু-নীরস কালো মর্ত্যের অভিশাপ ৭২

ধোঁয়া জমে আছে আকাশে,
গাছপালাগুলো যেন শঙ্কায় আড়ষ্ট। ৭৩

জ্যোৎস্নাকে যেন অজগর সাপে জড়িয়েছে। ৭৪

থাক এ ধরনের ছবি, দেখি এবার মানুষের চেহারা : দেখি তার মুখ কিংবা মুখোশ, দেখি তার গড়ন :

ছোটো ছোটো দুই চোখে নেই রোঁওয়া,
ভ্রূ কুঁচকিয়ে কী দেখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে,
তার দেখাটা যেন চোখের উঞ্ছবৃত্তি। ৭৫

যেমন উঁচু তেমনি চওড়া নাকটা,
সমস্ত মুখের সে বারো-আনি অংশীদার। ৭৫

কপালটা মস্ত
তার উত্তর দিগন্তে নেই চুল, দক্ষিণ দিগন্তে নেই ভুরু। ৭৫

খাপছাড়া টাক সামনের মাথায়,
ফুরফুরে চুল কোথাও সাদা কোথাও কালো। ৭৫

অল্প বয়সের ছেলে,
শামলা রঙ্, কালো চোখ, ঝাঁকড়া চুল,
ছিপছিপে গড়ন,— ৭৬

'প্রান্তিকে'র নাম করেছি ; খোলা যাক 'প্রান্তিক' :

বিশ্বের আলোকলুপ্ত তিমিরের অন্তরালে এল
মৃত্যুদূত চুপে চুপে, ৭৭

অগ্নিবর্ষী প্রচণ্ডের প্রলয়হুংকারে ৭৮

অতৃপ্ত তৃষ্ণার যত ছায়ামূর্তি প্রেতভূমি হতে
নিয়েছ আমার সঙ্গ ৭৯

পিছু হতে সম্মুখের পথে
দিতেছ বিস্তীর্ণ করি অস্তশিখরের দীর্ঘ ছায়া
নিরন্ত ধূসরপাণ্ডু বিদায়ের গোধূলি রচিয়া। ৭৯

অবসন্ন চেতনার গোধূলি বেলায়
দেহ মোর ভেসে যায় কালো কালিন্দীর স্রোত বাহি
নিয়ে অনুভূতিপুঞ্জ, ৮০

ঘনালো রজনী........
এক কৃষ্ণ অরূপতা নামে বিশ্ববৈচিত্র্যের 'পরে
স্থলে জলে। ৮১

নিয়ে গেল বিরাট প্রাঙ্গণে তব;
চক্ষে দেখিলাম অন্ধকার। ৮১

দৈত্যসম পুঞ্জ মেঘভার
ছায়ার প্রহরীব্যূহে ঘিরে ছিল স্বর্গের দুয়ার;
অভিভূত আলোকের মূর্চ্ছাতুর ম্লান অসম্মানে
দিগন্ত আছিল বাষ্পাকুল, ৮২

আর দরকার নেই। সব শেষে 'রোগ শয্যায়' বইটির নাম করেছিলাম, তারই একটি কবিতা থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখা যাক:

হে প্রাচীন তমস্বিনী,......
কী ভীষণ একা,
বোবা তুমি, অন্ধ তুমি। ৮৩

অসুস্থ দেহের মাঝে ক্লিষ্ট রচনার যে প্রয়াস
তাই হেরিলাম আমি
অনাদি আকাশে। ৮৪

পঙ্গু উঠিতেছে কাঁদি নিদ্রার অতল-মাঝে,
আত্মপ্রকাশের ক্ষুধা বিগলিত লৌহগর্ভ হতে
গোপনে উঠিছে জ্বলি শিরায় শিরায়। ৮৪

অস্পষ্ট শিল্পের মায়া বুনিয়া চলিছে;
আদি মহার্ণব-গর্ভ হতে
অকস্মাৎ ফুলে ফুলে উঠিতেছে
প্রকাণ্ড স্বপ্নের পিণ্ড,
বিকলাঙ্গ, অসম্পূর্ণ— ৮৪

থাক, এইখানেই শেষ করছি। যদি বলি আমরা এতক্ষণ রবীন্দ্রনাথের কবিতার জগতে নয়, তাঁর ছবির রাজত্বে ছিলাম, তাহলে একটুও ভুল বলব না। এ-বিষয়ে আমাদের এ-আলোচনার পক্ষে এইটুকুই যথেষ্ট।

এবার একটি উল্লেখযোগ্য কথা ব'লে রাখতে চাই। সংগীত, নৃত্য ও চিত্র,—এদের প্রত্যেকটির শিল্পগুণই রবীন্দ্রকাব্যে আশ্চর্যভাবে ধরা দিতেছে। তবে, কোনো বিশেষ কবিতায় এই তিন ধরনের শিল্পের বিভিন্ন গুণবৈশিষ্ট্যের একটি বা দুটি উচ্চারিত হয়ে উঠলেও, তাঁর বেশির ভাগ রচনাতেই এরা গভীর সামঞ্জস্যে বিধৃত হয়ে শিল্পের ঐকতান সৃষ্টি করেছে।

তাছাড়া আরো একটি কথা। যে-সব শিল্পভূমিতে তিনি নিজে কখনো সাধনা করেন নি, এবং যে-সব শিল্পের গুণলক্ষণ কবিতার জগতে সাধারণত মহাকাব্যেই দেখা যায়,—সেই ত্রিমাত্রক স্থাপত্য-ভাস্কর্য-শিল্পের বিশিষ্ট গুণগুলি তিনি তাঁর কয়েকটি গীতিকবিতার ক্ষুদ্রদেহেও অসামান্য কৃতিত্বের সঙ্গে ধরতে পেরেছেন। এ-বিষয়েও অন্য একটি প্রবন্ধে আলোচনা করেছি। এই প্রসঙ্গে তাঁর 'হিমালয়'-বিষয়ক সনেটগুলির কিংবা 'ভাষা ও ছন্দ' জাতীয় গম্ভীর সুরের কবিতাগুলির কথা প্রথমেই মনে আসে। ইতিপূর্বে উল্লেখিত 'ধ্রুপদ'-পর্যায়ের গানের কথাও এইখানে ব'লে রাখা প্রয়োজন। তাছাড়া পঙ্‌ক্তি-বিশেষে বাণীর জমাট গাঢ়বদ্ধতার স্থাপত্যকর্ম কিংবা নিটোল মূর্তিরচনার ভাস্কর্যকর্ম তো তাঁর বহু কবিতাতেই ছড়িয়ে আছে।

কিন্তু কেবল সংগীত নৃত্য ও চিত্র-লোক নয়, কিংবা স্থাপত্য-ভাস্কর্যলোক নয়, বাণীলোকেও আমরা সাধারণত যে-সব বিভিন্ন ধরনের রচনা দেখতে পাই, বিশেষত তিনি নিজে যে-সব দিকে সাধনা করেছেন, তাঁর গীতিকবিতায় তাদেরও ভাবপ্রতিরূপ ধরা পড়েছে। সে সব বিভাগে তাঁর কবিপ্রতিভার দান সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে, এবার অন্যদিক থেকে তাঁর কবিতার সৃষ্টিলোকেও তাদের বিশেষ বিশেষ গুণলক্ষণগুলির কথা সংক্ষেপে বিবৃত করছি :

পূর্বেই বলেছি, তাঁর গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য ছাড়া বাণীনাট্যেও লিরিক সুর এসেছে। গীতি ও নৃত্য-নাট্য যে এক হিসাবে গীতিকবিতারই যথাক্রমে 'সুর' এবং 'সুর-ও-নৃত্য'-সমন্বিত নাট্যরূপ, একথাও মোটামুটিভাবে বলা হয়েছে। কাজেই এক্ষেত্রে এদের বাদ দিয়ে বরং তাঁর বাণীনাট্যের দিক থেকেই বিষয়টি ভাবতে হয়। পুরোপুরি নাটকের এলেকায় না-গিয়ে শুধু তাঁর কবিতার জগতের প্রান্তভূমিতে গেলেই আমরা তাঁর নাট্যকবিতাগুলির মধ্যে বাণীনাটকের স্বাদ পেতে পারি। এরা যে কবিতার এলেকায় পড়ে সেকথা আগেই বলেছি ; বস্তুত কবিতার এলেকায় থেকেই এরা তাদের শিল্পদেহে নাট্যরূপ বিম্বিত করছে। 'কাহিনী'র নাট্যকবিতাগুলিকে, কিংবা 'বিদায়-অভিশাপ'কে নাটক না-বলে নাট্যগুণযুক্ত কবিতাই বলতে হয়। নাট্যগুণ আরো খানিকটা উচ্চারিত না হলে রচনা ঠিক নাটকের পর্যায়ে পৌঁছয় না। এদের 'নাটক'-সংজ্ঞা দিতে হলে প্রকারান্তরে 'চিত্রা'র 'আবেদন' কবিতাকেও নাটক বলতে হয়, এবং নেহাত সংলাপের ছাঁচ আছে ব'লেই 'মানসী'র 'নবদম্পতির প্রেমালাপ'কেও নাটকের পর্যায়ে ফেলতে হয়,—কিন্তু এ কল্পনা হাস্যকর। সমগ্রতার দিক থেকে

কাহিনী'র 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' রচনাটি তার সীমিত ক্ষেত্রে মোটামুটি একটি পূর্ণতা পেয়েছে, কিন্তু প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ষণ্মাত্রপর্বিক সরল কলামাত্রিক ছন্দে রচিত হওয়ায় সমস্ত লেখাটিই রীতিমতো কবিতালক্ষণাক্রান্ত। রবীন্দ্রনাথ তো তাঁর বাণীনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা'কেও উৎসর্গপত্রে 'আমার কাব্য' বলেছেন।

এ তো গেল তাঁর কবিতার নাট্যগুণের কথা। আবার 'কবিকাহিনী'-'বনফুল' থেকে শুরু করে যাবতীয় কাহিনী-কবিতা ও কথা-কবিতার মধ্যে আমরা তাঁর কথা-সাহিত্যের শিল্পপ্রতিবিম্ব দেখতে পাই। গল্পের প্রতিরূপ হিসাবে 'কথা ও কাহিনী'র বিশেষ ক'রে 'কাহিনী'-অংশ এবং 'পলাতকা'র কবিতার কথা প্রথমেই মনে আসে, এবং সেই সঙ্গে পরবর্তীকালের গদ্যকবিতা-পর্বে রচিত কাহিনী-কবিতাগুলিও স্মরণ হয়। 'পুনশ্চ'র 'ক্যামেলিয়া' কিংবা 'সাধারণ মেয়ে' জাতীয় কবিতা 'দুই বোন' 'মালঞ্চ' থেকে এমন-কি বাণীভঙ্গির দিক থেকেও খুব বেশি দূরে নয়। তাছাড়া লিপিকার কথিকাগুলির কথা তো পূর্বেই বলেছি। এই প্রসঙ্গে 'সোনার তরী'র 'বিম্ববতী', 'রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে', 'নিদ্রিতা', 'সুপ্তোত্থিতা' জাতীয় কবিতার কথাও নিশ্চয়ই বলতে হয়। বিদ্রূপাত্মক গল্পের কাব্যপ্রতিরূপ হিসাবে 'হিং টিং ছট্', 'জুতা আবিষ্কার' জাতীয় কবিতার তুলনা কোথায়? 'হিং টিং ছটে'র নাম থেকে শুরু ক'রে বহু পঙ্ক্তিই তো এখন প্রবচনে দাঁড়িয়ে গেছে। তাঁর বিভিন্ন ধরনের গল্পের সঙ্গে শিল্পসাদৃশ্যযুক্ত কবিতার এরকম আরো বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে।

কিন্তু সবচেয়ে অবাক লাগে যখন দেখি তাঁর এক শ্রেণীর কবিতা তাঁর অনেক-গুলি গভীর চিন্তাসমৃদ্ধ প্রবন্ধের আশ্চর্য কাব্যপ্রতিমা। এই প্রবন্ধগুলি তাঁর বহু কবিতায় নানাভাবে সূত্রাকারে জড়িয়ে আছে, এমন-কি কবিতাবিশেষে ছড়িয়ে আছে। 'মেঘদূত' কাব্য সমালোচনা ও 'মানসী'র 'মেঘদূত' কবিতা, কিংবা 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' ও 'ভারততীর্থে'র সাদৃশ্যর কথা পূর্বেই বলেছি। ঐ জাতীয় প্রবন্ধের সঙ্গে, কিংবা 'শ্রাবণসন্ধ্যা' 'বসন্ত যাপন', 'কেকাধ্বনি' প্রভৃতি রচনার সঙ্গে তাঁর কাব্যের মিল তো আছেই, তাছাড়া নানা ধরনের দার্শনিক আলোচনা, ব্রহ্মবাদ, জগৎ ও জীবন-জিজ্ঞাসা, কিংবা জীবন-মৃত্যুর পারস্পরিক সম্বন্ধ বিষয়ক তাঁর বহু প্রবন্ধের গভীর চিন্তাধারা 'মানসী'-সোনার তরী' তো বটেই, এমন-কি তারও ঢের আগে থেকেই তাঁর কবিতায় নানাভাবে রূপ পেতে শুরু করেছে। এই প্রসঙ্গে তাঁর নৈবেদ্য এবং 'বলাকা'র কথা বিশেষভাবে মনে আসে। এদের মধ্যেও আবার অনুরূপ শিল্পরূপায়ণের কথা

ভাবলে 'বলাকা'কেই প্রথম স্থান দিতে হয়। তাঁর এ-ধরনের প্রবন্ধে সাধারণত চিন্তার এক বিশাল বিসর্পিল ধারা বৃহৎ নদীর মতো নানা উপধারায় পুষ্ট হয়ে, পথে- পথে শাখা বিস্তার ক'রে, ধীর-মন্থর গতিতে অনিবার্য পরিণামের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। 'বলাকা'র মুক্তক ছন্দের বিষমমাত্রিক পঙ্‌ক্তিপ্রবাহকে আশ্রয় ক'রে তাঁর কবিতাও তেমনি নানা সূক্ষ্ম ভাব-ভাবনার সূত্রধারায় পরিপুষ্ট হয়ে, পথে-পথে আরো অনেক বিচিত্রভাবের ব্যঞ্জনা ছড়িয়ে , এক বৃহৎ বিসর্পিত চিন্তাধারাকে বহন ক'রে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে। প্রবন্ধকে অনেকে 'বাঙ্‌ময় চিন্তা' ব'লে থাকেন, এ-কবিতাগুলিও অনেক তাই, তবে এখানে বাঙ্‌ময় চিন্তাস্রোত কাব্যশরীর নিয়ে প্রবাহিত। এ-কবিতাগুলিতে নদীর বাঁকের মতো মোড় ফেরাবার ভঙ্গিগুলিও লক্ষ্য না-ক'রে উপায় নেই। অনেক দূর পর্যন্ত এক ধারায় কথা বলতে-বলতে হঠাৎ চিন্তার দিকপরিবর্তন ঘটে: 'শা-জাহান' কবিতায় 'মিথ্যা কথা, কে বলে যে ভোলো নাই', কিংবা 'ছবি' কবিতায় 'কী প্রলাপ কহে কবি?' প্রভৃতি পঙ্‌ক্তিতে চিন্তাস্রোতের আচমকা গতি-পরিবর্তন আমাদের চেতনাকে ধাক্কা দিয়ে সজাগ ক'রে তোলে। এই প্রসঙ্গে তাঁর কতকগুলি গদ্যকবিতার কথাও স্বভাবতই মনে আসে: 'আমার চেতনার রঙে চুনি হল লাল' কিংবা 'তুমি প্রভাতের শুকতারা' প্রভৃতি কবিতা তো তত্ত্বমূলক দার্শনিক প্রবন্ধেরই কাব্যভাষ্য। এ-সব ক্ষেত্রে তাঁর গদ্য-পদ্য উভয়বিধ রচনার বাণীভঙ্গির সাদৃশ্যও লক্ষণীয়। 'জীবনস্মৃতি' থেকে 'ছেলে-বেলা ' পর্যন্ত আত্মকাহিনীমূলক রচনাগুলির কাব্যপ্রতিরূপও তাঁর বহু কবিতায় ছড়িয়ে আছে। 'পুনশ্চ'-রচনার সময় থেকে শেষের দিকের লেখাতেই এ-ধরনের কবিতা বেশি পাওয়া যায়। 'কাঠের সিঙ্গি' 'আতার বিচি' জাতীয় কয়েকটি ছড়াতেও তাঁর ছেলেবেলার স্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে। তাছাড়া 'আত্মপরিচয়' জাতীয় অন্তর্জীবনের কাহিনী তো 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' থেকে শুরু ক'রে 'শেষ লেখা'র শেষ কবিতাটি পর্যন্ত তাঁর বহুসংখ্যক রচনাতেই ব্যাপ্ত হয়ে আছে। এই প্রসঙ্গে তাঁর শেষের দিকের জন্মদিন সম্পর্কিত সবগুলি কবিতাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া তাঁর চিঠিপত্রের অবিকল কাব্য-স্বাদটি তাঁর পত্রকবিতাগুলির মধ্যে সব সময়ই পাওয়া যাবে, এবং তাঁর মানস-গুঞ্জনে-ভরা অতুলনীয় ডায়ারির স্বাদ তো তাঁর প্রতিটি খাঁটি লিরিকেই পেতে পারি। কেননা তাঁর লিরিকগুলি তো আসলে তাঁর অন্তর্জীবনের অসংখ্য চলতি মুহূর্তের আত্মকথা। রম্যরচনা সম্বন্ধেও ঐ একই কথা বলা চলে। তাঁর প্রতিটি সার্থক লিরিক ও পত্রকবিতাই এক হিসাবে তাঁর রম্যরচনার কাব্যপ্রতিরূপ। তাছাড়া 'পুষ্পাঞ্জলি' কিংবা 'লিপিকা'র রম্যরচনাগুলি যে নিজেরাই লিরিক-ধর্মী এ-কথা পূর্বেই বলেছি।

।। কবিসার্বভৌম ।।

কথাগুলি যথাসম্ভব সংক্ষেপেই বলা হল। তবু এর থেকেই আমাদের আলোচনার মূল বক্তব্যটি বিশদ হবে। অর্থাৎ বোঝা যাবে, রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির প্রত্যেক বিভাগেই যেমন তাঁর কবিপ্রতিভার দান রয়েছে, তাঁর কবিতার মধ্যেও তেমনি অন্য প্রত্যেক বিভাগের সৃষ্টি ধারার বৈশিষ্ট্যগুলি নানাভাবে ব্যঞ্জিত হচ্ছে। এদিক থেকে তাঁর কবিতা এক হিসাবে তাঁর বহুবিচিত্র সৃষ্টি ধারার প্রতিনিধিত্ব দাবি করতে পারে। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই 'কবিসার্বভৌম'। শিল্প-জগতের যত বিভিন্ন সৃষ্টিলোকেই তাঁর শক্তির প্রকাশ হয়ে থাক, কবিপ্রতিভাই তাঁর মুখ্য প্রতিভা। তা শুধু ঐ বিচিত্র সৃষ্টিধারায় উৎসারিত হয়েই ক্ষান্ত হয় নি, তাঁর মূল কাব্যধারাকেও তাদের শিল্পাস্বাদে 'শবলিত' ক'রে তুলেছে। এ এক 'বিম্ব-প্রতিবিম্ব তত্ত্ব'। বাইরের জগতে এর দৃষ্টান্ত পাওয়া সহজ নয়। যদি এমন হত যে মেঘের বুকের সূর্যরশ্মি-ভাঙা রামধনু সূর্যের নিরঞ্জন শুভ্রতাকেও আবার সাতটি রঙের আভায় বর্ণময় ক'রে তুলেছে, তাহলে এক রকম ক'রে এর খানিকটা উপমা হতে পারত। বস্তুত তাঁর কবিতা,—তাঁর গীতিকবিতার এই 'বাঁশি'টি—সাধারণ বাঁশি নয় ব'লেই তিনি একে বলেছেন, 'বিচিত্রের নর্মবাঁশি'। তাতে শুধু 'প্রাণের নিশ্বাস'ই ধরা পড়ে নি, কিংবা তা শুধু 'নব নব ভাব' প্রকাশ ক'রেই ক্ষান্ত হয় নি, সেই সঙ্গে তাতে ধরা পড়েছে রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-সংগীতে ভরা এই সৃষ্টিপ্রাঙ্গণের বিরাট বহির্লোক, এবং মানুষের বিচিত্র শিল্পধারায় প্রকাশিত ঐশ্বর্যময় অন্তর্লোক। এ রহস্য উন্মোচনে ভাবীকালের বহু সাধকের বহু সাধনার প্রয়োজন। একজনের এক জীবনের সাধনায় কিংবা এক শতাব্দীর আলোচনায় তা নিঃশেষিত হবে না।

আমরা শুধু ভাবছি তাঁর হাতের ঐ আশ্চর্য 'বাঁশি'টির 'নানা-বর্ণে-চিত্র-করা' নিপুণ কারুকর্মের কথা। এর রহস্যেরও কি অন্ত আছে? এ-বাঁশির রন্ধ্রে রন্ধ্রে নানা সুরের খেলাতেই তো বিশ্বকবির এমন বিশ্বব্যাপী সংগীতের সৃষ্টি হয়েছে। এর কথাও কি এক জীবনে ব'লে শেষ করা যাবে? না-কি এক শতাব্দীর আলোচনাও এর পক্ষে যথেষ্ট? সত্যি বলতে, রবীন্দ্রকাব্যের শিল্পরূপের যে-কোনো একটি দিকেরও পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করতে হলে বহু সমা-লোচককেই একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করতে হবে, এবং তাঁরা নিজেরা কবি না হলেও 'সহৃদয়' 'সামাজিক' হবেন। অর্থাৎ তাঁরা কবিশিল্পীর সঙ্গে "একাত্ম' হবেন, এবং কবির 'অপূর্ব' শিল্প 'বস্তু'র সঙ্গে চিত্তের সাযুজ্য স্থাপন ক'রে শিল্পের আঙ্গিক উৎকর্ষ থেকে রসরূপ পর্যন্ত সমস্তই গভীর অন্তর্দৃষ্টির আলোকে প্রত্যক্ষ করবেন।

॥ উল্লেখ পঞ্জী ॥

সংকেত : র-র-রবীন্দ্ররচনাবলী । [বিশ্বভারতী সংস্করণ] খণ্ড পৃষ্ঠা গীতবিতান [অখণ্ড সংস্করণ, ১৩৬০] / পৃষ্ঠা / গানসংখ্যা ।

১। প্রথম প্রকাশিত কবিতা : অভিলাষ : তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৭৯৬ শক, ১২৮১ অগ্রহায়ণ, ১৮৭৪ নভেম্বর।

২। বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনাবলীর বিভাগ অনুসারে
১ম—২৬শ খণ্ডে মোট কাব্যগ্রন্থ ৫০ ; নাটক ৪৬।
অচলিত সংগ্রহ ১ম খণ্ডে কাব্যগ্রন্থ ৪ ; নাটক ৩।
এতে 'বিদায়-অভিশাপ' ও কাহিনীর নাট্যকবিতাগুলিকে 'নাটক ও প্রহসন' বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তেমনি আবার ব্যঙ্গকৌতুক ও হাস্যকৌতুকের ছোটো ছোটো নাটিকাগুলিকে পৃথকভাবে ধরা হয় নি।

৩। গীতবিতানের [তিন খণ্ড একত্র : পুনর্ মুদ্রণ ১৩৬৪] অখণ্ড সূচীতে ২১৯৯টি গানের উল্লেখ আছে। এদের কয়েকটি রচনা গ্রন্থটিতে ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে একাধিক বার মুদ্রিত হয়েছে।

৪। দ্রষ্টব্য : রবীন্দ্রস্মৃতি : ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী : বৈশাখ, ১৩৬৭ : পৃষ্ঠা : ১৫-২০।
রবীন্দ্রসংগীত : শান্তিদেব ঘোষ : সংস্করণ ১৩৬৫ : পৃষ্ঠা : ১৪৪-১৪৫।

৫। দ্রষ্টব্য : রবীন্দ্রসংগীত : ঐ : পৃষ্ঠা : ৪৭।

৬। 'প্রায় দশ বারো বছরের মধ্যেই [১৯২৫-২৬ থেকে ১৯৩৭-৩৮] যে-সব ছবি তিনি এঁকেছেন, তার সংখ্যা গত ৫০ বৎসরে বাংলা দেশের সমস্ত নামকরা চিত্রশিল্পীরা মিলে যত ছবি এঁকেছেন তার চেয়ে বেশি।......' নন্দলাল বসু। উদ্ধৃতি : রবীন্দ্র জীবনী ৩য় খণ্ড : সংস্করণ ১৩৫৯ : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : পৃষ্ঠা ২৩৯।

৭। 'সঞ্চয়িতার কবিতাগুলির সংকলনের ভার আমি নিজে নিয়েছি।'—রবীন্দ্রনাথ। ভূমিকা : সঞ্চয়িতা : পুনর্মুদ্রণ ১৩৫৬ আশ্বিন : পৃষ্ঠা : ৩।

৮। অবশ্য ভারতচন্দ্রও এ নিয়ে পরীক্ষা করেছেন :
'কমল পরিমল / লয়ে শীতল জল / পবনে চলচল / উছলে কূলে' / দীনেশচন্দ্র সেন এ-বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।—
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য: ৫ম সংস্করণ : পৃষ্ঠা ৫০২।

৯। কয়েকটি গান : যেমন, 'ও তো আর ফিরবে নারে' [ঈষৎ রূপান্তরিত] ; 'আরো আরো প্রভু, আরো' ; 'আমাকে যে বাঁধবে ব'রে' ; 'আমারে পাড়ায় পাড়ায়' ; 'রইল/ব'লে রাখলে কারে' ইত্যাদি।

১০। প্রবন্ধ সংগ্রহ : প্রথম খণ্ড : প্রথম চৌধুরী : পুনর্মুদ্রণ ১৯৫৭ : পৃষ্ঠা : ২২৬।

১১। উদ্ধৃতি : প্রবন্ধ সংগ্রহ : প্রথম খণ্ড: ঐ : পৃষ্ঠা ২২৫ ।

১২। রক্তকরবীর প্রস্তাবনা : গ্রন্থপরিচয় : র-র ১৫/৫৪৮ ।

১৩। রক্তকরবী : র-র ১৫/৩৭৮ ।

১৪। ফাল্গুনী : সূচনা-অংশ : র-র ১২/৯৯ ।

১৫। ফাল্গুনী : ঐ : র-র ১২/৯৪।

১৬। বলাকা ৩৫ : র-র ১২/৫৭।

১৭। বিদায় : মহুয়া : র-র/১৫/৯৯।
১৮। সুপ্রভাত : সঞ্চয়িতা : পুনর্মুদ্রণ ১৩৫৬ : পৃষ্ঠা ৪৮২ ।
১৯। বলাকা ৩৭ : র-র ১২/৬১ ।
২০। পরিচয় : মহুয়া : র-র/১৫/৩৮ ।
২১। শিশুতীর্থ : পুনশ্চ : র-র ১৬/ ১২৫।
২২। বন্দীবীর : কথা ও কাহিনী : সঞ্চয়িতা : ৩৫৯ ।
২৩। শিশুতীর্থ : পুনশ্চ : র-র ১৬/১২৫
২৪। বলাকা ১ : র-র ১২/১
২৫। হোরিখেলা : কথা ও কাহিনী : র-র ৭/৭৬
২৬। সিন্ধুপারে : চিত্রা : সঞ্চয়িতা ২৬৮
২৭। সিন্ধুপারে : ঐ : ঐ ২৬৯
২৮। সিন্ধুপারে : ঐ : ঐ ২৬৯
২৯। বলাকা ৩ ৬: র-র ১২/৫৭
৩০। শিশুতীর্থ : পুনশ্চ : র-র ১৬/১২৫
৩১। আত্মপরিচয় ৪ : পুনর্মুদ্রণ জুন, ১৯৫৭ : পৃষ্ঠা ৭৩
৩২। প্রবাসী : উৎসর্গ : সঞ্চয়িতা : ৪৬৪
৩৩। বলাকা ৩৫ : র-র ১২/৫৭
৩৪। প্রণাম : পরিশেষ : সঞ্চয়িতা : ৬৩৫
৩৫। মুক্তধারা : র-র ১৪/২৩৯-২৪০
৩৬। গীতবিতান : অখণ্ড সংস্করণ, ১৩৬৪ : ১০২/২৩৩
৩৭। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ : প্রভাতসংগীত : র-র ১/৫৯
৩৮। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ : ঐ : র-র/১/৬০
৩৯। সুরদাসের প্রার্থনা : মানসী : র-র ২/২১৫
৪০। অন্তর্যামী : চিত্রা : র-র ৪/৫৬
৪১। বিশ্বনৃত্য : সোনার তরী : র-র ৩/৮৮
৪২। গীতবিতান : অখণ্ড সংস্করণ : ১৩৬৪ : ৩১৩/১০৫
৪৩। আবির্ভাব : ক্ষণিকা : সঞ্চয়িতা : ৪৩০ পৃষ্ঠা
৪৪। হৃদয়-যমুনা : সোনার তরী : সঞ্চয়িতা : ১৫৩ পৃষ্ঠা
৪৫। অভিসার : কথা ও কাহিনী : সঞ্চয়িতা : ৩৩৯ পৃষ্ঠা
৪৬। গীতবিতান : অখণ্ড সংস্করণ : ১৩৬৪ : ৪৭২/১১৭
৪৭। গীতবিতান : ঐ : ঐ : ৪৬৯/১০৯
৪৮। বর্ষামঙ্গল : কল্পনা : সঞ্চয়িতা : ২৯৩ পৃষ্ঠা
৪৯। গীতবিতান : অখণ্ড সংস্করণ : ১৩৬৪ : ৬০১/১৩১
৫০। পতিতা : কাহিনী : র-র ৫/৮৬
৫১। বলাকা ৪০ : র-র ১২/৬৭
৫২। গীতবিতান : অখণ্ড সংস্করণ : ১৩৬৪ : ৫৪৬/৭
৫৩। গীতবিতান : ঐ : ঐ: ৪৯৭/১৭৯
৫৪। গীতবিতান : ঐ : ঐ: ৪৮৯/১৫৭

৫৫। সোনার তরী : সঞ্চয়িতা : ১০৬ পৃষ্ঠা
৫৬। সহজ পাঠ ১ম ভাগ : ৭ম পাঠ : র-র অচ ২/৬২১
৫৭। গীতবিতান : অখণ্ড সংস্করণ : ১৩৬৪ : ৫০৫/১৯৯
৫৮। গীতবিতান : ঐ ঐ : ঐ : ৩৮৭/২৯৩
৫৯। নদী : র-র ৪/৯
৬০। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ : প্রভাতসংগীত : র-র ১/৬০
৬১। দুঃসময় : কল্পনা : সঞ্চয়িতা : ২৯১ পৃষ্ঠা
৬২। পুরাতন ভৃত্য : কাহিনী : র-র ৭/৯৬
৬৩। বেঠিক পথের পথিক : পূরবী : র-র ১৪/৩৯
৬৪। পথের বাঁধন : মহুয়া : র-র ১৫/৩৬
৬৫। দুর্লভ জন্ম : চৈতালি : সঞ্চয়িতা : ২৭৬ পৃষ্ঠা
৬৬। বসুন্ধরা : সোনার তরী : সঞ্চয়িতা : ১৯৫ পৃষ্ঠা
৬৭। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত : পূরবী : সঞ্চয়িতা : ৫৭৮ পৃষ্ঠা
৬৮। উর্বশী : চিত্রা : সঞ্চয়িতা : ২৪৯ পৃষ্ঠা
৬৯। নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা : র-র ২৫/১৬৫
৭০। শাপমোচন : পুনশ্চ : র-র ১৬/১৩৬
৭১। শাপমোচন : ঐ : র-র ১৬/১৩৭
৭২। শাপমোচন : ঐ : র-র ১৬/১৩৫
৭৩। প্রথম পূজা : ঐ : র-র ১৬/১১৪
৭৪। প্রথম পূজা : ঐ : র-র ১৬/১১৫
৭৫। সহযাত্রী : ঐ : র-র ১৬/৪৪
৭৬। সহযাত্রী : ঐ : র-র ১৬/৪৬
৭৭। প্রান্তিক ১ র-র ২২/৫
৭৮। প্রান্তিক ৪ র-র ২২/৮
৭৯। প্রান্তিক ৫ র-র ২২/৮
৮০। প্রান্তিক ৯ র-র ২২/১২
৮১। প্রান্তিক ১০ র-র ২২/১৩
৮২। প্রান্তিক ১৫ র-র ২২/১৬
৮৩। রোগশয্যায় ৯ : র-র ২৫/১২-১৩
৮৪। রোগশয্যায় ৯ : র-র ২৫/১৩।

রবীন্দ্রনাথের আর্থনীতিক চিন্তা

শ্রীপ্রিয়তোষ মৈত্রেয়

আধুনিক কালীন আর্থনীতিক বিবর্ত্তনের এক সংকটময় মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথ তাঁর যাত্রা সুরু করেন। স্বদেশে যখন সামন্ত যুগীয়-অর্থনীতি তার অন্তিম সীমায় উপস্থিত এবং বণিকতন্ত্রগত মূলধন পরিমাণ ও বিস্তৃতির দিক থেকে পরিপূর্ণতার মধ্যে দিয়ে ধনতন্ত্রগত অর্থনীতির উদ্বোধনের অপেক্ষারত, তখন বিদেশী ইংরেজ তার স্বদেশের আর্থনীতিক স্বার্থে ভারতের এই সকল আয়োজন ব্যর্থ করে তার স্বাভাবিক অগ্রগতিকে স্তব্ধ করে দেয়। ফলে ভারতের ক্ষেত্রে যে বিবর্ত্তনের সূচনা হ'ল তা' খণ্ডিত ও বিকৃত। এর কুফল থেকে আজও আমাদের আর্থনীতিক জীবন মুক্ত হ'তে পারেনি—রবীন্দ্রনাথের জীবিত কালে ত' বটেই।

ইংরেজ আগমনের পিছনে এইটেই ছিল উদ্দেশ্য। কিন্তু এর আরেকটা দিক আছে। স্বদেশের আর্থনীতিক স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যকে এদেশের মাটিতে সার্থক করে তুলবার কার্য্যক্রমের খাতে ইংরেজদের অজ্ঞাতে ও অনিচ্ছাসত্ত্বেও যে নতুন জীবনাদর্শের অনুপ্রবেশ ঘটে তা আমাদের আধুনিক কালীন জীবন-রূপায়ণের ভগীরথ হ'য়ে ওঠে।

ইংরেজদের যখন এদেশে আগমন ভারতবর্ষের আর্থনীতিক ইতিহাসের তখন এক সন্ধিক্ষণ। মুমূর্ষু সামন্ততান্ত্রিক আর্থনীতিক কাঠামোয় পরিণত বণিক-তন্ত্রগত অর্থনীতির উদ্ভব ঘটেছে। যদিও যন্ত্রশিল্পগত আর্থনীতিক রূপান্তর উপযোগী রাষ্ট্রীয় ও আর্থনীতিক শক্তি সংগঠিত হ'য়ে ওঠেনি। ফলে প্রচলিত সমাজ-কাঠামোতে বিগত ও আগামী যুগের অন্তর্দ্বন্দ্বের ইঙ্গিত ক্রমশঃই সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে ভারতের মাটিতে আবির্ভাব ঘটল যন্ত্রশিল্পাশ্রিত ধনতন্ত্রের প্রতিভূ ইংরেজদের। অবশ্য এর পূর্বে ওলন্দাজ, ফরাসী, ইংরেজ বণিক কোম্পানীর যে আবির্ভাব ঘটেছিল তা'তে ভারতের মানসিক কিংবা বৈষয়িক কোন ক্ষেত্রেই বিশেষ আলোড়ন ঘটেনি। ইতিমধ্যে ইংলণ্ডে সংঘটিত হ'ল শিল্প-বিপ্লব—প্রচলিত সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতিক কাঠামো ভেঙ্গে গড়ে উঠল ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা। ইংলণ্ডের এই ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির বিকাশের স্বার্থে পট পরিবর্ত্তন ঘটল ভারতের অর্থ-নীতিতে। ভারতকে কাঁচামাল যোগাবার সূত্র হিসেবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ইংরেজ-বণিক কোম্পানীর শাসনের পরিবর্ত্তে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রতিভূ

ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টের সাক্ষাৎ শাসনাধীনে আনা হ'ল।* অবশ্য ভারতের ক্ষেত্রে এ আগমন সেদিন একদিক দিয়ে অভিনন্দিত হয়েছিল। মুমূর্ষু সামন্ত-তান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় প্রাচীন পদ্ধতিতে পরিচালিত কৃষি অথনীতি আশ্রয়ী শাস্ত্র-গুরু-ধর্ম নির্দেশিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের জীবনে নতুন আলোর আবির্ভাব ঘটে।

ইংরেজী শিক্ষার মধ্য দিয়ে নতুন জীবনবাদ সাম্য মৈত্রী ভ্রাতৃত্বের আদর্শ সেদিনের গতানুগতিক জীবনযাত্রায় এক নতুন প্রত্যহার উদ্বোধন ক'রে। এই নতুন জীবন ধর্মের উদ্বোধনের দাবী ছিল, প্রাচীনধারাকে অস্বীকার এবং নবতর পথে বেঁচে ওঠার চেষ্টা। পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশের যন্ত্রশিল্পগত অর্থনীতির বিকাশে মানুষের এই চিত্তগত উদ্বোধন প্রথম সর্ত্ত। রবীন্দ্রনাথ এই সত্যকে উপলব্ধি করেছিলেন ; তিনি লিখেছিলেন,

"য়ুরোপীয় চিত্তের জঙ্গমশক্তি আমাদের স্থাবর মনের উপর আঘাত করল, যেমন দূর আকাশ থেকে আঘাত করে বৃষ্টির ধারা মাটির পরে ভূমিতলের নিশ্চেষ্ট অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করে প্রাণের সঞ্চার করে দেয়। সেই চেষ্টা বিচিত্ররূপে অঙ্কুরিত বিকশিত হ'তে থাকে।"

ঐতিহাসিক রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়েছ বলে প্রবহমান ইতিহাসের বোধ তাঁর মধ্যে অনায়াসে জাগ্রত হতে পেরেছে ; এই বোধই তাঁকে আমাদের দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের সীমাবদ্ধতা ও ইংরেজ-অনুসৃত আর্থনীতিক বিধিব্যবস্থাও কার্য্যক্রমের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণে উদ্বুদ্ধ করেছে। ভারতবর্ষের বর্তমান আর্থনীতিক দুরবস্থার মূলে ইংরেজ অনুসৃত আর্থনীতিক ক্রিয়াকর্মই যে দায়ী একথা রবীন্দ্রনাথ দৃঢ়তার সংগেই ঘোষণা করেছেন। তিনি লিখেছিলেন, "......ভারত-বর্ষে বাণিজ্য ও সাম্রাজ্যের অশুভ সংগমকালে বণিক রাজা দেশের ধন-কল্পতরুর শিকড়গুলোকে কি করে ছেদন করতে লাগলেন সে কথা বহুবার কথিত এবং অত্যন্ত শ্রুতিকটু। ......এদেশের বর্ত্তমান দুর্বহ দারিদ্র্যের উপক্রমণিকা সেই-খানে।" (উপসংহার, রাশিয়ার চিঠি—পৃঃ ৯৩)। ইংরেজ প্রবর্ত্তিত আর্থ-নীতিক বিধি-ব্যবস্থার সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়ার কথা আজকের মানুষের বিস্মৃত হ'বার নয়। কেননা, এর ফলে জনসাধারণের অসহ্য দুঃখে দিন যাপন সুরু

*ইংলণ্ডের শিল্প-বিপ্লবের স্বল্পকালের মধ্যেই য়ুরোপের বিভিন্নদেশে শিল্প-বিপ্লব সংঘটিত হবার ফলে এবং নেপোলিয়নের নির্দেশে য়ুরোপ-মহাদেশের উপকূলে বৃটিশ পণ্যজাহাজ নোঙ্গর করা নিষিদ্ধ হলে ভারত ও এসিয়ার দেশগুলিতে বৃটিশ তার ধনতন্ত্রের পুষ্টির অন্যতম ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহারের প্রয়োজনও তীব্রতর হ'য়ে ওঠে। ধনতন্ত্র-আশ্রিত গণতান্ত্রিক ইংলণ্ডের এই সাম্রাজ্যবাদে রূপান্তর রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন রচনাতে কঠোর ভাষায় নিন্দিত হয়েছে।

হ'ল কিন্তু সুখের অদূর ভবিষ্যতের কোন প্রতিশ্রুতিই তারা পেলনা ; তারা বিদেশী শাসকের স্বার্থে পরিচালিত ধনতান্ত্রিক-বিধিব্যবস্থায় দিন কাটায় কিন্তু এই ব্যবস্থায় মূলধন সঞ্চয় ঘটে না ; তারা বহুদিনের জীবিকা হারালো কিন্তু তাদের নতুন জীবিকার ব্যবস্থা হ'লনা ; পশ্চিমের উন্নত বিজ্ঞানের আলোতে তাদের চোখ ধাঁধিয়ে গেল কিন্তু তবুও তারা অনুন্নতির অন্ধকারে পরের উচ্ছিষ্ট জীবী হ'য়েই রইল।

আমাদের দেশের আর্থনীতিক ইতিহাসের এই অধ্যায় সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,

"এই সময় ভারতবর্ষ তার বিপুল ঐশর্য্যের জন্য জগতে বিখ্যাত ছিল—তখনকার বিদেশী ঐতিহাসিকেরা সেকথা বারংবার ঘোষণা করে গেছেন। এমন কি স্বয়ং ক্লাইভ বলে গেছেন যে, 'ভারতবর্ষের ধনশালি তার কথা যখন চিন্তা করে দেখি তখন অপহরণ নৈপুণ্যে নিজের সংযমে আমি নিজেই বিস্মিত হই'। এ প্রভূত ধন, এ কখনো সহজে হয়না—ভারতবর্ষ এ ধন উৎপন্ন করেছিল, তখন বিদেশ থেকে যারা এসে রাজাসনে বসেছে তারা এবন ভোগ করেছে কিন্তু নষ্ট করেনি। অর্থাৎ তারা ভোগী ছিল, কিন্তু বণিক ছিলনা।"

এই উক্তি রবীন্দ্রনাথের আর্থনীতিক ইতিহাস চেতন মনের নিদর্শন। ইংরেজ আগমনের পূর্ব্বে ভারতের মাটিতে বিদেশী বিভিন্ন সামন্ততন্ত্রী রাজশক্তির আবির্ভাব ঘটেছে—কিন্তু তাদের আবির্ভাবে সেদিনের সামন্ততন্ত্রী ভারতের আর্থ-নীতিক, রাজনৈতিক জীবনে বা সমাজ মানসে কোন গুণগত পরিবর্ত্তন বা প্রভাব ঘটেনি। উপরিভাগে শাসকের বদল ঘটেছে কিন্তু তাতে রাজনৈতিক বা আর্থ-নীতিক বা সমাজ মানসগত কাঠামোর কোন পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয়নি। কেননা, এই দিক দিয়ে সামন্ততান্ত্রিক ভারত এবং আগন্তুক সামন্ততন্ত্রী রাজ-শক্তির আক্রমণের আঘাত ভারতবর্ষের আচরিত জীবন-ধর্মে, জীবনচর্যা ও চর্চা মর্মে পৌঁছতে পারেনি।

কিন্তু এরপর যখন ইংরেজ নতুন আর্থনীতিক সমাজমানসের প্রতিভূ হ'য়ে আমাদের দেশের শাসনতন্ত্রে অধিষ্ঠিত হ'ল তখন আমাদের সমাজ-মানসে ও আর্থনীতিক জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। রবীন্দ্রনাথ উৎপাদন পদ্ধতিগত পরিবর্ত্তনের এই সুদূরপ্রসারী প্রভাব সম্পর্কে লিখিছিলেন,

"বাহির থেকে মুসলমান হিন্দুস্থানে বসে স্থায়ী বাসা বেঁধেচে কিন্তু আমাদের দৃষ্টিকে বাহিরের দিকে প্রসারিত করেনি। তারা ঘরে এসে ঘর দখল করে বসল ; বন্ধ ঘরে দিলে বাহিরের দিকে দরজা।......এমনি কিছু ঘটেনি যাতে বাহিরের বিশ্বে আমাদের পরিচয় বিস্তারিত হ'তে পারে।...... তখনকার কালের সনাতন বেড়া দেওয়া সভ্যতা ভারতবর্ষে পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছে......... বাহুবলের ধাক্কা দেশের উপরে খুব জোরে লেগেছে কিন্তু কোন নতুন চিন্তার রাজ্যে কোন নতুন সৃষ্টির উদ্যমতার মনকে চেতিয়ে তোলেনি।......ইংরেজদের আগমন ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক

বিচিত্র ব্যাপার।......য়ুরোপের চিত্তদূত রূপে ইংরেজ এত ব্যাপক ও গভীরভাবে আমাদের কাছে এসেছে যে আর কোন বিদেশী জাত কোনদিন এমন করে আসতে পারেনি।" (কালান্তর)

'রাশিয়ার চিঠি'তে রবীন্দ্রনাথ ভারতের আর্থনীতিক ইতিহাসের পর্য্যালোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন,

"তারপর বাণিজ্যের পথ সুগম করবার উপলক্ষে বিদেশী বণিকেরা তাদের কারবারের গদিটার উপর রাজতক্ত চড়িয়ে বসল। সময় ছিল অনুকূল।"

অনুকূল অর্থে রবীন্দ্রনাথ সেদিনের মুমূর্ষু সামন্ততান্ত্রিক শাসক-মোগল-মারাঠা-শিখদের অন্তর্দ্বন্দ্বের দুর্ব্বলতার ইঙ্গিত করেছেন। আর্থনীতিক ইতিহাসের ছাত্র এই পরিণতির ব্যাখ্যা করে বলবেন, সামন্ততন্ত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়েই সেদিনের নতুন অর্থনীতি ও নতুন রাষ্ট্রতন্ত্রের আবির্ভাব ঘটে অর্থাৎ সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোয় বণিকতন্ত্রগত আর্থনীতিক ক্রিয়াকর্মের আবির্ভাবের ফলে মানুষের নতুন আশা আকাঙ্ক্ষা আর মেটান সম্ভব হয়না। তখন বণিকতন্ত্রগত অর্থনীতি তার পরিপূর্ণতার জন্য নতুন অর্থনীতি নতুন শক্তি-শালী রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রয়োজন অনুভব করে; আর অবশেষে এই সংঘাতে নতুনের কাছে পুরাতনকে হার মানতে হয়। জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষ সমান, কেন্দ্রীয় শাসনও সর্ব্বত্র একই শাসনব্যবস্থা, উন্নত পথঘাট ও রেল ব্যবস্থা, নতুন ভূমি রাজস্ব-ব্যবস্থা এসব কিছুই ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির অঙ্গ। অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল এদেশের সম্পদকে বিদেশের ধনতন্ত্রের অগ্রগতির পাথেয় হিসাবে ব্যবহার করবার উদ্দেশ্যে। তাই সেদিন য়ুরোপের নতুন জীবনাদর্শে মানুষ অনুপ্রাণিত হ'য়ে ইংরেজদের স্বাগত জানিয়েছিলেন—কিন্তু স্বল্পকালের মধ্যেই ব্রিটিশ ধনতন্ত্রের সাম্রাজ্যবাদীরূপ প্রকট হয়ে পড়ল। বিদেশী শাসকের আসল উদ্দেশ্য উদ্ঘাটিত হ'ল। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন,

"এদেশের বর্ত্তমান দুর্বহ দারিদ্রের উপক্রমনিকা সেইখানে। ভারতবর্ষের ধনমহিমা ছিল। কিন্তু সেটা কোন বাহন যোগে দ্বীপান্তরিত হয়েছে সে কথা যদি ভুলি তবে পৃথিবীর আধুনিক ইতিহাসের একটি তত্ত্ব আমাদের এড়িয়ে যাবে।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিভিন্ন রচনায় ব্রিটিশ আগমনে আমাদের জীবনরূপায়ণে যে অভূতপূর্ব্ব উন্মাদনা সৃষ্টি হয়েছে তা স্বীকার করেছেন; কিন্তু য়ুরোপের ধনতন্ত্রের ক্রম অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তার পূর্ব্বের প্রগতি বাদী চরিত্রের পরিবর্ত্তে প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্রের আবির্ভাব ঘটছে যার প্রত্যক্ষ পরিচয় যে ভারতেতিহাস রবীন্দ্রনাথ তা দেখিয়ে দিয়েছেন। তাই সেদিনের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রনীতির প্রতিভূ ইংরেজদের ভারত শাসন সম্পর্কে বলতে গিয়ে সাধারণভাবে তিনি বল্লেন,

"আধুনিক রাষ্ট্রনীতির প্রেরণা শক্তি বীর্য্যাভিমান নয়, সে হ'চ্ছে ধনের লোভ, এই তত্ত্বটি মনে রাখা চাই।"

রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে আরও লিখছেন,

"বনিকরাজের লোভ ভারতের ধনউৎপাদনের বিচিত্র শক্তিকেই পঙ্গু করে দিয়েছে। বাকি রয়েছে কেবল কৃষি, নইলে কাঁচা মালের যোগান বন্ধ হয় এবং বিদেশী পণ্যের হাটে মূল্য দেবার শক্তি একেবারেই বিনষ্ট হয়। ভারতবর্ষের সদ্যঃপাতীজীবিকা এই অতি ক্ষীণ বৃন্তের উপর নির্ভর করে আছে।"

পূর্ব্বেই বলেছি, উনবিংশ শতকের শেষভাগে ভারতবর্ষের অর্থনীতি যে পর্যায়ে এসে দাঁড়াল তার হাত থেকে উদ্ধার পেতে হ'লে শিল্পায়ণ ছাড়া গত্যন্তর থাকেনা। রাণাডে, গোখেল, রমেশদত্তের রচনায় ভারতের সেদিনের আর্থনীতিক উন্নয়ণের অণ্যতম পথ হিসেবে যন্ত্রশিল্পের কথা বলা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ আর্থনীতিক অগ্রগতির এই অন্তর্নিহিত সত্য উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি লিখছেন,

"একথা মেনে নেওয়া যাক, তখনকার কালে যে নৈপুণ্য ও যে সকল উপায়ের যোগে হাতের কাজ চলত ও শিল্পীরা খেয়ে পরে বাঁচত, যন্ত্রে র প্রতিযোগিতায় তারা স্বতই নিস্ক্রিয় হ'য়ে পড়েছে। অতএব প্রজাদের বাঁচাবার জন্যে নিতান্তই প্রয়োজন ছিল সর্ব্ব প্রযত্নে তাদের যন্ত্রকুশল ক'রে তোলা। ......জাপান অতি অল্প কালের মধ্যে ধনের যন্ত্রবাহনকে আয়ত্ব করে নিয়েছে যদি না সম্ভব হ'ত তাহ'লে যন্ত্রী য়ুরোপের ষড়যন্ত্রে সে ধনেপ্রাণে মারা যেত। আমাদের ভাগ্যে সে সুযোগ ঘটল না ; কেননা লোভ ঈর্ষাপরায়ণ।......রাজা আমাদের ধনে প্রাণে সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন এখনো ধনপ্রাণের যেটুকু বাকী সেটুকু রক্ষা করবার জন্য আইন এবং চৌকিদারদের ব্যবস্থাভার রইল আমার হাতে। এদিকে আমাদের অন্নবস্ত্র বিদ্যেবুদ্ধি বন্ধক রেখে কণ্ঠাগত প্রাণে আমরা চৌকিদারের উর্দ্দির খরচ যোগাচ্ছি।"

ভারতবর্ষের আর্থনীতিক জীবনের সংকটের সব কয়টি দিক রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি গোচর হ'য়েছে এবং তার কার্য্যকারণের বিশ্লেষণে যে প্রগতিশীল আর্থনীতিক চিন্তার পরিচয় মেলে তাতে বিস্মিত হ'তে হয়।

ইংরেজদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাদের দেশের মাটিতে পশ্চিমের জীবনবাদের যে উদ্বোধন ঘটল তাতে আমাদের 'আধুনিকতা'র সূচিত হয়। এই জীবন রূপায়ণের প্রত্যক্ষ সাক্ষী রবীন্দ্রনাথ। একদিকে ল' অ্যাণ্ড অর্ডার ব্যবস্থা, জাতিভেদ বিরোধী ব্যবস্থা, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের চেতনা, সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে গণতান্ত্রিক ভাবধারার প্রচার, অপরদিকে নতুন আর্থনীতিক বিধিব্যবস্থা—ক্রিয়াকর্মের ফলে উদ্ভূত হ'ল কর্মজীবী বা শ্রমজীবী মানুষে। পুরুষানুক্রমে আচরিত বৃত্তির অনুসরণের পরিবর্তে এল প্রয়োজনানুগ শ্রম নির্ব্বা-

চন্দ্রের আকাঙ্খা। মানুষের উপর প্রকৃতির এবং প্রকৃতির উপর মানুষের পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ধারণা ভারতের সমাজ চেতনার ক্রমশঃই অঙ্গ হয়ে উঠল। আর মানুষ ও প্রকৃতির পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াই (অর্থাৎ humanisation of Nature and Naturalisation of human being) হ'ল যন্ত্র শিল্পগত অর্থনীতির তত্ত্বগত ভিত্তি। মানব সভ্যতার অগ্রগতির যে পর্য্যায়ে প্রকৃতিকে মানুষের চেয়ে বড় করে দেখায় না এবং প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে পরস্পরের দেয়া, নেয়ার মধ্যে দিয়ে বৈষয়িক ও মানসিক বা চেতনাগত অগ্রগতি ঘটে তাহ'ল আধুনিক সভ্যতা। বিজ্ঞান ও পরিবেশের উপর তার ব্যবহার অর্থাৎ শিল্পায়ণ এর বাহন। এই বক্তব্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গীর ঠিক মিল খুঁজে পাওয়া না গেলেও যন্ত্রশিল্প সভ্যতার সঠিক পরিচয়টি তিনি ধরে দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর কথা উঠতে পারে। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক-আর্থনীতিক চিন্তায় গান্ধীজীর প্রভাব অস্বীকার করা যায়না। গান্ধীজী কিন্তু শিল্পায়নের অন্তর্নিহিত সত্যকে স্বীকার করেননি। তিনি ধনতান্ত্রিক সমাজের ভয়ঙ্কর শোষণকারী রূপ দেখে যন্ত্রশিল্পের বিরোধিতা করেছেন। ধনতান্ত্রিক আর্থনীতিক কাঠামো অন্তর্নিহিত শোষন, সাধারণ মানুষের দারিদ্র, বেকার সমস্যা এবং সর্বোপরি ইংরেজদের ভারতে অনুস্থতনীতির ফলে সমৃদ্ধশালী (তাঁর মতে) গ্রামীণ অর্থনীতির ধংসস্তুপের উপর সংগঠিত শোষণতন্ত্রের যে প্রতিক্রিয়া গান্ধীজীর মনে ঘটে ছিল তাতে তিনি যন্ত্রশিল্পকেই ধংসকারী শক্তি হিসেবে দেখেছেন—যে রাষ্ট্রকাঠামো, আর্থনীতিক বিধিবিধান এর জন্য দায়ী তাকে তিনি দেখেননি। তাই তিনি বৃহৎ যন্ত্রশিল্পনীতির বিরোধিতা করে কুটির শিল্প নির্ভর গ্রামীণ ভারতে ফিরে যেতে চাইলেন। ভারতে সেদিন বয়ন-শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য কিছু ভোগ্য শিল্পের পত্তন ঘটেছে এবং স্বভাবতঃই শোষণ, শ্রেণীবিদ্বেষ, কারখানা সম্বলিত নগরেরও উদ্ভব ঘটেছে। গান্ধীজী যন্ত্রশিল্পকেই এর জন্য দায়ী করেছেন এবং তাই শোষণ ও নোংরা জীবনের হাত থেকে বাঁচবার পথ হিসেবে কুটীর শিল্পের গ্রামীণ ভারতে প্রত্যাবর্ত্তনের কথা বারংবার ঘোষণা করেছেন। অথচ ভারতের সেদিনের আর্থনীতিক কাঠামোতে দেখি একদিকে অ-ব্যবহৃত বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদ এবং অপরদিকে বেকার ও স্বল্প উৎপাদনক্ষম অসংখ্য জনশ্রেণী। স্বল্প মূলধন সম্বলিত প্রাচীন প্রথায় পরিচালিত ও কৃষি-অর্থনীতির সাহায্যে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়।

রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীর দৃষ্টিভঙ্গীকে সমর্থন করতে পারেননি। তিনি একদিকে প্রাচীন পদ্ধতিতে পরিচালিত কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে যন্ত্রশিল্পের প্রতিষ্ঠার দাবী করেছেন এবং অপরদিকে ক্ষুদ্রায়তন কৃষি অর্থনীতির অবসান ঘটিয়ে সমবায় মূলক আর্থনীতির প্রবর্ত্তনের কথা বলেছেন।

বিজ্ঞানাশ্রয়ী যন্ত্রশিল্পের মধ্যে মানুষের বৈষয়িক ও মানসগত সমৃদ্ধির যে বিপুল সম্ভাবনা নিহিত আছে তাকে তিনি অভিনন্দন জানিয়েছেন :

"য়ুরোপীয় সভ্যতার বিজ্ঞান চর্চার সামনে যদি কোন বড় নৈতিক সাধনা থাকে সে হচ্ছে মানুষের মনটাকে যন্ত্রে না বেঁধে প্রাকৃতিক শক্তিকেই যন্ত্রে বেঁধে কাজ আদায় করা। একথা নিশ্চিত যে বিজ্ঞানকে একপাশে ঠেলে রেখে কেবল হাত চালিয়ে দেশের বিপুল দারিদ্র কিছুতে দূর হ'তে পারে না। মানুষের জানা এগিয়ে চলবে না কেবল তার করাই চলতে থাকবে, মানুষের পক্ষে এত বড় কুলিগিরির সাধনা আর নেই। মানুষ যেদিন প্রথম চাকা আবিষ্কার করেছিল, সেদিন তার এক মহাদিন। অচল জড়কে চক্রাকৃতি দিয়ে তার সচলতা বাড়িয়ে দেওয়া মাত্র, যে বোঝা সম্পূর্ণ মানুষের নিজের কাঁধে ছিল তার অধিকাংশই পড়ল জড়ের কাঁধে। ......চাকা অসংখ্য শূদ্রকে শূদ্রত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছে। এই চাকাই চরকায়, কুমোরের চাকে, গাড়ির তলায়, স্থূলসূক্ষ্ম নানা আকারের মানুষের প্রভূত ভার লাঘব করেছে। এই ভার লাঘবের মত ঐশ্বর্য্যের উপাদান আর নেই, একথা মানুষ বহু যুগ পূর্বে প্রথম বুঝতে পারল যেদিন প্রথম চাকা ঘুরল। ইতিহাসের সেই প্রথম অধ্যায়ে যখন চরকা ঘুরে মানুষের ধন উৎপাদনের কাজে লাগল ধন তখন থেকে চক্রবর্তী হ'য়ে চলতে লাগল, সেদিনকার চরকাতে এসেই থেমে রইলনা। ('চরকা', কালান্তর)।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অর্থাৎ উন্নত মূলধন পরিচালিত উৎপাদন ব্যবস্থায় অর্থ-নৈতিক সম্পদ দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং মানুষের শ্রম লাঘব হয়। এই মূলধন বা বৈজ্ঞানিক উপায়ে বা যন্ত্রপাতির সাহায্যে পরিচালিত উৎপাদন পদ্ধতি গতিশীল, একটা বিশেষ কোন পর্য্যায়ে এসে থেমে থাকেনা—ক্রমশই এগিয়ে চলে। মানুষের সভ্যতাও এগিয়ে চলে। কল্যাণধর্মী অর্থনীতির মূল সত্য এই বিশ্লেষণে স্বীকৃত। ভারতবর্ষ আজ অবধি প্রধানতঃ কৃষি-অর্থনীতির দেশ এবং সেই হেতু অর্থনীতিক-অনুন্নতি প্রায় স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইংরেজ শাসনের পর থেকেই কৃষি অর্থনীতির অবনতি ত্বরান্বিত হয় ইংরেজ অনুসৃত অর্থনীতিক বিধি ব্যবস্থায়। সেদিন স্বচ্ছল কৃষি অর্থনীতির সঙ্গী কুটিরশিল্পের ধ্বংস অনিবার্য্য হয়ে উঠল কিন্তু বিকল্প শিল্পায়নের কোন ব্যবস্থা ঘটেনি। অথচ জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটছে এবং বর্ধমান জনসংখ্যা বিকল্প বৃত্তির অভাবে জমিতেই ভীড় করেছে —চাষবাস চলছে মান্ধাতার আমলের পদ্ধতিতে। ফলে মাথাপিছু উৎপাদন হারের ক্রমাবনতি ঘটে, দারিদ্রের বোঝা বাড়তে থাকে। রবীন্দ্রনাথ সেদিন কৃষি অর্থনীতি তথা উৎপাদন পদ্ধতির যান্ত্রিক করণের মধ্যেই ভারতের দারিদ্রের সমস্যার সমাধানের উপায় দেখেছিলেন। স্বভাবতঃই গান্ধীজির চরকা ও গ্রামীণ অর্থনীতির ব্যাপারে তাঁর মতবিরোধ ছিল। গান্ধীজী সেদিনের যান্ত্রিক সভ্যতার মধ্যে শোষণ ও শ্রেণীবিদ্বেষকে দেখেছিলেন। আর রবীন্দ্রনাথ যন্ত্রের অগ্রগতির মধ্যে মানুষের অন্ধতা, অচলতা দারিদ্র থেকে মুক্তির পথ দেখেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের মতে সেদিনের সমাজে শ্রেণীশোষণ ; শ্রেণীহিংসা ধনবৈষম্য যা প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিল তার মূলে ছিল লোভ। এই লোভ ত্যাগ করতে পারলেই সকল সংকট মুক্ত হ'তে পারা যাবে। আর গান্ধীজী ফিরে যেতে চাইলেন, গ্রামীণ সভ্যতায় ; কিন্তু লোভ ও শোষণের ব্যবহারিক উপকরণ ও কাঠামোর পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে বিজ্ঞান ও উৎপাদন ব্যবস্থাকে উন্নতি করে মানুষের বৈষয়িক ও মানসিক অগ্রগতির পরিবেশ সৃষ্টির কথা ঘোষণা করেন নি।

গান্ধী অর্থনীতির সমর্থক চরকাপন্থীরা অনেকে বলতেন—

"চাষীদের উদ্বৃত্ত সময়টা কাজে লাগাতে হ'বে। চাষের অবসরকালে চরকা কেটে সুতো বুনতে পারলে চাষিদের আর্থিক উন্নতি সামান্য ঘটতে পারে।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'চরকা' প্রবন্ধে এ প্রসঙ্গে লিখলেন :

"চাষীকে চাষের পথে উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণে চরিতার্থ করবার চেষ্টা অন্যান্য কোন কোন কৃষিক্ষেত্রে বহুল দেশে চলছে। সে সব জায়গায় বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি খাটিয়ে মানুষ চাষের বিস্তর উন্নতি করেছে। আমাদের দেশের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায়, তাদের জমি থেকে আমাদের চেয়ে দ্বিগুণ চারগুণ বেশি ফসল আদায় করেছে........চাষীর উৎকট উদ্ভাবনের দ্বারা চাষীর উদ্যমকে ষোল আনা খাটাবার চেষ্টা না করে, তাকে চরকা ঘোরাতে বলা শক্তি হীনতার পরিচয়।"

অর্ধশতাব্দী পূর্বে বিদেশী পদানত ভারতীয় জীবনের অন্ধকার পরিবেশে দাঁড়িয়ে বিজ্ঞান, উৎপাদন ব্যবস্থা, যন্ত্রশিল্পগত অর্থনীতির গতিশীল প্রকৃতির যথার্থ বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ রবীন্দ্রনাথ করে গিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের যন্ত্রসম্পর্কিত মতবাদ থেকে আর্থনীতিক ক্রিয়াকর্মের তিনটি প্রধান সত্য পরিস্ফুট হয়। প্রথমত: উন্নত জীবনমান ও সভ্যতার অগ্রগতির পক্ষে অপরিহার্য ব্যবস্থা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অর্থাৎ উন্নত যন্ত্রপাতিগত পদ্ধতির সাহায্যে দ্রুত উৎপাদন-বৃদ্ধি। দ্বিতীয়ত; উন্নত যন্ত্র শিল্পগত আর্থনীতিক উৎপাদন পদ্ধতির সাহায্যে মানুষকে তার দৈনন্দিন জীবন-সংগ্রাম ও কায়িক পরিশ্রম সহজ করা ; তৃতীয়ত; আর্থনৈতিক উৎপাদন পদ্ধতিকে গতিশীল হ'তে হবে—কালের গতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের নতুন নতুন প্রয়োজনের তাগিদে উৎপাদন পদ্ধতিকে উন্নততর এবং অধিকতর কল্যাণধর্মী করতে হ'বে। সেদিনের ধনতন্ত্রের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রের সম্যক পরিচয় তিনি পেয়েছিলেন। তাই তিনি বল্লেন যে যদি আমরা যন্ত্রশিল্পের দিক দিয়ে সমান তালে এগোতে না পারি তবে "যেসব মানুষ চক্রীর সম্মান রেখেছে তাদের চক্রান্তে আমাদের মরতে হ'বে।" রবীন্দ্রনাথের এই

সাবধান বাণীতে আমরা সেদিন কর্ণপাত করিনি বা বিদেশী শাসনের প্রচণ্ড প্রতাপে কর্ণপাত করা হয়ত সম্ভব হয়নি। তাই আজ অর্থনীতিক উন্নয়নের প্রচেষ্টায় ভারত এবং ভারতের মত যন্ত্র-শিল্পে অনুন্নত দেশগুলিতে পশ্চিমী চক্রান্তের কুটিল প্রভাব লক্ষণীয়। যন্ত্র -শিল্প প্রসার সম্পর্কিত মতবাদে রবীন্দ্রনাথের আরেকটি গভীর আর্থনীতিক সত্যের পরিচয় পাই। তা হ'ল, কোন বিশেষ উৎপাদন পদ্ধতিই শেষ কথা নয় ; যাঁরা তা মনে করেন তাঁরা সভ্যতার ইতিহাসের গতি প্রবাহকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে প্রয়াস পান এবং জনজীবনে, কি বৈষয়িক কি মানসিক, অসহ্য দুঃখের সৃষ্টি করেন। ইংলণ্ডে ঠিক শিল্প বিপ্লবের পূর্বকালে ম্যাল্থাস উৎপাদন পদ্ধতির গতিশীল রূপকে অস্বীকার ক'রে যে মতবাদের প্রবর্তন করেছিলেন তা আজও আমাদের অগ্রগতিকে পঙ্গু করবার উপক্রম ঘটায়।

রবীন্দ্রনাথ সেদিন যন্ত্রশিল্প-আশ্রিত ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির সাম্রাজ্যবাদী রূপান্তরের স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছিলেন,

"..........যন্ত্রযুগ এল, লাভের অঙ্ক বেড়ে চল্‌ল অসম্ভব পরিমাণে। এই লাভের মহামারী সমস্ত পৃথিবীতে যখন ছড়াতে লাগল তখন যারা দূরবাসী অনাত্মীয়, যারা নির্ধন, তার আর উপায় রইল না—চীনকে পেতে হ'লে আফিম, ভারতকে উজাড় করতে হ'ল তার নিজস্ব ; আফ্রিকা চিরদিন পীড়িত, তার পীড়া বেড়ে চলল। এতো গেল বাইরের কথা, পশ্চিম মহাদেশের ভিতরেও ধনী-নির্ধনের বিভাগ আজ অত্যন্ত কঠোর ; জীবনযাত্রার আদর্শ বহুমূল্য ও উপকরণ বহুল হওয়াতে দুই পক্ষের ভেদ অত্যন্ত প্রবল হয়ে চোখে পড়ে। (রাশিয়ার চিঠি— ১১৪ পৃঃ)।

এই প্রসঙ্গে জনসংখ্যাবৃদ্ধি ও আর্থনীতিক সংকট সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য আলোচনা করা যেতে পারে। ভারতবর্ষের আর্থনীতিক দারিদ্রের মূলে অন্যতম কারণ হিসেবে 'অতিপ্রজন' কথাটা আজ অবধি প্রচলিত রয়েছে—ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যাই আমাদের নিম্নজীবনমান, বেকার সমস্যা, দারিদ্রের মূলে রয়েছে এমন একটা বিশ্বাস শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল মানুষের মনে দৃঢ় হ'য়ে রয়েছে। দারিদ্রের মূল কারণ অতি প্রজন এই কারণের আড়ালে সেদিনের বিদেশী শাসক তাদের শোষণ এবং আমাদের অর্থনীতিকে জোর জবরদস্তি করে অনুন্নত রাখবার চেষ্টা করেছে। রবীন্দ্রনাথ ইংরেজ-শাসনের আর্থনীতিক অবস্থা ও জনতত্ত্বের সম্পর্কের প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করেছিলেন ; তিনি লিখেছিলেন,

"টাইমসের সাহিত্যিক ক্রোড়পত্রে দেখা গেল, Mackee' নামক এক লেখক বলেছেন যে, ভারতের দারিদ্র্যের root cause ; মূলকারণ হ'চ্ছে, এদেশে নির্ব্বিচারে বিবাহের ফলে অতিপ্রজন। কথাটার ভিতরটার ভাবটা এই যে, বাহির থেকে যে শোষণ চলছে তা দুঃসহ হ'ত না যদি স্বল্প অন্ন নিয়ে স্বল্প লোকে হাঁড়ি চঁচে পুঁছে খেত। শুনতে পাই ইংলণ্ডে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯২১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে শতকরা ৬৬ সংখ্যা হারে প্রজাবৃদ্ধি হয়েছে। ভারতবর্ষের পঞ্চাশ

বৎসরের প্রজাবৃদ্ধির হার শতকরা ৩৩। তবে এক যাত্রায় পৃথক ফল হ'ল কেন। অতএব দেখা যাচ্ছে root cause প্রজা বৃদ্ধি নয়, root cause অন্নসংস্থানের অভাব। তারও root কোথায়।" (রাশিয়ার চিঠি)।

কারণ হিসেবে রবীন্দ্রনাথ সাম্রাজ্যবাদী শোষণের কথা বলেছেন—যার নাম দিয়েছিলেন সেদিন রাণাডে—দত্ত Drain Theory, রবীন্দ্রনাথ লিখলেন,

"আজ একশো ষাট বৎসর ধরে ভারতের পক্ষে সর্ববিষয়ে দারিদ্র্য ও বৃটেনের পক্ষে সর্ববিষয়ে ঐশ্বর্য পিঠোপিঠি সংলগ্ন হ'য়ে আছে। এর যদি একটি সম্পূর্ণ ছবি আঁকতে চাই তবে বাংলা-দেশে যে চাষী পাট উৎপন্ন করে, আর সুদূর গণ্ডিতে যারা তার মুনাফা ভোগ ক'রে জীবন যাত্রার দৃশ্য পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে দেখতে হয়। উভয়ের মধ্যে যোগ আছে লোভের, বিচ্ছেদ আছে ভোগের। এই বিভাগ দেড়শ বছরে বাড়ল বই কমলনা।"

ভারতবর্ষের অর্থনীতি সেদিন প্রধানতঃ অসংগঠিত কৃষিনির্ভর এবং সেই হেতু স্বভাবতঃই দুর্বল। আজকের পক্ষেও একথা সত্য। ইংরেজ শাসন-প্রবর্তনের পর থেকেই বিদেশী শাসক অনুসৃত আর্থনীতিক বিধি ব্যবস্থার ফলে কৃষি অর্থনীতির ক্রম অবনতি ত্বরান্বিত হয় অথচ সংস্কারের কোন ব্যবস্থা সেদিন গ্রহণ করা হয়নি। এবং ইংরেজ প্রবর্তিত নতুন ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থাতে জমি লগ্নীর পক্ষে লোভনীয় হওয়ায় পূর্বের কাঁচা টাকাওলা দেশীয় বণিকদের অনেকেই জমিদার হ'য়ে উঠলেন ফলে এঁদের সঞ্চয় শিল্পমুখী হ'লনা। এই প্রকারেই অর্থনীতি প্রধানভাবে অনুন্নত কৃষিপ্রধান হয়েই রইল। রবীন্দ্রনাথ আমাদের অর্থনীতির এই দুরবস্থার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন ;

"মান্ধাতার আমলের হাল লাঙল নিয়ে আল বাঁধা টুকরো জমিতে ফসল ফলানো আর ফুটো কলসীতে জল আনা একই কথা -......ভোরবেলা থেকে হাল লাঙল এবং গরু নিয়ে একটি একটি করে চাষী আসে, আপন টুকরো ক্ষেতটুকু ঘুরে ঘুরে চাষ করে চলে যায়। এই রকম ভাগ-করা শক্তির যে কত অপচয় ঘটে প্রতিদিন সে আমি স্বচক্ষে দেখেছি।" (রাশিয়ার চিঠি)

রবীন্দ্রনাথ এ সংকটের সমাধানের পথ হিসেবে বৃহদায়তন যন্ত্র পরিচালিত কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা সেদিন বলেছিলেন—সমবায় সংগঠন হবে কৃষি আর্থনীতিক সংগঠনের গোড়ার কথা।

বিদেশী শাসক সমস্যার সত্যিকারের সমাধানের কোন ব্যবস্থার কথা ভাবেনি, সে গরজও তাদের ছিলনা। এদিকে কৃষি—অর্থনীতির সংকট দেখা দিয়েছে বিকটাকার হয়ে। একদিকে মহাজন, জমিদার, অপরদিকে দুর্বল উৎপাদন ব্যবস্থা, একদিকে ঋণ ও খাজনার পাহাড় প্রমাণ বোঝা অপরদিকে শীর্ণ জীর্ণ বলদ ও বহুব্যবহৃত ভাঙ্গা হাল লাঙ্গল দিয়ে বহু বিখণ্ডিত জমিতে চাষ এই নিয়েই মৃতপ্রায় কৃষককুলের দুঃখময় দিন যাপন চলছিল। অবশ্য ইতিমধ্যে চলতি

শতকের প্রারম্ভে সরকারী হুকুমনামায় সরকারী তকমার খবরদারীতে গ্রামে গ্রামে সমবায় সমিতি গড়ে তোলার কাজ জোর করে সহজ ঋণের লোভ দেখিয়ে কৃষক-কুলের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হল। ফল হ'ল, সমবায় আন্দোলনের আর্থনীতিক উদ্দেশ্য সার্থক হ'তে পারল না—আজও হয়নি এবং চাষীদের অবস্থা বা উৎপাদন-ব্যবস্থার কোন উন্নতিই চোখে পড়লনা। সমবায় আন্দোলন সরকারী হুকুম-নামায় চালাবার কাজ নয়। যাদের নিয়ে এর কাজ তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে এবং সেকাজে সকলপ্রকার বৈষম্য দূর করে এগোতে হ'বে। অথচ সেদিনের সরকার অনুসৃত পদ্ধতি থেকে কৃষককুল মনে করল সমবায় আন্দোলন বুঝি বা সরকারী দপ্তরজাত কোন কাজ—তাই তারা ভয়ে ভয়ে কাছে ঘেঁসে। প্রাণের তাগিদ ছিল কিন্তু মনের সায় ছিলনা। তাছাড়া, সমবায় আন্দোলন সেদিন প্রধানভাবে ঋণ দেওয়ার আন্দোলন হিসেবে সক্রিয় ছিল—আন্দোলন সর্ব্বমুখী হ'য়ে উঠতে পারেনি—উৎপাদন পদ্ধতি বা সংগঠনগত অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বৃহদায়তন ভিত্তিক সমবায় মূলক কৃষি অর্থনীতির পত্তন ঘটল না। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু সেদিন আমাদের কৃষি অর্থ নীতির সংকটের স্বরূপ সঠিক ধরতে পেরেছিলেন। তাই তিনি সেদিন "সমস্ত জমি একত্র ক'রে কলের লাঙলে চাষ করবার সুবিধের কথা" চাষীদের বুঝিয়েছিলেন। এ-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের বড় বাধা যে জমিদার শ্রেণীর অস্তিত্ব সে কথাও রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন এবং বলেছিলেন,

"জমির স্বত্ত্ব ন্যায়তঃ জমিদারের নয়—সে চাষীর........সমবায় নীতি অনুসারে চাষের ক্ষেত্র একত্র করে চাষ না করতে পারলে কৃষির উন্নতি হ'তেই পারেনা।" (রাশিয়ার চিঠি)

১৯৩০ সালে রবীন্দ্রনাথ একথা বলেছিলেন—আজ তারও প্রায় ৩১ বছর বাদে আমরা একথা কাজে লাগাবার কথা ভাবছি। আমাদের দেশের প্রবর্ত্তিত সমবায় আন্দোলনের ত্রুটি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এড়ায়নি। তিনি লিখেছিলেন"—

কো-অপারেটিভের যোগে অন্যদেশে যখন সমাজের নীচের তলায় একটা সৃষ্টির কাজ চলছে আমাদের দেশে টিপে টিপে টাকা ধার দেওয়ার বেশি কিছু এগোয় নি" (রাশিয়ার চিঠি,)

এই অবস্থার মূলে ছিল, সেদিন সমবায় আন্দোলনের দুর্বলতা। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,

"কয়েকবছর পূর্ব্বে যেদিন সমবায় মূলক জীবিকার কথা প্রথম শুনি, আমার মনের জটিল সমস্যার একটা পাঁট যেন অনেকটা খুলে গেল। মনে হ'ল যে জীবিকার ক্ষেত্রের স্বাতন্ত্র্য মানুষের সত্যকে এতদিন অবজ্ঞা করে এসেছিল, সেখানে স্বার্থের সম্মিলন সত্যকে আজ প্রমাণ করবার ভার নিয়েছে। এই কথাই বোঝাতে বলেছে যে দারিদ্র মানুষের অসম্মিলনে, ধন তার সম্মিলনে।........

কেউ কেউ বলবে ; তুমি যে সমবায় জীবিকার কথা বলছ সকলে মিলে চরকা কাটাইত তাই। আমি তা মানিনে।........একমাত্র সূতো তৈরীর বেলাতেই তেত্রিশ কোটী লোক মিলে বিশেষ আচার রক্ষা। তাতে সূতো অনেক কমবে। কিন্তু যুগে যুগে যে অন্ধতা জমে উঠে আমাদের দারিদ্রকে গড়বন্দী করে রেখেছে তার গায়ে হাত পড়বেনা।" (চরকা—কালান্তর)

তিনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে সমবায় সংগঠনের অধীনে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎপাদন ব্যবস্থার পরিচালনা যদি সম্ভব করে তোলা না যায় তবে শুধুমাত্র ভাঙ্গা হাল লাঙ্গল সম্বল করে শীর্ণ জীর্ণ বলদ ও অনাহার ক্লিষ্ট কৃষকদের দুর্বল হাতের সাহায্যে বা দারিদ্র পীড়িত কারিগর শুধু চরকা ঘুরিয়ে এব্যবস্থার কোন শুভ পরিবর্ত্তন ঘটান যাবেনা।

বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের কৃষি-অর্থনীতির সংকট-স্রষ্টির পিছনে অন্যতম কারণ ইংরেজ অনুসৃত ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় যারা জমি চাষ করে তারা জমির মালিক নয় এবং যারা জমির মালিক তাদের জমি চাষ করে যারা, তারা জমির মালিককে জমির উৎপন্ন ফসলের এক বিরাট অংশ খাজনা বলে দিতে বাধ্য হয়। ফলে, ফসলের যে উদ্বৃত্ত সঞ্চয়ে রূপ নিতে পারত তা জমিদার শ্রেণীর ভোগ বিলাসে ব্যয় হত আর চাষীকে উচ্ছিষ্ট সামান্য উপার্জ্জনে দিন যাপন করতে গিয়ে গ্রাম্য মহাজনদের কাছে জমি থেকে মাথার চুল পর্য্যন্ত বাঁধা রাখতে হত। দেশের শতকরা ৬৫ জন লোকের এই অবস্থা এদের জীবন যাত্রার চাহিদা সামান্য প্রয়োজনের সীমায় বাঁধা—তাই শিল্পের বাজার দেশর সংখ্যা-গরিষ্ঠজনের চাহিদা থেকে বঞ্চিত হয়ে পঙ্গু হ'য়ে রইল। এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হ'লে একদিকে যেমন জমিদারী প্রথার অবসান ঘটিয়ে চাষীদের হাতে জমি বিলি করে দেওয়া প্রয়োজন ; অপরদিকে তেমনি দরিদ্র চাষীদের ব্যক্তি মালিকানায় কৃষি অর্থনীতির দায়িত্ব ছেড়ে না দিয়ে সমবায়-করণের (Cooper-ativisation) মাধ্যমে বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থার পত্তনের সাহায্যে কৃষি অর্থনীতির পুর্নগঠন প্রয়োজন। আর যদি শুধু জমিদারী ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে এবং কোনরূপ সমবায় মূলক উৎপাদন সংগঠন ও পদ্ধতির প্রবর্ত্তন না করে দরিদ্র কৃষকদের মধ্যে জমি বিলির ব্যবস্থা হয়, পরিণামে তা'হলে, কৃষি-অর্থ-নীতিতে মহাজন ও ধনী জোতদারদের নিরঙ্কুশ প্রাধান্যের ব্যবস্থাই পাকা হয়। ভারতবর্ষে আজ জমিদারী প্রথা অবসানের পর কৃষি অর্থনীতিতে এই আশঙ্কা বাস্তব হ'য়ে উঠেছে বলে সতর্ক বাণী শোনা যাচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথ 'জমিদারী ব্যবসায়ীর অবসান ঘটিয়ে সমবায়-প্রথার সাহায্যে কৃষি অর্থনীতির পরিচালনার কথা বলেছেন। প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের "জমি চাষ করে যে জমি তারই হওয়া উচিত" (রায়তের কথা) এই বক্তব্যের সমা-লোচনা করতে গিয়ে পুর্ব্বের আশঙ্কাই রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'রায়তের কথা' প্রবন্ধে

প্রকাশ করেছেন। তিনি বলতে চেয়েছিলেন ; যদি জমির হস্তান্তরে বাধা না থাকে এবং জমি যদি খোলা বাজারে বিক্রি হয়ই তাহ'লে যে ব্যক্তি স্বয়ং চাষ করে তার কেনবার সম্ভাবনা অল্পই, যে লোক চাষ করেনা, কিন্তু যার টাকা আছে অধিকাংশ বিক্রয়যোগ্য জমি তার হাতে গিয়ে পড়বেই। অর্থাৎ নতুন করে মালিকানা সৃষ্টি হ'বে। তাতে সমস্যার সমাধান হ'বেনা। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন জমিদারী ব্যবস্থা অবসান ঘটিয়ে সমবায়ের মাধ্যমে পল্লীর মধ্যে সমগ্রভাবে প্রাণসঞ্চার করতে পারলে তবেই সে সেই প্রাণের সম্পূর্ণতা নিজেকে প্রতিনিয়ত রক্ষা করবার শক্তি নিজের ভিতর থেকেই উদ্ভাবন করতে পারবে।

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে স্বদেশের আর্থনীতিক জীবন, তার বিবর্ত্তন ও সংকটের বিশ্লেষণ আলোচনা করা হ'ল। কিন্তু পশ্চিমী জগতে সেদিন ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে আর্থনীতিক শোষণ, চরম ধনবৈষম্য ও বাণিজ্য সংকট আবর্তের লক্ষণ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। উনবিংশ শতকের শেষার্ধে য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রাথমিক পর্য্যায়ের কল্যাণধর্মী-সৃজনশীল শক্তি নিঃশেষিত হ'য়ে একচেটিয়া ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির পত্তন ঘটেছে এবং অপরদিকে ধনতন্ত্র-আশ্রিত যে গণতন্ত্র একদিন মানুষকে সাম্য, মৈত্রী স্বাধীনতার আদর্শে অনুপ্রাণিত করেছে সেই ধনতন্ত্র সেদিন তার সংকট থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-কাঠামোর আড়ালে য়ুরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা, প্রভৃতি দেশগুলিতে জাতীয়তাবাদের দোহাই দিয়ে সাম্রাজবাদের-রূপে অত্যাচার, অসাম্যের, শোষণ দাসত্ব-পরাধীনতার-দণ্ড হস্তে মূর্ত হয়ে উঠেছে। শ্রেণীশোষণ ও ক্রমবর্ধমান ধন-বৈষম্যের প্রতিক্রিয়ায় ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির সংকট প্রথম অবস্থায় য়ুরোপের ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে উনবিংশ শতকের শেষার্ধে আর্থনীতিক-বাণিজ্যিক সংকটের আকারে দেখা দিল—কিন্তু ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রকৃতি এই যে তাকে বাঁচতে হ'লে তার শোষণের শক্তিকে তীব্রতর এবং ক্ষেত্রকে ব্যাপকতর করতেই হ'বে। ফলে, বিভিন্ন ধনতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যেই অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয় এবং সেই শোষণের ক্ষেত্র নিয়ে তাদের সংকটের চরম প্রকাশ ঘটে যুদ্ধে। অবশ্য পরিণামে এর প্রতিক্রিয়া অন্য রূপেও দেখা দেয়। আর্থনীতিক সংকট ও শোষণের হাত থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশে শোষিত জন আর্থনীতিক শোষণ-বিহীন উৎপাদন-ব্যবস্থা ও সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় সমাজবিপ্লব সংঘটিত করে।

রবীন্দ্রনাথ ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির এই সংকট ও ইতিহাস নির্দেশিত-পরিণতিমুখী গতি প্রত্যক্ষ করেছেন। তাই তাঁর বিভিন্ন রচনাতে জাতীয়তাবাদ এবং আধুনিক রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকর্ম্মের ও ধনতান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। (কালান্তর Nationalism, দ্রষ্টব্য)

বিংশ শতাব্দীতে ধনতন্ত্র আত্মরক্ষার উপায় হিসেবে সাম্রাজ্যবাদে রূপান্তরিত হয়েছে; বিভিন্ন ধনতান্ত্রিক দেশ তাদের স্বকীয় আর্থিক শোষণ ক্ষমতার ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধির প্রচেষ্টার প্রতিদন্দ্বিতা মহাযুদ্ধে (১৯১৪ ও ১৯৩৯ এর যুদ্ধ) এবং ৩০ এর মহাসংকটের রূপে দেখা দিয়েছে। (অর্থনীতিবিদ কার্লমার্ক্স ছাড়াও আধুনিককালের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ কেইন্‌সও উৎপাদন বিপুলতা ও ধনবৈষম্য হেতু সীমিত বাজার সৃষ্ট সংকটই ধনতন্ত্রের মৃত্যুর কারণ হ'তে পারে বলেছেন।) শুধু তাই নয় ধনতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী আর্থনীতিক বিধিব্যবস্থার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ বিদ্রোহী হয়ে উঠছে এবং সেই বিদ্রোহ ধনতন্ত্র-আশ্রিত গণতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে ব্যক্তিগত শোষণ ও ধন-বৈষম্য বিহীন সমাজতন্ত্রী অর্থনীতি প্রতিষ্ঠায় রূপায়িত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এই নতুন সমাজের সৃষ্টিও প্রত্যক্ষ করেছেন এবং শুধু প্রত্যক্ষ করেননি সেই ব্যবস্থাকে তাঁর জীবনের একটি মহাতীর্থ বলে অভিনন্দিত করেছেন।

এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

"মোট কথা হচ্ছে, আধুনিক কালে ব্যক্তিগত ধনসঞ্চয় ধনীকে যে প্রবল শক্তির অধিকার দিচ্ছে তাতে সর্বজনের সম্মান ও আনন্দ থাকতে পারে না। তাতে এক পক্ষে অসীম লোভ, অপর পক্ষে গভীর ঈর্ষা, মাঝখানে দুস্তর পার্থক্য। সমাজে সহযোগিতার চেয়ে প্রতিযোগিতা অসম্ভব বড়ো হয়ে উঠল। এই প্রতিযোগিতা নিজের দেশের এক শ্রেণীর সংগে অন্য শ্রেণীর, এবং বাইরে এক দেশের সংগে অন্য দেশের। তাই চারদিকে সংশয় হিংস্র অস্ত্র শাণিত হ'য়ে উঠছে, কোন উপায়েই তার পরিমাণ কেউ খর্ব করতে পারছেনা। আর পরদেশী যারা এই দূরস্থিত ভোগ-রাক্ষসের ক্ষুধা মেটাবার কাজে নিযুক্ত তাদের রক্তবিরল কৃশতা যুগের পর যুগ বেড়েই চলেছে। এই বহুবিস্তৃত কৃশতার মধ্যে পৃথিবীর অশান্তি বাসা বাঁধতে পারেনা, একথা যারা বলদর্পে কল্পনা করে তারা নিজের গোয়ার্তুমির অন্ধতার দ্বারা বিড়ম্বিত। যারা নিরন্তর দুঃখ পেয়ে চলেছে সেই হতভাগারাই দুঃখবিধাতার প্রেরিত দূতদের প্রধান সহায়। তাদের উপবাসের মধ্যে প্রলয়ের আগুন সঞ্চিত হ'চ্ছে।......বর্ত্তমান সভ্যতার এই অমানবিক অবস্থায় বলশেভিক নীতির অভ্যুদয়।" ('রাশিয়ার চিঠি')

রুশদেশে বিপ্লবের পর যে নতুন আর্থনীতিক বিধি-ব্যবস্থা অনুসৃত হয়েছিল তা' রবীন্দ্র মানসকে গভীরভাবে আলোড়িত করে। রুশদের পরিচালক ও সাধারণ মানুষ দেশের আর্থনীতিক উন্নয়নের প্রচেষ্টায় যে নীতি ও পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন এবং সেই নীতি ও পদ্ধতিকে সার্থক করতে গিয়ে তাঁরা যে অতুলনীয় আত্মত্যাগ ও কৃচ্ছ্রতা স্বীকার করেছিলেন সে কথা কবি বারংবার সশ্রদ্ধচিত্তে উল্লেখ করেছেন আর সঙ্গে সঙ্গে ভারতের হতভাগ্য চাষী মজুরদের দুঃখময়-জীবনের কথা স্মরণ করে ব্যথিত হয়েছেন।

লক্ষ্য করবার বিষয় সেদিন সোভিয়েট-তন্ত্রে সমাজতন্ত্রী পরিকল্পনার সাহায্যে শিল্পায়ণের যে চেষ্টা চলেছিল তার প্রকৃত স্বরূপ রবীন্দ্র-মানসে ধরা পড়েছিল এবং তিনি এই প্রচেষ্টা সম্পর্কে আন্তরিক সহানুভূতি ও শ্রদ্ধার সংগে লিখেছিলেন,

"এরকম দেশকে বাঁচাবার উপায় কারখানার কাজ খোলা, যাকে বলে industrialisation বিদেশী বা স্বদেশী ধনী মহাজনদের পকেট ভরাবার জন্যে কারখানার কথা হ'চ্ছেনা, এখানকার কারখানার উপস্বত্ব সর্ব্ব সাধারণের" ('রাশিয়ার চিঠি')

সত্যিকারের পরিকল্পনার সাহায্যে শিল্পায়ণ করতে হ'লে মুনাফাভিত্তিক ব্যক্তিমালিকানার অস্তিত্ব একটি প্রধান বাধা আজকের দিনের পরিকল্পনা-মূলক অর্থনীতিতে তা' সর্ব্বত্র স্বীকৃত। যদিও বাস্তবে আজকের অনেক তথাকথিত পরিকল্পনা-মূলক শিল্পায়ণের অর্থনীতিতে এ তত্ত্বের প্রয়োগ বড় একটা দেখা যাচ্ছেনা—ফলে, শিল্পায়ণ শম্বুকগতি এবং জনজীবনে দুঃখ পাহাড় প্রমাণ হয়ে উঠেছে অথচ অদূর ভবিষ্যতে সুখের আশার আলোর ইঙ্গিত নেই। আবার, শিল্পায়নের কাজে একদিকে সর্বসাধারণের আন্তরিক উৎসাহ, উদ্যম অক্লান্ত পরিশ্রম অপরদিকে তাদের বিলাসব্যসন বিহীন জীবন ধারণের পক্ষে অপরিহার্য্য পণ্যে সীমাবদ্ধ স্বল্পভোগ, বিপুল ত্যাগ ও কৃচ্ছ্রতা সর্বজনীন কল্যাণকারী শিল্পায়ণের ভিত্তি স্থাপনের পক্ষে অন্যতম সর্ত। স্বেচ্ছাকৃত বিপুলত্যাগ ও কৃচ্ছ্রতা সাধন তখনই মানুষ সাগ্রহে করে যখন তার ভবিষ্যৎ সু-ফল মুষ্টিমেয় মানুষের উদ্দেশ্যে না ঘটে সর্বজনীন হয়। শ্রেণী—বৈষম্য বিহীন সমাজ ব্যবস্থাতেই তা' সম্ভব।

রবীন্দ্রনাথ সেদিন সোভিয়েট দেশের মানুষের ত্যাগ ও আন্তরিক প্রচেষ্টার একনিষ্ঠতা দেখে আনন্দে ব্যাকুল হ'য়ে লিখেছিলেন,

"এই কাজের এদের প্রভূত টাকার দরকার। য়ুরোপীয় বড়বাজারে এদের হুণ্ডি চলেনা, নগদ দামে কেনা ছাড়া উপায় নেই। তাই পেটের অন্ন দিয়ে এরা জিনিষ কিনছে, উৎপন্ন শস্য, পশুমাংস ডিম মাখন সমস্ত চালান হচ্ছে বিদেশের হাটে। সমস্ত দেশের লোক উপবাসের প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। এখনও দেড় বছর বাকি। অন্য দেশের মহাজনেরা খুসী নয়। বিদেশী ইঞ্জিনিয়াররা এদের কলকারখানা অনেক নষ্ট করেছে। ব্যাপারটা বৃহৎ ও জটিল, সময় অত্যন্ত অল্প। সময় বাড়াতে সাহস হয়না, কেননা সমস্ত ধনীজগতের প্রতিকূলতার মুখে এরা দাঁড়িয়ে, যত শীঘ্র সম্ভব আপন শক্তিতে ধন উৎপাদন এদের পক্ষে নিতান্ত দরকার। তিনবছর কষ্টে কেটে গেছে, এখনও দুবছর বাকি।" (রাশিয়ার চিঠি)

দরিদ্র দেশের আর্থনীতিক উন্নয়ন পদ্ধতির মূলনীতি এই বিশ্লেষণে প্রকাশিত। আমাদের দেশের শিল্পায়ণ-প্রচেষ্টার এই নীতি আজও স্বীকৃতি পেল না—তার গতি মন্থর, সাধারণ মানুষের দুঃখ কষ্টের সীমা ক্রমশঃই দীর্ঘায়ত হ'চ্ছে।

অবশ্য রবীন্দ্রনাথ ভারতের কৃষি অর্থনীতির সমাধানের জন্য কলের লাঙলের কথা এবং আর্থনীতিক উন্নয়ণের উদ্দেশ্যে যন্ত্রশিল্প প্রবর্ত্তনের কথা বলেছেন কিন্তু যন্ত্রশিল্প বা কলের লাঙল প্রবর্ত্তন করতে হলে যে সঞ্চয়-বিনিয়োগ-ভিত্তিক আর্থনীতিক কর্ম পদ্ধতি অনুসরণ করা প্রয়োজন সে সম্পর্কে পদ্ধতি বা বাণিজ্যগত কোন নির্দেশ নেই। আবার তিনি আর্থনীতিক সমস্যার সমাধানের জন্য যে ব্যবস্থার কথা বলেছেন তার মালিকানা ও সংগঠন ব্যবস্থা কি হ'বে—সে সম্পর্কে তিনি নীরব। আর্থনীতিক সম্পদ ও ক্রিয়াকর্মে লেসেফেয়ার, নীতির অনুসরণ না রাষ্ট্রীয় নির্দেশে ও তত্ত্বাবধানে যুক্তিধর্মী সুপরিকল্পিত (Planned Economy) পদ্ধতির অনুসরণ এই প্রসঙ্গেও তিনি কিছু বলেননি। অথচ সেদিনের বিশিষ্ট ভারতীয় অর্থনীতি বিদ্ রমেশ চন্দ্র দত্ত, রানাডে, গোখেল প্রভৃতিদের রচনায় এ প্রসঙ্গে যথেষ্ট আলোচনা রয়েছে। সমবায় পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর যে ধারনা তাতে ও সাধারণভাবে আর্থনীতিক সূত্র ও কর্মপদ্ধতির সুসংবদ্ধ নীতির উল্লেখ নেই। বরং এদিক থেকে গান্ধীজীর আর্থনীতিক মতবাদ অপেক্ষাকৃত সম্পূর্ণ। গান্ধীবাদে একটি সুসংবদ্ধ আর্থনীতিক তত্ত্বও কর্মপদ্ধতির পরিচয় আমরা পাই।

রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে ভারতের ও বহির্বিশ্বে যে ভয়ঙ্কর আর্থনীতিক সংকট সংস্কৃতি ও সভ্যতার সংকটরূপে দেখা দেয় তাতে তিনি গভীরভাবে বিচলিত হয়েছিলেন। এ থেকেই তার বিভিন্ন রচনায় আর্থনীতিক আলোচনা প্রাধান্য পেয়েছে। ইতিহাস-গতির ইঙ্গিত তিনি সঠিক উপলব্ধি করেছিলেন—তাই তিনি যন্ত্র শিল্প সভ্যতাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং প্রাচীন অর্থনীতি আশ্রিত ভারতে মানুষের দু:খময় জীবন থেকে রক্ষার উপায় হিসেবে যন্ত্র শিল্পগত অর্থ-নীতির প্রসারের প্রয়োজনের কথা বারংবার ঘোষণা করেছেন কিন্তু যন্ত্রশিল্পগত অর্থনীতির সংগঠনের জন্যে যে আর্থনীতিক কর্মপদ্ধতির অনুসরণ ও সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রীয় সংগঠনগত পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন—তার নির্দেশ পাওয়া যায়নি। তিনি য়ুরোপে যন্ত্রশিল্পের কল্যাণধর্মী রূপ দেখেছেন; আবার সেই যন্ত্রশিল্প আশ্রিত ধনতন্ত্রের সাম্রাজ্যবাদী রূপান্তরের ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখে তীব্রভাবে তার নিন্দা করেছেন। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির যে-সংকট সেদিন য়ুরোপে প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিল তাকে তিনি বল্লেন ধনগত উপকরণের প্রতি মানুষের দুর্নিবার লোভ এবং উপকরণ প্রাচুর্য্যের সৃষ্টির প্রয়াসে মানুষের অন্তর উপেক্ষিত—অবহেলিত থেকে গেল—এর ফলেই সভ্যতার সংকট ঘনায়মান হয়েছে। এখানেই রবীন্দ্র-নাথের ঔপনিষদিক মানবতাবাদ ও প্রগতিশীল অর্থনৈতিক চিন্তার সমাহৃত রূপ দেখতে পাই।

চরিতসাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ

শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য্য

রবীন্দ্রনাথ যখন কবি-চরিত রচনায় ব্রতী হয়েছেন সেখানে তিনি তাঁদের ব্যক্তিজীবনের, সামাজিক পটভূমির বা লৌকিক সম্পর্কের তথ্যগুলিকে সচেতন-ভাবে বর্জন করেছেন। তথ্যের চেয়ে সত্যকে, বহির্জগতের চেয়ে অন্তর্জগতকে তিনি চিরদিনই প্রধান স্থান দিয়ে এসেছেন। 'পথের সঞ্চয়' গ্রন্থের 'অন্তর বাহির' প্রবন্ধে তিনি অনবদ্যভাষায় লিখেছেন :

"আমাদের গুণীরা ভৈরোঁতে টোড়িতে সুর বাঁধিয়া বলিলেন, ইহা সকালবেলাকার গান। কিন্তু তাহার মধ্যে সকালবেলার নবজাগ্রত সংসারের নানাবিধ ধ্বনির কি কোনো নকল দেখিতে পাওয়া যায়। কিছুমাত্র না। তবে ভৈরোঁকে টোড়িকে সকালবেলাকার রাগিনী বলিবার কী মানে হইল। তাহার মানে এই, সকালবেলাকার সমস্ত শব্দ ও নিঃশব্দতার অন্তরতর সংগীতটিকে গুণীরা তাঁহাদের অন্তঃকরণ দিয়া শুনিয়াছেন। সকালবেলাকার কোনো বহিরঙ্গর সঙ্গে এই সংগীতকে মিলাইবার চেষ্টা করিতে গেলে সে চেষ্টা ব্যর্থ হইবে।"

তিনি এই প্রসঙ্গে 'গুণীদের অন্তঃকর্ণে'র কথার উল্লেখ করেছেন এবং 'বাহিরের প্রকাশের অন্তরালে যে-একটি গভীরতর অন্তরের প্রকাশ আছে' তারই পরিচয় পেয়েছেন ভৈরোঁ, টোড়ি, কানাড়ার প্রভাত-নিশীথের আলাপে।

তেমনি কবির প্রকৃত 'গভীরতর অন্তরের প্রকাশ' লাভ করতে হলে 'বাহিরের প্রকাশ'কে দেখে কোনো লাভ নেই বলে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন। 'উৎসর্গ' কাব্যে একটি কবিতায় তিনি এ সম্পর্কে লিখেছেন :

'বাহির হইতে দেখো না এমন করে
আমায় দেখোনা বাহিরে।
আমায় পাবেনা আমার দুখে ও সুখে,
আমার বেদনা খুঁজোনা আমার বুকে,
আমায় দেখিতে পাবেনা আমার মুখে,
কবিরে খুঁজিছ যেথায় সেথা সে নাহিরে।

* * *

যে আমি স্বপন-মুরতি গোপনচারী,
যে আমি আমারে বুঝিতে বুঝাতে নারি,
আপন গানের কাছেতে আপনি হারি,
সেই আমি কবি। কে পারে আমারে ধরিতে।'

'চৈতালি'র 'কাব্য' নামে কবিতাটিকে তিনি কালিদাস সম্পর্কে লিখেছেন যে তাঁর জীবনে 'সুখ-দুঃখ, যত আশা-নৈরাশ্যের দ্বন্দ্ব' 'রাজসভা ষড়যন্ত্রচক্র, আঘাত-গোপন' সবই নিশ্চয় বিদ্যমান ছিল। তাঁকেও হয়ত 'অপমান ভার, অনাদর, অবিশ্বাস, অন্যায় বিচার, অভাব কঠোর ক্রূর' সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু তাঁর মতে কালিদাসের প্রকৃত পরিচয় রয়েছে :

> "তবু সে সবার উর্ধ্বে নির্লিপ্ত নির্মল
> ফুটিয়াছে কাব্য তব সৌন্দর্য কমল
> আনন্দের সূর্য-পানে ;"

এই মনোভাবের সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত তাঁর 'কবি জীবনী' প্রবন্ধটি (১৩০৮, আষাঢ়)। কবি লর্ড টেনিসনের দুই খণ্ডে সমাপ্ত চরিত গ্রন্থ রচনা করেন কবি পুত্র হ্যালাম টেনিসন্। বইখানি ১৮৯৭ এ প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ এই বৃহৎ চরিতগ্রন্থের সমালোচনা পড়ে তৃপ্ত হতে পারেননি। তার মুখ্য কারণ তাঁর মতে টেনিসনের কবি-জীবনের অন্তরতর সত্যটি ঐ তথ্যাকীর্ণ গ্রন্থের মধ্যে উদ্ভাসিত হয়নি। তিনি তাই লিখেছেন :

> "ইহা টেনিসনের জীবনচরিত হইতে পারে, কিন্তু কবির জীবনচরিত নহে। আমরা বুঝিতে পারিলাম না, কবি কবে মানবহৃদয় সমুদ্রের মধ্যে জাল ফেলিয়া এত জ্ঞান ও ভাব আহরণ করিলেন এবং কোথায় বসিয়া বিশ্বসংগীতের সুরগুলি তাঁহার বাঁশিতে অভ্যাস করিয়া লইলেন। ......যে-ভাবে তিনি বিরাট, যে ভাবে তিনি মানুষের সহিত মানুষকে, সৃষ্টির সহিত সৃষ্টিকর্তাকে একটি উদার সংগীতরাজ্যে সমগ্র করিয়া দেখাইয়াছেন, তাঁহার সেই বৃহৎ ভাবটি জীবনীর মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে নাই।"

রবীন্দ্রনাথ টেনিসন্ পুত্র রচিত জীবনীর অসম্পূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির উল্লেখ করেছেন এবং 'কবির জীবনচরিত' স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে রচিত হওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছেন। তাঁর 'পথের সঞ্চয়' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'কবি য়েটস্' প্রবন্ধটি (১৯১২) পড়লে বোঝা যায় কবি কীভাবে এই কবির 'গভীরতর অন্তরের প্রকাশ'টি বিশ্লেষণ করে কবিচরিত রচনার প্রকৃত পথ নির্দেশ প্রয়াসী। এই প্রসঙ্গে স্বাভাবিক ভাবেই এমার্সনের English traits and Representative Men (১৮৩৩) গ্রন্থের প্রথমাংশের কথা মনে হবে কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এমার্সনের ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ-বর্ণনা এবং রবীন্দ্রনাথের য়েটস্-বর্ণনার রীতি ও দৃষ্টি পৃথকধর্মী।

ঠিক এই কারণেই হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বঙ্গভাষার লেখক' (১৩১১) গ্রন্থে সংকলিত অন্যান্য কবি-সাহিত্যিকদের রচিত স্বজীবন বৃত্তান্ত থেকে রবীন্দ্রনাথের রচনাটি সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মী। তিনি প্রথমেই লিখেছেন :

"জীবনবৃত্তান্ত হইতে বৃত্তান্তটা বাদ দিলাম। কাব্যের মধ্য দিয়া আমার কাছে আজ আমার জীবনটা যে-ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে'—

সেই রূপটিকেই তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। সেইটি তাঁর কবিজীবনের 'সত্য', তাঁর 'জীবন দেবতা' বাদ। দুঃখের বিষয় সেকালে এই রচনাটি প্রকাশিত হলে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে দাম্ভিকতা, অস্পষ্টতা ও দুর্বোধ্যতার অভিযোগ আনীত হয়।

এই প্রসঙ্গে বলা যায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আত্মজীবনী' মুখ্যত তাঁর ব্রহ্মোষণা ও ব্রহ্মানন্দোপলব্ধির বিবৃতি এবং সেজন্যই শ্রীমতী আন্ডারহিল্ এই গ্রন্থখানিকে পৃথিবীতে সাধু-পুণ্যাত্মাদের রচিত 'few classic autobiographies'-এর অন্যতম বলে ঘোষণা করেছেন। এর সঙ্গে দেওয়ান কার্তিকেয় চন্দ্র রায়ের 'আত্মচরিত' গ্রন্থের তুলনা করা অবাস্তব ও অসম্ভব। তেমনি রবীন্দ্রনাথ যেভাবে তাঁর কবিসত্তায় জীবনদেবতার আবির্ভাবকে ব্যাখ্যা করেছেন তার ভিত্তি সম্পূর্ণ-রূপেই subjective। এই দৃষ্টি নিয়ে দেখলে রবীন্দ্র-বিরোধীরা দেখতে পেতেন যে ঐ রচনাটিতে দাম্ভিকতা, অস্পষ্টতা বা দুর্বোধ্যতা নেই—শুধু কবি তাঁর অন্তরে উপলব্ধ কবিজীবনের সত্যটিকেই প্রকাশ করেছেন।

কিছু পরে রচিত তাঁর 'জীবনস্মৃতি' (১৯১২) গ্রন্থখানি একদিক থেকে 'স্মৃতির মায়াপুরী'। তাঁদের পরিবারের, সাহিত্যিক পরিবেশের, স্বাদেশিক প্রচেষ্টার এবং নিজের ব্যক্তিজীবনের পরিচয়মূলক বহু তথ্য এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে। তিনি আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন:

"এ লেখাটি জীবনী নহে। ইহা কেবল অতীতের স্মৃতিমাত্র। এই স্মৃতিতে অনেক বড়ো ঘটনা ছোটো এবং ছোটো ঘটনা বড়ো হইয়া উঠিয়াছে, সন্দেহ নাই।......অতএব ইহাকে জীবনের পুরাবৃত্ত বলা চলে না—ইহা স্মৃতির ছবি।" (দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপি)

এবং

"জীবনের সকল স্মৃতি স্তূপাকার করিয়া ধরিলে তাহার কোনও শ্রী থাকে না। সেইজন্য আমি একটি সূত্র বাহিয়া স্মৃতিগুলিকে সাজাইতেছিলাম। সেই সূত্রটিই আমার জীবনের প্রধান সূত্র অর্থাৎ আমার লেখক জীবনের ধারা।' (তদেব)।

তিনি সেজন্যই নিজের কবিসত্তার উন্মেষ ও ক্রমপরিণতির দিকটির পরই বেশি জোর দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন:

"আমি ইহা আজ বেশ করিয়া জানিয়াছি যে, কবির জীবন যেমন কাব্যকে প্রকাশ করে কাব্যও তেমনি কবির জীবনকে রচনা করিয়া চলে।......পদ্মের বীজকোষ এবং তাহার দলগুলির মতো একত্রে রচিত আমার জীবন ও কাব্যগুলিকে একসঙ্গে দেখাইতে পারিলে সে চিত্র ব্যর্থ হইবেনা।"

তাই দেখি 'জীবনস্মৃতি'র শেষে তিনি পুনরায় জীবনদেবতার উল্লেখ করেছেন। 'বঙ্গভাষার লেখক' (১৯০৪)-এর রচনাটিতে তাঁর কবিসত্তার মূলে যে-জীবনদেবতার আবির্ভাব ও তাঁর নিয়ন্ত্রীশক্তিকে ব্যাখ্যা করেছিলেন 'জীবনস্মৃতি'র সমাপ্তি অংশে তাঁরই কথা উত্থাপন করে লিখেছেন:

এই সমস্ত বাধা বিরোধ ও বক্রতার ভিতর দিয়া আনন্দময় নৈপুণ্যের সহিত আমার জীবন-দেবতা যে একটি অন্তরতম অভিপ্রায়কে বিকাশের দিকে লইয়া চলিয়াছেন তাহাকে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেখাইবার শক্তি আমার নাই। সেই আশ্চর্য পরম রহস্যটুকুই যদি না দেখানো যায়, তবে আর-যাহা কিছু দেখাইতে যাইব তাহাতে পদে পদে কেবল ভুল বুঝানোই হইবে।

'জীবনস্মৃতি' আলোচনায় এই কথাটি আমাদের বিশেষভাবে স্মরণ রাখা দরকার।

অনেকে 'জীবনস্মৃতি'কে গ্যেটের (১৭৪৯-১৮৩২) 'Truth and Poetry: From my own life' নামক আত্মজীবনীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। ত্রয়োদশ পর্বে গ্যেটের এই বৃহৎ অথচ অসমাপ্ত আত্মচরিত লিখিত হয়েছে। গ্যেটে ১৭৭১-এর পর তাঁর জীবনকাহিনী বিবৃত করেননি। রবীন্দ্রনাথও তাঁর জীবনস্মৃতির মধ্যে 'কড়ি ও কোমল' রচনাকাল অবধি তাঁর জীবনের স্মৃতি তথা কবিজীবনের সত্যটিকে উদ্‌ঘাটিত করেছেন। তারপর 'খাস মহালের দরজার' সামনে পাঠকদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছেন। কিন্তু গ্যেটের আত্মরচিত ও রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতির এই মিল একান্তই বহিরঙ্গীয়। অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ ও উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধের জার্মানী, গ্যেটের ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক প্রভাব, সামাজিক পরিবেশ কোনো দিক থেকেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মিল নেই। গ্যেটের আত্মজীবনী রচনার পিছনে ছিল রুশোর বিখ্যাত 'Confession'sএর প্রভাব। তিনি রুশোর মতই নিজের জীবনের উদ্দাম প্রণয়-ইতিহাসকে অকুণ্ঠভাবে উদ্‌বারিত করে দেখিয়েছেন। 'জীবনস্মৃতি'তে কি তার সাদৃশ্য পাওয়া যায়? তাছাড়া গ্যেটে যে-ভাবে আইনবিদ্যা, রসায়ণ, . ভেষজ বিজ্ঞান, জ্যোতিবিজ্ঞান প্রভৃতির চর্চা করেছিলেন, যার রূপ ফাউষ্ট চরিত্রে বিধৃত, রবীন্দ্রনাথ সে-জগত থেকে পলাতক, গীতিকবি। অন্যদিকে গ্যেটের মধ্যে যে পুণ্য-পাপের দ্বৈতসত্তার দ্বন্দ্ব যৌবনের প্রথমেই দেখতে পাই, সেই—মেফিসটোফেলিস ও ফাউস্‌টের দ্বন্দ্ব কি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে লক্ষিত হয়? স্বর্গ-নরকের সেই টাইটানিক দ্বন্দ্ব রবীন্দ্রনাথের মধ্যে অসম্ভব নয় কি?

রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি রচনা রীতিও গ্যেটের Dichtung and wahrheit থেকে পৃথক। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে চরিত ও আত্মচরিত সম্পর্কে গ্যেটের ধারণা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এক নয়। গ্যেটে লিখেছেন:

"to exhibit the man in relation to the features of his time; and to show to what extent they have opposed or favoured his progress; what view of mankind and the world he has formed from them and how far he himself, if an artist poet or author may externally reflect them."

—এই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মিল নেই। গ্যেটে তাঁর আত্মজীবনীকে সমকালীন যুগের ঐতিহাসিক পটভূমিকায় রেখে রচনা করেছেন—সেজন্য তাঁর রীতি উপন্যাসিকের কিন্তু 'জীবনস্মৃতি' উপন্যাসের রীতিতে লেখা নয়। কাজেই জীবনস্মৃতিকে গ্যেটের আত্মজীবনীর সঙ্গে তুলনা করা সঙ্গত নয়।

অনুরূপ ভাবেই দেখা যাস রবীন্দ্রনাথ যখন জীবনী-সাহিত্য রচনায় অগ্রসর হয়েছেন, তিনি আলোচ্য ব্যক্তির জীবনের বাহিরের দিকটির ছোটবড়ো ঘটনার, তথ্য সমাবেশের চেয়ে জীবনের 'ভাব-সত্য'টির উপর বেশি জোর দিয়েছেন। দেখা যাবে 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' প্রবন্ধ রচনায়ও তিনি এই অন্তরনিহিত সত্যের অনুসন্ধান করেছেন। 'Fact'-এর চেয়ে 'Truth'কে বড়ো করে দেখেছেন। এই সূত্রে বলা দরকার যে ইতিহাস ও জীবনী ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। ব্যক্তিজীবনের ইতিহাসই জীবনী আর দেশ ও জাতির জীবনীই ইতিহাস। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে ইতিহাস ও জীবনীকে যে-দৃষ্টিতে দেখা হয় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার মিল নেই। রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেননি যে, সকল মানুষেরই চরিতগ্রন্থ লিখিত হওয়া দরকার। তিনি এ প্রসঙ্গে লিখেছেন:

"য়ুরোপকে চরিত বায়ুগ্রস্ত বলা যাইতে পারে। কোনমতে একটি যে কোন প্রকারে বড়লোকত্বের সুদূর গন্ধটুকু পাইলেই তাহার সমস্ত চিঠিপত্র, গল্পগুজব,, প্রাত্যহিক ঘটনার সমস্ত আবর্জনা সংগ্রহ করিয়া মোটা দুই ভল্যুম জীবনচরিত লিখিবার জন্য লোক হাঁ করিয়া বসিয়া থাকে। যে নাচে তাহার জীবনচরিত, যে গান করে তাহার জীবনচরিত—জীবন যাহার যেমনই হোক, যে লোক কিছু-একটা পারে তাহারই জীবনচরিত। কিন্তু যে-মহাত্মা জীবনযাত্রার আদর্শ দেখাইয়াছেন তাঁহারই জীবনচরিত সার্থক, যাঁহারা সমস্ত জীবনের দ্বারা কোন কাজ করিয়াছেন তাঁহাদেরই জীবন আলোচ্য"। (বারোয়ারি মঙ্গল, রবীন্দ্র রচনাবলী ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ৪৩৩)

কিন্তু য়ুরোপে রবীন্দ্রনাথের কাম্য জীবনীগ্রন্থ বিশেষ রচিত হয়নি। তিনি মানবসমাজে চিরদিনই 'ক্ষমতা' এবং 'মাহাত্ম্য' এই দুয়ের পার্থক্য নির্দেশ করে এসেছেন এবং তিনি লক্ষ্য করেছেন:

"য়ুরোপে এই ক্ষমতা এবং মাহাত্ম্যের প্রভেদ লুপ্তপ্রায়। উভয়েরেই জয়ধ্বজা একই রকম, এমনকি, মাহাত্ম্যের পতাকাই যেন কিছু খাটো। পাঠকগণ অনুধাবন করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, বিলাতে অভিনেতা আর্ভিঙের সম্মান পরমসাধুর প্রাপ্য সম্মান অপেক্ষা অল্প নহে।

রামমোহন রায় আজ যদি ইংলণ্ডে যাইতেন তবে তাঁহার গৌরব ক্রিকেট খেলোয়াড় রঞ্জিত সিংহের গৌরবের কাছে খর্ব হইয়া থাকিত।" (তদেব)

'ক্ষমতা' ও 'মাহাত্ম্য' এই দুইয়ের প্রভেদলুপ্তি রবীন্দ্রনাথের কাছে অসহ্য। কিন্তু তিনি কারলাইলের 'Hero-worship' দৃষ্টিকে গ্রহণ করেছেন বললে ভুল হবে। কারলাইল বিভিন্ন পর্যায়ের 'বীর' বা Heroর স্তুতি করেছেন। মহম্মদ, দান্তে, সেক্সপীয়র, লুথার, রুশো, জনসন্, ক্রমওয়েল, নেপোলিয়ন সকলেই তাঁর কাছে Hero, অবশ্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে। কিন্তু তাঁর লক্ষ্য যেন নীট্শে কথিত, অতিমানব—'মহৎ' মানব নয়। সেজন্যই তিনি জর্মানীতে ১৮৭০ এর পরবর্তী বিসমার্কের (১৮১৫–৯৮) 'blood and iron' শাসন-নীতির সমর্থক হয়েছিলেন এবং তারই 'পুরস্কার স্বরূপ বিসমার্ক তাঁকে দিয়েছিলেন Order of Merit। একথা স্বীকারে কোন দ্বিধা থাকা উচিত নয়, যে কারলাইল যদি এযুগে বেঁচে থাকতেন (তাঁর মৃত্যু ১৮৮১) তাহলে তিনি হিটলার-মুসোলিনীর সমর্থক হতেন। প্রমথ চৌধুরী এ-সম্পর্কে চমৎকার লিখেছেন:

"দুর্বলের উপর বল প্রয়োগের নামই যে বীরত্ব, তা বুঝলুম ঢের পরে, যখন কারলাইলের Hero-worship পড়লুম।" (বীরবল, প্রবন্ধ সংগ্রহ)।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ক্ষমতার 'blood and iron' নীতির চির-বিরোধী। তিনি মানব কল্যাণ মূল্যকে চিরদিনই শ্রেষ্ঠ মর্যাদা দান করেছেন, শক্তির প্রতাপকে নয়। হিটলার-মুসোলিনীর ফ্যাসিষ্ট শাসনকে তিনি 'দানবের মূঢ় অপব্যয়' বলে ধিক্কার দিয়েছেন।

বস্ওয়েল-রীতি ও লিটনস্ট্রেচি-রীতি অপর দুটি উল্লেখযোগ্য পন্থা পাশ্চাত্যে চরিত সাহিত্য রচনায়। রবীন্দ্রনাথ পক্ষে এ দুটির কোনটি গ্রহণ সম্ভব হয়নি। বস্ওয়েল জনসনের সঙ্গী, বন্ধু ও গুণমুগ্ধ ভক্ত ছিলেন। জনসনের জীবনের বিপুল তথ্য তিনি সুন্দরভাবে সন্নিবেশিত করেছেন তার মধ্য দিয়ে জন্সনকে 'জীবন্ত' ভাবে পাওয়া যায়। বস্ওয়েলের মধ্যেও hero-worship মনোবৃত্তি বিদ্যমান কিন্তু কারলাইলের পন্থা তাঁর নয়। আর লিটন স্ট্রেচির Eminent Victorians—এ দেখা যায় লেখক অষ্টাদশ-শতকী, সংশয় বাদী, মোহমুক্ত, বুদ্ধি প্রধান দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা চালিত হয়েছেন। কিন্তু একথাও অস্বীকার করা অন্যায় যে স্ট্রেচি ভিক্টোরীয় যুগের প্রখ্যাত নরনারীদের ধরাশায়ী করবেন বলে প্রস্তুত হয়েই তাঁর উপাদান সংগ্রহ করেছেন এবং যে-শরগুলি নির্বাচন করলে তাঁদের শরশয্যা রচনা করা যায় সেগুলিই নিপুণভাবে বেছে নিয়েছেন।

একটি দৃষ্টান্ত দিলে বক্তব্য স্পষ্ট হবে। স্ট্রেচি লিখেছেন কার্ডিনাল মানিং তাঁর স্ত্রীকে মনে-প্রাণে ভালোবাসেননি। উচ্চপদ লাভ ও উচ্চাকাংক্ষা তৃপ্তির

জন্যই তিনি তাঁকে বিবাহ করেছিলেন। কিন্তু মানিং প্রকৃতপক্ষে স্ত্রীকে খুব ভালোবাসতেন, সে তথ্য পাওয়া গেছে। পরলোকগতা পত্নীর ডায়েরি তাঁর কাছে যুগপৎ প্রেম ও শ্রদ্ধার বস্তু ছিল। তিনি তাঁর সুহৃদকে এ-সম্পর্কে তাঁর মনোভাব জ্ঞাপন করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ কারলাইল, বস্ওয়েল বা স্ট্রেচি কারোর দৃষ্টিভঙ্গিকে স্বীকার করেননি। তথ্যাকীর্ণ জীবনীর তিনি বিরোধী ছিলেন। রজার নর্থ যে-রীতিতে Life of Gray (১৭০৪) লিখেছিলেন, সেই Life and Letters রীতির চরম প্রতিষ্ঠা বসওয়েলের Life of Johnsonএ। রবীন্দ্রনাথ এই তথ্যধনী জীবনীর বিশেষ সার্থকতা দেখেননি, তাই তিনি লিখেছেন :

"অতি বিশ্বাসযোগ্য তথ্য স্তূপাকার করে তা দিয়ে স্মরণস্তম্ভ হতে পারে কিন্তু জীবনচরিত হবে কী করে।"

স্বভাবতই মনে পড়বে রবীন্দ্রনাথ 'কবিজীবনী' প্রবন্ধে টেনিসনের লিখিত জীবনীর বিরূপ সমালোচনা করেছিলেন তার কারণ তিনি ঐ গ্রন্থে টেনিসনের 'কবি স্বভাব'টিকে অর্থাৎ কবি জীবনের 'সত্য'কে প্রত্যক্ষ করতে পারেননি। ঠিক ঐ একই কারণে তিনি গোর্কি লিখিত টলষ্টয়ের জীবনীকেও সমর্থন জানাননি। এখানে রবীন্দ্রনাথ গোর্কি রচিত Reminiscences গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। টেনিসনের জীবনচরিতে যেমন 'যে ভাবে তিনি বিরাট' রূপটি রবীন্দ্রনাথ দেখতে পাননি তেমনি গোর্কি রচিত টলষ্টয়ের জীবনীতে 'যে-সত্যের গুণে' টলষ্টয় মহৎ' সেই ছবিটি তাঁর চোখে পড়েনি। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

"মাক্সিম গোর্কি টলষ্টয়ের একটি জীবনচরিত লিখেছেন। বর্তমানকালের প্রখর বুদ্ধি পাঠকেরা বাহবা দিয়ে বলেছেন, এ লেখাটা আর্টিষ্টের যোগ্য লেখা বটে। অর্থাৎ টলষ্টয় দোষে-গুণে ঠিক যেমনটি সেই ছবিতে তীক্ষ্ণ রেখায় তেমনটি আঁকা হয়েছে। এর মধ্যে দয়ামায়া ভক্তি-শ্রদ্ধার কোনো কুয়াশা নেই। পড়লে মনে হয় টলষ্টয় যে সর্বসাধারণের চেয়ে বিশেষ কিছু বড়ো তা নয় এমন কি অনেক বিষয়ে হেয়। ....টলষ্টয়ের কিছুই মন্দ ছিলনা এ কথা বলাই চলেনা; খুঁটিনাটি বিচার করলে তিনি যে নানাবিষয়ে সাধারণ মানুষের মতই এবং অনেক বিষয়ে তাদের চেয়েও দুর্বল, একথা স্বীকার করা যেতে পারে। কিন্তু যে সত্যের গুণে টলষ্টয় বহু লোকের এব-বহু কালের, তাঁর ক্ষণিক মূর্তি যদি সেই সত্যকে আমাদের কাছ থেকে আচ্ছন্ন করে থাকে তাহলে এই আর্টিষ্টের আশ্চর্য ছবি নিয়ে আমার লাভ হবে কি।......গোর্কির টলষ্টয়ই কি টলষ্টয়? বহু কালের ও বহুলোকের চিত্তকে যদি গোর্কি নিজের মধ্যে সংযত করতে পারতেন তাহলেই তাঁর দ্বারা বহু কালের বহু লোকের টলষ্টয়ের ছবি আঁকা সম্ভবপর হত।" (রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৯শ খণ্ড পৃঃ ৩৮২)।

আমাদের মনে রাখতে হবে রবীন্দ্রনাথের 'যে সত্যের গুণে টলষ্টয় মহৎ' এই বাক্যাংশই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এখানেও রবীন্দ্রনাথ টলষ্টয়ের জীবনের

অন্তরতর আদর্শ বা সত্যকেই সবচেয়ে বেশি মর্যাদা দিয়েছেন অন্য কিছুকে নয়।

আলোচিত প্রসঙ্গগুলির সূত্র ধরে বলা যায় 'যাঁহারা সমস্ত জীবনের দ্বারা কোন কাজ করিয়াছেন' তাঁদের জীবনই আলোচ্য বলে তাঁর কাছে মনে হয়েছে। সেজন্যই একদিকে বুদ্ধদেব ও খ্রীষ্ট অপরদিকে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধীর চরিত ভাষ্য তিনি রচনা করেছেন। তিনি তাঁর 'কথা' ও 'কাহিনী' কাব্য গ্রন্থে প্রাচীন ভারতের বীর্যবান সবল মনুষ্যত্বের ধর্ম এবং শিখ-রাজপুত-মারাঠাদের তেজ ও ত্যাগ-উদ্দীপ্ত জীবনের মহিমার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন। আমাদের প্রাচীন ভারতের বেদ-উপনিষদ-রামায়ণ-মহাভারতে জীবনের যে মহনীয় আদর্শ উদ্‌ভাসিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথ তাকে নব-ব্যাখ্যা দান করেছেন। তিনি বুদ্ধদেব সম্পর্কে তাঁর অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন তার প্রধান কারণ বুদ্ধদেবের 'মৈত্রী' সাধনা। মানব কল্যাণ-ব্রতে বুদ্ধদেব জীবন উৎসর্গ করেছেন—সেই ত 'ব্রহ্ম-বিহার'। রবীন্দ্রনাথ এই জীবনদর্শনকে 'মানবধর্ম' আখ্যা দিয়েছেন। এই মানবধর্মের রূপ কোনও দেশ-কালের দ্বারা বিধৃত বা নিয়ন্ত্রিত নয়। পৃথিবীতে নানা দেশে যে 'মানব যাত্রী যুগ হতে যুগান্তর পানে' যাত্রা করেছেন তাঁদের সকলের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ এই জীবনসত্যের প্রকাশ দেখেছেন। বেদ-উপনিষদ ও অন্যান্য প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রের প্রভাব তাঁর এই দৃষ্টি গঠনের মূলে,—একথা স্বীকার করেও বলা দরকার যে রবীন্দ্রনাথ 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা' 'শান্তম্‌ শিবম্‌ অদ্বৈতম্‌' 'রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং' প্রভৃতি মন্ত্রের তিনি যে-ব্যাখ্যা দিয়েছেন সে তাঁর নিজের জীবন দর্শনেরই প্রস্ফুটন, সে ব্যাখ্যা তাঁর পিতৃদত্ত ব্যাখ্যা থেকেও স্বতন্ত্র।

সেইরূপ এই কারণেই Renan অথবা Strauss যেভাবে খৃষ্টকে দেখেছেন রবীন্দ্রনাথ খৃষ্টকে সেভাবে দেখেননি। Strauss তাঁর Leben Jesu গ্রন্থে যিশু চরিতকে যেভাবে উপস্থাপিত করেছেন সেই 'আধুনিক' দৃষ্টি রবীন্দ্রনাথ বর্জন করেছেন। আমাদের বাংলাদেশে রামরাম বসু থেকে নবীন চন্দ্র সেন অবধি অনেকে খৃষ্ট-জীবনী কাব্যে প্রকাশ করেছেন। রামমোহন রায় খৃষ্ট ধর্মের সত্যকে গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু যাজকদের স্বার্থ-মূল ধর্মপ্রচারকে বাধা দিয়েছিলেন। কেশব চন্দ্র সেন তাঁর ধর্মমতে খৃষ্ট ধর্মের অনেক কিছুকেই গ্রহণ করেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আশ্রয় করেছিলেন বেদান্তকে, কেশবচন্দ্র বহুলাংশে গ্রহণ করেছিলেন বাইবেলকে।

আর—রবীন্দ্রনাথ খৃষ্টের জীবনে খুঁজে পেয়েছেন ত্যাগাজ্জ্বল ও প্রেমোদ্দীপ্ত মনুষ্যত্বের বাণী। তাঁর পিতৃদেব দেবেন্দ্রনাথ ঈশ্বরের সঙ্গে ভক্তির যোগ, পিতা-পুত্রের যোগ, প্রভু-সেবকের যোগ উপলব্ধি করেছিলেন। 'ওঁ পিতা

নোঽসি, পিতা নো বোধি'—এই মন্ত্রকে তিনি তাঁর সাধনায় সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যিশুর মধ্যে এই সত্যের প্রকাশ দেখেছেন :

"ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের যে গ্রন্থি বন্ধনের প্রয়োজন আছে মন্ত্র তার সহায়তা করে। মন্ত্রকে অবলম্বন করে আমরা তাঁর সঙ্গে একটা-কোনো বিশেষ সম্বন্ধকে পাকা করে নেব। সেইরূপ একটি মন্ত্র হচ্ছে : পিতা নোঽসি।......

যিশু ওই সুরটিকে পৃথিবীতে বাজিয়ে গিয়েছেন। এমনি ঠিক করে তাঁর জীবনের তার বাঁধা ছিল যে মরণান্তিক যন্ত্রনার দুঃসহ আঘাতের সেই তার লেশমাত্র বেসুর বলেনি, সে কেবলই বলেছে : পিতা নোঽসি॥ (খৃষ্ট প্রসঙ্গ—৪)"

যিশু চরিতে রবীন্দ্রনাথ দেখতে পেয়েছেন 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ'কে, তাঁর মতে যিশুর প্রাণদানে শুধু সত্যের জন্য আত্মত্যাগের মহত্ব প্রকাশ পায়নি, তিনি তাঁর মানবপ্রেম দ্বারা অগণ্য মানুষের চিত্তদীপ জ্বেলে দিয়েছেন। সেখানেই 'ব্রহ্ম-বিহার'—'পরম আনন্দ'-এর এষণা।

পূর্বে বলা হয়েছে রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতের জীবনে এবং মধ্যযুগে শিখ-মারাঠা-রাজপুত জীবনে যে মনুষ্যত্বের পরিচয় পেয়েছেন ও দিয়েছেন, আমাদের বাংলাদেশে তাকে তিনি প্রত্যক্ষ করেননি। সে ক্ষোভ তাঁর চিরদিন ছিল। ঊনবিংশ শতকের নব জাগরিত বাংলাদেশে তিনি 'যাঁহারা সমস্ত জীবনের দ্বারা' কাজ করেছেন তাদের সন্ধান পেলেন রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে। তাঁদের নিয়ে যে-জীবনী লিখেছেন তার নাম দিয়েছেন 'চারিত্র পূজা'। চরিত্রের শক্তিই চারিত্র।

রামমোহন বিদ্যাসাগর ও দেবেন্দ্র নাথের চরিত-ভাষ্য রচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। রামমোহনকে তিনি আখ্যাত করেছেন 'ভারত পথিক' রূপে। তাঁর মতে যে-উদার অসাম্প্রদায়িক বিশ্বজনীন ধর্ম ও মানবতাবোধ একদিন প্রাচীন ভারতে জাগ্রত ছিল, কালক্রমে 'তুচ্ছ আচারের মরু বালুরাশি বিচারের স্রোতঃ পথ'কে গ্রাস করে ফেলেছিল। রামমোহন সংস্কারের অচলায়তনকে ভেঙে সেই মহান ভারতপন্থকে পুনরাবিষ্কার করলেন। তিনি প্রাচীন ভারতের 'আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা' ঐক্য মন্ত্রটির নব প্রতিষ্ঠা ঘটালেন। এইভাবে রামমোহনের জীবনের 'ভাব-সত্য'টাকে রবীন্দ্রনাথ ব্যাখ্যা করলেন।

তেমনি বিদ্যাসাগরের চরিত্রে তিনি বাঙালীসুলভ উচ্ছ্বাসময় ভাবালুতার পরিবর্তেদেখেছিলেন কর্তব্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা, সত্যের প্রতি অটল আস্থা, মানব ধর্মের প্রতি গভীর বিশ্বাস। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বিদ্যাসাগর সম্পর্কে আলোচনা-কালে যোগবাশিষ্ট-এর 'মননেন হি জীবতি' শ্লোকটি উদ্‌ধৃত করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তার ব্যাখ্যায় লিখলেন, 'মনের জীবন মননক্রিয়া এবং সেই জীবনেই মনুষ্যত্ব'। বিদ্যাসাগরের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ দেখলেন 'মনন জীবনই তাঁহার

মুখ্য জীবন ছিল'। সেই দীপ্ত তেজস্বীরূপ দেখে রবীন্দ্রনাথ বিস্মিত হয়ে ভেবেছেন :

"আমাদের এই অবমানিত দেশে ঈশ্বরচন্দ্রের মতো এমন অখণ্ড পৌরুষের আদর্শ কেমন করিয়া জন্মগ্রহণ করিল, তাহা বলিতে পারিনা। কাকের বাসায় কোকিলে ডিম পাড়িয়া যায়; মানব-ইতিহাসের বিধাতা সেইরূপ গোপনে কৌশলে বঙ্গভূমির প্রতি বিদ্যাসাগরকে মানুষ করিবার ভার দিয়াছিলেন।"

দেবেন্দ্রনাথ সম্পর্কিত রচনাগুলিতে তিনি তাঁর পিতার যে মূর্তি আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন সে-ও তাঁর অন্তরতর সত্যের মূর্তি। 'যে সত্যের গুণে' তিনি বড়ো তাকেই ব্যাখ্যা করেছেন। ঐশ্বর্যের মধ্যে বাস করেও অমৃত-পিপাসা ও অমৃতসন্ধানের পথযাত্রা দেবেন্দ্রনাথের জীবনের সবচেয়ে বড়ো কথা। তাঁর চিত্তের মৈত্রেয়ী-প্রার্থনাটি কী ভাবে তাঁর সমগ্র জীবনের মধ্য দিয়ে শাশ্বত জ্যোতিরূপে বিকিরিত হয়েছে—সেইটিই রবীন্দ্রনাথ দেখিয়ে দিয়েছেন, তাঁর বাহিরের জীবনকে নয়।

কাজেই কবি জীবন আত্ম-জীবনী ও মহৎ জীবনী সর্বক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথ বাহিরের পরিচয়ের চেয়ে 'অন্তরতর সত্য'কেই বড়ো বলে মেনে এসেছেন। তাই তাঁর 'জীবনস্মৃতি' প্রকৃত পক্ষে কবিজীবন-স্মৃতি। তাঁর জীবনীমূলক প্রবন্ধগুলি subjective বা 'ভাবগত-সত্য'দৃষ্টি মণ্ডিত।

এ দৃষ্টিভঙ্গিকে অনেকে মানবেন না, বিরোধিতা করবেন, এবং তাঁদের পক্ষেও সুযুক্তির অভাব নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্যটিই এখানে আলোচনা করে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করা হলো। অন্যসব দৃষ্টিভঙ্গিই যে ভ্রান্ত, একথা বলা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়।

রবীন্দ্রনাথের কবিতার সংগীত-পাঠান্তর

শ্রীসুধীর চক্রবর্তী

পৃথিবীতে সবচেয়ে দুর্জ্ঞেয় বোধহয় কবির মন। কাব্যপাঠকের মন দর্পণের মত স্বচ্ছ না হ'লে তাই কবিতার অন্তরতম কথাগুলি অনুভব করা যায় না, এই হ'ল কবিমনীষীদের মত। এ মত স্বীকার্য, কেননা, কবিতা কোন বস্তুর রূপৈশ্বর্য নয় বরং নিবিড় বোধের ধ্বনিময় প্রকাশ। তাই তার উপভোগে আমাদের বস্তুভারনত মনকে ঊর্ধ্বে তুলতে হয়। এই ঊর্ধ্বগ্রীব অনুসন্ধান আয়াসসাধ্য এবং একাগ্র। যাঁরা এই একাগ্র অনুশীলনে আমগ্ন তাঁরা কাব্য-রসের সঙ্গে সঙ্গে পারিতোষিক পান জগতের অন্যতম রহস্যময় অংশের সন্ধান: কবির মন। বাস্তব ঘটনাকে অনুভবে মিশিয়ে ভাবময়তায় সাবলীল পূর্ণতা দেয় যাদুকর কবির মন। আমাদের চেনা জগতের বস্তু নিয়ে অচেনার রহস্য জাগে। একটি কি দুটি আমাদেরই ব্যবহৃত শব্দকে কী এক ধ্বনিতরঙ্গে মিশিয়ে অশেষ কথার আভায় আমাদের আনন্দিত করে যে শিল্পী সে আসলে কবির মন। কবিতা তাই সমুদ্র-সংকেত। আমাদের অমল অনুভব শব্দের কান্তার পার হয়ে সেই ভাবতরঙ্গস্রোতে বিকীর্ণ হয়ে যাকে বলা হয়েছে কাব্যোপলব্ধি। শব্দই কবিতার সংকেত। শব্দের নিপুণ অনুধাবনই বস্তুত প্রকৃষ্ট কাব্যপাঠ। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। ইয়েট্স্ তাঁর একটি কবিতার প্রারম্ভে প্রথমে লিখলেন: The quarrel of the Sparrows in the eaves। কিছু পরেই quarrel শব্দটি পালটে brawling শব্দটি বসালেন। এই পরিবর্তন কাব্য পাঠককে অভিনিবিষ্ট করে একটি চিন্তায়: quarrel শব্দটির বদলে brawling শব্দটির এমনকি মহিমা। বাংলা অনুবাদে প্রথম শব্দটির অর্থ 'কলহ' দ্বিতীয়টির 'কোলাহল'। দুটি শব্দের মধ্যে ব্যঞ্জনাগত যে সূক্ষ্ম পার্থক্য তার প্রকৃতমর্ম বুঝবেন তিনিই যিনি চালাঘরের কানাচে একপাল চড়াইয়ের ধ্বনিপুঞ্জ শুনেছেন। বলাবাহুল্য সে শব্দধ্বনি কলহ নয়, মধুর কোলাহল। শেষোক্ত শব্দপ্রয়োগ তাই অব্যর্থ। শব্দদুটির পুনর্বিশ্লেষণ করলে আরো দেখা যাবে, brawling, quarrelএর চেয়ে অনেক বেশি শ্রুতি-সুখকর এমনকি quarrel শব্দটির অনুষঙ্গ ইতর অতএব বর্জনীয়। সুতরাং এই পরিবর্তন কবিতাটিকে সুন্দরতর করল আর সেই সৌন্দর্যের ধ্যানী কবির মন। যে-মন পূর্ণতার অতলে ডুব দিয়ে সৌন্দর্যের সাধনারত।

কিন্তু অনেকের মতে গীতিকবিতা মুহূর্তের শিল্প। সৎকবির অনুভব থেকে

বিশেষ এক আবেগময় ক্ষণলগ্নে কবিতা পূর্ণশ্রী হয়ে জন্মায়। তার আর পরিবর্তন নেই; তার রূপান্তর মানেই অঙ্গহানি। কেননা অনেক শিল্পরূপ পরিবর্তন, পরিবর্জন ও পরিবর্ধনের নীতি মেনে চললেও গীতিকবিতা অপরিবর্ত, সম্পূর্ণাঙ্গ। কবিতার এ এক আশ্চর্য রহস্য! তার জন্মমুহূর্তেই পূর্ণতার মহিমা। তাই পরবর্তীকালে কবিতার একটি মাত্র শব্দ পরিবর্তনে কবিতার রসবিনষ্ট হয়, ছন্দোলিপির কিছুমাত্র রূপান্তরে শ্রুতি আহত হয়। অথচ এর বিরুদ্ধ মতের বক্তব্য হ'ল: শিল্পমাত্রেই সচেতন মনের স্বাক্ষর। সুতরাং প্রকৃষ্ট পরিবর্তন এবং সূক্ষ্ম বিচারপ্রসূত রূপান্তরে অনেক সময়েই শিল্প দ্বিতীয়জন্ম তথা পূর্ণতা পায়। এই প্রয়াসে অনেক দীর্ঘাকার কবিতা সংহত হয়। অনেক উচ্ছ্বসিত ভাবস্রোত সান্দ্র তরঙ্গরেখায় চিত্তস্পন্দী হয়ে ওঠে। অর্থাৎ কবিমনের তাৎক্ষণিক অনেক মোহ পরবর্তী পরিমার্জনার সাহায্যে নির্লিপ্ত প্রজ্ঞায় মণ্ডিত হয়।

এই দুই মতেরই পক্ষে এবং বিপক্ষে বলবার মত কিছু কথা সকলেরই আছে। কেননা পৃথিবীর অনেক শ্রেষ্ঠ কবিতা যেমন অপরিমার্জিত অথচ সুন্দর, তেমনই অনেক কবিতা যে আবার পরিমার্জনার মাধ্যমে শ্রেষ্ঠরূপ লাভ করেছে এ কথাও সত্য। উদাহরণত সমান্তরালভাবে দুটি কবিতার উল্লেখ করা যাক। রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষশেষ' চৈত্রান্ত এক ঝড়ের আবেগপুঞ্জিত স্মৃতিলেখা। এ-কবিতা রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা কিন্তু এর কোন পরিবর্তন রবীন্দ্রনাথ কখনও করেননি। পাশাপাশি স্মরণীয় কীটস্‌এর Endymion কাব্যের প্রবাদপ্রতিম পৃথক পংক্তি: 'A thing of beauty is a joy for ever'। এ পংক্তিটি কিন্তু মূল পংক্তির পরিবর্তিত রূপ অর্থাৎ পাঠান্তর। মূল রূপটি ছিল: 'A thing of beauty is a constant joy'। বলা বাহুল্য প্রথম পাঠের গদ্যাত্মক নীতিবাদী পংক্তিটি পরবর্তী পরিমার্জনার মাহাত্ম্যে সুন্দর ধ্বনিময় মাধুর্য পেয়েছে। জনৈক সমালোচক 'for ever' শব্দটির মধ্যে 'for ever and ever, Amen' এই প্রার্থনার অনুষঙ্গও খুঁজে পেয়েছেন। বস্তুত শব্দযোজনার ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ যাই হোক মূল সত্য এই যে, কাব্যের যাঁরা সমর্থক তাঁরা কবিতার সৃষ্টি উৎসের এই দ্বন্দ্বকে স্বীকার করে নিয়েছেন।

সম্ভবত সেই কারণেই সর্বাধুনিক কাব্যপাঠক যে-কোন কবিতার রসাস্বাদনের মুহূর্তে সচেতন থাকেন। লক্ষ্য রাখেন ঐ কবিতার কোন পূর্বপাঠ আছে কিনা। যদি থাকে, তবে উভয়পাঠের তারতম্য অনুধাবন করলেই কবিতাটির মর্মে প্রবেশ করবার নানা ইঙ্গিত ও দৃষ্টিকোণ পাওয়া যায়। কারণ শিল্পাস্বাদের সবটাই ভাবাত্মক নয়, কিছুটা বিশ্লেষণাত্মক এবং কিছুটা তথ্যসন্ধান। যে-কোন কবিতার পাঠান্তর সুতরাং সেই কবিতার মর্মোদ্ধারের চাবিকাঠি; রহস্যউন্মোচনের উপক্রমণিকা। কিন্তু সব কবি পরিমার্জনায় বিশ্বাসী নন।

বাংলাদেশে বিহারীলাল চক্রবর্তী, এবং নজরুলের কবিতা সবচেয়ে অপরি-মার্জিত, উচ্ছ্বসিত। আবার রবীন্দ্রনাথ এবং সুধীন্দ্রনাথ অত্যন্ত সচেতন শিল্পী এবং সেই কারণে কবিতার পরিমার্জনে আস্থাবান। বিদেশী কবিদের মধ্যে রিলকে-র সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সহমর্মিতার সূত্র অনেকে খুঁজে পেয়েছেন। পরিমার্জনার ব্যাপারেও তিনি রবীন্দ্রনাথের মত কেমন চঞ্চল-উৎকণ্ঠ ছিলেন তার প্রমাণ মেলে তাঁর কবিতার অসংখ্য পাঠান্তরে। আপাতত একটি উদাহরণ আলোচ্য :

মূলপাঠ

[O my servitress, serve]
To learn what your own heart is,
Serve, serve him you admire.
When his feeling with you is afire,
Can it be his ?

[Moved by her he has moved]
You, you only inspire
What there upblazes so.
Or is there a glow of his fire
Within your fire-glow ?

পাঠান্তর

To learn what your own heart is,
Serve, serve him you admire,
When his feeling with you is afire.
Can it be his ?

Has he imbibed romance's
Image-upcasting wine ?
Is it gleam of his fire outglances
From your own fire-shine ?

মূল পাঠের বন্ধনী-বদ্ধ অংশ দুটি পাঠান্তরে বর্জন করা হয়েছে সংগত কারণেই। অংশ-দুটি স্তবক দুটির চিন্তাসূত্র। দ্বিতীয় স্তবকের প্রথম দুটি পংক্তি পাঠান্তরে নতুন দুটি পংক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। শব্দার্থের দিক থেকে এ পরিবর্তন বিশেষ তাৎপর্যগূঢ় না হলেও প্রকাশ ভঙ্গীর ক্রমোন্নত উদাহরণ হিসাবে পাঠান্তরের পংক্তিদুটি অনেক সুন্দর এবং চিত্রময়ী।

শেষ স্তবকের Glow শব্দটি পাঠান্তরে Gleam শব্দে রূপান্তরিত হয়েছে। তার ফলে ভাবার্থের যে সূক্ষ্ম এবং প্রতীকী ব্যঞ্জনা ফুটেছে তা রিল্‌কের কবিতার চরিত্রলক্ষণের সঙ্গে সমলগ্ন।

প্রতিভামাত্রই নিত্যনবরূপাকাঙ্খী সন্দেহ নেই, কিন্তু রবীন্দ্রপ্রতিভা এ প্রসঙ্গে সবচেয়ে দুরাধিগম্য। তাঁর ভাবমনের বিচিত্রলীলা কোন শিল্পাঙ্গিককে অপরিবর্তনীয় ব'লে মেনে নেয়নি। সেইজন্য তাঁর দীর্ঘায়ত শিল্পীজীবনে নবসৃজনের পাশাপাশি চলেছে প্রাক্তন রচনার রূপান্তর, পরিমার্জন ও পরিবর্ধন। রবীন্দ্ররচনাবলীর উৎসাহী পাঠকমাত্রেই জানেন তাঁর প্রত্যেকটি গ্রন্থে কী পরিমাণ পাঠান্তর এমনকি রূপান্তর। একটি কাব্যের শব্দ বা ছন্দের পরিবর্তন শুধু নয়—বরং গল্প ভেঙ্গে নাটক, কাব্যনাট্য ভেঙ্গে নৃত্যনাট্য, সনেট ভেঙ্গে গান রচনা পর্যন্ত উদাহরণ অঙ্গুলি অমেয়, অসংখ্য। নিত্যনবরূপের অন্বেষণ তিনি শিল্পের সর্বক্ষেত্রে সর্বদাই করতেন। কিন্তু শিল্পরূপের এই পরিবর্তন প্রবণতা তাঁর জীবনের মধ্যভাগে বিশেষভাবে প্রবলতা লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথের যৌবনের রচনাগুলি অনেক ক্ষেত্রে তাঁর প্রৌঢ়ত্বে রূপান্তর লাভ করেছে। আপাতত বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে, একটি নির্দিষ্ট কালপর্বে তিনি পরিবর্তন প্রয়াসের অস্থিরতায় নিমগ্ন ছিলেন। ১৩৩৬ থেকে ১৩৪৪ সাল পর্যন্ত এই কালপর্ব। এই পর্বে রবীন্দ্রনাথ কবিতাকে গদ্যভঙ্গীর মধ্যে আশ্রয় দিয়ে কাব্যের মুক্তি সাধনায় রত। পাশাপাশি চলছে অন্যতর রূপান্তর। ১২৯৯ সালে লেখা 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যনাট্য এই সময় নৃত্যনাট্যের বেশ পরল। ১৩০৬ সালে লেখা 'পরিশোধ' কাব্যনাট্য ও ১৩৪০ সালে লেখা 'চণ্ডালিকা' গদ্যনাটকের এই কালপর্বেই সাজবদলঘটল। রবীন্দ্রকাব্যশিল্পের এই অন্তর্বিপ্লবেই প্রায় পঞ্চাশটি কবিতা গানের আকার নিল। সেগুলির উদাহরণ দেওয়া সম্ভব কিন্তু আপাতত অপ্রয়োজন। মৌল বক্তব্য এই যে, একই কবির মধ্যে বিভিন্নযুগে উচ্ছ্বাস এবং সংযম থাকতে পারে। রবীন্দ্রনাথ তার প্রমাণ। দীর্ঘ আয়ুর সৌভাগ্য তাঁর প্রথম জীবনের কাব্যের উদ্বেলতা পরবর্তীকালে সচেতন প্রজ্ঞায় পরিশীলিত হয়েছে। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথের যৌবনোত্তর সাহিত্যকর্মে পাঠান্তরের এমন স্বমহিম মর্যাদা।

কিন্তু তবু আরেকটি প্রশ্ন ওঠে। কবিতার পাঠান্তরে অন্যকাব্যরূপ থাকা সম্ভব, কিন্তু কবিতার সংগীত-পাঠান্তর ব্যাপারটি কি?

এ প্রশ্নের উত্তর অবশ্যকর্তব্য এই জন্যে যে, রবীন্দ্রনাথের কবিতার পাঠান্তরে যেমন অনেক কবিতা পাওয়া যায় তেমনই অন্তত পঞ্চাশটি কবিতার সংগীতরূপ পাওয়া গেছে। কবিতায় সুর দিলেই যদি সংগীতরূপ গ্রহণ সমাপ্ত হত তাহ'লে আলোচনার প্রশ্ন উঠতো না; কিন্তু দেখা যায়, কবিতাকে গানে পরিণত করার

কালে রবীন্দ্রনাথ শব্দ, ছন্দ এমনকি রূপকর্মেরও এমন রূপান্তর ঘটিয়েছেন যে তা পাঠান্তরের মত রোমাঞ্চকর ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। একটি উদাহরণ 'সানাই' কাব্য থেকে :

কবিতারূপ

উদাস হাওয়ার পথে পথে
মুকুলগুলি ঝরে,
কুড়িয়ে নিয়ে এনেছি তাই
লহো করুণ করে।
যখন যাব চলে
ফুটবে তোমার কোলে,
মালা গাঁথার আঙুল যেন
আমায় স্মরণ করে।

সংগীতরূপ

এই উদাসী হাওয়ার পথে পথে মুকুলগুলি ঝরে ;
আমি কুড়িয়ে নিয়েছি, তোমার চরণে দিয়েছি—
লহো লহো করুণ করে।
যখন যাব চলে ওরা ফুটবে তোমার কোলে,
তোমার মালাগাঁথার আঙুলগুলি মধুর বেদনভরে
যেন আমায় স্মরণ করে॥

কবিতাটির সংগীতরূপে এমন কতকগুলি নতুন শব্দ পাওয়া যাচ্ছে (এই, আমি, লহোলহো, ওরা, তোমার, যেন) যেগুলি গানে অনিবার্য অথচ কবিতাতে নয়। কেননা কবিতা মূলত সংহত শিল্প আর গানের সুরের মধ্যে যে বিস্তার ও ভাবের প্রসার তারই অনুরোধে এই নবশব্দযোজন। সংযোজিত শব্দগুলি স্বরবর্ণের উদাসী ধ্বনিমায়ায় এমন বিচিত্র যে গানটিতে ঐ শব্দগুলি যে নতুন বসন্তাভাস জাগাচ্ছে তার আবেদন অন্যকোন ভাবে পাওয়া সম্ভব ছিল না।

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের যেসব কবিতার সংগীত-পাঠান্তর পাওয়া যাচ্ছে সেগুলির নিগূঢ় তাৎপর্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করা দরকার। তাছাড়া একথা মনে রাখা ভাল যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতা ও গানের মধ্যে কোন ভেদ-রেখা টানতেন না। তাঁর হৃদয়ভাব উন্মোচনে কবিতা ও গান যুথবাহন। বোধহয় সেইকথা ভেবেই রবীন্দ্রনাথ একদা লিখেছিলেন :

'সঙ্গীত মনোভাব প্রকাশের শ্রেষ্ঠতম উপায়মাত্র। আমরা যখন কবিতা পাঠ করি, তখন তাহাতে অঙ্গহীনতা থাকিয়া যায়, সঙ্গীত আর কিছু নয়, সর্বোৎকৃষ্ট উপায়ে কবিতা পাঠ করা।'

এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়: Some of the means of poetry are very similar to those of music. They both use rhythm and acoustic features, which include the sounds produced by the inflexions of voice and the various vocal devices of verse such as assonance, rhyme, and the play of vowels. This gives a simple, elementary overlap with music. The border line of poetry and music is seen where reading a lyric seems to be on the point of becoming a song ; or in recitative, where the word-meaning predominates over the melody. Thus, though normally a poem read and song sung are two different phenomena, between them they have a common element ।[১]

কবিতা ও সংগীতের অন্তর্মিলন প্রসঙ্গে রবীন্দ্রসাহিত্যের আরো একটি দিকে আমাদের মনোনিবেশ করা প্রয়োজন। লক্ষণীয় যে, রবীন্দ্রনাথ যেমন কবিতার পাঠান্তরে গান লিখেছিলেন তেমনই গানের পাঠান্তরে কবিতা লিখেছিলেন।[২] 'সানাই'-কাব্যে এমন কিছু উদাহরণ আছে। এই জাতীয় পাঠান্তরকে সমান্তরাল পাঠান্তর বলে। এই জাতীয় পাঠান্তরে কোন রূপটিই বর্জনীয় নয় বরং উভয় পাঠের যুগল উপস্থিতি কবিতা ও গানের প্রকারভেদ সম্পর্কে আমাদের সচেতন করে।

১। The art of Drama: Ronald Peacock, [Music and Poetry Chapter], p. 121

২। আমার আশংকা যে, এই তালিকা সুসম্পূর্ণ নয়। আরও অনেক গান হয়ত তিনি কবিতায় পরিণত করেছিলেন কিন্তু তার খবর পাইনি। আপাতত, সাধারণ উল্লেখের খাতিরে পাঁচটি গানের কাব্য-পাঠান্তরের নজির উপস্থিত করলাম। প্রথম চারটি 'সানাই' কাব্যে আছে, শেষেরটি 'শেষ লেখা'য়। যথাসম্ভব পাঠান্তরের সন-তারিখ দিলাম।

বাদলদিনের প্রথম কদমফুল। সংগীতরূপ ৩০.৭.৩৯ > বাদলদিনের প্রথম কদমফুল। কাব্যরূপ ১০.১.৪০

আমার প্রিয়ার ছায়া। সংগীতরূপ ২৫.৩.৩৮ > আমার প্রিয়ার সচল ছায়াছবি। কাব্যরূপ ১৩৪৫

এসগো জেলে দিয়ে যাও। সংগীতরূপ ১.৮.৩৯ > জেলে দিয়ে যাও সন্ধ্যাপ্রদীপ। কাব্যরূপ ১৫.১.৪০

যে ছিল আমার স্বপনচারিনী। সংগীতরূপ ৮.১২.৩৮ > যে ছিল আমার স্বপনচারিনী। কাব্যরূপ ৮.১২.৩৮

পাখী তোর সুর ভুলিসনে। সংগীতরূপ ডিসেম্বর ১৯৪০ > ওরে পাখি থেকে থেকে ভুলিস কেন সুর? ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১

পাঠান্তর আসলে শিল্পের ক্রমবিকাশের সাধনা। শিল্পী পূর্ণতার তন্নিষ্ঠ-সাধক। কোন রচনার রূপান্তর তিনি যখনই করেন তখনই বুঝতে হবে প্রথম পাঠে এমন কোন অপূর্ণতা আছে যার ফলে কবির মনে প্রকৃত সুরটি বাজছে না। তাঁকে তাই কেবলই পরিবর্তন করতে হচ্ছে এবং সচেতন সংস্কার চেষ্টায় তাঁর রচনাটি ক্রমশই অভিপ্রেত পূর্ণতার পথে চলেছে। পাঠান্তরের প্রতিটি পর্যায়ই এই পূর্ণতার সাধনাচিহ্ন। সুযোগ্য অভিনিবেশ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলির সংগীত-পাঠান্তর আলোচনা করলে রবীন্দ্রমানসের চঞ্চল সৃজন-বেগের পরিচয় পাব।

প্রথমেই দেখা যাক একটি সনেটকল্প কবিতার গীতরূপপ্রাপ্তির রহস্য। কবিতাটির নাম 'তবু'—'কড়ি ও কোমল' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

তবু মনে রেখো, যদি দূরে যাই চলি,
সেই পুরাতন প্রেম যদি এক কালে
হয়ে আসে দূরস্মৃত কাহিনী কেবলি—
ঢাকা পড়ে নব নব জীবনের জালে।
তবু মনে রেখো, যদি বড়ো কাছে থাকি,
নূতন এ প্রেম যদি হয় পুরাতন,
দেখে না দেখিতে পায় যদি শ্রান্ত আঁখি—
পিছনে পড়িয়া থাকি ছায়ার মতন।
তবু মনে রেখো, যদি তাহে মাঝে মাঝে
উদাস বিষাদ ভরে কাটে সন্ধ্যাবেলা,
অথবা শারদপ্রাতে বাধা পড়ে কাজে,
অথবা বসন্ত-রাতে থেমে যায় খেলা।
তবু মনে রেখো, যদি মনে প'ড়ে আর
আঁখি প্রান্তে দেখা নাহি দেয় অশ্রুধার।

গীতরূপ

তবু মনে রেখো যদি দূরে যাই চলে।
যদি পুরাতন প্রেম ঢাকা পড়ে যায় নবপ্রেমজালে।
যদি থাকি কাছাকাছি,
দেখিতে না পাও ছায়ার মতন আছি না আছি—
তবু মনে রেখো॥

যদি জল আসে আঁখিপাতে,
একদিন যদি খেলা থেমে যায় মধুরাতে,
এক দিন যদি বাধা পড়ে কাজে শারদ প্রাতে—
তবু মনে রেখো॥

যদি পড়িয়া মনে
ছলোছলো জল নাই দেখা দেয় নয়নকোণে—
তবু মনে রেখো ॥

উল্লিখিত দুটি উদাহরণের আলোচনা করলে কবিতা ও গানের শব্দবয়নের পার্থক্য সম্পর্কে আমরা কিছু ধারণা লাভ করি। মূল কবিতাটি প্রায় সনেট। চোদ্দ মাত্রার পয়ার ছন্দ, সনেটের সুনির্দিষ্ট পংক্তিবিন্যাস এবং সংহত আকারের বন্ধন থাকা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ যে এটিকে সংগীতে মুক্তি দিলেন তার কারণ হিসেবে একটি ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন রয়েছে মূলরূপটিতেই। দেখা যাচ্ছে, প্রতি স্তবকের সুরুতেই 'তবু মনে রেখো' এই কথাকটি গানের ধুয়োর মত ঘুরে ঘুরে এসেছে। সম্ভবত এই ধ্রুবপদের সূত্রেই গানটির অবয়ব প্রাপ্তি। এবং সেই সূত্রেই শব্দ পরিবর্জন, পংক্তি উল্লঙ্ঘন ঘটেছে।

প্রসঙ্গক্রমে স্মরণীয় যে, রবীন্দ্রনাথের আর কোন সনেটকল্প কবিতায় এমন স্তবক প্রারম্ভিক ধ্রুবপদ নেই। একমাত্র উল্লিখিত 'তবু' কবিতাতেই এই বিশেষ যোগাযোগ। সম্ভবত সেই কারণেই এটি চতুর্দশপদীর সংগীতরূপ প্রাপ্তির একমাত্র উদাহরণ।

বিশেষভাবে অনুধাবণ করলে দেখি, 'তবু' কবিতা একটি সংহত সুন্দর কবিতা। কিন্তু সৌভাগ্যত, পাশাপাশি গীতরূপটি আছে বলেই বুঝতে পারি কবিতাটির ত্রুটি। গীতরূপটিতে মূল কবিতার সবকটি প্রয়োজনীয় কথাই আছে অথচ যে ভূরি পরিমাণ শব্দ রবীন্দ্রনাথ গানটিতে বর্জন করেছেন তারই বা কী চমৎকার সংহতি। দূরস্মৃত, শ্রান্ত আঁখি, আঁখিপ্রান্ত—প্রভৃতি যুক্তস্বরের ভারীচালের শব্দগুলিকে গানে কেমন সুকৌশলেই না পরিবর্তিত ক'রে নেওয়া হয়েছে স্বরধ্বনিবহুল হাল্‌কাচালের শব্দে। গানটির বাণীতে যুক্তস্বর যে প্রায় অনুপস্থিত তা-ও লক্ষণীয়। যাঁরা এ গান শুনেছেন তাঁরা জানেন টপ্পার মীড়ের দানা কেমন সুন্দরভাবে এইসব স্বরধ্বনির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

কবিতার গীতরূপ প্রাপ্তির এই যে শব্দগত সরলীকরণ তার পুনরপি উদাহরণ 'পঁচিশে বৈশাখ' কবিতার গীত-পাঠান্তর 'হে নূতন' গানে। মূলকবিতার আশীটি পংক্তি থেকে দশটি পংক্তি বিচ্ছিন্নভাবে নির্বাচন ক'রে নিয়ে গানটি রচনা করলেন রবীন্দ্রনাথ। এই পুনর্নববিন্যাসের সময় এমন কতকগুলি শব্দধ্বনি পরিবর্তন করলেন যা চিত্তাকর্ষক। যেমন—

১। তোমার প্রকাশ হোক কুজ্ঝটিকা করি উদ্‌ঘাটন >তোমার প্রকাশ হোক কুহেলিকা করি উদ্‌ঘাটন।

২। ব্যক্ত হোক, তোমা মাঝে অনন্তের অক্লান্ত বিস্ময় >ব্যক্ত হোক তোমা মাঝে অসীমের চিরবিস্ময়।

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। বর্জিত শব্দগুলি যে কী পরিমাণে গদ্যাত্মক তা সহজেই অনুমেয়। অথচ 'কুহেলিকা' এবং 'অসীমের চিরবিস্ময়' শব্দপ্রয়োগ শুধু সরলীকরণ নয়, সঙ্গে সঙ্গে অভিপ্রেত তাৎপর্যের ঘনিষ্ঠতর। অনন্ত আর অসীম প্রায় সমার্থক শব্দ, তবু রবীন্দ্রমানসে দ্বিতীয় শব্দটির যে-অনুষঙ্গ চির-জাগ্রত এখানে তারই পুনর্বিন্যাস।

অবশ্য ইতিপূর্বে উদ্‌ধৃত উদাহরণ থেকে যদি কেউ সিদ্ধান্ত করেন যে, কবিতা থেকে সংগীত-পাঠান্তরে যে শব্দগত পরিবর্তন ঘটে তা কেবল তৎসমের তদ্‌ভবরূপান্তর এবং যুক্তস্বরের সরলীকরণ, তবে তিনি বিভ্রান্ত হবেন। কেননা তিনি দেখতে পাবেন 'পূরবী'র 'আনমনা' কবিতায় এর বিপরীত পদ্ধতি—

কবিতা

আনমনা গো, আনমনা,
তোমার কাছে আমার বাণীর মালাখানি আনব না।

গান

আনমনা, আনমনা,
তোমার কাছে আমার বাণীর মাল্যখানি আনব না॥

সমস্ত কবিতাটির মধ্যে অনেক যুক্তস্বর ও তৎসম শব্দ আছে। রবীন্দ্রনাথ সেগুলিকে অপরিবর্তিত রেখে একটি মাত্র সরল শব্দকে সংস্কৃত করে নিয়েছেন।

কবিতার সংগীত-পাঠান্তরে যে-শব্দগুলি পরিবর্তিত হচ্ছে সেগুলির প্রকার লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে মূলত ধ্বনির অনুরোধে এবং সুরসংযোগের সহায়তা-কল্পে তাদের স্থানচ্যুতি এবং নতুন শব্দের আবির্ভাব। কিন্তু এই সিদ্ধান্তের মধ্যেই সম্পূর্ণ সত্য নেই। কেননা কতকগুলি পাঠান্তরে এমন শব্দ পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে যার আবির্ভাব কাব্যের অনুরোধে অর্থাৎ বিশেষ তাৎপর্যজ্ঞাপনে এবং ব্যঞ্জনাসৃষ্টি কর্মে। এর উদাহরণ হিসেবে 'উদাসী হওয়ার পথে পথে' গানটির শেষাংশের প্রতি মনোনিবেশ করা যেতে পারে—

কবিতা

স্মৃতির ডালায় রইবে আভাসগুলি
কালকে দিনের তরে।
শিরীষ-পাতায় কাঁপবে আলো
নীরব দ্বিপ্রহরে।

গান

এই আভাসগুলি পড়বে মালায় গাঁথা
কালকে দিনের তরে
তোমার অলস দ্বিপ্রহরে ।।

বোঝাই যাচ্ছে দ্বিপ্রহর শব্দটির যে বিশেষণ পরিবর্তন ঘটেছে তা ধ্বনির কারণে নয়। কেননা নীরব ও অলস শব্দ দুটি প্রায় সমধ্বন্যাত্মক, অযুক্ত ব্যঞ্জন সম্পন্ন এবং সরল। এ পরিবর্তন সুতরাং বিশেষ ব্যঞ্জনা বহন করছে। মুকুল-ঝরা উদাসী হাওয়ার পথে পথে যে দ্বিপ্রহর, তাকে নীরব বললে কিছুই বলা হয়না কিন্তু অলস বললে সবটাই বলা হয়। এ আলস্য স্মৃতির। তার বিধুর আনন্দের স্পর্শ অলস শব্দটির অনুষঙ্গে কেমন জেগে উঠেছে!

এমন নিগূঢ় ব্যঞ্জনাময় শব্দ পরিবর্তনের সুন্দরতর উদাহরণ মিলছে 'সানাই'-এর 'আধোজাগা' কবিতার সমান্তরাল সংগীত-পাঠান্তরে :

কবিতা

রাত্রে কখন মনে হল যেন
ঘা দিলে আমার দ্বারে,
জানি নাই আমি জানি নাই, তুমি
স্বপ্নের পরপারে।

অচেতন মন-মাঝে
নিবিড় গহনে ঝিমিঝিমি ধ্বনি বাজে,
কাঁপিছে তখন বেনুবনবায়ু
ঝিল্লির ঝংকারে।

গান

স্বপ্নে আমার মনে হ'ল কখন ঘা দিলে আমার দ্বারে, হায়।
আমি জাগি নাই জাগি নাই গো,
তুমি মিলালে অন্ধকারে, হায় ।।
অচেতন মনো-মাঝে তখন রিমিঝিমি ধ্বনি বাজে,
কাঁপিল বনের হাওয়া ঝিল্লিঝংকারে।
আমি জাগি নাই জাগি নাই গো, নদী বহিল বনের পারে ।।

শব্দ-পরিবর্তনের মাধ্যমে শুধু পাঠান্তর নয়, ভাবান্তর ঘটে গেছে। কবিতাটিতে যার আগমনবার্তার কথা বলা হচ্ছে সে কে? তার উত্তর

নিঃসংশয়ে দেওয়া কঠিন। কিন্তু গানটিতে নিঃসন্দেহেই নিশীথরাতের বাদল-ধারার গোপন অভিসারের কথা বলা হচ্ছে। এবং তা বুঝতে গীতবিতানের বর্ষা-অধ্যায় খোলবার দরকার নেই, পাঠান্তরের 'রিমিঝিমি' শব্দটিই যথেষ্ট। আরও লক্ষণীয়, উল্লিখিত অংশদুটিতে অনুভব ও অবস্থানের কত বিভেদ। প্রথমটিতে রাত্রির গোপনতা, দ্বিতীয়টিতে স্বপ্নের অর্ধজাগ্রত অবগুণ্ঠন। প্রথমটিতে তাই অজানার জন্যে খেদ ('জানি নাই আমি জানি নাই') দ্বিতীয়টিতে তাই অর্ধচেতনার আনন্দবেদনা ও অজাগরণের খেদ ('জাগি নাই জাগি নাই গো')। নবযোজিত 'হায়' শব্দটি সেই খেদ কারুণ্যের ধুয়ো।

এতক্ষণকার আলোচনায় যতগুলি শব্দ-রূপান্তর নিয়ে আলোচনা করেছি সেগুলিকে পাঠান্তর বলেই নির্দেশ করেছি। অনেকে কিন্তু সহজেই প্রশ্ন তুলতে পারেন যে, ওগুলি পাঠান্তর নয়, শব্দ-সংশোধন। কবিতার ক্ষেত্রে সংশোধন কর্ম অনিবার্য এবং আমরা যেসব কবির কবিতা পড়ি তার বর্তমান রূপ নিশ্চয়ই কিছু সংশোধনের পর প্রকাশিত হয়েছে ছাপার অক্ষরে। কিন্তু রবীন্দ্র-নাথের শব্দ-পরিবর্তনকে যদি কেউ সেই একই ঘটনা মনে করেন তবে তিনি ভ্রান্ত হবেন। কেননা তা যদি হোত তবে রবীন্দ্রনাথ সংশোধিত রচনা-গুলি প্রকাশিত ক'রে অসংশোধিত মূল রূপটি প্রত্যাহার করতেন। কিন্তু তা তিনি করেননি ; এবং সেইজন্যই তাঁর অপরিবর্তিত কবিতা ও রূপান্তরিত গান একই সঙ্গে প্রচার ক'রে তিনি কবিতা ও গানের প্রকারভেদের যেসব সুন্দর ইঙ্গিত রেখে গেছেন তা আমাদের পক্ষে ভ্রান্তিবিলাস নয়। ফলত সেগুলি কবিতা ও সংগীতের সেতুসম্ভব সম্পর্কেরই নির্দেশবাহী। কাব্য-সংশোধন, যার ইংরাজি পরিভাষা Emendation, সর্বদেশের কাব্যরসিকদের নিত্য আলোচনার বস্তু। এবং এ ব্যাপারে অজস্র উদাহরণ রেখে গেছেন শেকস্‌পীয়ার এবং কীট্‌স্। শেকস্‌পীয়ারের নাটকের বিভিন্ন দৃশ্য ও সংলাপে যে পরিমাণ সংশোধনী লেখনী চালনা ঘটেছে তার রোমাঞ্চকর স্মরণচিহ্ন ইংরাজী সাহিত্যের পাঠকদের মনে আছে। একজন সমালোচক তো বেশ মজা ক'রে লিখেছেন :

Shakespearian emendation is a game, like cricket. But like cricket it must be played according to rule and under proper conditions. And the first essential is to select a true pitch.

রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সংশোধন, সুতরাং, প্রচলিত অর্থে সংশোধন নয়। তিনি সমান্তরালভাবে অসংশোধিত ও পরিমার্জিত রূপ তুলনামূলক আলোচনার জন্যে রেখে গেছেন। কিন্তু কাব্যরচনার কৈশোরকালে তিনি সংশোধন-উৎসাহী ছিলেন এবং এমনকি অসংশোধিত পাঠ বর্জন করেছেন চিরতরে। আপাতত তার দুটি উদাহরণ লক্ষ্য করা যেতে পারে।

'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'র একটি সুপরিচিত গান :

সজনী গো—

আঁধার রজনী ঘোর ঘনঘটা চমকত দামিনী রে > শাঙনগগনে ঘোর ঘনঘটা, নিশীথ যামিনী রে।

ওপরের উদাহরণে দ্বিতীয় পাঠটি গৃহীত হয়েছে এবং প্রথম পাঠটি চিরতরে বর্জিত হয়েছে। সংশোধনটিও অব্যর্থ এবং সুন্দর।

রূপান্তরের পরে প্রাক্তন পাঠের চিরবর্জনের আরেকটি নজির পাওয়া যাচ্ছে 'ভগ্নহৃদয়' কাব্য থেকে :

পূর্বপাঠ

তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা।
এ সমুদ্রে আর কভু হব নাকো পথহারা।
যেথা আমি যাই নাকো, তুমি প্রকাশিত থাকো
আকুল এ আঁখি 'পরে ঢা'ল গো আলোকধারা।
ও মু'খানি সদা মনে জাগিতেছে সঙ্গোপনে
আঁধার হৃদয়মাঝে দেবীর প্রতিমা-পারা।
কখনো বিপদে যদি ভ্রমিতে চায় এ হৃদি
অমনি ও মুখ হেরি সরমে যে হয় সারা।
চরণে দিনু গো আনি—এ ভগ্নহৃদয়খানি
চরণ রঞ্জিবে তব এ হৃদি-শোণিত-ধারা।

পরবর্তীপাঠ

তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা।
এ সমুদ্রে আর কভু হব নাকো পথহারা।।
যেথা আমি যাই নাক তুমি প্রকাশিত থাকো,
আকুল নয়নজলে ঢালগো কিরণধারা।।
তব মুখ সদা মনে জাগিতেছে সংগোপনে,
তিলেক অন্তর হলে না হেরি কূল-কিনারা।
কখনো বিপথে যদি ভ্রমিতে চাহে এ হৃদি
অমনি ও মুখ হেরি শরমে সে হয় সারা।।

দৃশ্যত দশপংক্তির কবিতা আটপংক্তির গানে পরিণতি লাভ করেছে। কিন্তু 'রবীন্দ্রজীবনী' পাঠে আরো অনেক দৃষ্টিকোণ পাওয়া যায়। তথ্যত, জানা যাচ্ছে প্রথম পাঠটি 'ভগ্নহৃদয়' কাব্যের উপহার স্বরূপ কোন নারীর উদ্দেশে রচিত। সেই নারী আর কেউ নন, রবীন্দ্রনাথের শাশ্বত স্মরণপ্রতিমা কাদম্বরী দেবী। পরবর্তী পাঠ কিন্তু এতদূর ভাবান্তরিত যে পুরোপুরি ব্রহ্মসংগীতে পরিণত। এবং স্মরণীয় যে 'এই উৎসর্গ-গীতটি কিন্তু সেই বৎসরই (১২৮৭) মাঘোৎসবের সময়ে ব্রহ্মসংগীতে রূপান্তরিত করা হয়।'

কোন মর্তমানবীর উদ্দেশে উৎসারিত গান যখন অনন্ত ব্রহ্মের স্তবসংগীতে রূপান্তরিত হয়েছে তখন তারমধ্যে যে সব অন্তর্লগ্ন পরিবর্তন তা অনুধাবন করা যেতে পারে।

এ পাঠান্তর শব্দজাত নয়। এ হ'ল বিশিষ্টের সাধারণীকরণ। তাই রূপান্তরের সময় প্রথম পাঠের যাবতীয় লৌকিক চিহ্ন মুছে ফেলতে হয়েছে। যা ছিল কোন শরীরিনী নারীর প্রতি কবির একান্ত হৃদয়ের নিভৃত বাণী তার পরিণতি ঘটল ব্রাহ্মসমাজের সকলের সম্মেলক বন্দনাগানে নিরবয়ব ঈশ্বরের প্রতি।

সেইজন্য কত সুকৌশলে 'আঁধার হৃদয় মাঝে দেবীর প্রতিমা-পারা' পংক্তিটি বর্জিত হয়েছে। কারণ ঐটুকুই ছিল কবির ব্যক্তিগত স্মৃতি। কবির ভগ্নহৃদয়ের শোনিতধারায় যে-দেবীর চরণরঞ্জণের আকুতি প্রথমপাঠের অন্তিক পংক্তিতে ব্যক্ত হয়েছে তা কিশোর হৃদয়ের মুগ্ধ কম্পিত স্বাক্ষর। সেইজন্যই তা বর্জিত হয়েছে। এই পাঠান্তর তাই ব্যক্তিগত অনুভূতির নৈর্ব্যক্তিক উত্তরণ।

শব্দ-পরিবর্তন ও ভাবান্তরের সৌন্দর্য এতক্ষণ অনুধাবন করা গেল। এবার রবীন্দ্র কবিতার সংগীত-পাঠান্তরের আরেকটি দিক দেখা যেতে পারে। এক্ষেত্রে শব্দ-পরিবর্তন নয় বা কবিতার অন্তঃস্থ ভাবের রূপান্তর নয়, একেবারে আকার পরিবর্তন। একে রূপাঙ্কিকের রূপান্তর বলা চলে। আপাতত উদাহরণের সূত্রে 'বলাকা'র একটি কবিতার আকার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাক :

মূল কাব্যরূপ

মোর গান এরা সব শৈবালের দল,
যেথায় জন্মেছে সেথা আপনারে করে নি অচল।
মূল নাই, ফুল আছে, শুধু পাতা আছে—
আলোর আনন্দ নিয়ে জলের তরঙ্গে এরা নাচে।
বাসা নাই, নাইকো সঞ্চয়,
অজানা অতিথি এরা কবে আসে নাইকো নিশ্চয়।

যেদিন শ্রাবণ নাবে দুর্নিবার মেঘে,
দুই কূল ডোবে স্রোতোবেগে,
আমার শৈবালদল
উদ্দাম চঞ্চল,
বন্যার ধারায়
পথ যে হারায়,
দেশে দেশে
দিকে দিকে যায় ভেসে ভেসে।

পরিবর্তিত সংগীতরূপ

গানগুলি মোর শৈবালেরই দল—
ওরা বন্যাধারায় পথ যে হারায়
উদ্দাম চঞ্চল ॥
ওরা কেনই আসে যায় বা চলে, অকারণের হাওয়ায় দোলে—
চিহ্ন কিছুই যায়না রেখে পায় না কোন ফল ॥
ওদের সাধন তো নাই, কিছু সাধন তো নাই,
ওদের বাঁধন তো নাই, কোন বাঁধন তো নাই।
উদাস ওরা উদাস করে গৃহহারা পথের স্বরে,
ভুলে-যাওয়ার স্রোতের 'পরে করে টলোমল ॥

মরমী পাঠক লক্ষ্য করবেন, পাঠান্তরে কী রোমাঞ্চকর বিভেদ সৌন্দর্য! মূল কবিতার প্রবহমান মুক্তক পয়ার একেবারে ধ্রুবপদের সঙ্গে অন্ত্যমিল রেখে (দল, চঞ্চল, ফল, টলোমল) পুনর্বিন্যাসে ধ্রুপদাঙ্গ গানের আকার পেয়েছে। ধ্রুপদ সংগীতের চারটি তুক্ (স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ) সংগীত রূপটিতে সহজেই খুঁজে পাবেন যেকোন সুরসাধক; অথচ মূল কবিতায় ধ্রুপদ লক্ষণ পর্যন্ত ছিল না। আদিরূপের ছড়ানো-ছিটানো কথাগুলি কেমন গাঢ়বদ্ধ ধ্বনিস্পন্দে পরিণত হয়েছে। আরও লক্ষণীয়, মূল কবিতার প্রথম, নবম, দশম ও একাদশ এই বিক্ষিপ্ত পংক্তি চারটি সমন্বিত হয়ে সংগীত রূপটির প্রথম স্তবক (সংগীতশাস্ত্রের পরিভাষায় স্থায়ী বা প্রথম তুক্) গঠিত হয়েছে।

মূল কবিতার অন্যান্য পংক্তিগুলি পরবর্তী পাঠে বর্জ্জিত হয়েছে সম্ভবত অত্যন্ত গদ্যাত্মক এবং ধ্বনিহীন ব'লে। তার বদলে এমন কতকগুলি নতুন পংক্তি সংযোজিত হয়েছে যা অমোঘ, ব্যঞ্জনাময় এবং সুন্দর গীতিকবিতার লক্ষণযুক্ত। এমনকি ভাবের দিক থেকে সংগীত রূপটি যে বলাকার মৌলতত্ত্ব গতিরাগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর তা বিবেচনা করলেই বোঝা যাবে। নির্বন্ধন সাধনা-হীন উদাসী শৈবালদলের মত কবির সংগীতধ্বনি বিস্মৃতির স্রোতরেখায় চিরন্তনতার দাবী জানাচ্ছে। তাই বোধহয় এ-কবিতার সংগীতরূপ না থাকলে অপূর্ণতা থেকে যেত।

'বলাকা'-র অন্তর্গত 'ছবি' কবিতাটির প্রচলিত গীতরূপ আরও নূতন দিকনির্দেশ করে। 'ছবি' মূলত তত্ত্বকবিতা হিসেবে রবীন্দ্রানুরাগীদের প্রীতি অর্জন করেছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, কবিতাটির সংগীতরূপ তত্ত্বদর্শনহীন নিতান্তই ভাবময় সুরস্রোত। দেখা যায়, কবিতাটির একশো সাত পংক্তির মধ্যে থেকে মাত্র উনিশটি পংক্তি নির্বাচন ক'রে রবীন্দ্রনাথ গীতরূপ দিয়েছেন।

কবিতা হিসাবেই বিচার করলে, তার প্রত্যেকটি অংশই প্রয়োজনীয়, তাৎপর্যবহ ও অর্থপূর্ণ। অথচ সংগীত রূপান্তরে ৮৮টি নিগূঢ় পংক্তি কবি বর্জন করলেন কেন? স্বতঃসিদ্ধ উত্তর হ'ল: গানের আকার যেহেতু সুনির্দিষ্ট এবং ক্ষুদ্র অতএব সমগ্র কবিতাটিতে সুরসংযোগ মানেই রসহানি। তার প্রতিবাদে বক্তব্য: রবীন্দ্রনাথ্ অনেক দীর্ঘাকার কবিতায় আগাগোড়া সুর দিয়েছেন এবং তাতে রসহানি ঘটেনি; যেমন 'ভারততীর্থ', 'কৃষ্ণকলি' কিংবা 'নীলনবঘনে'। সুতরাং সংগীতের সুনির্দিষ্ট আকারের নিয়ম রক্ষা করতে গিয়ে পংক্তিবর্জন ঘটেছে এ যুক্তি অচল। বস্তুত, 'ছবি' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের জনৈকা দুখজাগানিয়ার আলেখ্যদর্শনজাত উদ্বেলতার তত্ত্বরূপ। সেই স্মরণপ্রতিমার রূপশ্রী কবির মনে যে অস্থির চিত্তবেদনা ও নির্বেদ জাগ্রত করেছে তার থেকে কবি সান্ত্বনা লাভ করেছেন তত্ত্বদর্শিতায়। চলমান জীবন এবং মূক স্মৃতির মধ্যে যে নির্মম বিরোধ তার হাত থেকে নিষ্কৃতিলাভ সহজ নয়। কবিতার প্রথমাংশে স্মৃতিময়ীর চিত্রদর্শনে কবি অভিভূত হয়ে পড়েছেন কিন্তু তারপরেই দ্বিতীয়াংশে দর্শনের বোধ তাঁকে শান্তি দিয়েছে। তাই কবিতাটির প্রচ্ছন্ন দুটি অংশ দেখা যায়। একটি অংশ উদ্বেলতা, উতরোল, আবেগ এবং স্মৃতি ও বর্তমানের ব্যবধানের আর্তিতে ('হায় ছবি তুমি শুধু ছবি') মুখরিত। আরেকটি অংশ তত্ত্বদর্শনের প্রমা ও প্রজ্ঞার ('ভুলে থাকা নয় সে তো ভোলা') শান্তি। নিঃসন্দেহে প্রথমটি সংগীতের এবং দ্বিতীয়টি কবিতার প্রসঙ্গ। কারণ প্রথমটি অস্থির হৃদয়ালিপি, দ্বিতীয়টি সুচেতন বিশ্লেষণ। একটি কম্পিত তরঙ্গবেগ, আরেকটি স্তব্ধ ধ্যানময় বোধ। ইতিপূর্বে কয়েকটি কবিতার সংগীত-পাঠান্তরের উদাহরণসূত্রে কবিতা ও সংগীতের শব্দবয়নের পার্থক্য সম্পর্কে সচেতনতা লাভ করা গিয়েছিল। 'ছবি' কবিতার গীতরূপায়নসূত্রে কবিতা ও সংগীতের প্রসঙ্গ পার্থক্য সম্পর্কে ধারণা ঘটে।

> 'সঙ্গীত মনোভাব প্রকাশের শ্রেষ্ঠতম উপায় মাত্র। আমরা যখন কবিতা পাঠ করি, তখন তাহাতে অঙ্গহীনতা থাকিয়া যায়, সঙ্গীত আর কিছুই নয়, সর্বোৎকৃষ্ট উপায়ে কবিতা পাঠ করা। ......আমি গানের কথাগুলিকে সুরের উপরে দাঁড় করাইতে চাই।......আমি সুর বসাইয়া যাই কথা বাহির করিবার জন্য।'

রবীন্দ্রনাথের উপরোক্ত মন্তব্যের সাহায্যে তাঁর যেসব কবিতা গীতরূপে পাঠান্তরিত হয়েছে সেগুলির সম্পর্কে সুবিচার করতে পারব। এই মন্তব্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ কবিতা ও সংগীতের অন্তর্ময় সংযোগ স্বীকার করলেও শিল্পহিসেবে সংগীতকে প্রগত মনে করতেন। সুরের অপরূপ স্পর্শে যে কবিতা উর্ধ্বস্তরের সামগ্রী হয়ে ওঠে সে ধারণাও তিনি ব্যক্ত করেছেন।

তাই তাঁর যে সব কবিতার সংগীত-পাঠান্তর পাওয়া যায় সেগুলির সম্পর্কে গভীরতর মনোযোগ প্রয়োজন। কেননা এতক্ষণকার আলোচনায় একথা সুস্পষ্ট যে, যে-কোন কবিতাতেই সুর দিয়ে গীতরূপ দেওয়া চলে না; কবিতাটির মর্মমূলে সাংগীতিক সম্ভাবনা অন্তর্নিবিষ্ট থাকা প্রয়োজন। তেমনই কবিতারূপ যথাযথ রক্ষা ক'রে সংগীতরূপান্তর সম্ভব নয়। কিছু পরিবর্তন অপরিহার্য; সে পরিবর্তন শব্দ, ছন্দ বা রূপকল্প যা কিছু আশ্রয় ক'রে ঘটতে পারে। যে কেউ সংগীত রচনা করতে পারে না, কিন্তু অনেকেই সুর রচনা করতে পারেন। এখানেই সংগীত রচনার বিশিষ্ট দুরূহতা। কেননা সংগীত মূলত শিল্পের পরমতম সঙ্গতি। সেখানে ভাব, আকার, শব্দকে সুরের সঙ্গে এমন ভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তুলতে হয় যা খুব অনন্যসাধারণ সংগীতবোধ ছাড়া সম্ভব নয়। এই প্রসঙ্গে James Mainwaring এর মতামত স্মরণযোগ্য; তিনি বলেছেন:

Song would seem to be a natural form of self-expression, for it is universal, existing amongst even the most primitive people. Children, untrained in musicianship, often improvise quite spontaneously their own tunes to known fragments of verse and even to non-rhythmic phrases. The significance of this is that the knowledge and skills implied in musical craftmanship are not necessary for the creation of song; but they are necessary for the writing of the song and for its polished perfection as a 'work of art'. It is only after the implied knowledge, skills, and judgment have become 'second nature' through long experience that inspired improvisation approaches the finished perfection of a composition.

Song-writing, therefore, is not a mechanical process. In common with all forms of art it combines imagination and craftsmanship, it involves something that is spontaneous and something that is deliberate and intellectual.

[The setting of verse: A creative approach to the study of Music]

রবীন্দ্রনাথের কবিতার সংগীত-পাঠান্তরগুলির বৈচিত্র্য ও সার্থকতা অনুভব করতে হলে ওপরের কথাগুলি মনে রাখা দরকার। পাঠান্তরিত গানগুলি যে কেবল কবিতার মামুলি সুরারোপ নয় তা বোঝা উচিত। এগুলি রূপান্তরের মাধ্যমে শুধু বৈচিত্র্যময়ই হয়নি সঙ্গে সঙ্গে সংগীতের পূর্ণ মহিমা তথা শিল্পরূপ পেয়েছে। এই প্রবন্ধের পরিণামে তাই আমরা নিঃসংশয়ে সিদ্ধান্ত করতে

পারি, রবীন্দ্রনাথ যে পঞ্চাশটিরও বেশি কবিতার সংগীত-পাঠান্তর করেছেন তা কবিমনের লঘুলীলা নয়, বরং সুনিবিড় বোধের সচেতন স্পর্শে অভিনব। পাঠান্তরের পরেও যে মূল কাব্যরূপটি রবীন্দ্রনাথ বর্জন করেননি এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, তার পাঠান্তর বস্তুত শিল্পের ক্রমোন্নতিসাধক সংশোধন নয়। সমান্তরাল ভাবে যুগল পাঠকে আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত ক'রে তিনি প্রকারান্তরে কবিতা ও সংগীতের মর্মগত বৈষম্য এবং নিগূঢ় অন্তর্মিলনের পরমগহন রহস্য নির্দেশ করেছেন। রবীন্দ্র কবিতার সংগীত-পাঠান্তরকে আমরা তাই শিল্পের দ্বিতীয় জন্ম বলতে পারি। রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশে শিল্পের এই দ্বিজত্ব-সাধনে প্রথম আচার্য।

"দন্তুর সত্যতার শিল্পী রবীন্দ্রনাথ"

শ্রীসুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

"আমার জীবনের শেষ পর্বে মানুষের ইতিহাসে এ কী মহামারীর বিভীষিকা দেখতে দেখতে প্রবল দ্রুত গতিতে সংক্রামিত হয়ে চলেছে, দেখে মন বীভৎসতায় অভিভূত হোলো। একদিকে কী অমানুষিক স্পর্ধা, আর একদিকে কী অমানুষিক কাপুরুষতা।........মনুষ্যত্বের এই দারুণ ধিক্কারের মধ্যে আমি প'ড়লুম আজ ৭৮ বছরের জন্ম বৎসরে।"

(অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি, এপ্রিল, ১৯৩৮)

রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ দশকের সাহিত্যকর্মের পরিবেশটা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্বের উন্মত্ত আবহাওয়ায় শঙ্কাকুল হ'য়ে উঠেছিল। চিত্রাংকনে কবির কল্পনাশক্তির আন্তরিক উৎসর্গের সময়কালও এই দশক। স্বভাবতঃই এ যুগের কবিতা ও ছবিতে ব্যবহৃত চিত্রকল্পগুলি আত্মীয়তাসূত্রে পরম্পরাবদ্ধ। কিন্তু বিস্ময়কর হচ্ছে এদের চরিত্র। পুরোন কাব্যের চেনা রূপক ও প্রতীকের সুকুমার মার্জিত জগত ছেড়ে যেন একটা অপরিচিত দেশে এসে পৌঁছেছি, যেখানে পাঠককে জঙ্গল কেটে পথ তৈরি করতে হচ্ছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের চিত্রানুশীলন বিচার্য। রবীন্দ্রনাথ নিজে ব'লতেন—

"কবিতার রবীন্দ্রনাথ আর ছবির রবীন্দ্রনাথ এক নয়।"

কথাটা কিছু পরিমাণে সত্য)। কারণ ১৯৩০ পর্যন্ত সুপরিচিত কবি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যজগতে যে ভূমিকা, তার সঙ্গে পরবর্তী দশকের চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথের আত্মীয়তাটা দূর-সম্পর্কের। জীবনের বিরাট অংশ জুড়ে যে সাহিত্য-কর্মের সৃষ্টি তার চরিত্র আর শেষ কয়েক বছরের আঁকা চিত্রশিল্পের প্রকৃতির মধ্যে বহুদূরবিস্তৃত ব্যবধানটা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এই শেষ দশকে রচিত কবিতা একটা পরিবর্তনের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে চ'লছিল। তাই পূর্ববর্তী কাব্য থেকে এর মেজাজটাও স্বতন্ত্র। এবং ঠিক সেই জন্যই, তার প্রতিবেশী চিত্রকলায় হয়তো চিন্তার প্রতিধ্বনি মিলতে পারে।

রবীন্দ্রকাব্যে ঋতু-পরিবর্তন বার বার হ'য়েছে। কিন্তু এ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে হাওয়া-বদল যেন একটা প্রচণ্ড ঝড়। এতদিনের সযত্ন সাজানো বাগানকে বিপর্যস্ত করে দিয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথের নিজের ভাষায় :

"আমার ফুলবাগানের ফুলগুলিকে
বাঁধব না আজ তোড়ায়,

আজ দেখো ওদের যেমন-তেমন খেলা,
শোনো ওদের যখন-তখন কলধ্বনি—
তাই নিয়ে খুশি থাকো।" (শেষ সপ্তক)

আর এই ঝটিকাপ্রবাহে এলো নতুন অচেনা নির্ভীক চিন্নকল্প, যাদের বীভৎস আকৃতি, অতি বড় রিয়ালিস্টের দুঃস্বপ্নেও প্রবেশের ছাড়পত্র পাবে না। পুরোন পরিচিত ছন্দের বৈচিত্র্যহীন মেঠো পথটা অতিব্যবহারে ক্ষয়প্রাপ্ত হ'য়ে গিয়েছিল ; তাই অপরিচিত খোলা মাঠে যেন কথাগুলোকে ছেড়ে দেওয়া হোল ; কখনও সেগুলো মুক্তির স্বাদ পেয়ে ছুটে চলল, কখনও চিন্তার আলে পা বেধে হোঁচট খেলো, কখনও থমকে দাঁড়াতে হোল জঙ্গালের ঢিপির ধাক্কায়। মোট কথা বিচরণ ক্ষেত্রটা একেবারে অজ্ঞাত ; তাতে যেমন মুক্তির ব্যাপকতা আছে, আবার অচেনার বাধাও রয়েছে। ছবির জগতটাও এই সুবিপুল অপরিচিতের রাজ্য। আগে যা নিয়ে ছবি আঁকা হ'য়েছে, যেভাবে তার অনুশীলন চলেছিল, এ একেবারে তার বিপরীত ধারায়। সুপরিকল্পিত চর্চার কোন চেনা পথে নয়, একেবারে অভাবনীয় ভাবে নিসর্গচিত্রের গাছপালা গুঁড়িয়ে দৈত্যের মতো, চিত্রজগতে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। অবনীন্দ্রস্কুলের ছবির গীতিধর্মী ভদ্র কোমল রাগের আলাপে বাধা প'ড়ল। জান্তব হুংকার, গর্জন বা বল্গাহীন অট্টহাস্য রবীন্দ্রচিত্রের চরিত্রদের কথ্যভাবা। সূক্ষ্ম রেখার ছান্দস সমন্বয়ে পেলব দেহবল্লরী সৃষ্টির পরিবর্তে, সরু-মোটা রেখার উন্মত্ত উল্লম্ফন ; ওয়াশ্ টেকনিকে পাৎলা বিলীয়মান জলরঙের অর্ধস্ফুট আভাসের বদলে ঘণ অন্ধকারাচ্ছন্ন রঙের বলিষ্ঠ উপস্থিতি। পুরোন ছন্দ না থাকলেও, কবিতা যেমন শব্দ নির্বাচনের দ্বারা একটা নতুন গম্ভীর সুর সৃষ্টি করেছিল, ছবিতেও তেমনি রং ও রেখার দুঃসাহসিক, অপ্রত্যাশিত সমাবেশেও একধরনের সমতান বা সামঞ্জস্য আবিষ্কার করা দুঃসাধ্য নয়। এরা একটা নিজস্ব নিয়ম তৈরি ক'রেছে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে অধিকাংশ ছবিতে পটভূমির রঙটা অন্ধকারাচ্ছন্ন, কখনও পেন্সিলের রেখার ভিড়ে, কখনও ঘন রঙের প্রলেপে। আর তাছাড়াও রবীন্দ্রনাথের প্রায় তিন হাজার ছবির মধ্যে, প্রতিকৃতি ও নিসর্গচিত্র বাদ দিলে, একটা বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে ফ্যাণ্ট্যাস্টিক্ জন্তুর চিত্র বা বীভৎসরসধর্মী ছবি। এদের সৃষ্টি কি নেহাৎই আকস্মিক ? আকারসৃষ্টি করার অপেশাদারী আনন্দপ্রসূত ? না অবচেতনলোকের কোন নিঃশব্দ প্ররোচনা ছিল এর পিছনে ?

কবিতার দিকে তাকালে দেখতে পাওয়া যায় যে এসময়ে রচিত বহু পদ্যেও কদাকার জন্তু-জানোয়ার বা প্রাগৈতিহাসিক কিম্ভূত দানবের ছবি বা তাদের হিংস্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বর্ণনা বার বার এসেছে। চীনের উপর জাপানী আক্রমনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কবিতাটা লক্ষণীয়:

"যুদ্ধের দামামা উঠল বেজে।
ওদের ঘাড় হোল বাঁকা, চোখ হোল রাঙা,
কিড়মিড় করতে লাগল দাঁত।
মানুষের কাঁচা মাংসে যমের ভোজ ভরতি করতে
বেরোল দলে দলে।"—("পত্রপুট")

কিংবা খ্রীষ্টের জন্মদিনে রচিত কবিতায়:

"এদিকে দানব-পক্ষী ক্ষুব্ধ শূন্যে
উড়ে আসে ঝাঁকে ঝাঁকে বৈতরণী নদী পার হতে
যন্ত্রপক্ষ হুংকারিয়া নরমাংস ক্ষুধিত শকুনি
আকাশেরে করিল অশুচি।"—("প্রান্তিক")

বিশ্বব্যাপী ধ্বংসের পরিপ্রেক্ষিতে আকাশযান, কবি-কল্পনায় দানবপক্ষীর অনুষঙ্গে বীভৎস হ'য়ে উঠেছে।

অথবা স্মর্তব্য "জন্মদিনে"র একবিংশ কবিতার কথাগুলি:

"সভ্য শিকারীর দল পোষ মানা শাবকের মতো,
দেশ-বিদেশের মাংস করেছে বিক্ষত,
লোল-জীহ্বা সেই কুক্কুরের দল
অন্ধ হ'য়ে ছিঁড়িল শৃঙ্খল,
ভুলে গেল আত্মপর।"—"জন্মদিনে"

কখনও কখনও পাওয়া যায় মানুষের মৃতদেহ সম্বন্ধীয় কদর্যতার চিত্রকল্প, ইংরেজীতে যাকে বলা চলে macabre; যেমন দেখি "জন্মদিনে"র উদ্ধৃত কবিতাটির আর একটি অংশে:

"শ্মশানবিহারবিলাসিনী
ছিন্নমস্তা, মুহূর্তেই মানুষের সুখস্বপ্ন জিনি
বক্ষ ভেদি দেখা দিল আত্মহারা,
শতস্রোতে নিজ রক্তধারা
নিজে করি পান।"

মহাভারতে বর্ণিত কোন রণক্ষেত্রের কথা স্মরণে আসে।

এই কবিতাগুলি যুদ্ধের অত্যাচারের প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণায় রচিত ব'লে বন্য পশু বিষয়ক চিত্রকল্পের প্রবেশ পথ সহজ হ'য়ে গেছে। কিন্তু এই সময়ের

অন্যান্য দু-একটি কবিতাতেও অনুরূপ বর্ণনা চোখে পড়ে। ধরা যেতে পারে "পত্রপুটের" নবম পদ্যের ঝড়ের অপূর্ব বর্ণনাটি :

"সূর্যাস্তসীমার রঙিন পাঁচিল ডিঙিয়ে
ব্যস্ত বেগে বেরিয়ে প'ড়ল মেঘের ভিড়
বুঝি ইন্দ্রলোকের আগুনলাগা হাতিশালা থেকে
গাঁ গাঁ শব্দে ছুটছে ঐরাবতের কালো কালো শাবক
শুঁড় আছড়িয়ে।"

বা অপর একটি ঝড়ের ছবি :

"বৈশাখে দেখেছি, বিদ্যুৎচঞ্চুবিদ্ধ দিগন্তকে ছিনিয়ে নিতে এল
কালো শ্যেনপাখির মতো তোমার ঝড়,—
সমস্ত আকাশটা ডেকে উঠল যেন কেশর-ফোলা সিংহ।"
—"পত্রপুট"

পশুজগতের একাধিক বর্ণনা বা উল্লেখের অন্তর্নিহিত সত্যটি অস্বীকার করা যায় না। সমসাময়িক যুদ্ধলিপ্সুদের দানবীয় অত্যাচার রবীন্দ্রনাথকে বিচলিত করে তুলেছিল, এবং সেই ধ্বংসের সংবাদ-মুখরিত ইতিহাসের দিনলিপি তাঁর কবিতার চিত্রকল্পগুলি। কুৎসীৎ বীভৎসার প্রতীকরূপে এই পশুরা কবিতায় বিচরণ করেছে। আধুনিক জগতকে এই প্রতীকী পদ্ধতিতে চিত্রায়ণে কবির সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম, অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা তাঁর বিখ্যাত চিঠি, যেখানে একে "দন্তুর সভ্যতা" আখ্যায় ধিক্কৃত করেছেন :

"প্রাণীজগতের আদিযুগে চর্মে চর্মে ভারাক্রান্ত বিকট জন্তুরা আস্ফালন ক'রে পৃথিবীকে দলিত করেছিল তারা তো প্রাণলোকের অসহ্য হ'য়ে উঠল, টিকতে পারল না—সৃষ্টি বিভাগে সেই ব্যর্থ পরীক্ষার স্মৃতি এখনি কি লুপ্ত হ'য়েছে!......প্রাচীন ডাইনোসারদের সঞ্চরণক্ষেত্র আজকের দিনের যুদ্ধক্ষেত্রে, সেখানে তার প্রেত উঠছে জেগে, যে রাস্তা দিয়ে তারা নিষ্ক্রান্ত হ'য়েছে সেই রাস্তা দিচ্ছে দেখিয়ে।"

এই চিত্রকল্পেরই ঘন ছায়া প'ড়েছে রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবিতে। তাঁর চিত্রসামগ্রীর মধ্যে 'ফ্যাণ্ট্যাস্টিক্' জন্তু-জানোয়ারের ছবির প্রাধান্যটা চোখে পড়ে। এগুলি দেখতে গিয়ে, বাঘের সঙ্গে মিল খুঁজতে খুঁজতে হয়তো হাতির আভাস পেয়ে দর্শককে হতবুদ্ধি হ'তে হয়। বাস্তবজগতের কুমীর ব'লে সনাক্ত ক'রতে গিয়ে দেখা যেতে পারে আজগুবী কোন জন্তুর মুখোসের আড়ালে সে গা ঢাকা দিয়েছে। আসলে চিত্রকর এদের বাস্তবধর্মী চিত্রায়ণে একেবারেই উদাসীন ছিলেন। জন্তু-জানোয়ারের যথার্থ সাদৃশ্যের পরিবর্তে তাদের সঙ্গে জড়িত বীভৎসার ভাবানুষঙ্গ প্রকাশ করাই রবীন্দ্রনাথের মূল লক্ষ্য ছিল। তাই

ছবিগুলো হয়তো সবই মুখোস; কুৎসীৎ কদর্যতার প্রতীক। আদিম যুগে যে কাদাকার অসম্পূর্ণ পশুরা বিচরণ করত, তাদেরই বংশধর এরা। সমসাময়িক যুগে যে দানবীয় নিষ্ঠুরতার বন্যা বইছিল, তার সমান্তরাল মেলে একমাত্র প্রাগৈতিহাসিক যুগের এই প্রাণীদের চাল-চলনেই। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ও চিত্রে এই ক্রুদ্ধ ধিক্কারই আধুনিক সভ্যতার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিশাপ। জলন্ত সত্যের লেলিহান শিখা এ ছবিগুলি। আর অধিকাংশ চিত্রই একটা বিকটত্বের ধূমচ্ছায়ায় পরিব্যপ্ত। যেন দান্তের 'ইন্‌ফার্ণো।'

কিন্তু এই দন্তুর সভ্যতাকে ইতিহাসের স্থায়ী ব্যাধিরূপে স্বীকার করে নিতে কবির দ্বিধা ছিল। অভিব্যক্তির পথে 'রুদ্ধকণ্ঠ ভয়ার্ত এ শৃঙ্খলিত যুগ' একটি অবশ্যম্ভাবী স্তর বলেই রবীন্দ্রনাথ তাকে সহ্য করেছেন। তার স্থান সভ্যতার বনিয়াদ রচনার প্রয়োজনীয় স্বল্পকালস্থায়ী পাটাতনের সিঁড়িতে। এই ভরসাকে সকল সন্দেহ-নিরাশার উপর প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য কবি তার নজির খুঁজেছেন কখনও প্রকৃতিতে কখনও বিস্মৃত অতীতে:

"....স্পষ্ট বুঝতে পারি প্রথম যুগের উদ্ভিদ-পশু-পক্ষী কি কুশ্রী ছিল, অভিব্যক্তির তপস্যায় সমস্তই একটা সুশ্রীতায় পৌঁছুচ্ছে, এই অভিব্যক্তি তাঁরই (মহামানবের) আত্মোপলব্ধির সোপান-পরম্পরা।"— মহামানবের তপস্যা, ২০।৬।৪০

"মানুষের দেবতারে
ব্যঙ্গ করে যে-অপদেবতা বর্বর মুখবিকারে
তারে হাস্য হেনে যাব, ব'লে যাব, এ প্রহসনের
মধ্য অঙ্কে অকস্মাৎ হবে লোপ দুষ্ট স্বপনের,......
....ব'লে যাব, দ্যূতচ্ছলে দানবের মূঢ় অপব্যয়
গ্রন্থিতে পারে না কভু ইতিবৃত্তে শাশ্বত অধ্যায়।"—জন্মদিনে ("সেঁজুতি")

"তীক্ষ্ণ দশনে টানছেঁড়া তারি দিকে দিকে যায় ব্যেপে
রক্তপঙ্কে ধরার অঙ্ক লেপে।
সেই বিনাশের প্রচণ্ড মহাবেগে
একদিন শেষে বিপুল বীর্য শান্তি উঠিবে জেগে।"
—প্রায়শ্চিত্ত ("নবজাতক")

এবং সর্বশেষে "জন্মদিনে"র অন্তর্ভুক্ত সেই বিখ্যাত কবিতাটির দৃপ্ত আশ্বাসে এই চিন্তনেরই বলিষ্ঠ পদক্ষেপ পাই:

"দামামা ঐ বাজে
দিন বদলের পালা এল
ঝোড়ো যুগের মাঝে।
শুরু হবে নির্মম এক নূতন অধ্যায়—
নইলে কেন এত অপব্যয়,—"

আর এর প্রতিধ্বনি রয়েছে 'চিত্রলিপি' (১) র একটি আশ্চর্য ছবিতে। কিম্ভূত সরীসৃপ জাতীয় এক কদাকার জানোয়ারের উপর ব'সে রয়েছে মানুষ। পটভূমিতে অন্ধকারকে টুকরো করে ছিঁড়ে আসছে আলো। ছবির নীচে কয়েক ছত্র কবিতা ছবির বক্তব্যকে আরও স্পষ্ট করে :

> "এসেছে প্রথম যুগে প্রকাণ্ড প্রচণ্ড মাংস-স্তূপ
> পঙ্কিল ধরণী পৃষ্ঠে। প্রাণের সে সন্দিগ্ধ স্বরূপ
> সৃষ্টির তিমির রাত্রে। ক্ষুদ্র তনু মানুষ তাহার
> মনের আনিল দীপ্তি। সংশয় ঘুচিল বিধাতার।"

অবশ্য কেবলমাত্র দন্তর সভ্যতার প্রতিনিধিরূপেই এই বীভৎস দানবের দল রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ও চিত্রে এসে হানা দেয়নি। মনে হয় তাদের আগমনের পথটা আরও একটা সচেতন বৃহত্তর চিন্তাধারার প্রেরণায় প্রশস্ত হ'য়ে উঠেছিল। বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের অভিজাত উপাসক হিসেবেই রবীন্দ্রনাথের খ্যাতির বনিয়াদটা গ'ড়ে উঠেছিল। কিন্তু এই শেষ দশকে এতদিনের লালিত সৌন্দর্যবোধ সম্বন্ধে নতুন প্রশ্ন দেখা দিল। অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা একটি চিঠিতে এর প্রত্যক্ষ পরিচয় পাই :

> "একদিন নিশ্চিত স্থির করে রেখেছিলেন সৌন্দর্য রচনাই সাহিত্যের প্রধান কাজ। কিন্তু এই মতের সঙ্গে সাহিত্যের ও আর্টের অভিজ্ঞতাকে মেলানো যায় না দেখে মনটাতে অত্যন্ত খটকা লেগেছিল।....ব'লনুম সুন্দর আনন্দ দেয় তাই সাহিত্যে সুন্দরকে নিয়ে কারবার।....আমি যে আমি, এইটে খুব করে যাতেই উপলব্ধি করায় তাতেই আনন্দ। যখন সামনে বা চারিদিকে এমন কিছু থাকে যার সম্বন্ধে উদাসীন নই, যার উপলব্ধি আমার চৈতন্যকে উদ্বোধিত করে রাখে তার আস্বাদনে আপনাকে নিবিড় করে পাই।"—১৩৪৩

আরও পরে ছবি সম্বন্ধে যামিনী রায়কে কবি লিখছেন :

> "যে রূপের রেখা এড়াবার জো নেই, যা মনকে অধিকার করে নেয় কোন একটা বিশেষত্ব বশতঃ—তা সুন্দর হোক্ বা না হোক মানুষ তাকে আদর করে নেয়, তাতে তার চারিদিকের দৃষ্টির ক্ষেত্রকে পরিপূর্ণ করতে থাকে।......আমি আছি—আমি নিশ্চিত আছি এই কথাটা সে আমাদের কাছে বহন করে আনে। তাতে আমি আছি—এই অনুভূতিকেও কোনও একটা বিশেষভাবে চেতিয়ে তোলে।" —৭।৬।৪১

রবীন্দ্রনাথের ছবির চরিত্ররা দর্শকের মনে সুপরিচিতির ঔদাসীন্যকে ধাক্কা দিয়ে ভেঙে ফেলবে। স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের জোরে দর্শককে ভাবিয়ে তুলবে। তাদের স্বাতন্ত্র্যের সূত্রের আভাস আগেই দিয়েছি। পূর্বপ্রচলিত ছবি দেখতে অভ্যস্ত দর্শকের ছন্দবোধ ব্যথিত হ'তে পারে ; কারণ রবীন্দ্রনাথের ছবির জন্তু-জানোয়ারগুলি উপলক্ষ্য নয়, প্রধান নায়ক। তাও অবনীন্দ্রনাথের 'শেষ যাত্রার' মুমূর্ষু উটের দৈহিক ভঙ্গীর কোমলতা নেই, অপরিচিত জন্তুর কদাকার দেহের

স্থূল বীভৎসতাটা অতি প্রকট। আর ঘন চাপা রঙের প্রলেপ। সব মিলিয়ে একটা গুমোট অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া। তবুও তাদের আনন্দদানের রহস্যটা এই অস্বাভাবিকত্বেই নিহিত। প্রচলিত ধারণানুযায়ী তারা সুন্দর নয়; কিন্তু তাদের উপর থেকে চোখ ফিরিয়ে নেওয়াটাও সহজ নয়। কারণ জগতে দুজাতের বিষয় মানুষকে চমকে দেয়—অতি-সুন্দর ও অতি-কুৎসীত। বিকৃতির আতিশয্য, সে মানুষের মুখেই হোক, বা জন্তুর দেহেই হোক, দর্শকের দৃষ্টি গ্রাস করবেই। উৎকট চেহারার লোকের দিকে মানুষে ফিরে তাকায়, কারণ পরিচিতের সাধারণ গণ্ডী থেকে সে স্বতন্ত্র। হরিণের দেহের ছন্দটা বহুদর্শনে পূর্বপরিচিত, নূতনত্বের স্বাদবিহীন; কিন্তু জলহস্তির কদাকার রূপে বিচিত্র অঙ্গভঙ্গীর নিত্যনতুন সম্ভাবনা দেখতে পাই। সুতরাং এরা যথার্থই মনোহর। "যাকে সুন্দর বলি তার কোঠা সঙ্কীর্ণ, যাকে মনোহর বলি তা বহুদূরপ্রসারিত।" (সাহিত্যতত্ব—১৩৪১) তথাকথিত সুন্দর বিষয়বস্তু বর্জন করে কুৎসীতকে আত্মপ্রতিষ্ঠার অধিকার দেবার দুঃসাধ্য কৃতিত্ব সর্বাগ্রে রবীন্দ্রনাথের প্রাপ্য। যৌবনের সৌন্দর্য উপাসনার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিবাদের প্রয়াস দেখা যায় এই কৃতিত্বের মধ্যে। "শেষ সপ্তকের" বিংশ কবিতাটিতে গল্পচ্ছলে কবি এই কথাই ব'লতে চেয়েছেন।

"সেদিন আমাদের ছিল খোলা সভা, আকাশের নীচে। সভার লোকেদের অনুরোধে পুঁথি খুলে কবি সংকুচিত হ'য়ে প'ড়লেন। কি প'ড়বেন? পুরোন কবিতাগুলো দেখে মনে হ'ল:

> "এরা এত কোমল, এত স্পর্শকাতর,
> এত যত্নের ধন।"

তাই নতুন কাব্য দরকার:

> "এই পথের ধারের সভায়
> আসতে পারে তারাই
> সংসারের বাঁধন যাদের খসেছে—
> খুলে ফেলেছে হাতের কাঁকন,
> মুছে ফেলেছে সিঁদুর;
> ....যাদের অসংকোচ অক্লান্ত গতি,........
> ....কোন দায় নেই যাদের
> কারো মন যুগিয়ে চলবার;"

এই জন্যই হুইট্‌ম্যানের কবিতা রবীন্দ্রনাথের সমাদর পেয়েছিল; কারণ: "তার মধ্যে সাহিত্য-অসাহিত্য দুই সঞ্চরণ ক'রছে আদিম যুগের মহাকায় জন্তুদের মতো। এই অরণ্যে ভ্রমন ক'রতে হোলে মরিয়া হওয়া দরকার।" উপমাটি লক্ষণীয়।

আসলে এই সময়, উপমা-উৎপ্রেক্ষার মন্দিরের প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত ক'রে দেওয়া হ'ল এতদিনের অচ্ছুৎ কদাকার বিকলাঙ্গ চরিত্রগুলির জন্য। ফলে কবি-কল্পনায় সহজেই আদিম জন্তুদের প্রাত্যহিক যাতায়াত বেড়ে গেল। তাই রোগ-শয্যায় স্নিগ্ধ শুশ্রূষার কমনীয়তার মধ্যেও কবির মন "প্রাচীন তমস্বিনীর" কল্পনায় বিভোর হ'য়ে ওঠে। সৃষ্টির প্রাথমিক কদর্যতার চিত্রায়ণে একজাতীয় আনন্দের স্বাদ মেলে:

> "অসুস্থ দেহের মাঝে ক্লিষ্ট রচনার যে প্রয়াস
> তাই হেরিলাম আমি
> অনাদি আকাশে।
> পঙ্গু উঠিতেছে কাঁদি নিদ্রার অতল মাঝে,
> আত্ম প্রকাশের ক্ষুধা বিগলিত লৌহগর্ভ হতে
> গোপনে উঠিছে জ্বলি শিখায় শিখায়।
> ....আদি মহার্ণব গর্ভ হতে
> অকস্মাৎ ফুলে ফুলে উঠিতেছে
> প্রকাণ্ড স্বপ্নের পিণ্ড
> বিকলাঙ্গ, অসম্পূর্ণ—" (রোগশয্যায়—৯)

ব্যক্তিগত শারীরিক যন্ত্রণার আর্তনাদ রয়েছে কি এই ছত্রগুলির মধ্যে? একথা মানতেই হবে যে কোন কোন ক্ষেত্রে বিবস্ত্রা সুন্দরীর ছবি থেকে নরকঙ্কালের মাথার খুলির ঈস্থেটিক্ মূল্য বেশী আকর্ষণীয়। সমাধিক্ষেত্রে হ্যামলেটের দার্শনিক চিন্তার উপলক্ষ্য তো সর্বজনবিদিত; আর ডান্ এর কয়েকটি বিখ্যাত কবিতায় মৃতের দৈহিক বিকৃতিই কল্পনার মূল উৎস। তাই কদর্যতার নিখুঁত রূপায়ণে কদাকার জন্তু বা বিকৃত মৃতদেহের নির্বাচন ইতিহাস-স্বীকৃত। রবীন্দ্রনাথের যুদ্ধসংক্রান্ত কবিতাগুলিতে বা রোগের যন্ত্রণায় রচিত পদ্যে বিকলাঙ্গ মানুষের অথবা মৃতের গলিত অস্ত্রের বর্ণনায় কবির প্রচেষ্টা রয়েছে সত্যকে কোমল ক'রে সম্পাদনার পরিবর্তে ক্ষমাহীনভাবে তার সকল নিষ্ঠুরতা, ক্রূরতা শুদ্ধু তাকে প্রকাশ করা। এর সার্থকতা সম্বন্ধে কবি স্থিরনির্ভরশীল এই ভেবে যে এর বীভৎসতা সুন্দর না হ'য়েও পাঠকের মনকে ধ'রে রাখবে।

Bandelaine এর মতে বীভৎস একমাত্র শক্তিমানকেই উদ্যমী ক'রে তোলে। আর রবীন্দ্রনাথের নিজের ভাষায়:

> "দুঃখের আঁধার রাত্রি বারে বারে
> এসেছে আমার দ্বারে;
> একমাত্র অস্ত্র তার দেখেছিনু
> কষ্টের বিকৃত ভান, ত্রাসের বিকট ভঙ্গি যত—
> ....ভয়ের বিচিত্র চলচ্ছবি—
> মৃত্যুর নিপুণ শিল্প বিকীর্ণ আঁধারে।"

এর কাছে পরাজয় স্বীকার না ক'রে, তাকে বর্জন না ক'রে, বরং আরও সুষ্ঠুভাবে এই ভীতি ও বীভৎসাবোধকে তাঁর সৃষ্টিকর্মে উপস্থাপিত করতেই রবীন্দ্রনাথ সচেষ্ট হ'য়েছেন। কারণ :

"সত্য যে কঠিন,
কঠিনেরে ভালবাসিলাম।"

বিশেষতঃ ছবিগুলি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় চিত্রকরের মনের অসন্তোষ, ঘৃণা, ক্রোধ কি প্রচণ্ড বেগে প্রকাশিত হ'য়েছে। কোথাও ক্ষমা নেই, কুণ্ঠার মৃদু স্পর্শ নেই। অঙ্কন পদ্ধতিটা যেন একটা দুঃসহ যাতনার স্টাইল; প্রভাতে পূর্ণতালাভের জন্য রাত্রির ব্যগ্র যন্ত্রণার মত।

অবশ্য কদর্য কুৎসিতের প্রতি এই ঈস্‌থেটিক অনুরক্তিটা শুধু বহির্জগতের ধাক্কাতেই আসেনি। এর জন্মটা আকস্মিক নয়। খুঁজলে হয়তো অবচেতনের স্তরে এর সমর্থন পাওয়া যাবে। রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলার জগৎ জোড়াসাঁকোর বাড়ির চাতালের মধ্যে আবদ্ধ ছিল; মিটমিটে আলোর পৃথিবী।

"তখন ভুত-প্রেত ছিল গল্পে-গুজবে, ছিল মানুষের আনাচে-কানাচে।......সে সময়টা হাওয়ায় হাওয়ায় আতঙ্ক এমনি জাল ফেলে ছিল যে, টেবিলের নিচে পা রাখলে পা সুড়সুড় ক'রে উঠত।" (ছেলেবেলা)।

এ ছাড়া ছিল আবদুর মাঝির বাঘ আর কুমীর শিকারের গল্প, রঘু ডাকাতের রোমাঞ্চকর কাহিনী—যা শিশু রবীন্দ্রনাথের কল্পনাকে আচ্ছন্ন ক'রে রাখত। নরম মনটার উপর যে ছাপ প'ড়েছিল সেটা পরিণত চিন্তার অধঃস্রোত চাপা পড়লেও অবচেতনলোকের আশ্রয়ে চিরস্থায়ী চিহ্নরূপে রয়ে গেছল। তাই শেষ বয়সে পুপুর জন্য যখন 'সে' লিখতে ব'সলেন তখন নিজের ছেলেবেলার অভিজ্ঞতা ও স্মৃতির ভাণ্ডারে গিয়ে হানা দিলেন, এবং সেই সব প্রিয় চরিত্রগুলি লেখনী ও তুলির মুখে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বার হ'য়ে এলো—সুন্দরবনের কেঁদো বাঘ, গাঙিসাঙুড়ুং বা ঘণ্টাকর্ণের মতো আজগুবী জানোয়ার।

নিজের ছবি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য :

"এমনি করে, মনের মধ্যে
অনেক দিনের যে লক্ষ্মীছাড়া লুকিয়ে আছে
তার সাহস গেছে বেড়ে।
সে আঁকছে; ভাবছে না সংসারের ভালো মন্দ,
গ্রাহ্য করে না লোকমুখের নিন্দা-প্রশংসা।" (শেষ সপ্তক)

দায়িত্বমুক্ত কল্পনার বাহনরূপে রেখা ও কথার জয়যাত্রা, ঘটনার ডাক-পিওন-গিরি নয়—এইটেরই আবেদন, রবীন্দ্রনাথের কাছে সর্বাধিক ছিল। গভীর থেকে মনের উপরিভাগে যা উঠে এসেছে, কখনও দৈনন্দিন বীভৎসার ইতিহাসের চাপে, কখনও শারীরিক অসুস্থতার যন্ত্রণায়, কখনও বা শিশুর দাবিতে, তা-ই রূপ পেয়েছে কলম বা তুলির আঁচড়ে। তাই রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকর্মের পরিচিত সৌকুমার্য ও অভিজাতশালীনতার উপবনে এই সব অস্বাভাবিক অসম্পূর্ণ পঙ্গপালের আগমনটা আকস্মিক আক্রমণ নয়, যুক্তিসঙ্গত পদক্ষেপ।

রবীন্দ্রনাথের দুখানি উপন্যাস

শ্রীশিশির চট্টোপাধ্যায়

ভার্জিনিয়া উলফের মতে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের কাছাকাছি সময়ে বিশ্বমানুষের চরিত্র পালটে গেল। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে মে কলকাতা থেকে রবীন্দ্রনাথ ইংলণ্ডে যাত্রা করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার কিছু দিন আগে পর্যন্ত তিনি ইংলণ্ডেই ছিলেন। এ সময়ে তিনি ওখানকার নানা জাতীয় সাহিত্যিক ও শিল্পীর সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করবার সুযোগ পেয়েছিলেন। ঐ সময়ে ইংলণ্ড ও আমেরিকার সাহিত্যমানসে যে চিন্তা ও আদর্শ, ভাব ও ভাবনা প্রচ্ছন্ন ও প্রত্যক্ষভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল তা রবীন্দ্র-নাথের শিল্পী মানসে রেখাপাত করে।

প্রথম মহাযুদ্ধের কিছুদিন আগে থেকেই বের্গসঁর দার্শনিক মতবাদ ইয়োরোপ ও আমেরিকায় যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। রবীন্দ্রনাথও তাঁর মতবাদের দ্বারা যথেষ্ঠ প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি অবশ্য বের্গসঁর মতবাদ পুরোপুরি গ্রহণ করেন নি। তিনি, রবীন্দ্রজীবনীকার শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়র মতে, বের্গসঁর গতিবাদের কাব্যময় কল্পনাটুকুকে আপনার অধ্যাত্মরসে রঙাইয়া কাব্য-মধ্যে অপরূপ সৌন্দর্য প্রকাশ করিলেন'।'

ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ এ সময় থেকে অনেকগুলি উপন্যাস রচনা করেন। 'বৌ ঠাকুরাণীর হাট' ও 'রাজর্ষি'কে বাদ দিয়ে ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের 'চোখের বালি'র প্রকাশকাল থেকেই তাঁর উপন্যাসিক জীবনের সূত্রপাত। ক্রমান্বয়ে নৌকাডুবি (১৯০৭) গোরা (১৯১০) চতুরঙ্গ (১৯১৬), ঘরে বাইরে (১৯১৬), যোগাযোগ (১৯২৯), শেষের কবিতা (১৯২৯) প্রকাশিত হল। তার পরে প্রকাশ লাভ করল দুইবোন (১৯৩৩), চার অধ্যায় (১৯৩৪) এবং ক্ষুদ্রকায় উপন্যাস মালঞ্চ (১৯৩৪)। মালঞ্চের প্রকাশ রবীন্দ্রনাথের ঔপন্যাসিক জীবনের উপসংহার। তাহলে দেখা যাচ্ছে, ১৯০৩ থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত প্রসারিত কালসীমার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ উপন্যাস লিখেছেন। নৌকাডুবি থেকে সুরু করে মালঞ্চ পর্যন্ত উপন্যাসশিল্পে তাঁর কলাকৌশলগত পরীক্ষা নিরীক্ষার অন্ত নেই। কিন্তু এ সব পরীক্ষা নিরীক্ষার মূলে দুটি কথা স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। তার প্রথমটি হলো অন্তর্মুখীনতা যাকে ইংরাজ সমালোচকদের ভাষায় বলতে

রবীন্দ্রজীবনী : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ৩৬৬ (২য় খণ্ড)

পারি inward turning আর দ্বিতীয় কথা হলো নব-বাস্তবতার, (neo-realism) প্রবর্তন।

চতুরঙ্গের প্রকাশকাল ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দ। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে চতুরঙ্গ সবচেয়ে বেশী আংশিকত্বের (fragmentary) লক্ষণাক্রান্ত। যাই হোক, এ উপন্যাসের প্রধানতম বিষয় হলো রচনাকৌশল। উপন্যাসটি পরিষ্কারভাবে চারটি অংশে বিভক্ত। এ চারটি অংশের নাম যথাক্রমে : জ্যাঠা-মশাই, শচীশ, দামিনী ও শ্রীবিলাস। কিন্তু সমস্ত উপন্যাসটির বক্তা 'আমি' স্বয়ং শ্রীবিলাস। উপন্যাসটি আপাতদৃষ্টিতে খাপছাড়া। এ উপন্যাসের চরিত্র-গুলির পারস্পরিক সম্পর্ক ও প্রকৃতি পরিবর্তন উচ্ছৃঙ্খল।গিরিনির্ঝরিনীর মত। ওরা বুঝি অকারণে চঞ্চল। তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক, বিশেষ করে শচীশ ও দামিনীর সম্পর্কের আকর্ষণ-বিকর্ষণ লীলা একেবারেই অনিয়ম-তান্ত্রিক। কিন্তু এ আপাত উদ্দেশ্যহীন আকর্ষণ বিকর্ষণ সংকুল প্রেমলীলার পশ্চাতে একটি মনস্তত্ত্বমূলক ইঙ্গিত আছে। মনে হয়, ঔপন্যাসিক ইচ্ছে করেই এ লীলাচাঞ্চল্য ও মনস্তত্ত্বমূলক আখ্যানবস্তুর বিশ্লেষণ আখ্যানবস্তুর বিশ্লেষণ গতানুগতিক বা সনাতন উপন্যাসের কাঠামোর মধ্যে জোর করে ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা করেন নি। দামিনীর যে সমস্যা, শচীশের যে সমস্যা, শ্রীবিলাসের যে সমস্যা, ঔপন্যাসিক তারই নিগূঢ় পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছেন। ঔপন্যাসিক তাঁর কর্তব্য সমাপন করেছেন আখ্যানবস্তুকে ঘটনা বৈচিত্র্যময় করে নয়, শুধুমাত্র মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ইঙ্গিত দিয়ে। অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় যাকে আংশিকতা দোষ বলেছেন, আমাদের মনে হয় তা রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছাকৃত। সনাতন রীতিতে লেখা উপন্যাসের আদি মধ্য অন্ত সব কিছুই ছকে বাঁধা। কিন্তু কাহিনীকে এমনি ছকবাঁধা রাস্তায় গতানুগতিকতার মধ্যে নিয়ে গেলে উপন্যাস কৃত্রিমতা দোষে দুষ্ট হতে বাধ্য। তথাকথিত বাস্তব ধর্মী উপন্যাসে এর অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে যেন সচেষ্টভাবে সে. গতানুগতিকতার ছক বাঁধা সনাতন রীতিতে ঠাসবুনানো কাহিনীবিন্যাসের পন্থা পরিহার করেছেন। চতুরঙ্গের রস পুরোপুরি গ্রহণ করতে হলে পাঠককে অনেকটা সজাগ থাকতে হয়। সংবেদনশীল মন নিয়ে তাকে শচীশ-দামিনী-শ্রীবিলাসের মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণ ও ইংগিতের মধ্য দিয়ে উপাখ্যানের মর্মকেন্দ্রে গিয়ে হাজির হতে হয়। এ পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের রচনাকৌশলের সবচেয়ে ভালো পরিচয় পাওয়া যাবে চতুরঙ্গের নিম্নোধৃত অংশে :

"শচীশের ডায়ারিতে লেখা আছে :

গুহার মধ্যে অনেকগুলি কামরা। আমি তার মধ্যে কম্বল পাতিয়া শুইলাম। সেই গুহার অন্ধকারটা যেন একটা কালো জন্তুর মত—তার ভিজা নিঃশ্বাস যেন আমার গায়ে লাগিতেছে।

আমার মনে হইল সে যেন আদিম কালের প্রথম সৃষ্টির প্রথম জন্তু ; তার চোখ নাই, কান নাই, কেবল তার মস্ত একটা ক্ষুধা আছে ;—সে অনন্ত কাল এই গুহার মধ্যে বন্দী ; তার মন নাই,—সে কিছুই জানে না, কেবল তার ব্যথা আছে—সে নিঃশব্দে কাঁদে।

শেষে ফিরিয়া আসিয়া কম্বলটার উপর শুইলাম। মনে হইল সেই আদিম জন্তুটা আমাকে তার লালাসিক্ত কবলের মধ্যে পুরিয়াছে, আমার কোন দিকে আর বাহির হইবার পথ নাই। এ কেবল একটা কালো ক্ষুধা, এ আমাকে অল্প অল্প করিয়া লেহন করিতে থাকিবে এবং ক্ষয় করিয়া ফেলিবে। ইহার রস জারক রস, ইহা নিঃশব্দে জীর্ণ করে।.......

জানি না কতক্ষণ পরে—সেটা বোধ করি ঠিক ঘুম নয়, অসাড়তার, একটা পাতলা চাদর আমার চেতনার উপরে ঢাকা পড়িল। এক সময়ে সেই তন্দ্রাবেশের ঘোরে আমার পায়ের কাছে প্রথমে একটা ঘন নিঃশ্বাস অনুভব করিলাম। ভয়ে আমার শরীর হিম হইয়া গেল। সেই আদিম জন্তুটা।......"

নর্মজীবনের গীতসগোত্র অভিব্যক্তিকে বহন করার জন্য ভাষা মাধ্যমের এহেন গীতিময়তা অপরিহার্য। গীতিকাব্যিক ভাষায় লেখা ডায়ারির পৃষ্ঠাটি উপন্যাসের পরিণতিকে অসাধারণ গতিবেগে পরিপুষ্ট করেছে।

'সবুজ পত্রে' 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল তখন থেকে সুরু করে তা পুস্তকাকারে প্রকাশের পর পর্যন্ত বহু বিরুদ্ধ সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিলেন উপন্যাসকার। তিনি টীকা টিপ্পনী নাম দিয়ে সবুজ পত্রে এসব সমালোচনার একটি প্রত্যুত্তর প্রকাশ করেছিলেন। পরে 'সাহিত্যবিচার' নামে আরও একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন 'প্রবাসীতে'। কৌতূহলী পাঠক এ দুটি প্রবন্ধ পড়ে নিলে উপকৃত হবেন।

এ উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ অনেকাংশে বঙ্কিমচন্দ্র প্রবর্তিত 'রজনী'র রচনা-কৌশলকে অনুসরণ করেছেন। তবে এ উপন্যাস গঠন কৌশল ও রচনা-শৈলীর দিক থেকে আরও অনেক বেশী উন্নত ও পরিণত। এখানেও তিনি সমস্ত কাহিনীকে ব্যক্ত করেছেন উপন্যাসের তিনটি প্রধান চরিত্র বিমলা, নিখিলেশ ও সন্দীপের জবানীতে। এরা নিজেদের আত্মকথার মধ্য দিয়ে কাহিনীটিকে পরিণতির পথে নিয়ে গেছে।

এ উপন্যাসে দুটি স্তর আছে: একটি রাজনৈতিক, দ্বিতীয়টি বিমলা, নিখিলেশ, সন্দীপের মধ্যে প্রেমকেন্দ্রিক মানসিক সংঘাত বিষয়ক। এ দুটি স্তর উপন্যাসের মধ্যে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত থেকেও নিজস্ব গতি অব্যাহত রেখেছে। এ ছাড়া ভাষার দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ ক্রমশই epigram—ধর্মী হয়ে উঠেছেন। অবশ্য তার সবচেয়ে বেশী পরিচয় পাওয়া যায় চার অধ্যায়, শেষের কবিতা প্রভৃতি আরও পরের উপন্যাসে।

দৃষ্টির অন্তর্মুখীনতায় বিমলা-নিখিলেশ-সন্দীপের কথা অভিব্যক্ত হয়েছে

আত্মকথার রূপ নিয়ে। কবির অন্তর বিচরণের নিভৃত পদক্ষেপ মাধ্যম করেছে এমন এক ভাষাকে যার স্বল্পরেখ লঘুস্পর্শে বর্ণনা ছোটগল্পের আকার ধারণ করেছে, বাঙনির্মিত style-এ রূপান্তরিত হয়েছে। বিমলার আত্মকথা :

"আমাদের ভালবাসার প্রদীপ যখন জ্বলে তখন তার শিখা উপরের দিকে উঠে—প্রদীপের পোড়া তেলই নীচের দিকে পড়তে পারে।

প্রিয়তম, তুমি আমার পূজা চাও নি, সে তোমারই যোগ্য, কিন্তু পূজা নিলে ভালো করতে। তুমি আমাকে সাজিয়ে ভালো বেসেছ, যা চাই নি তা দিয়ে ভালোবেসেছ। আমার ভালোবাসায় তোমার চোখে পাতা পড়ে নি তা দেখেছি। আমার দেহকে তুমি এমন করে ভালোবেসেছ যেন সে স্বর্গের পারিজাত, আমার স্বভাবকে তুমি এমন করে ভালোবেসেছ যে সে তোমার সৌভাগ্য। এতে আমার মনে গর্ব আসে, আমার মনে হয় এ আমারই ঐশ্বর্য যার লোভে তুমি এমন করে আমার দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছ। তখন রাণীর সিংহাসনে বসে মানের দাবী করি ; সে দাবী কেবল বাড়তেই থাকে, কোথাও তার তৃপ্তি হয় না। পুরুষকে বশ করবার শক্তি আমার হাতে আছে এই কথা মনে করেই কি নারীর সুখ, না তাতেই নারীর কল্যাণ? ভক্তির মধ্যে সে গর্বকে ভাসিয়ে দিয়ে তবেই তার রক্ষা। শঙ্কর তো ভিক্ষুক হয়েই অন্নপূর্ণার দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছেন, কিন্তু এই ভিক্ষার রুদ্রতেজ কি অন্নপূর্ণা সইতে পারতেন যদি তিনি শিবের জন্যে তপস্যা না করতেন?"

কেবল বিমলার আত্মকথা কেন সকলের আত্মকথাতেই এহেন অন্তর-চারিতার নির্দর্শন রয়েছে। মানসলোকের অতলান্ত গহনের লীলাস্পর্শে প্রকাশের মাধ্যম এমনিভাবে গীতিকাব্যিক হয়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যে।

উনিশ শ' চব্বিশ সালের মে মাসে ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্ কেম্বি্রজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসভায় যে বলেছিলেন :

And now I will hazard a second assertion which is more disputable perhaps, to the effect that on or about December, 1910 human character changed (Character in Fiction : The Criterion, July, 1924). এ উক্তিটির একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে লণ্ডন সহরে Grafton Galleries-এ প্রদর্শিত Van Gogh, Ganguin, Matiss, Picasso ও Cezanne প্রভৃতি শিল্পীর যুগান্তকারী ছবিগুলিতে চরিত্রগত রূপান্তরটি ধরা পড়েছিল। এ প্রদর্শনীকে উপলক্ষ করেই 'পোষ্ট-ইম্প্রেশনিজম' কথাটির সৃষ্টি। ১৯১০ সাল ও তার পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যে ইংরাজী কথাসাহিত্যে নতুন যুগসূচনা দেখা দিল। এ সময়ে Bennett, Wells, Galsworthy প্রভৃতি তথাকথিত বাস্তববাদী ঔপন্যাসিকদের বিরুদ্ধে প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি হয়। এ আলোড়নের উৎস

থেকে আবির্ভূত হল এক নবতর রচনাশৈলী, এক অপূর্ব বাঙনির্মিতি যাকে ইংরাজীতে বলতে পারি new technique.

এ সময় পৃথিবীর চারজন প্রতিভাবান কথাকার চারটি সম্পূর্ণ নতুন ধরণের উপন্যাস লিখতে সুরু করলেন। ১৯১৩ সালে ফরাসী ভাষায় মার্সেল প্রুস্তের A la Recherche Du Temps Perdu নামক উপন্যাসের প্রথম দু'খণ্ড প্রকাশিত হয়। ১৯১৫ সালে ইংলণ্ডে ডরোথি রিচার্ডসনের বৃহৎ উপন্যাস Pilgrimage-এর প্রথম খণ্ড প্রকাশ লাভ করে। তার একবছর পরে ১৯১৬ সালে James Joyce তাঁর A Portrait of the Artist as a Young Man উপন্যাসখানিকে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। ১৯১৬ সালে রবীন্দ্রনাথের চতুরঙ্গ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

এ আবির্ভাব আপাত দৃষ্টিতে যতই আকস্মিক বলে মনে হোক না কেন, আসলে তা পরিণত-তর ঐতিহ্যালুস্হতি। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে 'রজনী' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগত নতুন জিজ্ঞাসার আভাস পাঠকের চোখে ধরা পড়েছিল। ১৯১০ সালের আগে থেকেই ইংরাজী উপন্যাস জগতেও কয়েকজন শিল্পীর মনে এক নতুন জিজ্ঞাসা জেগেছিল। বিশেষ করে হেনরি জেম্‌স্ ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত Partial Portraits গ্রন্থে ঔপন্যাসিকের শিল্পাদর্শ ও রচনারীতি সম্পর্কে কয়েকটি মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন করেন। ১৯১৪ সালে The Times Literary Supplement পত্রিকায় প্রকাশিত The Younger Generation শিরোনামাঙ্কিত প্রবন্ধে তিনি দুটি বক্তব্য উপস্থাপিত করলেন। প্রথমত, তথাকথিত বাস্তববাদীরা উপন্যাসে জীবনের খুঁটি নাটি প্রাণপণে জড়ো করে মানবজীবনের পরিচয় দেবার আপ্রাণ চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁদের এ প্রচেষ্টা শুধু আবর্জনা বাড়ায়, মানবজীবনের সত্যিকার পরিচয় দিতে পারে না। দ্বিতীয়ত, এসব বাস্তববাদী ঔপন্যাসিকেরা বাইরে থেকে মানুষের চরিত্র আঁকেন। তাঁদের কথা বলবার তাগিদে তাঁরা কাহিনীর যে কাঠামো তৈরি করেন তাতে পুরে তাঁরা স্বেচ্ছায় জীবনকে বিকৃত করেন, আর মানবমনের মধ্যে যে নিরবচ্ছিন্ন আলো-আঁধারের খেলা চলছে, যে সূক্ষ্ম অনুমভূতির লীলাচাঞ্চল্যে মানবচেতনা চিরমুখর তার কোন পরিচয়ই তারা দিতে পারেন না। অর্থাৎ তাঁরা মানব-জীবনের খোলসটাকে নিয়ে এত ব্যস্ত থাকেন যে তাঁদের দৃষ্টি বহিরাবারণ ভেদ করে মনের অন্দরমহলে প্রবেশের অধিকার পায় না।

রবীন্দ্রনাথ সমকালের এ আন্দোলনের অন্যতম শরিক। 'চতুরঙ্গ' তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এজন্য কোন কোন সমালোচক চতুরঙ্গ উপন্যাসে 'উদ্দেশ্য গভীরতার অভাব' লক্ষ্য করেছেন। গতানুগতিক উপন্যাস বা কাহিনীর সংস্কার নিয়ে চতুরঙ্গ এবং 'চতুরঙ্গ'-পরবর্তী রবীন্দ্র উপন্যাসের বিচার করতে

গেলে এ রকম বিচার বিভ্রাট স্বাভাবিক। কারণ রবীন্দ্রনাথ বাঙলা উপন্যাস জগতে নববাস্তবতার পথিকৃৎ, নতুন কলাকৌশল-গত আন্দোলনের পুরোধা। অবশ্য মৌলিক সাদৃশ্য-সঙ্গতি সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ প্রুস্ত নন, জেম্‌স্ জয়স্ নন, ভার্জিনিয়া উলফ্‌ও নন। আপন শিল্প ব্যক্তিত্বের অনুকূল এক শিল্পরীতির তিনি স্রষ্টা। তাঁর উপন্যাস পাঠকের ভূমিকা প্রসঙ্গে এটিই বোধ করি সবচেয়ে বড় কথা।

রবীন্দ্রনাথের মানবিকতা

• ডাঃ নীহাররঞ্জন রায়

রবীন্দ্র চিন্তায় একটি জীবন্ত রূপ আছে। যে মৌল প্রত্যয়গুলি লইয়া তিনি যাত্রা সুরু করিয়াছিলেন তাহা কোনদিনই পরিবর্তিত হয় নাই ; বরং তাঁহার জীবৎকালীন অশীতিবর্ষের প্রবল সংবেগমণ্ডিত বিশ্বইতিহাসপ্রেক্ষিতে তাহা সম্প্রসারিত হইয়াছে। কয়েকটি মূলসূত্রে এই প্রত্যয়গুলি বিধৃত। সূত্রগুলি এই : মানবতায় বিশ্বাস, সীমাহীন মানবপ্রেম, শান্তি, প্রীতি, ঐক্য ও সংহতিতে সমাজ-আদর্শের সন্ধান, সর্ববিধ নিপীড়ন, সংকীর্ণতা ও উগ্র প্রাদেশিকতার বিরোধিতা এবং যে পথ সহজ সরল, যে পথ কেন্দ্র হইতে বহুমুখী সেই পথকে একমাত্র পথ বলিয়া গণ্য করা। ইতিহাস কোনদিন কবিকে অতিক্রম করে নাই ; তাঁহার কবিমন তাঁহাকে ইতিহাসে সহযাত্রী করিয়াছে এবং ইতিহাসের লক্ষ্য নির্দেশে সামর্থ্যদান করিয়াছে।

প্রথম পর্বে আধুনিক পৃথিবীর সম্মুখে অতীত ভারতের আদর্শায়িত রোম্যান্টিক রূপ তুলিয়া ধরেন। ব্রিটিশ বিজয়ের প্রাক্কাল পর্যন্ত ভারতীয় সভ্যতার ভিত্তি ছিল বহু সহস্র বর্ষের প্রাচীন পঙ্গুপ্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ অর্থব্যবস্থা। ব্রিটিশ বিজয় এই ভিত্তিভূমি ধ্বংস করিল এবং তাহার পর যাহা ঘটিল তাহা সেই পরিবর্তিত সামাজিক ও অর্থনীতিক ব্যবস্থার সহিত আমাদের অঙ্গাঙ্গী সামঞ্জস্য নয়, তাহা এক আরোপিত নগর সভ্যতা ; একান্তই কুশ্রী, সকল নৈতিক ও সামাজিক মূলবোধবর্জিত। ভারতীয় গ্রামজীবনের সমূহ বিনষ্টি ঘটিল। নূতন একটি অর্ধ-সামন্ত পরগাছা শ্রেণীর অভ্যুদয়ে কৌম-কৃষি-প্রথা অবসান হইল, বিদেশ হইতে আনীত স্তূপীকৃত যন্ত্রজাত পণ্যসম্ভারে কুটীরশিল্প বিনষ্ট হইল।

এই দীন হতশ্রী ও মলিন পরিবেশের প্রতিবাদে এবং বলপ্রয়োগে সমাজের পুনর্গঠন সম্ভব নয় স্থির জানিয়া (বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত এইখানেই তাঁর প্রভেদ), রবীন্দ্রনাথ উপনিষদীয় সারল্য, ঔদার্য ও বিশ্বপ্রেমের আদর্শ তুলিয়া ধরেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার রচনায়, বিশেষত রাজসিংহ, আনন্দমঠ ও সীতারাম উপন্যাসে যে উগ্র জাতি-অভিমান ও হিংসাত্মকতা প্রচার করিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্যে, ততোধিক তাঁহার গদ্য প্রবন্ধে, বিশেষত: গোরা ও ঘরে-বাইরে দুইটি উপন্যাসে তাহা দূরীকরণে চেষ্টা করেন। রবীন্দ্রনাথ ভিন্নতর একটি আদর্শ তুলিয়া ধরেন। সেই আদর্শ যে কেবল কল্পলোকের নহে, তাহা যে বাস্তবায়িত করাও সম্ভব, তাহা প্রমাণের জন্য তিনি শান্তিনিকেতনে এমন এক আশ্রম প্রতিষ্ঠা

করিলেন যাহা উপনিষদীয় আদর্শে পরিকল্পিত। পরবর্তী বিশ বৎসরকাল ইহাতেই তিনি তাঁহার সমস্ত কর্মশক্তি নিয়োগ করিলেন।

ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগণের প্রথম বিদ্রোহ স্বদেশী আন্দোলনে তিনি নিজেকে কায়মনে সমর্পণ করিলেন ; এবং সঙ্গে সঙ্গেই ইহার পুরোহিত, প্রবক্তা ও চারণ হইয়া উঠিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, তিনি যে আদর্শ কল্পনা করিতেন, যাহাকে অত্যন্ত মূল্য দিতেন, স্বদেশী আন্দোলনের তাহাই লক্ষ্য। তাঁহার আদর্শের ভারতবর্ষ কেবল বিদেশী শাসন হইতে মুক্ত হইবেনা। সর্বপ্রকার নৈতিক এবং মানসিক কলুষমুক্ত হইবে ; ভারতবর্ষের সমাজ বলের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে না, প্রতিষ্ঠিত হইবে আন্তরসংহতিতে ; বিকেন্দ্রীত অর্থনীতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থায়, যাহার বিশদ ব্যাখ্যা তিনি একের পর এক প্রবন্ধে বিবৃত করিয়াছেন। তিনি দেখিলেন বুয়র যুদ্ধে নূতন এক পাপশক্তির উত্থান, নূতন ভাষ্য দিলেন জাতীয়তাবাদের ; এবং স্বদেশী আন্দোলন যে রূপ পরিগ্রহ করিতেছিল, তাহাতে স্বদেশেও তিনি অনুরূপ প্রবণতার সূত্রপাত দেখিয়া (যদিচ এই দেখায় তাঁহার ত্রুটি ছিল) সমর্থন করিতে পারিলেন না।

১৯০০ হইতে ১৯১০ পর্যন্ত একটি ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ পর্ব। এই দশ বৎসরে ভারতবর্ষ বিগত শত শত বৎসরের তুলনায় বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। এশিয়ার ইতিহাসে সর্বপ্রথম দেখা দিল জনগণের এক রাজনীতিক অভ্যুত্থান। বিদেশীর বিজয়ে যে ব্যবস্থা বিনষ্ট হইয়াছে তাহাতে প্রত্যাবর্তন না করিয়া ভিন্নতর এক স্বাধীন সামাজ ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবার জন্য ক্রমবর্ধমান আকাঙ্খা জনচিত্তকে উদ্বেল করিয়া তুলিল। এই আকাঙ্খা ছিল স্বভাবতই অস্ফুট ইহার প্রথম প্রকাশ ঘটিল কেবলমাত্র হিংসাত্মক কার্যকলাপে ও যাবতীয় বিদেশী দ্রব্য বর্জনে।

এই দশকে কবি তাঁহার জীবনে প্রথম এবং শেষবার সক্রিয়ভাবে রাজনীতিক সংগ্রামে যোগদান করিলেন। এই সময়ে তাঁহার প্রবন্ধ, সংগীত ও ভাষণের আগ্নেয় উদ্দীপনা সমগ্র জাতিকে মাতাইয়া তুলিল। কিন্তু তাঁহার তৎকালীন কাব্যে ইহার অনুরূপ প্রতিফলন পড়ে নাই, কবিতার বিষয়বস্তু আপাতদৃষ্টিতে ছিল দূরাশ্রয়ী। কিন্তু ইহা কেবল আপাতবিচার। কেননা, এই সময়ে রচিত অন্য কাব্যগ্রন্থ না ধরিলেও কথা, কাহিনী ও নৈবেদ্যকে তাঁহার গদ্য রচনাবলী ও গানের সম্পূরক বলা যাইতে পারে। উপনিষদের স্বীকরণজাত যে ধ্যানধারণাগুলি তিনি স্বদেশী আন্দোলনে অনুস্যূত করিতে চাহিয়াছিলেন তাহাই নৈবেদ্যের সনেটগুলিতে, সনেটগুলির ধর্মীয় ভাববস্তু সত্ত্বেও, চিত্রকল্পে ও প্রতীক ব্যঞ্জনায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। চৈতালির অধিকাংশ সনেট এবং স্বদেশ ও উৎসর্গের কবিতাগুলিও এই শ্রেণীর অন্তর্ভূত।

তারপর যখন স্বদেশী আন্দোলন আক্রমণ ও হিংসাত্মক দিকে ফিরিল তখন

অকস্মাৎ কবি সরিয়া দাঁড়াইলেন। ১৯১৯ সালে এবং তৎপরবর্তীকালে যখন গান্ধিজী অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করিলেন, তিনি তাহাতে যোগ দেন নাই; বরং ইহার কয়েকটি নেতিবাচক দিকের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। ১৯৩০ সালে যখন গান্ধিজী লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন করেন, তখনও রবীন্দ্রনাথ নিস্পৃহ নিরপেক্ষ ছিলেন।

অবশ্য এরূপ মনে করা কখনোই সঙ্গত হইবে না যে, রবীন্দ্রনাথ জনসাধারণ এবং তাহাদের ব্যথা-বেদনা সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন। ১৯১৯ সালে অমৃতসরে নৃশংস হত্যালীলায় প্রকৃতপক্ষে তিনিই প্রথম প্রতিবাদবাণী উচ্চারণ করেন; প্রতিবাদে 'স্যর' পদবী বর্জন করিয়া বড়লাটকে তাঁহার লিখিত পত্র জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাসে একটি ক্লাসিক পর্যায়ী রচনা। দেখা যায়, দেশবাসীর প্রতি তাঁহার প্রীতি এবং দাসত্বমূলক শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁহার অনীহা ক্রমশঃ বাড়িয়াছে। তাই মৃত্যুর মাত্র দুই বৎসর পূর্বে তিনি লিখিলেন সেই বহুবিশ্রুত পুস্তিকা 'সভ্যতার সংকট', আর তাহাতে সেই সভ্যতার বিরুদ্ধে কবির চূড়ান্ত রায় উচ্চারিত হইল, অপরের দাসত্ব ও সর্ববিধ সুকুমার মূল্যবোধের সমাধির উপর যাহার ভিত্তি।

বিশ ও ত্রিশের দশকে রবীন্দ্রনাথ কেবল স্বদেশের মুক্তি সংগ্রামের ক্ষেত্রে আবদ্ধ রহিলেন না। স্বদেশী আন্দোলন হইতে সরিয়া দাঁড়াইবার পর হইতেই তাঁহার চিন্তাধারা সাধারণ মানুষের পরিপ্রেক্ষিতে স্বকীয় ভঙ্গিতে পরিণতি লাভ করে। ১৯৩০ সালে যখন তিনি সোভিয়েত ইউনিয়ন পরিদর্শনে গেলেন তাঁহার ধ্যান-ধারণা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ পরিণতি গ্রহণ করিল। তাঁহার মানসপরিণতির সহিত বিশ্বের মনন ও চিন্তারাজ্যের সংযোগ ঘটিল; ভারতের জাতীয় কবি থাকিয়াও রবীন্দ্রনাথ হইলেন বিশ্বকবি। তাঁহার চিন্তাধারা স্বকীয় যুক্তিপন্থার জোরেই ভাববাদের কোটর হইতে মুক্ত হইল, এখন আর বাস্তব পৃথিবী ও তাঁহার ভাবজগতের মধ্যে কোন ব্যবধান রহিল না।

কবি লিখিলেন 'মানুষের ধর্ম'; বহুকাল হইতেই ধীরে ধীরে ইহার বিকাশ ঘটিতেছিল; উপনিষদীয় প্রতিশব্দে ও চিন্তায় বস্তুত ইহা বিশ্বমানবিকতারই সর্বাধিক প্রগতিশীল অভিপ্রকাশ। বিশ্ব মানবের মুক্তি ও সমানাধিকার প্রয়াসে এই সময় হইতেই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মণীষীমণ্ডলীতে তিনি আসন গ্রহণ করিলেন। গোর্কি ও রলাঁ্যার মতই তিনি নূতন জীবনবেদের দ্রষ্টা ও স্রষ্টা রূপে আবির্ভূত হইলেন। ফ্যাসিস্ত বর্বরতায় লাঞ্ছিত মানবতার বিবেক তাঁহার মধ্যে মূর্ত; বিশ্বশান্তি ও স্বাধিকারের দাবি তাঁহার কণ্ঠে বাণী লাভ করিল এবং স্বদেশী আন্দোলনের মতই তিনি বিশ্বমুক্তির ক্ষেত্রেও পুরোহিতের ভূমিকা গ্রহণ করিলেন। কেবল স্বদেশের স্বাধীনতা নহে, শোষণ ও উৎপীড়ন হইতে সর্বমানবের মুক্তিই

তাঁহার লক্ষ্য। ইহার পর হইতেই রাজনীতি ক্ষেত্রে তাঁহার আত্ম-অপসরণের অবসান ঘটিল ; এবং আমরা দেখিতে পাই কবি নিঃসংশয়িত ব্যক্তিত্ব লইয়া জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করিতেছেন।

সুতরাং রবীন্দ্রমানসের পরিণতি অনন্য, অনবদ্য। কেবল ভারতের ইতিহাসেই অনবদ্য নহে, বিশ্ব-ইতিহাসেও তাঁহার তুল্য ব্যক্তিত্ব বিরল। একটি কৃষ্টিধারার প্রভাব সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়া এমন জীবনচর্যা আবিষ্কার করিলেন যাহা সম্পূর্ণ ভিন্ন কৃষ্টিধারার জনয়িতা। যখন জাতি বলিতে কেবল মধ্যবিত্ত শ্রেণী বুঝাইত, সেই সময়ে জীবন আরম্ভ করিয়া তিনি এই কৃষ্টির সকল সংকীর্ণতা অতিক্রম করিয়াছিলেন এবং সমগ্র জাতির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সম্পূর্ণ তাল রাখিয়া চলিয়াছিলেন। জীবনের গোধূলি-পর্বে কবি সর্বজাতির উদবর্তনে একজাতির স্বপ্ন দেখিতেন। যে জাতীয় ঐতিহ্যের সহিত রবীন্দ্রনাথ আপনাকে মিলাইয়া দিয়াছিলেন, তাহার মধ্যেই অনুরূপ পরিধি-প্রসার, গভীরতা ও তাৎপর্যের সম্ভাবনা নিহিত ছিল তাই এই উদ্‌বর্তন সহজসাধ্য হইয়াছিল।

তাঁহার পূর্বে আমাদের লেখকেরা ভারতের ইতিহাস ও কৃষ্টির কোন একটি বিশেষ দিককেই গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সেই উপাদানেই তাঁহারা এক একটি ভাবজগৎ গঠনে আপনাদের সাধনাকে নিয়োজিত করিতেন। রবীন্দ্রনাথই প্রথম কবি, যিনি সমগ্র ভারতবর্ষের ইতিহাসপ্রেক্ষিতে তাঁহার দৃষ্টি সম্প্রসারিত করিয়াছেন। শুধু তাই নয়, এই পরিপ্রেক্ষিত ক্রমশ ব্যাপক হইতে ব্যাপকতর হইতে থাকে।

জাতীয়তাবাদের আছে দুইটি দিক ; এবং যে গতিশীলতা সমগ্র জাতিকে নূতন আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক বৈজয়ন্তীর দিকে অগ্রসর করিয়া দিতে পারে, তাহা ঐ দুইয়ের সমন্বয়েই সম্ভব। একটি দিকের দৃষ্টি সম্মুখভাগে, তাহা বহির্মুখী, তাহা বাহিরবিশ্বের অভিজ্ঞতাকে আয়ত্ত করিতেছে ; অন্যটির দৃষ্টি পশ্চাদ্‌ভাগে, তাহা সমান আগ্রহের সহিতই অতীত ইতিহাস পুনরুদ্ধার করে এবং অতীত মহত্ত্ব সম্পর্কে সচেতনতা ও সুনিশ্চয়তাজাত একটি জাতীয় ভাগ্যের ধারণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে।

যাঁহার উপরে জাতীয় আদর্শ বিধানের দায়িত্ব পড়ে, তিনি এমন বিষয় ও শৈলী আবিষ্কার করেন যাহা অতীত ও বর্তমানকে সংযুক্ত করিতে পারে ; তাহাতেই ঐ দুইদিকের সমন্বয় হয়। রবীন্দ্রনাথই ইহা সম্ভব করিয়াছিলেন। এই আদর্শের একটি দিক লক্ষণীয় আবেগ-উদ্দীপনা সঞ্চার করিয়া ইহা জাতিকে ব্যাপকতা দান করিল, একটি পন্থা নির্বাচন এবং সেই পথেই অগ্রসর হইল। এই নূতন মতাদর্শ সত্য না মিথ্যা তাহা সহজেই বিচার্য। নূতন নূতন শ্রেণীর সংযোগে ইহা কি জাতিকে বৃদ্ধির দিকে লইয়া যায় নাই এবং পূর্ববর্তী কালের

পুরাতন মতাদর্শগুলির তুলনায় ইহা কি নূতন মানসিক ও আত্মিক পরিপুষ্টি বিধান করে নাই? ইহা কি জাতিকে অন্যান্য দেশের সহিত ক্রমবর্দ্ধমান সম্বন্ধ স্থাপনে সহায়তা করে নাই ঐক্য ও সংহতির নূতন রাখীবন্ধ রচনা করে নাই? অথবা ইহা জাতিকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে, আক্রমণে উৎসাহ দিয়াছে এবং ভুয়া মহত্ব ও অধিকারবোধে প্ররোচিত করিয়াছে?

এই সকল মানদণ্ডে বিচার করিলে ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর জন্য রবীন্দ্রনাথ যে মতাদর্শ সৃষ্টি করিলেন, তাহাকে অবশ্যই মহৎ ও প্রগতিশীল বলিতে হয়। সচেতনভাবে বা অচেতনভাবেই হউক তিনিই নূতন কৃষ্টিধারার ভিত্তি স্থাপনা করেন এবং তাহার উপরে তিনিই সেই সমন্বয়সৌধ গঠন করিলেন যে-সম্বন্ধে আমি পূর্বে বলিয়াছি। ইহা ব্যতীত অতীতের পুনরুদ্ধার এবং বহির্বিশ্বের নূতন শক্তিসম্ভার বিচ্ছিন্ন, বিনষ্ট, টুক্‌রা-টুক্‌রা জিনিসে পরিণত হইত। রামমোহন ঈশ্বরচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ প্রমুখ পূর্বসূরিগণ ভূমি প্রস্তুত করিয়াছিলেন , তাহার উপরে সমকালীন ভারতবর্ষ ও জাতীয়কৃষ্টির কাঠামো রচনার কাজ রবীন্দ্রনাথের অপেক্ষায় ছিল। আমাদের জাতীয় পরিণতির পথ এবং কৃষ্টির রূপরেখা তিনিই গঠিত করিয়া দিয়াছেন। সমগ্র দেশ তাঁহাকে আচার্য, গুরুদেব বলে। ইহা গোটেই আলংকারিক ভাবোচ্ছ্বাসমূলক অতিশয়োক্তি নহে; ইহাকে নিছক কৃতজ্ঞতা প্রকাশও বলা অনুচিত; ইহা সত্য ঘটনারই বিবৃতি। গান্ধীজি তাঁহাকে যথার্থই 'মহান প্রহরী' বলিয়াছেন। শত শতাব্দীর মধ্য দিয়া ভারতবর্ষ যে মৌল মানবিক, এবং আত্মিক মূল্যবোধগুলি লালন করিয়া আসিয়াছে, তিনি ছিলেন তাহারই প্রহরী এবং পুনরুদ্ধারক।

কী অর্থে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বপ্রতিভা এতক্ষণে নিশ্চয়ই তাহা স্পষ্ট হইয়াছে। তিনি বিশ্বখ্যাত মনীষীদের অন্যতম, যেহেতু বিশ্বের জাতিসভায় তিনি ছিলেন প্রস্ফুয়মান একটি জাতিসত্তার প্রবক্তা।

১৯২০ সালের পর হইতে ভারতের আর্থিক ও রাজনীতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে সেই শক্তি নিহিত ছিল যাহা পৃথিবীর ভাগ্য রূপান্তরিত করিতেছে। প্রাচীন ভারতের দর্শন, সাহিত্য ও বিজ্ঞান এখন বিশ্বঐতিহ্যের অন্তর্গত, নূতন চিন্তাও মননের রাজ্যে তাহার দানও যথেষ্ট। উপনিষদ, বৌদ্ধ দর্শন ও মধ্যযুগীয় মরমিয়াবাদের পুনরুজ্জীবনে নূতন ভাবধারার প্রবর্তন ঘটিয়াছে এবং বুদ্ধির ক্ষেত্রে সৃজনের নব নব সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে ভারতের মহান গণ-বিদ্রোহ আন্তঃমহাদেশীয় বিদ্রোহের প্রস্তাবনা। আগামী বহু বর্ষের পৃথিবীর ইতিহাস ভারতের রাজনীতিক ও সামাজিক বিপ্লবের ফলাফলের উপরই নির্ভর করিতেছে। আজ ভারতবর্ষ জগৎ সভায় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অগ্রনায়কের মর্যাদায় আসীন।

উনিশ শতকেও ভারত প্রশংসা পাইয়াছে, কিন্তু এখন আর শুধু প্রশংসা করে নাই। আমাদের দেশ প্রমাণ করিয়াছে যে ভারতবর্ষ কেবল ঐতিহাসিক পুরাতত্ত্বের যাদুঘর নহে। যে সকল শক্তি বহু পূর্বেই অবসিত হইয়াছে বলিয়া ধারণা করা হইত, তাহারা পূর্বের মতই এখনো প্রাণবন্ত রহিয়াছে এবং অন্যত্র অনুষ্ঠিত সর্ববিধ আন্দোলনের সহিত সংযোগসূত্ররক্ষায় সক্ষম।

ভারতবর্ষ দীর্ঘকাল ধরিয়া সংগ্রাম করিয়াছে এবং আজ জাতীয় স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। আধুনিক ইতিহাস সকল ক্ষেত্রে সংগ্রামের ইতিহাস এবং এই সংগ্রাম রাজনীতিক ও অর্থনীতিক ক্ষেত্রাপেক্ষা চিন্তা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কোন মতেই অপ্রধান নয়। এই সংগ্রামক্ষুব্ধ আধুনিক ইতিহাসে ভারতবর্ষ একটি মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে।

যে ভাবেই দেখি না কেন, বর্তমান চিন্তাজগতে ভারতবর্ষের যে প্রাধান্য তাহা যতখানি রবীন্দ্রনাথের জন্য ততখানি অপর কাহারও জন্য নহে। এই কারণেই তিনি বিশ্ব-প্রতিভা।

তিনি নিজের সৃষ্টিকে বিশ্বমুক্তি সাহিত্যের অঙ্গীভূত করিয়াছেন এবং সেই উপায়ে জাতীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ সেবা করিয়াছেন। তাঁহার হাতে জাতীয় সংস্কৃতি স্বতন্ত্ররূপ পরিগ্রহ করিল, পরিণতি লাভ করিল, শক্তি ও শ্রী সমন্বিত হইল এবং মানবতার ভবিষ্যৎ-সেবায় নিয়োজিত শক্তিসমূহের সঙ্গে সংগ্রথিত হইল।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, তিনি এমন সময়ে রচনা আরম্ভ করেন যখন বর্তমান ভারতবর্ষের ঐতিহ্য ছিল অস্ফুট। কাহারও পক্ষে বলা সম্ভব ছিল না। কীরূপে বহুবিচিত্র ধারা কোনো অচল ব্যবস্থার ছকে না পড়িয়া গতিশীলতায় সুসমঞ্জস হইবে, যাহার ফলে অতীতের সকল ঐশ্বর্য এবং ভবিষ্যতের সকল সম্পদ অঙ্গীভূত করিয়া একটি একাত্মকরণ সম্ভব হইবে। রবীন্দ্রনাথ এই একাত্মকরণ সম্ভব করিলেন, আমাদের জাতীয় ঐতিহ্য নিরূপণ করিয়া দিলেন এবং বর্তমান পৃথিবীর সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া এই ঐতিহ্য প্রাণ সঞ্চার করিলেন।

রবীন্দ্রনাথ এই একাত্মকরণ দুই উপায়ে সম্ভব করিলেন—প্রথমতঃ জাতির অতীতকে এবং দ্বিতীয়তঃ স্বদেশবাসীকে গভীরভাবে ভালবাসিয়া। প্রথমটি তাঁহাকে সহায়তা করিল ভারতীয় সামাজিক জীবনের অন্তঃস্রোতধারা আবিষ্কারে এবং দ্বিতীয়টি সাহায্য করিল নূতন পথের সন্ধান পাইতে, যে পথে এই ধারাগুলি অবশ্যই প্রবাহিত হইবে যদি তাহারা স্রোতহীন জলাভূমিতে পরিসমাপ্ত না হয়। অতীত প্রীতি এবং স্বদেশ ও স্বজাতি প্রীতি এই দুই শক্তি, তাঁহার মহৎ প্রতিভায় গতিসঞ্চার করিয়াছিল এবং এই প্রতিভার প্রকাশের পথও নির্ধারিত করিয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথ কখনোই থামেন নাই। এ বিষয়ে অনেক মহৎ কবির সহিত তাঁহার গরমিল, মিল যদি থাকে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের সহিত আছে। শেষ পর্যন্ত তাঁহার বুদ্ধি ও সংবেদ তীক্ষ্ণ ও সচেতন ছিল ; জ্ঞান অভিজ্ঞতা ও ইতিহাসের নানা নূতন তথ্য তাঁহার মনে নূতন নূতন সৃষ্টিশীল প্রতিক্রিয়া আনিয়াছিল। তাঁহার মৃত্যু বৎসর পর্যন্ত নূতনতর বিষয়, আঙ্গিক ও সমস্যা তাঁহাকে ব্যাপৃত রাখিয়াছিল এবং প্রাণতায় বা প্রাচুর্যে সেখানে কোন অভাব ছিল না। কোথা হইতে তিনি এমন শক্তি পাইলেন? স্বজাতির মধ্য হইতে এবং যে বৃহত্তর জীবনে জাতি ক্রমশঃ প্রধানতর ভূমিকা গ্রহণ করিতেছিল সেখান হইতেই তিনি শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। এই মন্তব্যের পুনরাবৃত্তি প্রয়োজন, কেননা ইহার উপর যথেষ্ট জোর দেওয়া হয় নাই। এই দিক হইতে বিচার করিলে রামমোহন যে কাজ সুরু করিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথই তাহার পরম সমৃদ্ধির প্রতীক। বরং তিনি তাহা হইতেও অধিক।

আমাদের মধ্যবিত্ত সংস্কৃতিতে এক সাংঘাতিক বিরোধ থাকিয়া গিয়াছিল। সত্যই খুব কম লেখকই দুই প্রান্তসীমায় উপনীত হইতে পারিয়াছিলেন। বঙ্কিম-চন্দ্র সেই বিরল লেখকদের মধ্যে অন্যতম। কোনো সংস্কৃতির সারমর্ম তাহার শ্রেষ্ঠ প্রতিভার মধ্যেই প্রকট হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র সেই বিরোধের সমাধান করিতে পারেন নাই। রবীন্দ্রনাথ কি পারিয়াছিলেন? অবশ্যই তিনি পারিয়াছিলেন, নতুবা তাঁহাকে আমরা ভারতের জাতীয় ঐতিহ্য বলিয়া চিহ্নিত করিতাম না। সমকালীন ব্যক্তিদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথই একাকী সেই বিরোধ কাটাইয়া উঠিয়াছিলেন, তখনকার কালে ইহা অসাধ্যসাধন ; আবার শেষ পর্যন্ত তিনি যাহা রক্ষা করিলেন তাহার সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের মূলগত পার্থক্য সামান্য।

রবীন্দ্রনাথেও সেই ভারতবর্ষের সভ্যতার প্রতি গভীর অনুরাগ, সেই জাতীয় ভাগ্যে আস্থা। নিশ্চিতভাবে বলিতে গেলে উপনিষদীয় ও মধ্যযুগীয় মানবতায় রবীন্দ্রনাথের আরো পরিচ্ছন্ন, আরো স্পষ্ট বিশ্বাস ছিল। কিন্তু অন্তর্বিরোধে পঙ্গু মধ্যবিত্ত চিন্তাকে তাঁহার যে শক্তি ও গতিধর্ম লালন করিয়াছিল এইটুকু বলিলেই তাহার যথার্থ ব্যাখ্যা হয় না। আমরা রম্যা রলঁ্যার সহিত রবীন্দ্রনাথের তুলনা করিয়াছি। কিছুদূর পর্যন্ত এই তুলনা সত্য ; কিন্তু পার্থক্যটিও লক্ষণীয়। রলঁ্যা একটি বিশেষ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দর্শনে বিশ্বাস করিতেন, তাহার প্রতি উগ্র আনুগত্যও ছিল ; রবীন্দ্রনাথ কখনো তাহা করেন নাই। শেষদিন পর্যন্তও হাল আমলের দার্শনিক মতাদর্শগুলিতে তাঁহার গভীর সংশয় ছিল, কিছুটা রাজনৈতিক দল ও ব্যবস্থার প্রতি প্রাচীনপন্থী বিরূপতার মতো। তৎসত্ত্বেও ব্যাপক সামাজিক রাজনীতিক আন্দোলনে তাঁহার সহানভূতি ছিল সর্বদা অত্যা-

চারিত নিপীড়িত মানবতার পক্ষে ; এবং যতই তিনি জড়বাদের মূলসূত্রগুলিতে অনাস্থা প্রকাশ করুন না কেন, তিনি জড়বাদের প্রবক্তাদেরই সামাজিক লক্ষ্য অঙ্গীকার করিয়াছিলেন।

চূড়ান্ত বিশ্লেষণে বলিতে হয়, মধ্যবিত্ত সংস্কৃতির বিরোধকে জয় করা তাঁহার ব্যক্তিত্বেরই বৈজয়ন্তী। যে পদ্ধতিতে তিনি সমীকরণ করিয়াছেন তাহা একান্তই ব্যক্তিগত। অবশ্য এই সিদ্ধান্ত সেইকালে ও সেই আবহাওয়ায় সামাজিক ও ঐতিহাসিক বিচারে সত্য, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে পথে তাঁহার সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন তাহা নিছক যুগোচিত ব্যাপার নহে।

অনেকাংশে এই ব্যতিক্রম অপরিহার্য, কারণ রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একজন শিল্পী, সর্বোপরি একজন জীবন-শিল্পী ; বিশেষত ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমাজে শিল্পীর মানসক্রিয়া একান্ত ব্যক্তিগত, অন্তর্লীন হইতে বাধ্য। আমরা শুধু দাবি করিতে পারি, শেষ ফলাফল যেন সমাজগতভাবে যথার্থ হয়।

সুতারং কি রূপে বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া ঔপনিষদিক মানবতা রবীন্দ্রনাথে ব্যক্তিসত্তার ক্রমউদ্ভিদ্যমান ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, অনন্য, অনবদ্য মানবতায় রূপান্তরিত হইল তাহার বুদ্ধিগ্রাহ্য সূত্রনিরূপণ সম্ভব নহে। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পাপক্ষালনে কবি বলপ্রয়োগের প্রয়োজন স্বীকার করিয়াছিলেন। এই পর্যন্তই রবীন্দ্রনাথ অগ্রসর হইতে পারিয়াছিলেন, এবং ইহাতেই আমাদের তৃপ্ত থাকিতে হইবে।

শেলী বলিয়াছেন, কবিরা বিশ্বের অস্বীকৃত আইনপ্রণেতা। কবিরা সর্বজাগতিক ; মানবিক অভিজ্ঞতায় তাঁহাদের এমন অধিকার যে মানব জীবনের বিধান তাঁহারা প্রণয় করিতে পারেন। কবিতা নির্জনের স্বপ্নবিলাস নহে, নির্বাচিত বিশ্লিষ্ট অভিজ্ঞতার, অন্তর্লীন প্রতিক্রিয়া বা অনুধ্যানও নহে। কবিতাকে বাস্তব সত্য হইতে হইলে বাস্তব জীবনের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ যোগ রাখিতে হইবে, জীবনের দূরপ্রসারী সমস্যা সমূহের বাস্তব সম্বন্ধ হইতে উদ্ভূত হইতে হইবে। অভিজ্ঞতাই একাধারে কাব্যের মূল ও কাব্যের উপজীব্য। কেবলমাত্র এই শ্রেণীর কাব্যই বিশ্বমানবের বিধান বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য এই শ্রেণীর অন্তর্গত। তাই ইহা জীবনের মতই গভীর ও বিশাল।

রবীন্দ্রনাথের জীবন-দর্শন।

শ্রীসরোজকুমার দাস

প্রবন্ধ-সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তুর আলোচনাসৌকর্যার্থে প্রাসঙ্গিক হইবে সূচনাতেই "জীবন" ও দর্শন" এই দুইটি শব্দের ব্যুৎপত্তিগত ও ব্যবহারিক অর্থবোধ। প্রথমতঃ "দর্শন" শব্দটির যৌগিক বা যোগরূঢ় অর্থ ও তার ক্রম-বিবর্তন-ধারা অনুধাবন করার চেষ্টা স্থান, কাল, পাত্র বিবেচনায় সর্বথা পরিত্যাজ্য। বিশেষজ্ঞ-দের অনুসরণ করিয়াই বলা যায় যে তত্ত্ববিদ্যার অনুশীলন অর্থে—অথবা ইংরাজী Philosophy শব্দের প্রতিশব্দরূপে-সংস্কৃতসাহিত্যে "দর্শন" বা "দার্শনিক" শব্দ-টির প্রয়োগ অতিবিরল, নাই বলিলেও চলে। সাধারণতঃ "দর্শন" শব্দের ব্যবহার হইতে যে বৈকল্পিক (alternative) অর্থনিচয় সংগ্রহ করা যায়, তাহাদের তালিকা এইভাবে নির্দিষ্ট করা যায়—(১) প্রথম, ঐন্দ্রিয়ক বা চাক্ষুষ জ্ঞান (২) দ্বিতীয়, মনশ্চক্ষুঃ দ্বারা মানসবস্তু বা অন্তঃকরণবৃত্তি সকল নিরীক্ষণ (৩) তৃতীয়, ধ্যানের দ্বারা সত্যবিশেষের উপলব্ধি বা ধ্যানজ-প্রমা, যেমন "রামায়ণে" আছে—"দৃষ্ট্বা বৈ ধ্যান-চক্ষুষা" অথবা রামানুজের ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে যেমন পাই—"ভাবনা প্রকর্ষাদ্ দর্শনরূপতা" অর্থাৎ ধ্যান বা চিন্তনের অবিচ্ছিন্ন বিস্তার বা উপচয় হইতে যে দর্শনরূপের উদ্ভব হয় (৪) চতুর্থ, অলৌকিক অনুভতি বা সমাধিপ্রসূত প্রজ্ঞা। এই সমস্ত অর্থ ব্যতিরেকে উত্তরকালে "দর্শন" শব্দটি বিচার-বিশ্লেষণ, সমীক্ষণ-সঞ্জাত বিশিষ্ট মতবাদ এই অর্থে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। অতএব সর্বসাকল্যে "দর্শনের" এই অর্থই গ্রহণীয়—মতবাদ বা চিন্তা-পদ্ধতি দ্বারা ইন্দ্রিয়-লব্ধজ্ঞানকে, মননের আনুকূল্যে, ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের সাহচর্যে পরীক্ষা ও পরিশুদ্ধ করিয়া ভাষায় প্রকাশ ও এই পদ্ধতিতে জ্ঞানের ক্ষেত্রকে প্রসারিত ও কেন্দ্রানুগ করার প্রয়াস।

এই কারণেই ব্যাপকতম অর্থে দর্শনের সহিত জীবনের অঙ্গাঙ্গিসম্পর্ক—একেবারে নাড়ীর যোগ বলা যায়। এই সম্পর্কে সহজবোধ্য হয়, যদি বলা যায় যে চিত্রার্পিত অনুলেখনে সমদ্বিবাহু একটি ত্রিভুজের শীর্ষভাগে "জীবন"কে সন্নিবিষ্ট করিলে তলদেশের দুইকোণে যথাক্রমে "সাহিত্য" ও "দর্শন" স্থান পাইতে পারে। কোণদ্বয়স্থিত দুইটিই অর্থাৎ "সাহিত্য" ও "দর্শন" জীবনের গহন-গুহাহিত জিজ্ঞাসায় সঞ্জাত ও সংবর্ধিত এবং এই জিজ্ঞাসার প্রকৃষ্ট নির্বচন (definition) জীবন-যোনি-প্রযত্ন (instinctive activity) এই অভিধানে। বিচার-মীমাংসা-সম্ভূত জ্ঞানের উৎসস্বরূপ এই যে "জিজ্ঞাসা",

তাহার জীবন-পুরঃসর-প্রবৃত্তির মধ্যেই সন্ধান মেলে ইহার প্রাণস্পর্শ ও জৈব-প্রেরণার। সাংখ্যদর্শনে তাই বলা হইয়াছে যে "বোধ" বা "জ্ঞান" প্রকৃতিজন্য বিকারের অনুগ্রহ (বা পশ্চাদ্ গ্রহণ) প্রসূত ফলবিশেষ (যশ্চেতনাশক্তেরনুগ্রহঃ পশ্চাদ্গ্রহণম্ তৎফলং প্রমা বোধঃ)। এই উক্তিটির যেন প্রতিধ্বনি করিয়াই উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ডেন্‌মার্ক দেশীয় প্রখ্যাত দার্শনিক সোরেন কায়ার্কো-গার্ড (Sören Kierkegaard)—যাঁকে আধুনিক যুগের "কেবলাস্তিত্ববাদ" (Existentialism)—এর প্রতিষ্ঠাতা ও পরিপোষক বলা যায়—এই প্রসঙ্গে একটি ভাবগম্ভীর উক্তি করিয়াছেন "We live forwards but understand backwards" অর্থাৎ "জীবনের গতি পুরোভাগে কিন্তু অবগতি পশ্চাদ্-গমনে"। জীবন আগ্রহপূর্বক, চিন্তন অনুগ্রহাত্মক। ইংরাজী reflection (=re, again+flectere, turn) শব্দটির মৌলিক অর্থ এই পরাবৃত্ত-গতিরই আভাস দেয়, জ্ঞান বা অবগতিসম্পর্কে। বিচার, মীমাংসা বা চিন্তনের সহজ-ধারা যেন শার্দুলবিক্রীড়িত গতিচ্ছন্দ।

এই প্রসঙ্গে, জীবন ও সাহিত্যের সম্বন্ধ নিরূপণ মুখ্য প্রয়োজনের বিষয় না হইলেও সাধারণভাবে আলোচ্য। বিশেষজ্ঞদের মতে "সাহিত্যে"যে ভাব ব্যক্ত হয় তাহা সম্বন্ধ-বিশেষ-স্বীকার অথবা পরিহার নিয়মের দ্বারা অনিয়ন্ত্রিত ও সাধারণ-গ্রাহ্য। এই সাধারণ প্রতীতির বলে তখনকার মত সকল পরিমিত প্রমাতৃভাব অপনীত হইয়া উদ্বেলিত হয়, অন্য কোন জ্ঞেয় বস্তুর সম্পর্ক-বিরহিত একটি অপরিমিতভাব এবং সংশ্লিষ্ট সকল সহৃদয় ব্যক্তির মধ্যে একটি ভাবগত ঐক্য থাকাতে এই ভাবরসের যথার্থ অনুভূতি হয়। তৎপরে সমস্ত বিচার, বিতর্ক, উদ্দেশ্য অপসারিত করিয়া ব্রহ্মানন্দ-আস্বাদনের সদৃশ অনুভূতির উদ্রেক করিয়া অলৌকিক চমৎকারকারী (ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদরঃ) এই রসানুভূতি, নিজ স্বরূপের আভাস দেয় (অন্যৎ সর্ব্বমিব তিরোদধৎ ব্রহ্মাস্বাদমিবানুভাবয়ন্ অলৌকিক চমৎকারকারী......রসঃ)। সার কথা এই, "সাহিত্য" তাকেই বলা যায়, যাহাতে রসানুভূতির মধ্যস্থতায় হৃদয়ের সহিত হৃদয়ের যোগ সাধিত হয়। কারণ শেষ পর্য্যন্ত রস ব্যতীত আর কিছুতেই মানুষের সহিত মানুষের হৃদয়ের যোগ স্থাপিত হয় না। "সাহিত্য"এই সেতুবন্ধ রচনা করিতে পারে। কবিগুরুর "সাহিত্যের স্বরূপ"ও তদানুষঙ্গিক সারগর্ভ প্রবন্ধগুলি এই প্রসঙ্গে প্রণিধান-যোগ্য।

রবীন্দ্রনাথের জীবন-দর্শন-আলোচনা-প্রসঙ্গে যে জীবন-পুরঃসর-প্রবৃত্তি বা জীবন-যোনি-প্রযত্নের উল্লেখ করা হইয়াছে, সে সম্বন্ধে কবিগুরুর সমর্থনসূচক বা আত্ম-পরিচয়-জ্ঞাপক উক্তিসমূহ উদ্ধৃত করিয়া সংক্ষিপ্ত আলোচনা একান্তই আবশ্যক ও অপরিহার্য। যথাসম্ভব তাঁরই কথায় এই আলোচনা সুসঙ্গত ও সমীচীন হইবে মনে করি।

"সকল মানুষের"ই 'আমার ধর্ম' বলে একটা বিশেষ জিনিস আছে....কোন্ ধর্মটি তার? যে ধর্ম মনের ভিতর গোপন থেকে তাকে সৃষ্টি করে' তুল্‌ছে। জীবজন্তুকে গড়ে তোলে তার অন্তর্নিহিত প্রাণধর্ম। সেই প্রাণধর্মটির কোন খবর রাখা জন্তুর পক্ষে দরকারই নেই। মানুষের আর একটি প্রাণ আছে, সেটা শারীর প্রাণের চেয়ে বড়ো—সেইটে তার মনুষ্যত্ব। এই প্রাণের ভিতরকার সৃজনীশক্তিই হচ্ছে তার ধর্ম। এইজন্যে আমাদের ভাষায় 'ধর্ম' শব্দ খুব একটা অর্থপূর্ণ শব্দ। জলের জলত্বই হচ্ছে জলের ধর্ম, আগুনের আগুনত্বই হচ্ছে আগুনের ধর্ম। তেমনি মানুষের ধর্মটিই হচ্ছে তার অন্তরতম সত্য।" একথাও অবশ্য স্বীকার করিতে হয় যে "মানুষের প্রত্যেকের মধ্যে সত্যের একটি বিশ্বরূপ আছে, আবার সেই সঙ্গে তার একটি বিশেষ রূপ আছে। সেইটেই হচ্ছে তার বিশেষ ধর্ম। সেইখানেই সে ব্যক্তি সংসারের বিচিত্রতা রক্ষা কর্‌ছে। সৃষ্টির পক্ষে এই বিচিত্রতা বহুমূল্য সামগ্রী....আমার অন্তর্যামী জানেন মনুষ্যত্বের মূলে আমার ধর্মের একটি বিশিষ্টতা বিরাজ করছে। সেই বিশিষ্টতাতেই আমার অন্তর্যামীর বিশেষ আনন্দ।" (১)

এই সূত্রাত্মক ভাবধারায় প্রভাবিত একটি প্রবন্ধ, "বঙ্গভাষার লেখক" (১৩১১) নামক গ্রন্থে, কবির 'জীবন-বৃত্তান্ত' লিখিবার অনুরোধ' অনুযায়ী লিখিত ও মুদ্রিত হয়। ইহাতে কবি দ্বিজেন্দ্রলাল প্রমুখ বঙ্গভাষার লেখক ও সমালোচকগণ "দম্ভ ও অহমিকার" সন্ধান পান এবং সেই সময় হইতেই রবীন্দ্রনাথকে সুদীর্ঘ-কাল তাঁহার রচনার অপব্যাখ্যা, অপবাদ ও অপপ্রচার সহিতে হইয়াছিল। নীরব, নির্বিচার বা নির্বিরোধভাবে এই সকল সমালোচনার দরবারে নতি স্বীকার করেন নাই। "আত্মপরিচয়" এর প্রথম নিদর্শন আমরা পাই, রবীন্দ্রনাথ বঙ্গ-দর্শন সম্পাদকের অনুরোধে 'দম্ভ ও অহমিকা' সংক্রান্ত অভিযোগের নিরস-নার্থে যে প্রত্যুত্তর দেন, তাহারই একাংশে এই মর্মে :—

"আমি মনে জানি, অহংকার প্রকাশ করিবার অভিপ্রায় আমার ছিল না....এই বিশ্বশক্তিকে নিজের জীবনের মধ্যেও রচনার মধ্যে অনুভব করা অহঙ্কার নহে। বরঞ্চ অহঙ্কারের ঠিক্ উল্‌টা। কেননা, এই বিশ্বশক্তি কোনো ব্যক্তিবিশেষের বিশেষ সম্পত্তি নহে, তাহা সকলের মধ্যেই কাজ করিতেছে।"

নিজ বক্তব্যের অংশতঃ সমর্থনকল্পে দার্শনিক অধ্যাপক কেয়ার্ডের একটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বলেন ,

"যে আইডিয়া সম্বন্ধে আমরা প্রথমে অচেতন ছিলাম তাহাই যে আমাদিগকে বলাইয়াছে ও করাইয়াছে এবং আমাদের অপরিণত অবস্থারও কথা ও কাজকে আমাদের অজ্ঞাতসারে সেই আইডিয়ারই শক্তি প্রবর্তিত করিয়াছে—আমার ক্ষুদ্র আত্ম-জীবনীতে এই কথাটার উপলব্ধিকে আমি কোনো এক রকম করিয়া বলিবার চেষ্টা করিয়াছি। কথাটা সত্য কি মিথ্যা সেকথা স্বতন্ত্র, কিন্তু ইহা অহংকার নহে, কারণ, ইহা কাহারও একলারী সামগ্রী নহে। তবে কিনা যখন নানা

(৬) "আত্ম-পরিচয়" পৃঃ ৭০-১

(৭) ঐ পৃঃ ৭১

কারণে নিজের জীবনবিকাশের মধ্যে এই আইডিয়াকে স্পষ্ট করিয়া প্রত্যক্ষ করা যায় তখন তাহাকে নিতান্ত সাধারণ কথা ও জানা কথা বলিয়া আর উপেক্ষা করিতে পারিনা।" *(২)

জীবন-ধারার বিকাশে যখনই সম্ভবপর হয়েছে "তরী থেকে তীরে ওঠা" তখনই এই আত্মপরিচয়ের দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত হইয়াছেন এবং ক্রমশঃ উপচিত "আমার ধর্ম" সাহিত্য রচনায় প্রতিফলনে স্বচ্ছ, সহজ ভঙ্গীতে প্রকাশ করিয়াছেন—

তাঁর অকুণ্ঠ স্বীকৃতি পাই যে "যেখানে আমি স্পষ্টতঃ ধর্মব্যাখ্যা করেছি সেখানে আমি নিজের অন্তরতম কথা না বলতেও পারি, সেখানে বাইরের শোনা কথা নিয়ে ব্যবহার করা অসম্ভব নয়। সাহিত্য রচনায় লেখকের প্রকৃতি নিজের অগোচরে নিজের পরিচয় দেয়, সেটা তাই অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ।"(৩)

এইজন্যই দেখি "বঙ্গদর্শন" যুগের এই বাদানুবাদের অন্যূন দশ বৎসর পরে ("সবুজপত্র" পত্রিকায় ১৩২৪ আশ্বিন-কার্ত্তিক সংখ্যায়) আত্ম-সচেতন, পূর্ণতর পরিচয় দিয়েছেন কবিতা ও গানের মধ্য দিয়ে। তাই সার্থক ও স্বতঃসিদ্ধ হয়েছে তাঁর সমসাময়িক চেতন-মানসের স্বীকৃতি—

"আমার ধর্ম আমার উপচেতন-লোকের অন্ধকারের ভিতর থেকে ক্রমে ক্রমে চেতনলোকের আলোতে যে উঠে আস্‌ছে এই লেখাগুলি তারই স্পষ্ট ও অস্পষ্ট পায়ের চিহ্ন। সে চিহ্ন দেখ্‌লে বোঝা যায় যে, পথ সে চেনে না এবং সে জানেনা ঠিক্ কোন দিকে সে যাচ্ছে।" (৫)

সত্যই এই 'পায়ের চিহ্ন' সমৃদ্ধ যে জীবনালেখ্য এই "আমার ধর্ম্ম" শীর্ষক প্রবন্ধে বিচিত্ররূপে প্রকাশ-মাহাত্ম্য লাভ করেছে, তাকে একাধারে সঞ্চয়ধর্ম্মী ও আলোক ধর্ম্মী বলা যায়। কী অনবদ্য-সুন্দর মহিমাতেই না এই অবচেতন-মনের উপচীয়মান দলগুলি চেতনার আলোকসম্পাতে পূর্ণবিকশিত একটি শতদল পদ্মের মতোই উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে।

এই বিকাশের লীলা এখনও যে চরম পর্যায়ের ভূমিকায় উন্নীত হয়নি তারও স্বাক্ষর রয়েছে।

"আমার ধর্ম কী, তা যে আজও আমি সম্পূর্ণ এবং সুস্পষ্ট করে জানি, এমন কথা বল্‌তে পারিনে—অনুশাসন-আকারে তত্ত্ব-আকারে কোনো পুঁথিতে-লেখা ধর্ম, সে তো নয়। সেই ধর্মকে জীবনের মর্ম কোষ থেকে বিচ্ছিন্ন করে, উদ্‌ঘাটিত ক'রে, স্থির ক'রে দাঁড় করিয়ে দেখা ও জানা আমার পক্ষে অসম্ভব—কিন্তু অলস শান্তি ও সৌন্দর্যরসভোগ যে সেই ধর্মের প্রধান লক্ষ্য বা উপাদান নয়, একথা নিশ্চয় জানি।"

(২) "আত্ম পরিচয়" (রবীন্দ্র পরিচয় গ্রন্থমালা) পৃষ্ঠা ১১৫-৬

(৩) ঐ, পৃঃ ৬৫

(৪) ঐ, পৃঃ ৫২

(৫) সবুজ পত্র (আশ্বিন-কার্ত্তিক ১৩২৪)

তবে এই ধর্মবোধের ভূমিকাতেও যে একটি স্থির প্রতিষ্ঠা-ভূমিতে, একটি দিগ্‌দর্শনের নিশ্চিত ক্ষেত্রে, কবিগুরু উন্নীত হয়েছেন তার ভাষাগত প্রমাণ অন্ততঃ ভূরি ভূরি পাওয়া যায় এই প্রবন্ধে। যেমন—

'ধর্মবোধের প্রথম অবস্থায় শান্তম্‌, মানুষ তখন আপন প্রকৃতির অধীন—তখন সে সুখকেই চায়, সম্পদকেই চায়, তখন শিশুর মতো কেবল তার রসভোগের তৃষ্ণা, তখন তার লক্ষ্য প্রেম। তার পরে মনুষ্যত্বের উদ্‌বোধনের সঙ্গে তার দ্বিধা আসে; তখন সুখ এবং দুঃখ, ভালো এবং মন্দ, এই দুই বিরোধের সমাধান সে খোঁজে—তখন দুঃখকে সে এড়ায় না। মৃত্যুকে সে ডরায় না। সেই অবস্থায় শিবম্‌, তখন তার লক্ষ্য শ্রেয়। কিন্তু এইখানেই শেষ নয়—শেষ হচ্ছে প্রেম, আনন্দ। সেখানে সুখ ও দুঃখের, ভোগ ও ত্যাগের, জীবন ও মৃত্যুর গঙ্গা-যমুনা সংগম। সেখানে অদ্বৈতম্‌।" (৬)

সংক্ষেপতঃ বলা যায়,

"ধর্মবোধের এই যে মাত্রা এর প্রথমে জীবন, তারপরে মৃত্যু, তার পরে অমৃত। মানুষ সেই অমৃতের অধিকার লাভ করেছে। কেননা জীবনের মধ্যে মানুষই শ্রেয়ের ক্ষুরধারনিশিত দুর্গম পথে দুঃখকে মৃত্যুকে স্বীকার করেছে......সেইজন্যেইতো মানুষ প্রার্থনা করে, অসতো মাসদ্‌ গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়। 'গময়' এই কথার মানে এই যে, পথ পেরিয়ে যেতে হবে, পথ এড়িয়ে যাবার জো নেই।" (৭)

তাই এই প্রবন্ধের উপসংহারে সুনিশ্চিত-প্রত্যয়ে, অকুণ্ঠিত ভাষণে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

"আমার রচনার মধ্যে যদি কোনো ধর্মতত্ত্ব থাকে তবে সে হচ্ছে এই যে, পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার সেই পরিপূর্ণ প্রেমের সম্বন্ধ উপলব্ধিই ধর্মবোধ—যে প্রেমের একদিকে দ্বৈত আর একদিকে অদ্বৈত, একদিকে বিচ্ছেদ আর একদিকে মিলন, একদিকে বন্ধন আর একদিকে মুক্তি। যার মধ্যে শক্তি এবং সৌন্দর্য্য, রূপ এবং রস, সীমা এবং অসীম এক হয়ে গেছে; যা বিশ্বকে স্বীকার করেই বিশ্বকে সত্যভাবে অতিক্রম করে এবং বিশ্বের অতীতকে স্বীকার করেই বিশ্বকে সত্যভাবে গ্রহণ করে। আমার ধর্ম যে আগমনীর গান গায় সে এই—

"ভেঙেছে দুয়ার এসেছে জ্যোতির্ময়,
তোমারি হউক জয়।" (৮)

এই 'আত্ম-পরিচয়' জীবন-দর্শনের তত্ত্বাঙ্গ সার্থক ও সুবোধ্য করিবে, আশা করা যায়। কিন্তু সাধনাঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত এই জীবন দর্শনের মুখ্যতম আঙ্গিক বলা যায়। সুরকার, সঙ্গীত-স্রষ্টার অধিকারে তাই বলেছিলেন,

"আমাদের সঙ্গীত জিনিসটা ভূমার সুর। তার বৈরাগ্য, তার শান্তি, তার গম্ভীরতা সমস্ত সংকীর্ণ উত্তেজনাকে নষ্ট করে।"

(৬) "আত্ম-পরিচয়" পৃঃ ৭০-১
(৭) ঐ পৃঃ ৭১
(৮) ঐ, পৃঃ ৭১-২

আর প্রতিদিন তাঁর পদপ্রান্তে বাস প্রার্থনা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন—

"হে আমার গুরু, তুমি আমাকে বেসুর থেকে সুরে নিয়ে যাও।"

বস্তুতঃ পক্ষে, কবিগুরুর গীতধর্ম্মী সাধনায়, তাঁর জীবন-জিজ্ঞাসা ও জীবন-দর্শনের মর্মবাণীই এই :—

"মানুষের সঙ্গীত কোন ধ্রুব সত্যকে প্রকাশ করছে? না—সমস্ত ছড়াছড়ির মূলে একটি গভীর মিল আছে, একটি অনির্বচনীয় আনন্দময় মিল। এই মিলের কথাটি ভাষায় বলা যায় না, কেবলমাত্র সুরেই বলা যায়।"

কারণ

"কথা জিনিসটা মানুষেরই আর গানটা প্রকৃতির। কথা সুস্পষ্ট এবং বিশেষ প্রয়োজনের দ্বারা সীমাবদ্ধ; আর গান অস্পষ্ট এবং সীমাহীনের ব্যাকুলতায় উৎকণ্ঠিত। জলের কল্লোলে, বনের মর্মরে, বসন্তের উচ্ছ্বাসে, শরতের আলোকে, বিশাল প্রকৃতির যা কিছু কথা সে তো স্পষ্ট কথায় নয়—সে কেবল আভাসে, ইঙ্গিতে, কেবল ছবিতে গানে। এই জন্যে প্রকৃতি যখন আলাপ করতে থাকে তখন সে আমাদের মুখের কথাকে নিরস্ত করে দেয়, আমাদের প্রাণের ভিতরে অনির্বচনীয়ের আভাসে ভরা গানকেই জাগিয়ে তোলে।" (৯)

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে,উনবিংশ শতাব্দীর প্রখ্যাত জার্ম্মানদেশীয় দর্শন-তত্ত্ববিদ্ আর্ডম্যান (Erdmann) তাঁর বিশ্ববিশ্রুত দর্শন-ইতিহাস-গ্রন্থে একটি সারগর্ভ উক্তি করিয়াছিলেন—

"যখন তোমার অন্তর্জগৎ ব্যাপ্তি ও গভীরতায় বহির্জগৎকে অতিক্রম করিয়া যায়, তখনই জলবুদ্বুদের মতো উৎসারিত হইয়া ওঠে একটি গান।" ["A song is when your inside is too big for the outside and it make a bubble."]

এই গীতধর্মী সাধনার শেষ পর্যায়ে উত্তীর্ণ কবিগুরু তাঁর জীবনসন্ধ্যায় স্পষ্টতর এবং পূর্ণতর স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন "পত্রপুটে"—

"আমার গানের মধ্যে সঞ্চিত হয়েছে দিনে দিনে,
সৃষ্টির প্রথম রহস্য আলোকের প্রকাশ,
আর সৃষ্টির শেষ রহস্য—ভালবাসার অমৃত।"

এই কারণেই সম্ভবপর হয়েছিল সকল সুরবৈভব ও ভাবগাম্ভীর্যে, সৃষ্টির প্রথমতম রহস্যকে "প্রতিসৃষ্টি"র দীপালোকে উজ্জ্বলিত করিয়া এই সঙ্গীত রচনা—

---

(৯) "শান্তি-নিকেতন" ২য় খণ্ড (বৈশাখ ১৩৪২ সাল) (বিশ্বভারতী সংস্করণ) "শ্রাবণ-সন্ধ্যা" পৃঃ ৪১৪-৫

"হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ
কী অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান......

......আপনারে তুমি দেখিছ মধুর রসে
আমার মাঝারে নিজেরে করিয়া দান।"

এই যে তিনি আমার মাঝারে নিজেকে দান করিয়া মধুর রসে আপনাকে দেখিতেছেন—এ রহস্যের মূল রয়েছে এই উপলব্ধিতে যে, তিনি রসস্বরূপ (রসো বৈ সঃ)। তিনি আনন্দরূপে, অমৃতরূপে, যা' কিছু দেখ্‌ছি, তার মধ্যে অনুস্যূত হয়ে আছেন। আমাদের মন কখনও জানিয়া, কখনও না জানিয়া এই পরম ঐক্যের সন্ধান করিয়া ফিরিতেছে। বাউল একেই বলেছে "মনের মানুষ"। প্রশ্ন করেছে "আমি কোথায় পাব তারে আমার মনের মানুষ যে রে?" সঙ্গে সঙ্গেই উত্তরও পেয়েছে—"মনের মধ্যে মনের মানুষ কর অন্বেষণ"। কবিগুরু একেই বলেছেন "মানব-সত্য" অথবা "সর্ব মানুষের জীবন-দেবতা"। এই পরম এক, কোনও অসঙ্গ, অবচ্ছিন্ন, অভাবাত্মক পদার্থ নয়। এই পরম এক হ'তেই দুই এবং দুইয়ের থেকেই চরম অদ্বৈতের আবির্ভাব। সেই ত সৃষ্টির ভাষা, সেই চিরন্তন লীলা—

"অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ
সীমা হতে' চায় অসীমের মাঝে হারা।"

কারণ, যেখানেই রসোপলব্ধি, সেখানেই দ্বৈতের সৃষ্টি, সেখানেই চিত্তের উপস্থিতি এবং রসসঞ্চালন প্রক্রিয়াতে জীবসত্তার সূচনা (যত্র রসস্তত্র চিত্ত-মনুমীয়তে। রসসঞ্চালনাদিনা 'জীবসদ্ভাবঃ সূচ্যতে। সৃষ্টির অর্থই হচ্ছে চিত্তের সৃষ্টি, হৃদয়মনের সৃষ্টি—সেটা কলের সৃষ্টি নয়। সৃষ্টি হয় এই বোধে যে জগৎটা আমার—

"আমার জ্ঞানের, আমার হৃদয়াবেগের, আমার আনন্দ বা সৌন্দর্যানুভূতির যোগেই সৃষ্টি হয়—ওটা রেডিয়ো চাঞ্চল্যমাত্র নয়।"

ঈশ্বর পদার্থের কম্পনেই আলোকের সৃষ্টি হয় না, আলোকের উদ্ভব আলোকের অনুভবে। আমি যে মুহূর্তে দেখ্‌ছি সেই মুহূর্তে সেই দেখার যোগে সৃষ্টি হচ্চে —এই "আমি"র কাব্যভাষ্যে বলেছেন :—

"এ আমার অহংকার
অহংকার সমস্ত মানুষের হয়ে'।
মানুষের অহংকার পটেই
বিশ্বকর্মার বিশ্বশিল্প।"

এখানে অবশ্য নানাবিধ বাদানুবাদ, তর্কবিতর্ক উঠিতে পারে। কেহ দেখিবেন ইহার মধ্যে ভারতীয় দর্শনের "দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ" অথবা "সৃষ্টিদৃষ্টিবাদের" ছায়াপাত। কেহবা আবিষ্কার করিবেন 'দেবতায় অবিমিশ্র মানবিকতার আরোপ' কিংবা অপরিশোধিত অহংকারকে দেবতার আসনে উত্তীর্ণ করিবার ব্যর্থ প্রয়াস মাত্র। সবই মানিয়া নেওয়া গেল, কিন্তু বাক্যবিন্যাস ব্যতীত এতে কি আর লাভ হয়?

শিল্পসাধনায় বা নন্দনতত্ত্বে এই "অহংকারে"র পরিমার্জিত, অভিনব সংস্করণ দেখা যায়। যখনই কোনও সুন্দর বস্তু আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তার অন্তঃস্থল হইতে যেন শুনি এক "অনুনয়" বা আবেদন—"তোমাদেরই মন পাইবার জন্য এই বিশ্বের প্রাঙ্গণে মুখ তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছি।" ভারতীয় অলঙ্কার-শাস্ত্র বিদ্‌গণের মতে এই "অনুনয়" সৌন্দর্য্যবোধের প্রাণস্বরূপ। অশিক্ষিত বাউল কবি এই সত্যেরই আভাস দিয়েছিলেন দুই ছত্রে—

> "রূপ দেখিলাম রে নয়নে আপনার রূপ দেখিলাম।
> আমার মাঝত বাহির হইয়া দেখা দিল আমারে॥"

তবেই প্রণিধান করি যে, অসীম যেখানে সীমাকে গ্রহণ করেছেন সেইটে হ'ল মনের দিক। সেই দিকেই দেশকাল, সেইদিকেই রূপ-রস গন্ধ, সেই দিকেই তাঁর প্রকাশ। অসীমের বাণী অর্থাৎ 'সীমার মধ্যে অসীমের প্রকাশই হচ্চে অহমস্মি। আমি আছি। এই এক "আমি—আছি" লক্ষ লক্ষ "আমি—আছি"তে ছড়িয়ে পড়েছেন—তবু তাঁর সীমা নেই। যদিচ আমার "আমি—আছি" সেই মহা "আমি-আছি"রই প্রকাশ কিন্তু তাই বলে' একথাও বলা চলে না যে এই প্রকাশে তাঁর প্রকাশ সমাপ্ত।

কবিগুরুর অতুলনীয় ভাষায় এই সৃষ্টিতত্ত্বের উপসংহার করা সমীচীন ও শোভন হইবে:—

> "রূপই আমার কাছে আশ্চর্য্য, রসই আমার কাছে মনোহর। সকলের চেয়ে আশ্চর্য্য এই যে আকারের ফোয়ারা নিরাকারের হৃদয় থেকে নিত্যকাল উৎসারিত হ'য়ে কিছুতেই ফুরতে চাচ্চে না। আমি এই দেখেছি যেদিন আমার হৃদয় প্রেমে পূর্ণ হয়ে ওঠে, সেদিন চন্দ্রালোকের মাধুর্য্য ঘনীভূত হয়—সেদিন সমস্ত জগতের সুর এবং তাল, নতুন তানে, নতুন লয়ে বাজতে থাকে—তার থেকেই বুঝতে পারি জগৎ আমার মন দিয়ে আমার হৃদয় দিয়ে ওতপ্রোত......তার থেকেই জেনেছি, এই জগতের জলস্থল আকাশ আমার হৃদয়ের তন্তু দিয়ে বোনা, নইলে আমার ভাষার সঙ্গে এর ভাষার কোনো যোগই থাক্‌ত না—গান মিথ্যা হ'ত, কবিত্ব মিথ্যা হ'ত, বিশ্বও যেমন বোবা হ'য়ে থাক্‌ত আমার হৃদয়কেও তেমনি বোবা করে' রাখ্‌ত।....আমি ধন্য যে আমি পান্থশালায় বাস করচিনে, রাজ প্রাসাদের এক কাম্‌রাতেও আমার বাস নির্দিষ্ট হয়নি; এমন জগতে আমার স্থান আমার আপনাকে দিয়ে যার সৃষ্টি; সেইজন্যই এ কেবল পঞ্চভূত বা চৌষট্টিভূতের আড্ডা নয়; এ আমার হৃদয়ের কুলায়, এ আমার প্রাণের লীলাভবন, আমার প্রেমের মিলন-তীর্থ।"(১০)

(১০) সঞ্চয়, "আমার জগৎ" ১২৪, ১২৫, ১২৬

যেমন সৃষ্টিতত্ত্বে তেমনি মুক্তিতত্ত্বে কবিগুরুর ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্যের প্রভাব সমপর্য্যায়ে উপলব্ধি করা যায়। আমাদের দেশে বিভিন্ন দর্শন ও ধর্ম সম্প্রদায়ে "মুক্তি"কে নঞর্থক, কামনাবিহীন, অভাবাত্মক এক অবস্থারূপে কল্পনা করা হয়েছে। কিন্তু তাঁরই কথায় "বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।" প্রকৃতির দাসত্বে মানুষের অভাবটাই প্রকাশ পায়, স্বভাবটা নয়। স্বভাবতই সে প্রভু, এইজন্যই মানুষ এই একটি আশ্চর্য্য কথা বলে যে আমি মুক্তি চাই। কি হইতে সে মুক্তি চায়? না, যা কিছু সে চাহিতেছে তাহা হইতে সে মুক্তি চায়। সে বলে আমাকে বাসনা হইতে মুক্ত কর—আমি দাসপুত্র নই অতএব আমাকে ঐ বেতন চাওয়া হইতে নিষ্কৃতি দাও। বেতন কর্মের মূল নয়, আনন্দই কর্মের মূল। বেতনের দ্বারা কৃত্রিম উপায়ে আমরা সেই আনন্দকেই আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করি।

যদি এই কথা সত্য হয় যে ব্রহ্ম কেবল আপনার অব্যক্ত স্বরূপেই আনন্দিত, তা হ'লে তাঁর সেই অব্যক্ত স্বরূপের মধ্যে বিলীন না হ'লে নিরানন্দের হাত থেকে আমাদের কোন ক্রমেই নিস্তার থাকত না। কিন্তু সেত হতেই পারে না। বিশ্ব তার আনন্দরূপ কিন্তু আমরা রূপকে দেখ্‌চি আনন্দকে দেখ্‌চিনে—সেইজন্য রূপ কেবল পদে পদে আমাদের আঘাত কর্‌চে—আনন্দকে যেমনি দেখ্‌ব অমনি কেউ আর আমাদের কোন বাধা দিতে পার্‌বে না। সেই তো মুক্তি। সেই মুক্তি বৈরাগ্যের মুক্তি নয়, যোগের মুক্তি। লয়ের মুক্তি নয়, প্রকাশের মুক্তি। তবে সংসারের মধ্যে, আমাদের মুক্তি কোন্‌খানে?—প্রেমে। যখনি জান্‌ব প্রয়োজনই মানব-সমাজের মূলগত নয়—প্রেমেই এর নিগূঢ় এবং চরম আশ্রয়—তখনি এক মুহূর্ত্তে আমরা বন্ধন মুক্ত হয়ে যাব। এই ত গেল মুক্তি। কিন্তু এও চরম সত্য নয়।

"যদি বলি মানুষ মুক্তি চায় তবে মিথ্যা বলা হয়। মানুষ মুক্তির চেয়ে ঢের বেশী চায়—মানুষ অধীন হতেই চায়। যার অধীন হ'লে অধীনতার অন্ত থাকে না তারই অধীন হবার জন্য সে কাঁদ্‌ছে। সে বল্‌ছে হে পরম প্রেম, তুমি যে আমার অধীন, আমি কবে তোমার অধীন হব। অধীনতার সঙ্গে অধীনতার পূর্ণ মিলন হবে কবে? যেখানে আমি উদ্ধত, গর্বিত, স্বতন্ত্র সেই-খানেই আমি পীড়িত, আমি ব্যর্থ। হে নাথ, আমাকে অধীন করে', নত করে', আমাকে বাঁচাও'।"

"জীবন-স্মৃতি"তে তাই কবিগুরু তাঁর সুপরিচিত উক্তিটি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন এই মর্মে—

"আমার সমস্ত কাব্য-রচনার ইহাই একটি ভূমিকা। আমার ত মনে হয় আমার কাব্য-রচনার এই একটি মাত্র পালা। সে পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে 'সীমার মধ্যেই অসীমের

সহিত মিলন-সাধনের পালা'। তাই "এ জগৎ-জোড়া ঘরটিতে, কেবল দুটিমাত্র লোকের ঠাঁই হয়—সেই বিশ্বপদ্মের কেন্দ্রগত মধুকোষে যে অপূর্ব পুরুষটি বসিয়া আছেন—তাঁহার, এবং সেই কমলমধুপিয়াসী যে চিত্তভ্রমর তাঁহার উদ্দেশে ঘুরিয়া ফিরিতেছে তাহার—কেবলমাত্র এই দুজনার।"

এইটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, ভারতীয় ধর্ম সাধনায় এই অসাম্প্রদায়িক মুক্তির বাণী এদেশের লোকচিত্তক্ষেত্রে কী ভাব গৌরবে, কী ভাষার লালিত্যে আজও সার্থক, সমুজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্য বা সাম্প্রদায়িক দর্শনগোষ্ঠীতে এইসব সহজ-ধারার মরমী সাধক ও কবি একেবারেই অপাংক্তেয়। এই রকম একটি তথাকথিত 'অশিক্ষিত' বা অর্দ্ধশিক্ষিত বাউল কবির "মুক্তি"-তত্ত্ব পূর্ব ও পশ্চিমের সুধী, শিক্ষিত সমাজে—নিখিল ভারতীয় দর্শন মহাসম্মেলনের প্রাথমিক অধিবেশনে (১৯২৫), 'আমাদের জাতীয়জীবন দর্শন' শীর্ষক সভাপতির অভিভাষণে, এবং তার পাঁচ বৎসর পরে 'মানুষের ধর্ম' ('Religion of Man') অক্স্‌ফোর্ডে "হিবার্ট্‌" বক্তৃতায় ইংরাজীতে অনুবাদ সহ প্রকাশিত করিয়া, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এই (তথাকথিত) অনগ্রসর চিন্তাধারাকে এক সম্মানিত আসন দিয়াছেন। বাউলের সেই গানটি ছিল এই—

হৃদয়-কমল উঠ্‌তেছে ফুটি কতো যুগ ধরি,
তাতে তুমিও বাঁধা আমিও বাঁধা উপায় কি করি ?
ফুটে ফুটে কমল, ফুটার না হয় শেষ
এই কমলের যে এক মধু, রস যে তায় বিশেষ।
ছেড়ে যেতে লোভী ভ্রমর পারো না যে তাই
তাইতে তুমিও বাঁধা, আমিও বাঁধা, মুক্তি কোথাও নাই।

এই ভাবের পূর্ণতম স্বীকৃতি দেখি কবিগুরুর "আমার ধর্ম" প্রবন্ধে—

"আমার রচনার মধ্যে যদি কোন ধর্মতত্ত্ব থাকে তবে সে হচ্ছে এই যে, পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার, সেই পরিপূর্ণ প্রেমের সম্বন্ধ উপলব্ধিই ধর্মবোধ, যে প্রেমের একদিকে দ্বৈত আর একদিকে অদ্বৈত, একদিকে বিচ্ছেদ, আরেক দিকে মিলন, একদিকে বন্ধন, আর একদিকে মুক্তি। এই যে আপাত-বিরুদ্ধতার ভাব, এর সমাধান করিয়াছেন "শান্তিনিকেতন" যুগের "সামঞ্জস্য" প্রবন্ধে—"তর্কের ক্ষেত্রে দ্বৈত এবং অদ্বৈত, পরস্পরের একান্ত বিরোধী ; হাঁ যেমন না'কে কাটে, না যেমন হাঁকে কাটে, তা'রা তেমনি বিরোধী। কিন্তু প্রেমের ক্ষেত্রে দ্বৈত এবং অদ্বৈত ঠিক্ একই স্থান জুড়ে রয়েছে......ভগবান্ প্রেমস্বরূপ কিনা, তাই তিনি এককে নিয়ে দুই করেছেন, আবার দুইকে নিয়ে এক করেছেন। স্পষ্টই যে দেখ্‌তে পাচ্ছি, দুই যেমন সত্য একও তেমনি সত্য....ধর্মশাস্ত্রে তো দেখা যায়, মুক্তি এবং বন্ধনে এমন বিরুদ্ধ সম্বন্ধ যে কেউ কাউকে রেয়াত্ করে না। বন্ধনকে নিঃশেষে নিকাশ করে দিয়ে মুক্তিলাভ কর্‌তে হবে, এই আমাদের প্রতি উপদেশ। তাই মনে

হয় স্বাধীনতা জিনিসটা যেন একটি চূড়ান্ত জিনিস। পাশ্চাত্য শাস্ত্রেও, এই সংস্কার আমাদের মনে বদ্ধমূল করে দিয়েছে। কিন্তু একটি ক্ষেত্রে আছে যেখানে অধীনতা এবং স্বাধীনতা ঠিক্ সমান গৌরব ভোগ করে, একথা আমাদের ভুল্‌লে চল্‌বে না। সে হচ্ছে প্রেমে।....প্রেম যেমন স্বাধীন এমন স্বাধীন আর দ্বিতীয় কেউ নেই, আবার প্রেমের যে অধীনতা, এত বড়ো অধীনতা বা জগতে কোথায় আছে?"

এই প্রেমেই আমরা অনন্তের স্বাদ পাই—

"প্রেমই সীমার মধ্যে, অসীমতার ছায়া ফেলে, পুরাতনকে নবীন করে রাখে, মৃত্যুকেই কিছুতেই স্বীকার করে না"

এই "প্রেমকেই যখন পরিপূর্ণরূপে পাবার জন্য আমাদের অন্তরাত্মার সত্য আকাঙ্ক্ষা আবিষ্কার করি, তখন আমরা সমস্ত উপকরণকে অনায়াসেই ঠেলে দিতে পারি। যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্?......এই প্রার্থনাই আমাদের প্রত্যেকের একমাত্র প্রার্থনা। এবং এই প্রার্থনাই বিশ্বমানবের বিরাট্ ইতিহাসে, যুগে যুগান্তরে উচ্চারিত হয়ে আস্‌ছে।"

কিন্তু এ তত্ত্বও চরম তত্ত্ব নয়। সকল বোঝা-পড়া জানা-শোনার পারে যে অজানার অনিশ্চয়তা তা'তেই বোধহয় সকল জিজ্ঞাসা ও আকূতির সমাপ্তি এবং পরিতৃপ্তি। মহাপ্রয়াণের ছয় সপ্তাহ পূর্বে (২৩শে জুন ১৯৪১ তারিখে) শ্রী বিশু মুখোপাধ্যায়কে লিখিত একটি পত্রে তদানীন্তন মনোভাব যথাযথ প্রকাশ করেন এই মর্মে:—

"আমার মনে পড়ে বেদের সেই বাণী 'কো বেদঃ' অর্থাৎ কে জানে, যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনিই কি জানেন, কিংবা জানেন না। এমন সন্দেহের বাণী বোধ হয় আর কোনো শাস্ত্রে প্রকাশ হয়নি যে, যার সৃষ্টি তিনি আপন সৃষ্টিকে জানেন না। সৃষ্টি তাঁকে বহন করে নিয়ে চলে। আসল কথা চরম প্রশ্নের কোন উত্তর নেই।"

"ঋগ্বেদ-সংহিতা"র শেষ পর্য্যায়ে দশম মণ্ডলস্থ সেই-জানা-অজানার দোলায় সমর্পিত যে চরম তত্ত্ব কবিগুরুর এই পত্রে উদ্ধৃত হয়েছে তার সম্পূর্ণ বাক্যটি এই—

"কো অদ্ধাবেদ ক ইহ প্রবোচৎ কুত আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ।
অর্বাগ দেবা অস্য বিসর্জনেনাথা কো বেদ যত আবভূব॥"

তাই বুদ্ধদেবের মতই স্বগতোক্তি করিতে চাহিয়াছিলেন—

"আমি চরমের কথা বল্‌তে আসিনি। আমি 'পথের কথা'ই বল্‌ব"।

এতেই কবিগুরুর জীবন-দর্শন লাভ করেছে তার চরম ও পরম সার্থকতা। "প্রথম দিনের সূর্য্য" যেভাবে অভিনন্দিত হয়েছিল "প্রভাত-উৎসব" ও "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" কবিতায়, তারই অনুরণন চলিয়াছিল শেষ পর্য্যন্ত একই সুরে—

"প্রথম দিনের সূর্য
প্রশ্ন করেছিল
সত্তার নূতন আবির্ভাবে
কে তুমি?
মেলেনি উত্তর।
বৎসর বৎসর চলে গেল
দিবসের শেষ সূর্য
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল
পশ্চিম সাগর তীরে
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়—
কে তুমি?
পেল না উত্তর॥"

এই "পশ্চিম সাগর তীরে" কথাটির মধ্যে যে দ্যোতনা, তার উপর আর এক শতাব্দী পারের সূর্য্য কি আলোকপাত করিবে?